বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

মুহম্মদ মতিউর রহমান
প্রফেসর ও সাবেক প্রধান বাংলা বিভাগ,
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রকাশক
এস. এম. রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

মতিঝিল অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ :জিলহজ্জ ১৪২২, ফাল্গুন ১৪০৮
ফেব্রুয়ারি ২০০২
দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
জানুয়ারি -২০১৩

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদ : ডিজাইন ওয়ান

মূল্য ঃ ৪০০/-

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Bangla Sahitye Muslim Aytijjya (Muslim Heritage in Bangali Literature) Written by Muhammad Matiur Rahman Published by: S.M. Raisuddin, Director, Publication, Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000.
Price: Tk. 400.00/- US$: 12/- **ISBN. 984-70241-0054-6**

www.nagorikpathagar.org

ভূমিকা

'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য' প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সনে। তখন এতে মোট ১৬টি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। গ্রন্থটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকাভুক্ত হয়। প্রথম সংস্করণ অনেক আগেই নিঃশেষ হওয়া সত্ত্বেও আরো বৃহৎ কলেবরে প্রকাশ করার আশায় গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হলো। দ্বিতীয় পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে প্রথম সংস্করণের দু'টি প্রবন্ধ বাদ দেয়া হয়েছে, দু'টি প্রবন্ধ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে, বাকিগুলো পরিমার্জিত আকারে স্থান পেয়েছে; নতুন ১৮টি প্রবন্ধ সংযোজিত হবার ফলে গ্রন্থের কলেবর দ্বিগুণের অধিক হয়েছে। আশা করি, এতে বহুলাংশে পাঠকের চাহিদা পূরণ হবে।

বাংলা ভাষার উৎপত্তি বৌদ্ধ-পাল শাসনামলে। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সেন আমলে বাংলা ভাষার চর্চার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়। তখন রাজভাষা ছিল সংস্কৃত। ঐ সময় ছিল বাংলা ভাষার জন্য চরম দুর্দিন। মুসলিম শাসনামলে বাংলা ভাষার নবজন্ম ঘটে, বাংলা সাহিত্যের চর্চা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। মুসলিম শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল কবি-সাহিত্যিক বাংলা ভাষার চর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু ধর্মীয় চিন্তা ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা ভিন্নতর হওয়ায় উভয়ের রচিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু, ভাব ও আবেদন অনেকটা ভিন্নরূপে দেখা দেয়। এ কারণে অভিন্ন বাঙালি সত্তা হওয়া সত্ত্বেও বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা ভিন্নতর রূপ লাভ করে। এটা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এ বাস্তবতার কারণেই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উপমহাদেশে দুটি পৃথক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সাহিত্য সে ঐতিহাসিক বাস্তবতার গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধারণ করে এক স্বাধীন জাতি ও সমৃদ্ধ সাহিত্যের উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান গ্রন্থে সে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের প্রসঙ্গই নানাভাবে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

আশা করি, গ্রন্থটি পাঠকের নিকট সাদরে গৃহীত হবে। বিশেষত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি একটি উপাদেয় গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হবে বলে মনে করি। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

মুহম্মদ মতিউর রহমান
প্রফেসর ও সাবেক বাংলা বিভাগীয় প্রধান
এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা

www.nagorikpathagar.org

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ
ডক্টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল
ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
শহীদ অধ্যাপক আনোয়ার পাশা

যাঁদের কাছ থেকে পেয়েছি অশেষ প্রেরণা

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশ একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার নাম হলেও বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য ও বাংলাদেশের ইতিহাসে নানা পালাবদল ঘটেছে। জাতিগতভাবেও বাঙালির পরিচয় কখনও একরকম থাকে নি। এখানে আর্য-অনার্য, জৈন-হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম বিভিন্ন ভাষা-ধর্ম ও জাতিগোষ্ঠির এক আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে যুগ যুগ ধরে। ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে।

বাংলাদেশে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপক উৎকর্ষের যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। সে সময় রচিত বৌদ্ধ গান ও দোহা বা চর্যাপদে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন ও আচরণ-বিধির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তিতে রচিত মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব কাব্য ইত্যাদিতে হিন্দু ধর্ম, দর্শন ও জীবনাচারের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম আমলে ইসলামী ভাবাদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখা আর একটি বলিষ্ঠ জীবনবাদী সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এ বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান অত্র গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের সে বৈচিত্র্য ও এর স্বরূপ নির্ণয়ে গভীর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়েছেন। দীর্ঘকাল তিনি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করার ফলেই তাঁর পক্ষে এ দূরহ কাজটি করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলা ভাষার বিকাশে বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছিল। দূর্ভাগ্যবশত সেন আমলে বর্ণবাদী ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যবাদীদের বিমাতাসুলভ আচরণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। পরবর্তী মুসলিম শাসনামলে লুপ্ত প্রায় বাংলা ভাষার নবজন্ম ঘটে এবং বাংলা সাহিত্য বিভিন্ন ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এ যুগকে তাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের 'স্বর্ণ যুগ' বলা হয়। ইংরাজ আমলে খ্রিস্টান পাদ্রী ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের যোগসাজশে বাংলা ভাষার স্বাভাবিক বিকাশের পথ কিছুটা রুদ্ধ হলেও পরবর্তীতে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দির শুরু থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যুগের চাহিদা অনুযায়ী নতুনভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের অবদান নানা বিষয়-বৈভব ও বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। গ্রন্থকার এ গ্রন্থে সে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের বিষয় যথাসাধ্য মূল্যায়নের প্রয়াস পেয়েছেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা কালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসূ পাঠক ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা বিবেচনা করেই এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আশা করি, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সহায়ক গ্রন্থ হিসাবে এটি বিশেষ উপাদেয় হিসাবে বিবেচিত হবে।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.nagorikpathagar.org

সূচী

	পৃষ্ঠা
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য	০৭
উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনা	৩৯
মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা	৬৩
মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন	৭৪
মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	৮৫
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী	৯৬
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	১০৩
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১১০
ইব্রাহীম খাঁ	১২৫
গোলাম মোস্তফা	১৩৮
আবুল মনসুর আহমদের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা	১৬১
গদ্যশিল্পী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	১৭৬
মাহবুব-উল আলম	২০৩
কাজী নজরুল ইসলাম	২১১
জসীমউদ্‌দীন	২২০
বে-নজীর আহমদ	২৩৬
বন্দে আলী মিয়া	২৪৯
মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা	২৮০
শামসুন নাহার মাহমুদ	২৮২
কাজী কাদের নওয়াজ	২৮৫
ফররুখ আহমদ	৩০০
তালিম হোসেন	৩০৮
সৈয়দ আলী আহসান	৩৩৩
মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	৩৪৪
কথাশিল্পী শাহেদ আলী	৩৬১
সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা	৩৭৩
আবদুর রশীদ খান	৩৮৮
আসকার ইবনে শাইখ	৩৯৯
কাজী দীন মুহম্মদ	৪০৭
আবদুস সাত্তার	৪১৬
সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ নূরী	৪২১
কথাসাহিত্যিক রাজিয়া মজিদ	৪৩০
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌	৪৩৮
আল মাহমুদ ও তাঁর নিজস্ব কাব্যভুবন	৪৬৪
শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ	৪৮৭
আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য সাধনা	৪৯৭
আফজাল চৌধুরী	৫০৮

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য

কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরা তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন তাঁদের সৃষ্টি-কর্মে। অনুভূতি ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই প্রত্যেকের সৃষ্টি-কর্মেই একটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। অনুভূতির সাথে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক অবিভাজ্য। অভিজ্ঞতার মধ্যেই ব্যক্তিগত অনুভূতির জন্ম, অথবা বলা যায়, অনুভূতির পুষ্পকোরক বিকশিত হয় অভিজ্ঞতার কাননে। অভিজ্ঞতা আবার দু'রকম। একটি ব্যক্তিগত ও সমকালীন, অন্যটি সমষ্টিগত ও চিরন্তন। কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী তাঁদের সৃষ্টি-কর্মে এ দু'রকম অভিজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। তবে মহৎ ও বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী ব্যক্তি ও সমকালীন অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত ও চিরন্তন বা যুগাতীত অভিজ্ঞতার জারক-রসে তাঁদের সৃষ্টি-কর্মকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাই তাঁদের আবেদনও ব্যক্তি বা সমকালকে অতিক্রম করে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী বা কালাতীতকে স্পর্শ করে।

মহৎ বা কালজয়ী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মধ্যে সমষ্টিগত জীবন-ব্যঞ্জনার অভিব্যক্তি ঘটান। সমকালীন জীবন-অভিজ্ঞতার মধ্যে তাঁরা যুগ-চিত্ত বা যুগধারাকে উপলব্ধি করেন। বর্তমানটাই সব নয়; বহু যুগের, দীর্ঘ বিস্তৃত অতীতের অভিজ্ঞতা, সাধনা-সংগ্রাম ও অর্জনের উপর বর্তমানের চির চঞ্চল ভীত সংস্থাপিত। আজ যা বর্তমান, কাল তাই অতীত। এভাবে আমাদের জীবন ও অভিজ্ঞতা গড়িয়ে চলেছে অন্তহীন ভবিষ্যতের দিকে। ভবিষ্যতও প্রতিনিয়ত তার অবগুণ্ঠন মুক্ত করে দিয়ে বর্তমান হয়ে অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাই এক অর্থে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই। এক চিরায়ত মহাকাল সর্বব্যাপী হয়ে সবকিছুকে ধারণ করে আছে। এ মহাকালের অনন্ত বিস্তার ও অভিজ্ঞানকে বলা যায়

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহ্য। মানুষ যেমন তার নিজেকে অস্বীকার করতে পারে না, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করাও তেমনি দুঃসাধ্য। তবে এ ঐতিহ্যকে কেউ সজ্ঞানে সচেতন উপলব্ধির মধ্যে প্রবলভাবে অনুভব করেন, কেউ হয়ত এ সম্পর্কে উদাসীন থাকেন, সজ্ঞান উপলব্ধির মধ্যে তাঁরা প্রবলভাবে এটাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন। এটা ব্যক্তিগত শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চর্চার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তবে ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। যারা সজ্ঞানে এটা অনুসরণ করেন তারা অবশ্যই মহৎ ও উন্নত সৃষ্টি উপহার দিতে সক্ষম হন। আর যারা এটাকে অস্বীকার করেন মূলত তাঁদের সৃষ্টি প্রায়শই সাময়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে ব্যর্থ হয়। এ সম্পর্কে ইংরাজ সমালোচক Sampson– এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"An artist of the first rank accepts tradition and enriches it; an artist of the lower rank accepts tradition and repeats it; an artist of the lowest rank rejects tradition and strives for originality" অর্থাৎ প্রথম সারির শিল্পীরা ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেন ও তাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন, দ্বিতীয় সারির শিল্পীরা ঐতিহ্য গ্রহণ করেন ও তার পুনরাবৃত্তি করেন এবং তৃতীয় সারি অর্থাৎ নিম্নমানের শিল্পীরা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে নিজেদের মৌলিকত্ব বিকাশে যত্নবান হন।

মৌলিকত্ব বিকাশ বা স্বকীয়তা প্রকাশের প্রচেষ্টা কোন খারাপ বা নিন্দনীয় বিষয় নয়। ঐতিহ্যকে স্বীকার বা অনুসরণ করেও এটা সম্ভব। কিন্তু ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এটা করার অর্থ নিজের অস্তিত্বের মূল ভিত্তিটাকেই অস্বীকার করা। গাছের গোড়া কর্তন করে তার শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব বৃদ্ধির প্রত্যাশা করা যেমন অবান্তর, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে স্বকীয়তা বিকাশের চেষ্টাও অনেকটা তেমনি পণ্ডশ্রম সমতুল্য। তাই দেখা যায়, সব দেশে সব যুগে সব বড় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীই কোন না কোন ঐতিহ্যের শুধু অনুসারীই নন, স্বীয় ঐতিহ্য থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে তাঁরা তাঁদের অমর সৃষ্টি-কর্মে ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে বাংলাদেশে ইসলাম-পূর্ব বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত গুপ্ত রাজবংশের রাজত্বকাল। এ সময় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির বিশেষ প্রচার ও প্রসার ঘটে। গুপ্তযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব হয়নি। সুতরাং ঐ যুগে বাংলা-সাহিত্যে প্রতিফলিত ঐতিহ্যের আলোচনার প্রশ্নও অবান্তর। গুপ্ত যুগের পর বৌদ্ধ পাল রাজাদের রাজত্বকাল শুরু

www.nagorikpathagar.org

হয়। পাল আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ঘটে। তবে এ আমলে রচিত চর্যাপদ ছাড়া বাংলা সাহিত্যের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। চর্যাপদ রচনা করেন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ। এতে বাংলাদেশের নদী-নালা-প্রকৃতি, মানুষ, মানুষের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা-আনন্দের কথা ব্যক্ত হয়েছে এবং সর্বোপরি গূঢ়ার্থে বৌদ্ধধর্মের কথা নানা উপমা, রূপক ও ইঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্পকলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময়কার সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে হিন্দুধর্মের প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের একটা মিলিত বা সংকর প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। মূলত সাধারণ জন-জীবনে তথা গ্রামীণ বা লোকজ সমাজ-সংস্কৃতিতে এ মিশ্র বা সংকর প্রভাব ছিল অনেকটা ব্যাপক। ফলে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই নয়, ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও একটি সমন্বিত ধারার সৃষ্টি হয়, যেটা সূক্ষ্ম অর্থে বৌদ্ধধর্মও নয়, হিন্দুধর্মও নয়। বরং উভয় ধর্মের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের সাথে লোকজ চিন্তা-ভাবধারা, রীতি-নীতি, আচার-অনুশীলন সংমিশ্রিত হয়ে এক নতুন ধর্মমতের রূপ লাভ করে। স্থান-কাল ভেদে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত হলেও মূলত এর সাধারণ পরিচয় লোকজ ধর্ম হিসাবে। অতএব, পাল-যুগে বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তিনটি ধারা বা ধর্মীয় ঐতিহ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। তা হলোঃ

এক. বৌদ্ধ ঐতিহ্য
দুই. হিন্দু ঐতিহ্য
তিন. লোকজ ঐতিহ্য

অষ্টম শতাব্দী থেকে আর একটি ক্ষীণ ধারা বাংলা সমাজ-সংস্কৃতিতে ক্রমশ অনুপ্রবিষ্ট হতে শুরু করে, তা হলো ইসলামী ধারা। প্রথমত ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চল বিশেষত চট্টগ্রাম ও দ্বীপাঞ্চল এলাকায় ধীরে ধীরে ইসলামের প্রচার শুরু হয়। দ্বিতীয়ত আরব দেশ থেকে বিভিন্ন সময় ধর্ম-প্রচারক, পীর-দরবেশ-আউলিয়াগণ ঐ সময় থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এসে ইসলামের প্রচার শুরু করেন। তবে সঠিক তত্ত্ব-তথ্যের অভাবে ঐ সময় ইসলামের প্রচার-প্রসার কতটা হয়েছিল এবং তৎকালীন বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার প্রভাব কতটা প্রতিফলিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে অনুমান করা যায় যে, ঐ সময় ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়তো তেমন ব্যাপকতা লাভ

www.nagorikpathagar.org

করেনি, ফলে তৎকালীন সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তার প্রভাব ছিল ক্ষীণ অথবা এও হতে পারে যে, পরবর্তীকালে সেন আমলে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবার সাথে সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সবকিছুও হয়ত ধ্বংস হয়। সেন-ব্রাহ্মণদের জাতিগত স্বভাব, অন্য ধর্মের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক মনোভাবই এরূপ অনুমান-আন্দাজের একমাত্র ভিত্তি।

একাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশীয় আর্য-ব্রাহ্মণগণ বাংলায় রাজত্ব বিস্তার করে। তারা বৌদ্ধ ধর্ম, বৌদ্ধদের শিল্প-সাহিত্য-স্থাপত্য সবকিছু ধ্বংস করে। বৌদ্ধদেরকেও পাইকারীভাবে হত্যা করে। অনেকে প্রাণভয়ে পার্বত্য অরণ্যানী অঞ্চল ও দেশের বাইরে বর্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, চীন প্রভৃতি দেশে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করে। অনেকে নিরুপায় হয়ে নিজ ধর্ম ত্যাগ করে নীচ জাতীয় হিন্দু হিসাবে জীবন রক্ষা করে। ফলে পাল আমলের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্য ইত্যাদি অনেক কিছু থেকেই আমরা বঞ্চিত হই।

সেন আমলে রাজ-ভাষা ছিল সংস্কৃত। কিন্তু শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ পুরুষ ব্যতীত অন্য কারো সংস্কৃত চর্চা ও বেদ পাঠের অধিকার নেই। এমনকি ব্রাহ্মণ নারীদেরও বেদ পাঠের অধিকার নেই। ফলে পুরুষ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য শ্রেণীর হিন্দুদের (অহিন্দুদের তো প্রশ্নই ওঠে না) ধর্ম-চর্চা, বেদ-পাঠ, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা বা জ্ঞান-চর্চার কোন সুযোগই ছিল না। অপরদিকে, সংস্কৃত ব্যতীত অন্য ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়। সাধারণ মানুষ ধর্ম-চর্চা, জ্ঞান-চর্চা, মাতৃভাষার চর্চা ও মেধা বিকাশের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। একমাত্র ব্রাহ্মণদের পদসেবা ও বিনা বাক্যব্যয়ে তাদের আদেশ শিরোধার্য করাই সাধারণ মানুষের ধর্ম-কর্ম-কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। এ অবস্থা সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান লিখেছেন।

“দেশের জনসাধারণ এইভাবে প্রথমে মাতৃভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিবার সুযোগ হারাইল। মাতৃভাষার পরিবর্তে যে ভাষার মহিমা তাহাদের কাছে কীর্ত্তিত হইল সে ভাষারও চর্চা করিবার অধিকার সকলে পাইল না। নতুন বিদেশী ভাষা (সংস্কৃত) দেশের জনসাধারণকে শিখাইবার উপযুক্ত শিক্ষায়তন স্থাপিত হইল না। যাহা হইল তাহা শুধু শ্রেণী বিশেষের জন্য। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় জনসাধারণের কোন বক্তব্য না থাকায় চিন্তা হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইল। শাস্ত্র বাক্য ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়া বিনা তর্কে মানিয়া লইবার অভ্যাসের

www.nagorikpathagar.org

ফলে বুদ্ধি ও কল্পনার উৎকর্ষ হইতে পারিল না। সুতরাং দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে তাহাদের কোনরূপ কৃতিত্বই সম্ভব হইল না।" (নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস ৩য় প্রকাশ, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, অক্টোবর, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-২১৩)।

সেন আমলে বহিরাগত সংস্কৃত ভাষার যথেষ্ট চর্চা হয়। বলাবাহুল্য, সেটা শুধু ব্রাহ্মণদের দ্বারা, অন্য কারো এ ভাষার চর্চা করার অধিকার ছিল না। আবার সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা চর্চার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। দেশীয় ভাষা বাংলা সম্পর্কে আর্য-ব্রাহ্মণদের নিষেধাজ্ঞা ছিল এরূপঃ 'নম্লেচ্ছ ভাষা শিক্ষেত'–অর্থ্যাৎ ম্লেচ্ছ ভাষা শেখা নিষেধ। অতএব, সেন আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশ ঘটার আদৌ কোন সুযোগ ছিল না। অবশ্য শাসক ও পুরোহিত শ্রেণীর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও মাতৃভাষা বা মুখের ভাষাকে নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে সম্পূর্ণ আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তাই দেখা যায়, সমাজের নিম্নস্তরে দেশীয় ভাষার চর্চা হয়েছে এবং এক ধরণের সাহিত্যের বিকাশও ঘটেছে, তবে তা ছিল নিতান্ত অরুচিকর, অমার্জিত ও প্রায়ই স্থূল যৌন উত্তেজনাকর অশ্লীলতায় পূর্ণ।

সেন আমলে বাংলাদেশের সাহিত্য বলতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য বুঝায় এবং এর চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মণ শাসক, পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও কবিদের মধ্যে। সেন রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন ও তদ্বীয় পুত্র লক্ষণ সেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁরা প্রত্যেকে একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষণ সেনের সভাকবি শরণ, ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্ধন, জয়দেব গোস্বামী প্রমুখ সকলেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করেন। গোবর্ধন 'আর্যাসপ্তদশী' জয়দেব 'গীতগোবিন্দ', কবীন্দ্র ধোয়ী, 'পবনদূত' ইত্যাদি কাব্য রচনা করে অমরত্ব লাভ করেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র জয়দেব বাঙালি হলেও তাঁর রচিত 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত ভাষায় রচিত। লক্ষণ সেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ভারতখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হলায়ুধ। তিনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব এবং মৎস্যসুক্ত ভিন্ন মীমাংসাসর্বস্ব ও পণ্ডিতসর্বস্ব রচনা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য পণ্ডিতদের মধ্যে পুরোষত্তম, পশুপতি ও ঈশান বিখ্যাত। এভাবে দেখা যায়, সেন আমলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা হয়। সে ভাষা-সাহিত্যের সাথে সাধারণ জনগণের কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ভাষা-সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য ছিল বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। এমনকি, সাধারণ হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়ও এতে

www.nagorikpathagar.org

বিধৃত হয়নি। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করার কোন সুযোগই তখন ছিল না। তাই সেন আমলকে যথার্থই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জন্য চরম বন্ধ্যাত্ব ও অন্ধকার যুগ রূপে আখ্যায়িত করা হয়।

আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় মহানবীর (স) সময় থেকেই ইসলাম প্রচার শুরু হয়। ঐ সময় মালাবার রাজ্যের (বর্তমান ভারতের কেরালা) হিন্দু রাজা চেরুমাল স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে মহানবীর (স) দরবারে হাজির হয়ে সদলবলে ইসলাম কবুল করেন। (দ্রষ্টব্যঃ শায়খ জয়নুদ্দীন/তুহ্ফাতুল মুজাহিদীন ফী বা' যে আহ্ওয়ালির বারতাকালীন)। আরব বণিকগণ তখন বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চল হয়ে সুদূর চীন দেশ পর্যন্ত তাদের বাণিজ্য পোত নিয়ে যেতেন। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত আব্বাসীয় খলীফা হারুন আল রশীদের (৭৮৬-৮০৯ঈসায়ী) নামাঙ্কিত মুদ্রা থেকে তৎকালীন বাংলাদেশের সাথে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ মেলে। (দ্রষ্টব্যঃ ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক/পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম)। ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ও আট শতকের গোড়ার দিকে তৎকালীন ভারত তথা বাংলাদেশের সাথে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্যঃ ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়/বাঙালীর ইতিহাস, পৃ. ৮৭-৮৮)। আরব ভৌগোলিকদের বর্ণনায় বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে সমন্দর নামক একটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে খুরদাবা (মৃত্যুঃ ৩০০ হিজরী) তাঁর 'আল মাসালিক ওয়াল সামালিক' গ্রন্থে বলেনঃ "কামরুত (কামরূপ) থেকে সমন্দরে চন্দন কাঠ মিষ্টারি মাধ্যমে (নদীপথে) পনের-বিশ দিনের মধ্যে আনীত হয়।" আল ইদ্রিসী (মৃত্যুঃ ৫৪৯ হিজরী) তাঁর 'নুযহাতুল মুশতাক' গ্রন্থে বলেনঃ "সমন্দর একটি বড় শহর, বাণিজ্য-কেন্দ্র ও সমৃদ্ধশালী স্থান।" (দ্রষ্টব্যঃ আব্দুল মান্নান তালিবঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৬৬-৬৭)।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডক্টর আব্দুল করীম এ সমন্দরকে চট্টগ্রামের সাথে অভিন্ন বলে প্রমাণ করেছেন। (ডক্টর আব্দুল করীমঃ চট্টগ্রামে ইসলাম, পৃ. ৪-১৫)। ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুর রহীম বাংলার উপকূলভাগে আরব বণিকদের আগমন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর বলেছেন, চাটগাঁয়ের সাথে আরবদের সম্পর্ক অতি প্রাচীন, এমন কি, চাটগাঁ নামটাও তাদেরই দেয়া। 'শাতি-উল-গঙ্গ (গঙ্গার শেষ প্রান্ত বা উপদ্বীপ) তা থেকে কালক্রমে চাটগাঁও-এ রূপান্তরিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্যঃ ড. মু. আ. রহীমঃ Social and Cultural History of Bengal)। এভাবে আরব বণিকদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে ইসলামের প্রচার হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে, ৭১২ ঈসায়ীতে ১৭ বছরের তরুণ মুসলিম সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধুতে মুসলিম শাসন কায়েমের পর পাঞ্জাবসহ পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম শাসন ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি লাভ করে। এরপর ইসলাম প্রচারক অলি-আল্লাহ, পীর-দরবেশগণ উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় দ্বীন প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ভারত অভিযান ও উপমহাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে মহানবীর (স) দুটি প্রসিদ্ধ হাদীস রয়েছে, এ হাদীসের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন মুসলিম যোদ্ধা ও ধর্ম-প্রচারকগণ এদেশে আগমন করেন। প্রসঙ্গত উক্ত হাদীস দু'টি এখানে উল্লেখ করা হলোঃ হযরত সওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (স) বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে দুটি সেনাদলকে আল্লাহ জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন। এর একটি হিন্দ আক্রমণকারী সেনাদল, অন্যটি হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম আলাইহিস সালামের সহযোগী সেনাদল।" (নাসায়ী, কিতাবুল জিহাদ ও মুসনাদে আহমদ)।

দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনায় হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসুল্লাহ (স) আমাদেরকে হিন্দ অভিযানের নিশ্চিত ওয়াদা দিয়েছেন। অতএব, সে সময় অবধি আমি জীবিত থাকলে তাতে অবশ্যই আমার ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধা করবো না। এতে যদি আমি নিহত হই তাহলে আমি শ্রেষ্ঠ শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হব, আর যদি আমি নিরাপদে ফিরে আসতে পারি তাহলে আমি দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাব।" (নাসায়ী)।

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের প্রেক্ষিতে, আগেই উল্লেখ করেছি, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম-প্রচারকগণ আগমন করেন। তবে তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নেই। পরবর্তীকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, তবে তা কতটা ইতিহাস-নির্ভর এবং কতটা কিংবদন্তী-নির্ভর সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়াও অনেকটা দুরূহ ব্যাপার। বাংলাদেশে এ সব ধর্ম-প্রচারকদের সম্পর্কে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটি সূত্র থেকে কয়েকটি লাইন উদ্বৃত করছিঃ "একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বকালে চট্টগ্রাম জেলা, ময়মনসিংহ জেলার মদনপুর, ঢাকা জেলার বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও, পাবনা জেলার (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা) শাহজাদপুর, বগুড়া জেলার মহাস্থান, মালদহ জেলার পাণ্ডুয়া ও দেওকোট এবং বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান ছিল ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র। এ আমলে যে সকল সুফী ও মুজাহিদ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করেন তন্মধ্যে প্রধান কয়েকজন হচ্ছেনঃ ১. শাহ সুলতান বলখী, ২.

www.nagorikpathagar.org

শাহ্ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, ৩. বাবা আদম শহীদ, ৪. মখদুম শাহ্‌দৌলা শহীদ, ৫. শায়খ জালালুদ্দিন তাবরিজী ৬. শাহ্ নেয়ামতুল্লাহ বুতশিকন, ৭. শাহ মাখদুম রুপোশ ও ৮. শায়ক ফরিদুদ্দীন শক্করগঞ্জ।" (আব্দুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম, পৃ. ৭৭)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের ফলে মানুষ একদিকে শান্তি, সাম্য, কল্যাণ ও তৌহিদের বিপ্লবী মুক্তি-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে লাগলো অন্যদিকে, শতধা-বিচ্ছিন্ন, দুঃসহ অনাচার, মনুষ্যত্বহীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান ও সর্বোপরি ব্রাহ্মণ শাসক ও পুরোহিতদের অমানবিক অত্যাচারে জন-জীবন তখন অতীষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। এ সময়কার জন-জীবনের দুঃসহ চিত্রের একটা পরিচয় ফুটে উঠেছে, ত্রয়োদশ শতকের বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিতের 'শূণ্য পুরাণ' কাব্যের 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কবিতায়। কবি বলেনঃ

জাজপুর পুরবাদি, সোল শঅ ঘর বাদি
বৌদি লয় কন্নএ নগুন।
দক্ষিণা মাগিতে জায়, জার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥
মালদেহে লাগে কর ন চিনে আপন পর
জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইআ বড় দশ বিশ হৈয়্যা জড়,
সদ্ধমীরে করএ বিনাশ॥
বেদে করি উচ্চারণ রেব্যাঅ অগ্নি ঘন ঘন,
দেখিআ সভায় কম্পমান।
মনেত পাইআ মর্ম, সভে বোলে রাখ ধর্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ, ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম, মনেত পাইয়া মর্ম
মায়াত হইল অন্ধকার ॥

বাংলার জনগণের যখন নানা দিক দিয়ে এরূপ দৈন্যদশা তখন দ্বাদশ শতকের শেষের দিকে শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করে উত্তর ভারতে মুসলিম রাজত্বের গোড়াপত্তন করেন। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি, মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয়ের পর (৭১২ ঈসায়ী) সেখানে মুসলমানদের শাসন কায়েম হয়। ধীরে ধীরে সেটা পাঞ্জাবসহ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে বিভিন্ন এলাকায়

www.nagorikpathagar.org

সম্প্রসারিত হয়। মোহাম্মদ ঘোরীর পর কুতুবুদ্দীন আইবেক দিল্লীর শাসনকর্তা হয়ে বিহার অধিকার করে মুসলিম শাসনকে তৎকালীন গৌড়-অধিপতি লক্ষণ সেনের রাজ্য-সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কুতুবুদ্দীন আইবেকের সহযোগিতায় তুর্কি বীর ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী ১২০৪ ঈসায়ীতে মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ লক্ষণ সেনের নদীয়াস্থ রাজ-প্রাসাদ অতর্কিতে আক্রমণ করে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীন সিরাজের 'তবকাৎ-ই নাসিরী গ্রন্থে খিলজীর জীবন-বৃত্তান্ত ও অসম সাহসিকতার সাথে তাঁর বাংলা অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। (এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্যঃ ডক্টর আব্দুল মমিন চৌধুরীঃ বাংলাদেশের ইতিহাস ও আবদুল মান্নান তালিবঃ বাংলাদেশে ইসলাম)।

বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার পর সমাজ, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তন ঘটে। মুসলিম শাসনামলে বাঙালিরা ধর্মের ক্ষেত্রে পেল অসংখ্য জাতিভেদ বিশিষ্ট, মানুষের মনগড়া প্রথা-রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্ম বা ধর্মসমূহের পরিবর্তে স্রষ্টার মনোনীত এক উন্নত সর্বাঙ্গ-সুন্দর পরিপূর্ণ মানবিক ধর্ম ইসলাম। সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তারা পেল ইসলামের সাম্য-শান্তি-ন্যায়নীতি ও সকল প্রকার অন্যায় ও পাপাচারমুক্ত এক কল্যাণময় সমাজ, যেখানে মানুষ একমাত্র তার মহান স্রষ্টার গোলাম, অন্য কারো নয়। এভাবে, মানুষের এক অসাধারণ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। সংস্কৃতি বলতে আগে যেখানে ছিল অশ্লীল গান-বাজনা, অবাধ যৌন-সম্ভোগ ও কামোত্তেজনাকারী নানাবিধ কুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং নীতি-নৈতিকতাবিবর্জিত আচার সেখানে তার পরিবর্তে ইসলাম নিয়ে এল স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস, পরকালের প্রতি আস্থাপূর্ণ এক পরিচ্ছন্ন, নির্মল, সুরুচিপূর্ণ সুষ্ঠু জীবনাচারবিশিষ্ট উন্নত মানবিক সংস্কৃতি যার স্পর্শে সমগ্র জীবনায়নে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হলো। মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত সংস্কৃতির নামে যেসব গান-বাজনা হতো সে সম্পর্কে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেনঃ

"These songs, however, generally speaking related to pastural life with all its crude love-makings. The tantrics not only became steeped in sexual vices but were dreaded for inhuman cruelties committed in the name of religion.... Vicious Tantrics offered human sacrifices to Kali and danced with swords in hands before her image in horrid ecstacy."

www.nagorikpathagar.org

এ ধরনের পাপাচারক্লিষ্ট, শোষণ-নিপীড়নমূলক একটি দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে মুসলমানদের শাসন কায়েম হবার সাথে সাথে সমাজের সর্বক্ষেত্রে যে একটি পরিবর্তনের শুভ সূচনা হলো তাতে সকলেই যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হলো। তারা প্রাণভরে এই পরিবর্তনকে অভিনন্দন জানালো। এ সময়কার একটি কবিতায় এর খানিকটা পরিচয় বিধৃত হয়েছে। কবিতাটি এখানে উদ্বৃত হলোঃ

ধর্ম্ম হৈলা জবনরূপি মাথা এত কাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিরুচ কামান
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেত দম্বদার॥
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন
ব্রহ্মা হৈল মহাম্মদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বার
আদম হৈল সুলপানি
গণেশ হইআ গাজী কার্ত্তিক হৈল কাজি
ফকির হইল্যা জত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা সেক
পুরন্দর হইল মলনা ॥
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে
সভে মিলি বাজায় বাজনা
আগুনি চন্ডিকা তিহু হৈলা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হল্যা বিবি নূর
জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন
প্রবেশ করিল জাজপুর।

এভাবে মুসলিম শাসনামলের শুরুতে বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মে যে পরিবর্তনের হাওয়া প্রবাহিত হয় তার একটি বর্ণনা উপরোক্ত কবিতায় পাওয়া যায়। মুসলিম শাসনামলে শুধু বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি ও ধর্মেই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও নবজন্ম ঘটে। সেন আমলে যে ভাষার কণ্ঠরোধ করে তাতে সাহিত্য চর্চা নিষিদ্ধ করা হয়, মুসলিম শাসনামলে সে ভাষা ও সাহিত্য অর্গলমুক্ত হয়ে স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের অপূর্ব সুযোগ লাভ করে। মুসলিম রাজা-

www.nagorikpathagar.org

বাদশাগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। এ সম্পর্কে ডক্টর দীণেশচন্দ্র সেন লিখেছেনঃ

"ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ ভাষা গ্রন্থ প্রচারের বিরোধী ছিলেন। কৃত্তিবাস ও কাশীদাসকে ইঁহারা 'সর্ব্বনেশে' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন এবং অষ্টাদশ পুরাণ অনুবাদগণের জন্য ইঁহারা রৌরব নামক নরকে স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন। এদিকে গৌড়েশ্বরগণের সভায় সংস্কৃত পুরাণ পাঠ ও ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলণ কোমল মলয় সমীর- এর ন্যায় পদাবলী প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইত।...এই সমৃদ্ধ সভাগৃহে বঙ্গভাষা কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? ... আমাদের বিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ই এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর সুকুমার সেন যে সত্য আড়াল করার চেষ্টা করেছেন, ডক্টর দীনেশ চন্দ্র কিছুটা ইতস্তত করে হলেও সে সত্য উদ্ঘাটনে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পরে অবশ্য তিনি নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সাথেই বলেনঃ "It was the Muslim sultan rather than the Hindu raja that encouraged vernacular literature"- অর্থাৎ 'হিন্দু নৃপতিগণ নয়, মুসলিম সুলতানগণই মাতৃভাষায় সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ প্রদান করেছেন।' তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আরো বলেনঃ "হিন্দু রাজাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকলে বাংলা ভাষা রাজ-দরবারে স্থান লাভ করার কোন সুযোগই পেতো না। এমনিভাবে মুসলমান শাসক ও আমির-ওমরাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহের ফলে হিন্দু জমিদাররাও বাঙ্গালী কবিদের প্রতি তাদের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানে অনুপ্রাণিত হন।" (**দীনেশ চন্দ্র সেনঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,** পৃ-৭৩-৭৫)।

এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ডক্টর এম. এ রহীম বলেনঃ "এটা খুবই আশ্চর্যজনক ঘটনা যে, মুসলমান শাসক ও অভিজাত সম্প্রদায়, যাদের নিজেদেরই একটা সমৃদ্ধিশালী ভাষা ছিল, তারা তাদের প্রজাসাধারণের ভাষা বাংলাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় ইসলামের উদারতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং মুসলিম শাসকদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। ইসলাম সকল মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা তুলে ধরেছে এবং মুসলমান শাসকবৃন্দ এই মহান আদর্শ সমুন্নত রেখেছিলেন।" (ডক্টর এম.এ রহীমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতহাস, পৃ.২৫০)।

মুসলমান শাসক তথা ইসলামের এ ঔদার্য অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক উল্লেখে দ্বিধা করলেও ডক্টর দীনেশচন্দ্র তা অকপটে স্বীকার করে তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এ সময়ে হিন্দু সমাজের ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার, গোয়ালা,

www.nagorikpathagar.org

মালী প্রভৃতি তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরাও সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেদের খ্যতিমান করার সুযোগ পায়। শুধু মুসলিম কবিগণ নয়, মুসলিম এমন কি, উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের হাতে নিগ্রহ ভোগকারী অন্ত্যজ শ্রেণীর কবিরাও মুসলিম শাসকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন। দীনেশচন্দ্রের এরূপ স্পষ্ট ভাষণের ভিত্তি হলো সেকালের রীতি অনুযায়ী কবিগণ যাঁর বা যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের পরিচয় ও প্রশস্তি তাঁরা তাঁদের কাব্যে করেছেন। এরূপ কয়েকটি প্রশস্তির উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৪৯৩ ঈসায়ীতে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের আদি পর্ব থেকে স্ত্রী পর্ব পর্যন্ত বাংলায় অনুবাদ করেন। সেখানে কবির বর্ণনাঃ

নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হওন্ত লস্কর।
লস্কর পরাগল খাঁন মহামতি।
সুবর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ূ গতি॥
লস্করী বিষয় পাই আইবন্ত চলিয়া ।
চাটি গ্রামে চলিয়া গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খাঁন মহামতি ॥
পুরাণ শুনন্ত নিতি হরষিত মতি॥

মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতিও মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে তাঁর কাব্যের ভণিতায় লেখেনঃ

সে যে নাসিরা সাহ জানে যারে হানিল মদন বাণে॥
চিরঞ্জীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

বিদ্যাপতি অন্যত্র বলেনঃ

বেকতেও চোরি গুপত কর কতিখান বিদ্যাপতি কবি ভাণ।
মহলম জুগপতি চিরজীব জীবথু গ্যাসদেব সুলতান॥

গ্যাসদেব সুলতান মূলত সুলতান গিয়াস উদ্দিন। অর্থাৎ কবি বিদ্যাপতি উপরোক্ত উভয় মুসলিম নৃপতিরই যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

পঞ্চাদশ শতকের অন্যতম প্রধান কবি কৃত্তিবাস ওঝা তৎকালীন মুসলিম শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর কবিতায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, তার অংশবিশেষ নিম্নরূপঃ

www.nagorikpathagar.org

রাজ পন্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে ॥
... ...
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
... ...
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলেন অনুরোধ।

এভাবে মুসলমান রাজার আদেশে কৃত্তিবাস বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করেন। ইতঃপূর্বে সেন আমলে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা মহাঅপরাধরূপে গণ্য হতো। ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ তাই বলেনঃ "মুসলমানদের আগমনে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা বাংলা ভাষা চর্চার এবং বাংলা সাহিত্য প্রণয়নে অশেষ উৎসাহ দিয়াছিল।" **(ডক্টর অজিত কুমার ঘোষঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস/কলিকাতাঃ পৃ. ৫)**।

এ প্রসঙ্গে আরো তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মন্তব্য উদ্বৃত করতে চাই। ডক্টর হাসান জামান বলেনঃ "মুসলিম আমলের পূর্বে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কোনও নজীর পাওয়া যায় না। অবশ্য বৌদ্ধ যাজকেরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বাংলার লৌকিক ও কথ্য ভাষায় ধর্ম প্রচার ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করতেন। খ্রীস্টীয় সপ্তম ও দশম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে সংঘর্ষে বৌদ্ধদের সে ধর্ম-সাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাকে ব্রাহ্মণেরা ইতর বা নীচুদের ভাষা বলতেন। মুসলিম সম্পর্কের ফলে ইসলামের তওহীদ ও সাম্য-নীতির সংস্পর্শে বৌদ্ধ দোঁহার এ বাংলা ভাষা ও তুর্কী মুসলিমের সংযোগে এক নতুন ভাষার উৎপত্তি হলো, যা বাংলা ভাষার প্রথম, স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক সাহিত্যিক রূপ।" **(ডক্টর হাসান জামানঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য, পৃ. ২০১)**।

গবেষক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেনঃ "যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তবে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত-প্রায় হয়ে অতীতের গর্ভে নিমজ্জিত হতো।" **(বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস-এর ভূমিকা)**।

বিশিষ্ট গবেষক সুখময় মুখোপাধ্যায় স্বাধীন সুলতানী আমালের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ "এই পর্বে বাংলা সাহিত্যের লক্ষণীয় বিকাশ ঘটে। কয়েকজন দিকপাল

www.nagorikpathagar.org

কবি এই পর্বেই আবির্ভূত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সুগঠিত ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন করেন, তাঁদের অনেকেই বাংলার রাজা ও রাজ-কর্মচারীদের কাছে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। কাজেই বাংলার ইতিহাসের আলোচ্য এই পর্বটি সব দিক দিয়েই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই পর্বে যেসব সুলতান বাংলাদেশের শাসন করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকেই অসাধারণ ছিলেন।" **(সুখময় মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানদের আমল, গ্রন্থকারের নিবেদন, প্রথম সংস্করণ)।**

মুসলিম শাসনামলে শুধু ভাষা, সাহিত্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে নয়, বাংলার সার্বিক জীবনায়নে যে সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত হয় সে সম্পর্কে কতিপয় বিশিষ্ট ঐতিহাসিকের মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত হলোঃ "যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, যা ছিল পাল ও সেনদের আমলে কম গৌরবের ও আদরের সেই বঙ্গ নামেই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত পাঠান আমলে বাংলার সমস্ত জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল।" **(ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ঃ বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, পৃ. ২২)।**

এন.এন.ল' সমগ্র উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের যে সার্বিক সুফলের বর্ণনা দিয়েছেন বাংলায় মুসলিম শাসন সম্পর্কে তা সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি বলেনঃ

"...that the mohammedan invasion of India marked the beginning of momentous changes not only in the social and political spheres, but also in the domain of education and bearing" **(N.N. Law: Promotion of Learing during mohammedan Rule P.XIX).**

ডক্টর মুহম্মদ আব্দুর রহীম আরো সুস্পষ্টভাবে বলেনঃ "মুসলিম বিজয় ছিল বাংলার প্রতি বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। যা বাংলা ভাষাভাষী লোকদেরকে একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্যমঞ্চে সংঘবদ্ধ করে, বাংলা ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। কেবল এই বিরাট সংহতি এবং মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতার গুণেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি উৎসাহিত হয়। যদি বাংলায় মুসলিম বিজয় ত্বরান্বিত না হতো এবং এদেশে আর কয়েক শতকের জন্য হিন্দু শাসন অব্যাহত থাকতো, তাহলে বাংলা ভাষা বিলুপ্ত হয়ে যেতো এবং অবহেলিত ও বিস্মৃত হয়ে অতীতের গর্বে নিমজ্জিত হতো।" **(ডক্টর এম. এ রহীমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ.৯)**

উপরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ, এর মূলে প্রতিবন্ধকতা ও এর নবজন্ম এবং বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়, জাতিগোষ্ঠী ও শাসনামলের

www.nagorikpathagar.org

সংক্ষিপ্ত বিবরণ পেশ করার পর বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত মুসলিম ঐতিহ্যকে নিম্মোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

এক. ভাষা
দুই. বিষয়বস্তু,
তিন. ভাবানুভূতি বা অনুপ্রেরণা, ও
চার. আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিভিন্ন দিক।

এক. প্রত্যেক ভাষার আসল সম্পদ হলো তার শব্দ সমষ্টি। যে ভাষার শব্দ সংখ্যা যত বেশি সে ভাষা মনের বিচিত্র ভাব প্রকাশের জন্য তত বেশি উপযোগী ও সমৃদ্ধ। ভাষায় উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শব্দরাজি থাকার ফলে মনের ভাব যথার্থরূপে প্রকাশ করা সহজ হয়। বাংলা ভাষা শব্দমালার দিক দিয়ে অতিশয় সমৃদ্ধ। কিন্তু হঠাৎ করে এটা হয়নি। বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে আর্য-অনার্য বিভিন্ন ভাষার শব্দ, দেশী-বিদেশী নানা ভাষার শব্দ। এসব শব্দ মিলিয়ে বাংলা ভাষায় বর্তমানে প্রায় সোয়া লক্ষ শব্দ রয়েছে। এ শব্দগুলোর মূল উৎস প্রধানত নিম্নরূপঃ

ক. দেশী শব্দ: মূলত এদেশের প্রাচীন ভাষাকে ভাষাতত্ত্ববিদগণ নাম দিয়েছেন 'প্রাচীন প্রাকৃত'। নাম থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তীকালে কোন এক সময়ে এই ভাষা 'আধুনিক প্রাকৃত' নামে অভিহিত হয়। কালক্রমে আধুনিক প্রাকৃত পরিবর্তিত হয়ে এক পর্যায়ে এ ভাষা অপভ্রংশ ভাষা নামে অভিহিত হয়। এ অপভ্রংশ ভাষা থেকেই বাংলা, অহমিয়া, উড়িয়া ও হিন্দী ভাষার উৎপত্তি। বাংলা ভাষার মূল উৎস এ অপভ্রংশ ভাষার শব্দরাজিই 'দেশি শব্দ' নামে পরিচিত। মূলত এ শব্দগুলোই এদেশের আদি জনগোষ্ঠীর অকৃত্রিম মাতৃভাষার সম্পদ। কালের বিবর্তনে এ শব্দগুলো নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলোর সাথে আমাদের নাড়ীর সম্পর্ক কিছুটা হলেও বিদ্যমান।

খ. সংস্কৃত শব্দ: সংস্কৃত আর্য-ব্রাহ্মণদের ভাষা। বাঙালি জাতি অনার্য প্রধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ ভাষায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ-উপনিষদ-মহাভারত রচিত হওয়ায় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হিন্দুশাস্ত্রের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কবিগণ এ ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করার ফলে এ ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। যেসব সংস্কৃত শব্দ হুবহু বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে সেগুলোকে বলা হয় তদ্ভব শব্দ, আর যেসব সংস্কৃত শব্দ ঈষৎ পরিবর্তিত হয়ে বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়েছে সেগুলোকে বলা হয় তৎসম।

www.nagorikpathagar.org

গ. পালি ভাষার শব্দ। পালি ভাষা মূলত প্রাচীন প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত। এ ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক রচিত হয়। একসময় ভারতবর্ষ ছাড়াও এশিয়ার একটি বিশাল ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের সুবাদে এবং পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় পণ্ডিত ও কবিগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনার ফলে বাংলাসহ ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার বিভিন্ন ভাষায় পালি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি অনুপ্রবিষ্ট ও আত্মীকৃত হয়।

ঘ. মুসলমানী জবান। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত আরব বণিক ও ইসলাম প্রচারকদের আগমনের ফলে, বিশেষত মুসলিম রাজত্ব কায়েমের ফলে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত মুসলিম শাসকদের ভাষা আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু ইত্যাদি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজিতে বাংলা ভাষা সুসমৃদ্ধ হয়। বিশেষত মুসলিম আমলের পূর্বে সেন আমলে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চা নিষিদ্ধ থাকার পর মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার নবজন্ম এবং ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হওয়ায় মুসলমানদের ধর্মীয় ভাষা আরবি এবং শাসক-সম্প্রদায়ের ভাষা তুর্কি, ফারসি ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি বাংলা ভাষায় সহজেই স্থান করে নেয়। মুসলিম আমলের সাড়ে পাঁচশো বছরে বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-তুর্কি উর্দু শব্দের এত ব্যাপক প্রচলন ঘটে যে, একসময় এ ভাষাকে অর্থ্যাৎ বাংলা ভাষাকে 'মুসলমানী জবান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। সুলতানী আমলে ফারসি রাজভাষা হওয়ায় ফারসি শব্দই বাংলা ভাষায় বেশি স্থান করে নেয়। এ জন্য এ ফারসিবহুল বাংলা এক সময় 'ফারসি-বাংলা' হিসাবেও খ্যাতি লাভ করে।

পরবর্তীকালে ইংরাজ আমলের পূর্ব পর্যন্ত সুদীর্ঘ কাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলিম সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ সমৃদ্ধ মুসলমানী বাংলা জবান বা ফারসি বাংলা'য় সাহিত্য চর্চা করেছেন। ইংরাজ আমলে বৃটিশ আমলাদেরকে দেশীয় ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যাকরণ ও পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে কলেজে নবনিযুক্ত হিন্দু সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু ভাষার শব্দরাজি পরিহার করে সে স্থলে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দরাজি আমদানী করে তাঁরা সংস্কৃতবহুল এক নতুন কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু করেন। এ ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে এবং ব্যাকরণ তৈরী করে ছাত্রদেরকে এ কৃত্রিম বাংলা ভাষাই শিক্ষা দেন। এ নতুন ভাষার নাম হয় 'সাধু বাংলা'। 'যাবনিক শব্দ ও ম্লেচ্ছ স্বর' বর্জিত এ সাধু ভাষার কিঞ্চিৎ

www.nagorikpathagar.org

নমুনা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' গ্রন্থ থেকে পেশ করছিঃ

"অকারাদি ক্ষকারান্তাক্ষরমালা যদ্যপি পঞ্চাশৎ সংখ্যকা এক পশ্চাশৎ কিম্বা সপ্তপঞ্চশৎ সংখ্যা পরিমিতা হউক তথাপি এতাবন্মাত্র কতিপয় বর্ণাবলী বিন্যাস বিশেষবশত বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষবশতঃ বৈদিক লৌকিক সংস্কৃত প্রাকৃত পৈশাচাদি অষ্টাদশ ভাষা ও নানা দেশীয় মনুষ্য জাতীয় ভাষা বিশেষত অনেক প্রকার ভাষা বৈচিত্র শাস্ত্রতো লোকতর প্রসিদ্ধ আছে। যেমন কুঞ্জরধ্বনি তুল্যধ্বনি নিষাদ স্বর। গোরবানুকারী ঋষভ স্বর।"

এরূপ 'যাবনিক শব্দ ও স্লেচ্ছ স্বর' বর্জিত সংস্কৃতবহুল দুর্বোধ্য ভাষাকেই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা শুচি-শুদ্ধ সাধু বাংলা বলে চালাবার প্রাণান্ত প্রয়াসে লিপ্ত হন। এ সাধু বাংলা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেনঃ "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষার কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না।"

এ ভাষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমানে এবং তার সূত্রধর হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর ভাদ্র বৌয়ের সম্বন্ধ।"

গবেষক নাজিরুল ইসলামের ভাষায়ঃ "ইংরাজ শাসনের পরিপোষকতায়, ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পণ্ডিতদের চেষ্টায় ও বাঙ্গালা ভাষা সংস্কারের জন্য দীনেশ চন্দ্র বর্ণিত 'ঘোর কোলাহলের' ফলে, বাঙ্গালা ভাষার চেহারা ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। এই ভাষা হইল সংস্কৃত প্রধান সুতরাং বাঙ্গলা যে আর্য ভাষা তাহা বলিতে আর কোন বাধা রহিল না। নূতন ভাষার নাম হইল সাধু ভাষা। বহুকাল পর্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমান এ ভাষার চর্চা করেন নাই। তাঁহারা প্রাচীন গৌড়ের ভাষাতেই পুঁথি রচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুঁথি বিশ্ববিদ্যালয়ে ও স্কুল-কলেজে স্থান লাভ করিতে পারিল না। তাহার ও গৌড়ের ভাষার স্থান হইল বটতলায়। এইভাবে ইংরাজ শাসন প্রতিষ্ঠার ফলে বাঙ্গালী মুসলমানের রাজ্য, ধন, মান, সুযোগ-সুবিধা যাহা কিছু সব ত গেলই এমন কি, পাঁচ শত বৎসরব্যাপী বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চা করিয়া যে ভাষাকে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে ভাষাকে বন্ধ্যা দশা হইতে ফলপ্রসূ করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই ভাষার উপর অধিকারও হারাইলেন। কলিকাতা হইল নতূন মহানগরী এই মহানগরীর মুৎসুদ্ধি, তহশীলদার ও গোমস্তা হইল নূতন জমিদার। এই নগরীর নূতন কলেজের

www.nagorikpathagar.org

পণ্ডিতদের বাঙ্গালা ভাষাই হইল নূতন সরকারের অনুমোদিত নূতন বাঙ্গালা ভাষা। এই নূতন ভাষার নাম হইল সাধু ভাষা 'যাবনিক শব্দ ও ম্লেচ্ছস্বর' বর্জ্জিত হইয়া সাধু ভাষা সম্পূর্ণরূপে শুচি ও শুদ্ধি হইয়া গেল'। **(নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ বাঙ্গালা ভাষার নূতন ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৪৫০-৫১)**

অবশ্য এ সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালির মুখের ভাষা হিসাবে পূর্বতন মুসলমানী জবানই চালু থাকে, বিশেষত বাঙালি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে। তবে শিক্ষিতের হার বাড়ার সাথে সাথে সংস্কৃতবহুল বাংলা ভাষার প্রচলন ঘটে। এমন কি, মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণও এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বিংশ শতকের শুরু থেকে এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়। মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নই তাঁর সাহিত্যে সর্বপ্রথম মুসলমানী জবান ব্যবহার করেন এবং যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অতঃপর কাজী নজরুল ইসলাম ব্যাপক ও সার্থকভাবে বাঙালির অকৃত্রিম মুসলমানী জবানে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এটা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। নজরুল শুধু ভাব ও বিষয়ের ক্ষেত্রেই বিদ্রোহ করেননি; তাঁর ভাষা-বিদ্রোহও ছিল এক অসাধারণ কাজ। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পুরাপুরি ঐতিহ্য-সচেতন। ভাষার ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ পাঁচ শো বছরের যে মুসলিম ঐতিহ্য তা অতি বলিষ্ঠ ও সার্থকভাবে তিনি তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত করেন। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় এমনকি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাঁর কঠোর সমালোচনা করেন। কিন্তু নজরুল তাতে এতটুকু হতোদ্যাম না হয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সাথে সমালোচকদের জবাবে বলেনঃ "বিশ্ব-কাব্যলক্ষ্মীর একটা মুসলমানি ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। ... বাংলা কাব্য-লক্ষ্মীকে দু'টো ইরানী জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং তাঁকে আরও খুবসুরতই দেখায়। আজকের কলালক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর।" **(দ্রঃ কাজী নজরুল ইসলাম/বড়র পিরীতি বালির বাধ)**।

নজরুলের পরে ফররুখ আহমদসহ অনেকেই তাঁদের সাহিত্যে অতি সার্থকভাবে মুসলমানী বাংলা জবানের প্রয়োগে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানের কথ্য ভাষায় তথাকথিত মুসলমানী বাংলা জবানের প্রাধান্য রয়েছে। অতএব, বাস্তব জীবনধর্মী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে দিন দিন এ ভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকলে তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। বরং বাস্তবতা ও ইতিহাসের দাবী এটাই। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সুচিন্তিত অভিমতটি নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ

www.nagorikpathagar.org

"পরবর্তীকালে উচ্চ বর্ণেরা লৌকিক ভাষাকে মার্জিত করিয়া সংস্কৃত করিয়া লইল। সাধারণে লৌকিক ভাষা পালি ব্যবহার করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রকারেরা বলিলেন ন-ম্লেচ্ছ ভাষাং শিক্ষেত' ম্লেচ্ছ ভাষা শিখিও না'। তখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্দশা বৌদ্ধ ধর্ম তাহার নবীন তেজে দণ্ডায়মন। কেহ ব্রাহ্মণের কথা শুনিল না। বৌদ্ধ গণতন্ত্রের পক্ষ লইল। পালি ভাষা এক বিপুল সাহিত্যের ভাষা হইল। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাততন্ত্রের পরাজয় হইল।

"আর এক যুগ আসিল। এখন রাজশক্তি বৌদ্ধ। বৌদ্ধ এখন অভিজাত-তন্ত্রের দিকে। বৌদ্ধ এখন ধর্মের দোহাই দিয়া পালিকে ধরিয়া রাখিতে চাহিল; তখন কিন্তু গণতন্ত্রের পক্ষ লইল জৈনধর্ম। তখন লৌকিক ভাষা প্রাকৃত। পালি প্রাকৃতের নিকট তিষ্টিতে পারিল না। গণতন্ত্রের নিকট অভিজাত-তন্ত্রের পরাজয় হইল।

"আর এক যুগ আসিল। এ যুগ অন্ধকারময়। এ যুগে উচ্চ শ্রেণীর প্রাকৃত নিম্ন শ্রেণীর অপভ্রংশের নিকট পরাজিত হইল এই অপভ্রংশ হইল বাংলা, ওড়িয়া, আসামী, হিন্দি, গুজরাতি, মারহাটি প্রভৃতি দেশীয় ভাষাসমূহের জননী।

"তারপর আধুনিক যুগ। এ যুগে পণ্ডিতেরা সাধারণের ভাষাকে মাজিয়া-ঘষিয়া সাধু ভাষা করিয়া লইলেন, বিশাল জনসাধারণের ভাষাকে ইতর ভাষা বলিয়া ফেলিয়া রাখিলেন। বর্তমানে এই ইতর ভাষার উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। পণ্ডিতে তাহার অন্ধ সংস্কৃত ভক্তির জন্য বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতের দুর্বহ শিকলে বাঁধিতে চাহিতেছেন। আর ইতর ভাষা সেই শিকড় কাটিতে চাহিতেছে। তাহার চেষ্টা ফলবতী হইবে কি? যদি ভারতের ভাষা-ইতিহাসের শিক্ষা মিথ্যা না হয়, তবে নিশ্চয়ই একদিন এই ইতর ভাষা সাধু ভাষাকে, যেমন লৌকিক- বৈদিককে, পালি সংস্কৃতকে, প্রাকৃত পালিকে, অপভ্রংশ প্রাকৃতকে ঠেলিয়া দিয়াছিল সেইরূপ ঠেলিয়া ফেলিবে। সাধু ভাষা মৃত ভাষারূপে পুস্তকে ঠাঁই পাইবে। যেমন মিল্টন, জনসন প্রভৃতির ল্যাটিন বহুল ভাষা এখন কেবল কেতাবী ভাষা হইয়া রহিয়াছে, এখনকার সাধু ভাষার অবস্থাও সেইরূপ হইবে। পরিণামে চরমপন্থীরই জয় হইবে। তবে মধ্যম পন্থা বর্তমান পরিবর্তনশীল যুগের উপযুক্ত ভাষা বটে। একেবারে 'নি' হইতে 'সা'তে সুর নামাইতে গেলে অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগিবে নিশ্চয়ই।" **(দ্র. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ আমাদের ভাষা সমস্যা)**।

৬) বিদেশী ভাষা। ইংরাজ আমলে রাজ-ভাষা ফারসির বদলে হলো ইংরাজি। আইন-আদালত, প্রশাসন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরাজি ভাষা-সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা শুরু হলো। ফলে ইংরাজি ভাষার বহু শব্দ বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করলো। এভাবে বহির্জগতের সাথে মেলামেশার ফলে পৃথিবীর বহু

www.nagorikpathagar.org

দেশের অসংখ্য ভাষার কিছু কিছু শব্দ বাংলায় স্থান পেল। দিনে দিনে এসব শব্দও আমাদের ভাষার সম্পদে পরিণত হয়েছে এবং বাংলা ভাষা তাতে সমৃদ্ধ হয়েছে। যেসব শব্দ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে বা সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছে বা সহজভাবে বোধগম্য হয়ে উঠেছে সেসব বিদেশী শব্দও এখন আমাদের ভাষার সম্পদ। ভাষায় জোর করে গ্রহণ-বর্জনের নীতি অচল। যা স্বাভাবিকভাবে গ্রাহ্য, আত্মীকৃত বা বোধগম্য তাই আমাদের নিজস্ব।

বাংলা ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি গবেষণামূলক তথ্য এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত একটি পরিসংখ্যানের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চাই।

১৯৬৫ সালে তদানীন্তন বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহ্‌সান সাহেবের তত্ত্বাবধানে "The Pattern of Bengali Vocabulary (1740-1864)" শীর্ষক পরিসংখ্যানভিত্তিক গবেষণা জরিপের ওপর এক পুস্তিকা প্রকাশ করি। এর তত্ত্বাবধায়নে সাব-কমিটিতে ছিলেন সর্বজনাব সৈয়দ আলী আহ্‌সান, প্রফেসর কাজী মোতাহার হোসেন, অধ্যাপক অজিত গুহ, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন রিসার্চ অফিসার মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ূম। সে জরিপের কিছু ফলাফল ছিল নিম্নরূপঃ

ব্যবহৃত শব্দাবলীর ভাষা উৎস (শতকরা হিসাবে)

কাল ও রচনার প্রকৃতি	তৎসম	তদ্ভব	স্থানীয়	আরবি-ফারসি-তুর্কি	ইংরাজি পুর্তগীজ	অন্যান্য	মোট
১৮ শতক	৩১.৫	৩৮.৯	৩.৩	২৬.৩	-	-	১০০.০
১৯ শতক	৭৭.৬	১৯.২	২.২	১.০	-	-	১০০.০
গম্ভীর প্রকৃতি	৫৯.৩	২৫.০	২.৫	১৩.২	-	-	১০০.০
প্রহসনমূলক	৬৮.২	২৭.২	২.৮	১.৭	০.১	০.১	১০০.১
পদ্য	৪২.৩	৩৬.০	৩.৬	১৭.৯	০.১	-	৯৯.৯
গদ্য	৮২.২	১৫.৪	১.৬	০.৮	-	-	১০০.০
হিন্দু ধর্মীয়	৭২.৩	২৪.০	২.৪	১.৪	-	-	১০০.১
ইসলামী	১২.০	৩৫.৫	৩.৪	৪৯.০	০.১	-	১০০.০
সব প্রকৃতির	৬২.৩	২৫.৭	২.৬	৯.৪	০.১	-	১০০.১

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকে আমাদের সাহিত্যের ভাষায় যে বিপুল সংখ্যক আরবি-ফার্সি-তুর্কি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হবার পর অকস্মাৎ তা প্রায় শূন্যের কোঠায় গিয়ে পৌঁছেছে। অবশ্য এটা সাহিত্যের ভাষার হিসাব। জনগণের, বিশেষত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের মুখের ভাষার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দু সংস্কৃত পণ্ডিতদের দৌরাত্ম্য কিছু মাত্র প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভাষার ক্ষেত্রে মুসলিম ঐতিহ্য সাধারণ জনগণের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

পূর্বের ন্যায়ই বহাল ছিল। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী নজরুল ইসলাম পুনরায় সাহিত্যের ভাষায় সেটা সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করলেন, চল্লিশের দশকে বিশেষত ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সে ধারা আরো বেগবান হয়েছে এবং ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তি অনুযায়ী আমাদের জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির অপরিহার্য তাগিদে জনগণের ভাষাই উত্তরোত্তর ফোর্ট উইলিয়ামীয় কৃত্রিম ভাষার উপর বিজয়ী হবে। ষড়যন্ত্র করে আর বিদেশের প্রভাবে ভাষার এই গণতন্ত্রায়ণ রোধ করা যাবে না। বাংলা ভাষায় মুসলিম ঐতিহ্য দিন দিন সূর্যালোকের মতই দীপ্ত-সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলীর একটি বক্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তাই এখানে তা একটু দীর্ঘ আকারেই উদ্ধৃত হলোঃ "বাংলা ভাষার চর্চা আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অপরিহার্য। তবে মাতৃভাষা আমাদের হাতে কি রূপ গ্রহণ করবে তা নিয়ে মতভেদ দেখতে পাওয়া যায়।... ভাষার আকার প্রকার এবং জাতি বিচার নিয়ে হিন্দু এবং মোসলেম সাহিত্যকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদের সৃষ্টি হয়েছে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্বে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই অসংখ্য আরবি, ফার্সি এবং উর্দু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহার করতেন পরিপূর্ণ মনের ভাব অভিব্যক্ত করার জন্য।

"সাহিত্যের ভাষা কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় একেবারে বদলে দিয়েছেন। তিনি আরবি, ফার্সি এবং উর্দু শব্দসমূহ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে, তাদের জায়গায় সংস্কৃতমূলক শব্দের আমদানী করেছেন। ফলে পণ্ডিতি বাঙ্গালা তথা বর্তমান বাঙ্গালা হিন্দু সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে।... হিন্দুদের জাতীয় সাহিত্য তাদের অক্লান্ত সেবায় সমৃদ্ধ এক সাহিত্যে পরিণত হলো। তারপর দুই একজন করে মুসলমানেরা যখন বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে নামতে আরম্ভ করলেন, তখন হিন্দুর ব্যবহৃত বাঙ্গালা ভাষা সমস্ত শিক্ষায়তনগুলিকে দখল করে বসেছে, দেশের সাহিত্যকে দখল করে বসেছে, সংবাদপত্র প্রভৃতিকে দখল করে বসেছে। জাতীয় ভাষা ব্যবহার করার মত সাহস, শক্তি এবং প্রতিভা আমাদের তখনকার সাহিত্যিকদের মধ্যে ছিল না। হিন্দুর ব্যবহৃত ভাষাকেই তাঁরা রুচিসম্মত এবং ভদ্রতাসম্মত বলে মনে করলেন। মীর মশাররফ হোসেন, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন, শেখ আব্দুর রহিম প্রভৃতি হচ্ছেন সেই যুগের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত মুসলমান সাহিত্যিক।

www.nagorikpathagar.org

" তারপর এসেছে আমাদের বর্তমান যুগ। বিদ্যাসাগরী গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে এবং মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ সাহিত্যিকদের অনুকরণপ্রিয়তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্রোহ বা Natural Reaction দেখা দিয়েছে। ... আমরা আস্তে আস্তে তখন বুঝতে পারছি, আমাদের স্বাভাবিক জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করা লজ্জার বিষয় নয়, উপরন্তু সেই ভাষাতেই আমাদের প্রকৃত সাহিত্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। আমাদের স্বাভাবিক ভাষা কী? বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালা যে বাঙ্গালী হিন্দুর বাঙ্গালা থেকে অনেকাংশে ভিন্ন. সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। আর এই প্রভেদ অহেতুক নয়। এর যথেষ্ট ঐতিহাসিক এবং কালচারগত কারণ বর্তমান আছে। সেই কারণের দরুণ এক সময় পুঁথির ভাষা স্বাভাবিককভাবেই আমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছিল। অবশ্য এখন আমাদের ভাষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করতে হবে। আমির হামজার দাস্তানের ভাষা আমাদের সাহিত্যে আর চলবে না আমরা আমাদের স্বাভাবিক ভাষার অনুসরণ করে সরলতার পথে অগ্রসর হবো। **(এস. ওয়াজেদ আলীঃ বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান)**।

লেখক এস. ওয়াজেদ আলী পাকিস্তান সৃষ্টিরও বহু পূর্বে বাংলা ভাষা সম্পর্কে উক্ত মন্তব্য করেছিলেন, বর্তমানেও তার তাৎপর্য ও যথার্থতা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। ১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরীর অধীনে নিযুক্ত সংস্কৃত পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামনাথ, বিদ্যাবাচস্পতি, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু প্রচলিত বাংলা ভাষা থেকে আরবি, ফার্সি, তুর্কি ইত্যাদি শব্দরাজি সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সংযোগে যে কৃত্রিম ভাষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকসমূহ রচনা করলেন বিদ্যাসাগর সে ভাষাকে কিছুটা প্রাঞ্জল ও বোধগম্য করলেও বাংলা ভাষার আদি রূপ থেকে তা ছিল ভিন্ন অর্থাৎ আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ বিবর্জিত। বিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকে নজিবর রহমান, নজরুল ইসলাম সে ভাষার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বিদ্রোহ' বা Natural reaction দেখিয়ে আমাদের জাতীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াসে লিপ্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সেটাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হওয়া, অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হওয়া এবং সর্বোপরি জাতিসংঘ কর্তৃক 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা

www.nagorikpathagar.org

দিবস' হিসাবে স্বীকৃতি লাভের পর সঙ্গতভাবেই আমাদের ভাষার আসল অকৃত্রিম রূপ বিকাশের অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এখনো আমাদের জাতীয় ভাষা-সাহিত্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এ ষড়যন্ত্র যত গভীর, সুপরিকল্পিত ও শক্তিশালীই হোক না কেন, আত্মপ্রত্যয়, আত্ম-সচেতনতা ও স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষার অপরিহার্য তাগিদে তা প্রতিরোধের দুর্জয় শপথ নিতে হবে। বিভাগ-পূর্বকালে আমাদের রাজধানী ছিল কলকাতায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিতদের নেতৃত্বে বিদ্যালংকার-বিদ্যাবাচষ্পতিদের হাতে যে কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু হয়েছিল এবং যার ভিত্তিতে তখন বাংলা ভাষার সংস্কৃতায়ন সাধিত হয় ও সে ভাষার ভিত্তিতে সাহিত্যের বিকাশ ঘটে, বিংশ শতকের শুরু থেকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে সে বিদ্রোহ নতুন আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ঢাকা এখন শুধু বাংলাদেশের রাজধানীই নয়, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও প্রধানতম কেন্দ্র ও আমাদের স্বতন্ত্র, স্বাধীন সত্তা ও জাতীয় ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠ।

দুই.- বাংলাদেশে মুসলিম শাসন কায়েম হবার পর মুসলিম শাসক ও আমীর- ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু-মুসলিম সকলেই স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেছে। কিন্তু উভয়ের সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল ভিন্ন। হিন্দুরা বেদ-উপনিষদ-মহাভারতের অনুবাদ করেছে, রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা সংবলিত বৈষ্ণব সাহিত্য এবং লৌকিক দেব-দেবির মহিমা কীর্তনমূলক মঙ্গল কাব্য ও শ্রীচৈতন্যের জীবনী সংবলিত চরিত সাহিত্য ইত্যাদি রচনা করেছে, তার বিপরীতে মুসলমানরা ইসলামী বিষয়বস্তু, রাসূলের (স) জীবনী, ইসলামের বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্র, ঘটনা ও কাহিনী যেমন মহানবী (স) আমীর হামজা, ইউসুফ-জোলায় খাঁ, লাইলু-মজনু, শিরী-ফরহাদ, ইত্যাদি মানবিক কাহিনী ও প্রেমোপাখ্যান নিয়ে অসংখ্য কাব্য-কবিতা রচনা করেছে। প্রাচীন কালের সব দেশের সাহিত্যই ধর্ম-নির্ভর। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদও বৌদ্ধধর্ম-কথা সংবলিত। হিন্দুদের রচিত প্রাচীন এমনকি, মধ্যযুগীয় সাহিত্যও হিন্দুধর্ম, তাদের দেব-দেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে ভরপুর। অবশ্য রাধা-কৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম, ষোল শো গোপিনীর সাথে শ্রীকৃষ্ণের অবৈধ প্রণয়লীলা ও মঙ্গলকাব্যের অসংখ্য কাহিনীতে মানবিক সংবেদনা ও জীবন-বাস্তবতার অনেক কিছু প্রচ্ছন্নভাবে ফুটে উঠেছে। তবে এসব কাহিনীতে অশ্লীলতা, নগ্নতা, ব্যভিচার ও অনৈতিকতা এত প্রকটভাবে ফুটে

www.nagorikpathagar.org

উঠেছে যে, কোন রুচিশীল পাঠকই তা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, মুসলিম রচিত সাহিত্যে কুরআন-হাদীস, নবী-রসূল, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ভাব-সম্পদ তো আছেই উপরন্তু মানবিক সংবেদনা, প্রেম-প্রণয়, জীবনের আর্তি মানবিক রসে জারিত হয়ে হৃদয়গ্রাহীভাবে ফুটে উঠেছে এবং আশ্চর্যের বিষয়, এসব রচনায় ইসলামের উন্নত নৈতিক বোধ ও মানবিক ঔদার্য সর্বদা উচ্চকিত, মধ্যযুগীয় ভাঁড়ামী, অশ্লীলতা, নগ্নতা ও ব্যভিচারের চিত্র এখানে অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে ডক্টর এম এ রহীমের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ

"যখন হিন্দু ঐতিহ্যের পবিত্র দেব-দেবীর অপবিত্র প্রেমকে পূজা করার মধ্যে জীবনের নৈতিক মূল্যবোধ অনুপস্থিত ছিল, তখন বাস্তবিক মুসলমান কবিদের নৈতিক ঐতিহ্যবাহী রম্য কাব্য ছিল বাংলা সাহিত্যের এক বিস্ময়কর ঘটনা।" (ডক্টর এম. এ. রহিমঃ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫)।

বাংলা সাহিত্যে এটা একটি নতুন দিক, মুসলিম কবিরাই এ ধারার প্রবর্তক এবং তাদের হাতেই এর বিকাশ ঘটে। অতএব, বিষয়বস্তু ও অশ্লীলতা বিবর্জিত অশ্লীল সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুস্পষ্ট মানবিক ধারা প্রবর্তনে মুসলমানদের এক ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা তথা কুরআন-হাদীস, মুসলমানের সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ মুসলমানদের সৃষ্টি-কর্মে প্রভাব বিস্তার করে। এ সম্পর্কে ডক্টর আহমদ শরীফের মন্তব্য স্মরণযোগ্যঃ

"বাংলাদেশের প্রায় সবাই মুসলমান। তাই বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ যুগে সুলতান সুবাদারের প্রতিপোষণ পেয়ে কেবল হিন্দুরাই বাঙলার সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, মুসলমানরাও তাদের সাথে সাথে কলম ধরেছিলেন এবং মধ্যযুগে বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, দেবধর্ম প্রেরণাবিহীন নিছক সাহিত্য রস পরিবেশনের জন্য তাঁরাই লেখনী ধারণ করেন। আধুনিক সংজ্ঞায় বিশুদ্ধ সাহিত্য পেয়েছি তাঁদের হাতেই। কাব্যের বিষয়বস্তুতেও বৈচিত্র্য দানের গৌরবও তাঁদেরই; কেননা, সব রকমের বিষয়বস্তুই তাঁদের রচনার অবলম্বন হয়েছে। মুসলমানদের দ্বারা এই মানব রসাশ্রিত সাহিত্য ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়েছে ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে। দরবারের ইরানী ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় এদেশের হিন্দু-মুসলমানের একই সূত্রে তথা একই কালে হলেও একেশ্বরবাদী মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধ ইরানী সংস্কৃতি দ্রুত গ্রহণে ও স্বীকরণে তাদের সহায়তা করেছে প্রচুর। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুর পক্ষে

www.nagorikpathagar.org

ছয়শ' বছরেও তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। তাই মুসলমান কবিগণ যখন আধুনিক সংজ্ঞায় 'বিশুদ্ধ সাহিত্য' প্রণয়োপাখ্যান রচনা করছিলেন, হিন্দু লেখকগণ তখনো দেবতা ও অতিমানব জগতের মোহমুক্ত হতে পারেন নি। যদিও এই দেবভাব একান্তই পার্থিব জীবন ও জীবিকা সম্পৃক্ত।" **(ডক্টর আহমদ শরীফঃ বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য, ঢাকা, পৃ. ১৮৫)।**

ডক্টর আহমদ শরীফ এখানে যেটাকে 'ইরানী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রভাব' বলে উল্লেখ করেছেন, সেটা ছিল মূলত ব্যাপকার্থে ইসলামের প্রভাব। ইসলামী বিশ্বাস, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ মুসলমানের জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করে তারই প্রতিফলন ঘটে তাদের সকল কৃতিতে, চিন্তা, মনন, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে।

এ প্রসঙ্গেই ডক্টর আহমদ শরীফ বাঙালি মুসলমানের রচিত সাহিত্যের রূপরেখা, বিষয়বস্তু ও অনুপ্রেরণা কী রকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন এভাবেঃ "আমাদের বাংলা ভাষায় স্বকীয় আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে, আদর্শ হবে কোরানের শিক্ষা, আধার হবে মুসলিম ঐতিহ্যানুগ আর বিষয়বস্তু হবে ব্যক্তি বা সমাজ অথবা বৃহদার্থে জগৎ ও জীবন।" **(ডক্টর আহমদ শরীফঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ধারায় হিন্দু পভাব, মাসিক মোহাম্মদী পৌষ, ১৩৫৮)।**

এ সম্পর্কে আরো দুটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি। প্রথম মন্তব্যটি করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক শশাঙ্কমোহন। তিনি বলেনঃ "মুসলমানের এই উপাখ্যান কাব্যে ধর্মের বা সাম্প্রদায়িকতার সম্পর্ক নাই, সাহিত্য রসই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য।"

অন্য মন্তব্যটি করেছেন বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক নগেন্দ্রনাথ। তিনি বলেনঃ "মুসলমান কবিগণ আরব্যোপন্যাস বা পারস্যোপন্যাস বর্ণিত অপূর্ব প্রেম কাহিনীর অনুসরণে বাঙ্গালা ভাষার পয়ারাদি ছন্দে নানা উপাখ্যান রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল কাব্যে যে কেবল মুসলমানী চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা নহে। এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাঙ্গালী ছাঁচও দৃষ্ট হয়।"

মুসলিম রচিত সাহিত্যের ভাষা ও বিষয়বস্তুর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান আরো সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতেঃ

"... পুঁথি সৃষ্টির ফলেই বাংলা সাহিত্যে নবযুগ পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহা ঠিক কিন্তু বাংলা ভাষার প্রাথমিক উন্নতি ১৪০০ হইতে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে না হইলে বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপ সম্ভব হইত না।

www.nagorikpathagar.org

১। বর্তমানে পুঁথি সাহিত্যের মূল্য যাহাই হোক-পুঁথি সাহিত্যিকদের কল্যাণেই বাংলা কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের প্রচলন হয়।

২। কাব্যের বিষয়বস্তু একঘেঁয়ামি তাঁহারাই ভাঙ্গিয়া দেন।

৩। পুঁথি সাহিত্যেই সর্ব্বপ্রথম মানুষের গল্প প্রচলিত হয়। সেই সব গল্পে নানা রসেরও পরিবেশন ঘটে।

৪। পুঁথি সাহিত্যের যুগে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম শুধু ধর্মীয় গ্রন্থ ছাড়া উপাখ্যান কাব্য, ইতিহাস, ঐতিহাসিক কেচ্ছা, জীবনী, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, জ্যোতিষ, হেকিমী, স্বপ্নতত্ত্ব প্রভৃতি নানা বিষয়ে পুঁথি রচিত হয়। আরবি ও ফারসি গ্রন্থের অনুপ্রেরণাতেই বাংলা সাহিত্যে ইংরাজ আমলের পূর্বেই এই সব বিষয়ে পুঁথি রচিত হইয়াছিল।

৫। পুঁথি সাহিত্যেই সেকালের গৌড়ের চলতি বাংলা ভাষা প্রচলিত হয় এবং তাহাই ছিল ইংরাজ আমলের পূর্বের বাংলা ভাষা।" (**নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ-১৯৯২, পৃ. ৪২৪-৪২৫**)।

তিন. ভাষা ও বিষয়বস্তুর পরেই সাহিত্যে যে বিষয়ের গুরুত্ব সেটা হলো ভাবানুভূতি ও অনুপ্রেরণা। যে কোন মহৎ সৃষ্টির জন্যই এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটা আবার দেশ-কাল-পাত্র ও পরিবেশের উপর অনেকটা নির্ভরশীল। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে আরবের কবিরা দেব-দেবী, পৌত্তলিক-মুশরিকী ভাবধারা, মানবিক প্রেম-কাহিনী ও নানা রূপ অশ্লীল-কুরুচিপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে কাব্য-কবিতা-গাঁথা রচনা করেছেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর সেসব কবিই অনেকে সম্পূর্ণ নতুন ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবিতা বা সাহিত্য চর্চায় মনোযোগী হয়েছেন। পূর্বে যাঁরা মুশরিকী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য-চর্চা করেছেন, পরবর্তীতে তাঁরাই তৌহিদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় কলমকে বানিয়েছেন জিহাদের উৎকৃষ্ট হাতিয়ার, এক স্রষ্টার প্রশংসা ও রাসূলের (স) প্রশস্তি-গাঁথায় হয়েছেন মুখর। তাঁদের লেখায় অশ্লীল-অনৈতিক চিন্তা-চেতনার বদলে এসেছে স্বচ্ছ-নির্মল মানবিক ভাবধারা। তাঁদের প্রকাশের মাধ্যম বা ভাষা একই ছিল, কিন্তু প্রকাশের রীতি, ভাব-বিষয় ও পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। একটি ভাব-বিপ্লব ও ঐশী-চেতনার বা অনুপ্রেরণার ফলেই শুধু আরবি সাহিত্য নয়, সমগ্র আরব সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা তথা সমগ্র জীবন-ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক ও সফল কল্যাণময় পরিবর্তন সংঘটিত হয় তা সমগ্র জীবন-ব্যবস্থায় যে বৈপ্লবিক ও সফল কল্যাণময় পরিবর্তন নিয়ে আসে তা সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করে, বিশ্ব-সভ্যতায় তা স্থায়ী কল্যাণময় ধারা সৃষ্টি করে এবং তার প্রভাব বিশ্বজুড়ে যুগ যুগ ধরে অনুভূত হয়। ইসলামের প্রচার এবং বিশেষত মুসলিম শাসনামলে এ প্রভাবের

www.nagorikpathagar.org

উত্তুঙ্গ তরঙ্গাভিঘাত বাংলাদেশের জীবনধারা, সংস্কৃতি, সমাজ-পরিবেশ ও চিন্তা-চেতনায় যে পরিবর্তন ঘটায়, ইতঃপূর্বে তার উল্লেখ করা হয়েছে, ভাব ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে যে প্রভাব তার উল্লেখও করেছি। মূলত ভাষা, ভাব, বিষয়বস্তু, স্বতন্ত্র জীবনধারা ও অনুপ্রেরণাগত যে স্বাতন্ত্র্য কালক্রমে সেটাই আমাদের স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য হিসাবে চিহ্নিত হয়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানের মন্তব্য আবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেনঃ

"১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সাপের দেবতা, বাঘের দেবতা, ওলাউঠা বসন্তের দেবতা লইয়াই বাংলা সাহিত্যের কারবার চলিতেছিল। কিন্তু এই সময় হইতে ভাবের রাজ্যে এক বিশেষ পরিবর্তন দেখা গেল। দেশের সর্বত্র ফকির ও দরবেশের ইসলাম প্রচারের ফলে জনসাধারণের চিন্তা-স্রোতের গতি কিছুটা দিক পরিবর্তন করে।" **(নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান, ঐ,পৃ. ২৩১)।**

বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারের ফলে বিশেষত মুসলিম রাজত্ব কায়েমের ফলে যে ভাব-বিপ্লব সংঘটিত হয় তা ধারণ করে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয়, সেটাই মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত নতুন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য। মধ্যযুগে শাহ মোহাম্মদ সগীর, সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ হামজা, কাজী দৌলত, আলাওল, ঊনবিংশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, মুনশী মেহেরউল্লাহ, বিংশ শতকে মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কাজী ইমদাদুল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ, জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মোফাখখারুল ইসলাম, শাহেদ আলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, আল মাহমুদ, আফজাল চোধুরী প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের সে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ধারাকেই সমুন্নত ও সমুজ্জ্বল রেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যে প্রবাহমান প্রধান দুটি ধারা। একটি হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা, অন্যটি মুসলিম ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারা। পাশাপাশি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল হয়ে এ দু'টি ধারাই পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মতই সমান্তরালভাবে বহমান। ঐ বৈশিষ্ট্য ভাবানুভূতি ও অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে, সামাজিক আচরণ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে, রীতি-নীতি ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে, স্বতন্ত্র ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনার ক্ষেত্রে এবং বাস্তবধর্মী জীবনবাদী সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যা চিরকাল অপরিহার্য বিবেচিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আব্দুল কাদিরের মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"চতুর্দশ শতকের শেষ পাদে বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক কাব্য ইউসুফ- জোলায়খা' রচিত হয়- তার আখ্যান- ভাগ আরবি ও ফারসি থেকে গৃহীত। অতঃপর বাংলা কাব্যে আরবি ও ফারসি প্রভাব ক্রমশ বেড়েই চলে। কিন্তু বৃটিশ আমলে ফারসির বদলে ইংরাজি যখন সরকারী দফতরের ভাষা হলো, মধুসূদন মোচন করলেন নতুন দ্বারপত- 'কল্পনার মণিকৌটা ভরে' ইউরোপ থেকে আমদানি করলেন ভাবের পাথেয়। রবীন্দ্রনাথ এসে ইউরোপীয় ভাবের বটিকা উপনিষদীয় অধ্যাত্ম-রসের অনুপান দিয়ে বৈষ্ণবীয় ভক্তির খল্লে ঘষে কালিদাসীয় পানপাত্রে পরিবেশন করলেন। তাতে দেশের বিদগ্ধ শ্রেণীর অভিজাত রুচির পরিতৃপ্তি ঘটল। কিন্তু তা দেশের আপামর সাধারণের রসতৃষ্ণা নিবারণের উপযোগী হলো না,- হিন্দু জনসাধারণ রামায়ণ-মহাভারত বৈষ্ণব-পদ ও মঙ্গল-কাব্য নিয়ে এবং মুসলমান জনসাধারণ -'রসূল-বিজয়, 'পদ্মাবতী' 'আমীর হামজা' 'জঙ্গনামা' 'আলেফ-লায়লা' কাছাছোল আম্বিয়া 'মারফতী পদাবলী' প্রভৃতি নিয়ে মশগুল রইল। এ কালে বাংলার হিন্দু মুসলিম জনসাধারণের কাব্য রুচি ও পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নব্য সাহিত্যের মধ্যে এই যে ব্যবধান গড়ে উঠলো, তা দিন দিন প্রশস্তই হয়েছে।.....পাঠান ও মুঘল আমলে বাংলা কাব্য ছিল যেমন সত্যাশ্রয়ী ও রসাশ্রয়ী, তেমনি ছিল জনগণের রুচি-অনুসারী। আমাদের পরাধীনতার যুগের সাহিত্য যখন হলো একদিকে প্রতীচ্য-মুখী ও অন্যদিকে সংস্কৃত-ভারাক্রান্ত, তখন অসংখ্য মুলমান কবি সুপ্রচলিত 'মুসলমানী বাঙ্গালা'য় পুঁথি প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করলেন। ...

"এদেশের জনগণের মুখের ভাষায় যেসব আরবি-ফার্সি-উর্দু শব্দ মিশ্রিত হয়ে আছে তাই-ই স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যে এসে আপন যথাযোগ্য স্থান দখন করেছে। বলাবাহুল্য যে ভাষার বিকাশে জবরদস্তির অবকাশ নেই। আরও একটা কথা এই যে, যে সাহিত্যে মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য ভাষার গ্রাম্যতা-বর্জিত ব্যবহার যত বেশি, তা ততো বেশি জনপ্রিয়। এ কারণেই কাশীরাম দাস, মালাধর বসু ও মুকুন্দরামের অপেক্ষা কৃত্তিবাস ওঝা, শেখ ফয়জুল্লাহ ও ভারতচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অধিক জনপ্রিয়। আধুনিককালে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক ও শাহাদাৎ হোসেনের চেয়ে নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীন ও ফররুখ আহমদ যে সমধিক জনপ্রিয় হয়েছেন, তারও একটা কারণ এই। শুধু ভাষা বিন্যাস ও রূপ-সৌষ্ঠবের ব্যাপারেই নয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, অনুপ্রাস-অলংকার প্রভৃতি প্রয়োগ এবং ভাবের পরিবেশ সৃষ্টিতেও নতুন কবিতায় আমাদের পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা পুনঃপ্রবাহমান।" **(আব্দুল কাদিরঃ মুখবন্ধঃ 'কাব্য-বীথি' ॥ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১৯৫৪)**।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য ব্যতিক্রম একেবারে নেই তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী তথা মুসলিম ঐতিহ্য ও ভাবধারা হিন্দুদের যেমন প্রভাবিত করেছে, অনুরূপভাবে কোন কোন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকও হিন্দু ভাবধারায় কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন। ঊনবিংশ শতকে শ্রী চৈতন্যের অবির্ভাব যেমন বহুলাংশে ইসলামের প্রভাবের ফল, ঊনবিংশ শতকেও তেমনি রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাবও অনেকটা ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মের সম্মিলিত প্রভাবের ফল। মধ্যযুগে কোন কোন মুসলিম কবি যেমন বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেছেন, ইংরাজ আমলে মুসলিম বাউল ও মরমী কবিদের লেখায় যেমন সুফীবাদের প্রভাব আছে তেমনি তাতে কিছু কিছু হিন্দু ভাবেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। বিংশ শতকে মুসলিম নবজাগরণের কবি নজরুল ইসলামও তেমনি কিছু কিছু শ্যামা-সঙ্গীত রচনা করেছেন এবং তাঁর অনেক রচনায় হিন্দু-মুসলিম চৈতন্যের মিশ্রণ ঘটেছে। তবে ব্যতিক্রম সর্বদাই সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত। মুসলিম শাসনামল থেকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের যে ধারা চলে আসছে তা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের এক সুস্পষ্ট আলোকিত উজ্জ্বল ধারা।

চার. আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক থেকেও বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্যের সুস্পষ্ট ছাপ বিদ্যমান। আরবি পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা। এ ভাষার সাহিত্যও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ফারসিও একটি প্রাচীন ভাষা। এ ভাষায়ও সুসমৃদ্ধ সাহিত্য বিদ্যমান। ফারসি ভাষার কবি জালালুদ্দীন রূমী, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, শেখ জামী, হাফিজ, ফেরদৌসী প্রমুখ পৃথিবীর সর্বকালের সকল ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্তর্ভুক্ত। মধ্যযুগ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এমন কি, বাংলা ভাষার অনেক আধুনিক কবি-সাহিত্যিকের উপরই তাঁদের প্রভাব বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করা যায়। উর্দু অপেক্ষাকৃত নতুন ভাষা হলেও এ ভাষাও অত্যন্ত সমৃদ্ধ। উর্দু সাহিত্যের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কবি মীর্যা গালিব, মহাকবি ইকবাল প্রমুখের বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও প্রভাব বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত-রেখাকে গভীরভাবে স্পর্শ করে গেছে। এ সকল প্রভাবের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিপুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে এবং সাথে সাথে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন স্বতন্ত্র ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। ইতঃপূর্বে এ প্রভাবের মূলগত ভাব, বিষয়-বৈভব ও চিন্তা-চেতনাগত দিক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি, এরপর আঙ্গিক ও প্রকরণগত দিক সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াস পাব।

মুসলিম আমলের পূর্বে একমাত্র চর্যাপদ ব্যতীত বাংলা সাহিত্যের আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে যে চর্যাপদের

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখ করা হয় তা আবিষ্কৃত হয় বিংশ শতকের গোড়ার দিকে। অতএব, মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় যখন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয় তখন বাঙালি কবিদের সামনে প্রধানত দুটি সমৃদ্ধ সাহিত্যের নজীর বিদ্যমান ছিল। একটি সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যটি আরবি-ফারসি সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় মহাকাব্য এবং বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় কালিদাসের 'মেঘদূত', 'কুমার সম্ভব', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এর ন্যায় প্রেম ও ভক্তিভাবপূর্ণ ধর্মীয় কাব্যও ছিল। এগুলো প্রধানত ধর্মভাবমূলক হলেও এতে মানবীয় প্রেম ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুসলিম শাসনামলে হিন্দু কবিরা শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন করে। তাছাড়া, মঙ্গল কাব্য জাতীয় ধর্মীয় উপাখ্যান রচনা করেছেন। 'মেঘদূতে'র আদলে তাঁরা বৈষ্ণব পদাবলী এবং 'গীত গোবিন্দে'র আদলে শ্রীচৈতন্যের চরিত্রমূলক অসংখ্য কবিতা-কাব্য রচনা করেছেন।

এর পাশাপাশি আরবি-ফারসি ভাষার অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের আদলে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি হয়। আরবি ভাষায় আল্লার নাযিলকৃত মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কেবল মানব জাতির পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানই নয়, এর শব্দ-বিন্যাস, বাক্য-গঠন প্রণালী, তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ-বিধি, উপমা, ছন্দ, বিশিষ্টাত্মক শব্দ, অর্থ, লালিত্য ইত্যাদি সবকিছু মিলিয়ে এক অনন্য গ্রন্থ। যেহেতু এটি বিশ্ব-স্রষ্টা স্বয়ং আল্লাহর সৃষ্টি তাই এর রূপ-সৌন্দর্য ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনন্য, পৃথিবীর অন্যকোন গ্রন্থের সাথে এর তুলনা করাও ধৃষ্টতা মাত্র। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ বাদ দিলেও এ ঐশী গ্রন্থটি আরবি সাহিত্যের একটি মডেল হিসাবে পরিগণিত হয়। মুসলিম, নাছারা, ইয়াহুদী, পৌত্তলিক-মুশরিক নির্বিশেষে সকল আরবি ভাষাভাষী কবি-সাহিত্যিকই এ মহাগ্রন্থের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যুগ যুগ ধরে এরদ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এমন কি, মুসলমানরা ইসলাম প্রচার, রাজ্য জয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর যে কোন দেশে গেছেন, সেখানেই এ গ্রন্থটি সাথে নিয়ে গেছেন। ফলে সেখানকার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচারে এ গ্রন্থের অনিবার্য প্রভাব পড়েছে। বিশ্ব-সভ্যতা তথা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে বিভিন্নভাবে এ একটি মাত্র গ্রন্থের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থকে তার সমকক্ষ দূরে থাক, কাছাকাছিও দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এভাবে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে এবং বহুলাংশে ফারসি, তুর্কি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে

www.nagorikpathagar.org

পরোক্ষভাবে আল-কুরআনের শব্দ, ভাব, কাহিনী, বিষয়, বর্ণনা, রূপক-উপমা, সৌন্দর্য বহুলভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

আল-কুরআনের মাধ্যমে আরবি, ফার্সি, তুর্কি, উর্দু প্রভৃতি ভাষার বিশ্ব-বরেণ্য অসংখ্য কবি ও তাঁদের অমর ধ্রুপদ সাহিত্যের প্রভাবও বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ও বাংলা সাহিত্য তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক ভাবধারা ও ঐশ্বর্য-সম্পদে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। আরো একটি ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যে আরবি-ফার্সি সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্যযোগ্য। তা হলো ছন্দ। প্রাচীন বাংলা কাব্যে অক্ষর সংখ্যা ও যতির কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। শুধু চরণের শেষে ব্যঞ্জনের মিলই সে যুগের কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ

"আমরা বাঙ্গালা পদ্যের প্রাচীনতম যে নিদর্শন পাইয়াছি তাহাতে কোন ছন্দ বা প্রণালী দৃষ্ট হয় না। ... মানিকচাঁদের গানে অক্ষর, যতি বা মিলের কিছু মাত্র নিয়ম দৃষ্ট হয় না। ভাব প্রকাশের প্রয়োজন হইলে অক্ষর সংখ্যা ২৪, ২৫ এমন কি ২৬ ও অতিক্রম করিয়াছে। আবার স্থল বিশেষে তাহা সংক্ষেপ হইয়া ১২ কি ১০-এ অবতরণ করিয়াছে এরূপও দৃষ্ট হয়।"

এ প্রসঙ্গে নাজিরুল ইসলাম বলেনঃ "বাংলার একটি অতি প্রাচীন ও প্রধান ছন্দ পয়ার। পয়ারেরই রকমফের ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, লাচরী প্রভৃতি। প্রাচীন কবিরা প্রায় সকলেই পয়ার রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, সৈয়দ সুলতান, মালাধর বসু, সগীর, কৃত্তিবাস, সকলেরই কাব্য পয়ারে গাঁথা। কিন্তু সংস্কৃতে পয়ার নাই। লঘু ত্রিপদী নাই।" (**নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ ঐ, পৃঃ ১৬৫**)।

নাজিরুল ইসলাম আরো বলেনঃ 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তণ' রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু তাঁহার রচনাতেও সংস্কৃত কাব্যরীতি নাই; আছে পয়ার, সেও আবার নিয়মাবদ্ধ পয়ার নহে।" (ঐ, পৃ. ১৬৫)।

তাহলে এ পয়ার ছন্দের আবির্ভাব কোথা থেকে? নাজিরুল ইসলাম এর যুক্তিসঙ্গত জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ "বাংলা কবিতার মত ফার্সী কবিতারও জাতিবিচার অক্ষর বা স্বর দিয়া ঠিক করা যায় না। মুসলিম যুগের পর হইতে যেসব ছন্দ বাংলায় দেখা যায়, মুসলিম যুগের পূর্বে সেই ধরনের ছন্দ বাংলায় কোথাও পাওয়া যায় নাই। বাংলা কবিতায় অক্ষর নির্দিষ্ট করিবার নিয়ম পূর্বে ছিল না; বর্তমানেও যে আছে তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অক্ষর বা

www.nagorikpathagar.org

স্বর বাংলা কবিতার ছন্দ রচনার চাবিকাঠি নয় পর্বের মাত্রাই ছন্দের প্রাণ। ... প্রাচীন কবিরা এবং মুসলিম পুঁথি সাহিত্যিকেরা যে সব ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন তাহা প্রায় সবই ফার্সী অথবা আরবী। চণ্ডীদাসের রচিত পয়ারের (কথা) পূর্বেই (বলা হইয়াছে)। তাঁহার রচিত ত্রিপদীর সংখ্যাও বহু। ত্রিপদী ফারসি 'সালমা' রাগেরই বাংলা সংস্করণ। 'রুবাই' বা চৌপদী চণ্ডীকাব্যে বিশেষ নাই তবে আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথ রুবাই-এর ঢং-এ কবিতা রচনা করিয়াছেন। ... রুবাই জাতীয় কবিতা, বয়েৎ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বড় কেউ লেখেন নাই।" (ঐ, পৃ.১৬৯-১৭০)।

এভাবে নাজিরুল ইসলাম আরো দেখিয়েছেন, ফারসি মেসরা (এক চরণের কবিতা), 'খামচা' বা 'মখচ্ছম' (পাঁচ চরণের কবিতা, 'মছদ্দস' (ছয় চরণের কবিতা), 'মছব্বা' (সাত চরণের কবিতা), 'মছন্মান' (আট চরণের কবিতা) প্রভৃতি চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই কম-বেশী অনুসরণ করেছেন। প্রাচীন পুঁথিকার সজ্ঞানেই ফারসি রীতি অনুসরণ করেছেন। তবে ফারসি রীতিতে বহুকাল থেকে বাংলা কবিতা রচিত হলেও এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়নি, কিংবা ফারসি নামও বাংলায় গৃহীত হয়নি।

অতএব, এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলিম আমল থেকে আমাদের ভাষার নবজন্ম ও সাহিত্য স্বচ্ছন্দ বিকাশের সাথে সাথে ভাষা, বিষয়বস্তু, ভাবানুভূতি বা অনুপ্রেরণা, আঙ্গিক ও প্রকরণগত বিভিন্ন দিকে আমাদের সাহিত্যে একটি প্রাণময়, দীপ্তিময়, ঐশ্বর্যমণ্ডিত ধারা গড়ে উঠেছে, যেটাকে এককথায় মুসলিম ঐতিহ্যরূপে আখ্যায়িত করা যায়। প্রধানত মুসলমানদের হাতেই এটা গড়ে উঠলেও হিন্দুরাও এর দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। ফলে এটা সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য রূপে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের অবিচ্ছেদ্য সম্পদ হিসাবে পরিগণিত। এটাকে উপেক্ষা করা বা বিস্মৃত হওয়া আত্মঘাতিরই নামান্তর। ঐতিহ্যের অনুসরণ ও তার নব নব রূপায়ণের মাধ্যমেই কালজয়ী, প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এ সচেতন উপলব্ধি থেকেই আমাদের ভাষা-সাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্যকে ধারণ ও লালন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

উনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট ও মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য সাধনা

বাংলায় মুসলিম শাসনামলের (১২০৪-১৭৫৭) সাড়ে পাঁচ'শ বছরকে নানাদিক থেকে 'স্বর্ণযুগ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ দীর্ঘ সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত ও স্বাভাবিক। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে। সামাজিক দিক থেকে শান্তিপূর্ণ, সহনশীল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান ছিল। ধর্মীয়ভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এ সময় বাংলার খ্যাতি বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শাসকগোষ্ঠী উদারভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। মুসলিম শাসকগোষ্ঠী এবং সমাজের বিত্তবানগণ স্বেচ্ছায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ও বিনা খরচে সেখানে ছাত্রদের থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার ব্যবস্থা করেন। এ কারণে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।

কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে বাংলার ভাগ্য-বিপর্যয়ের ফলে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় ঘটে। ইংরাজ শাসক ও তাদের দোসর হিন্দু জমিদার-জোতদার-গোমস্তা-কর্মচারী ও পাইক-বরকন্দাজদের শোষণ-জুলুম-অত্যাচারে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপর্যয় নেমে আসে এবং বাংলা ভাষার চর্চা ব্যাহত হয়। এতদিন পর্যন্ত শাসক ও অভিজাত শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় কবি-শিল্পীগণ সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু পলাশীর ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে নবাব সিরাজউদৌলার পরাজয় এবং বেনিয়া ইংরাজদের ক্ষমতা দখলের পর স্বাভাবিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা সামগ্রিক ক্ষেত্রে সমূহ বিপর্যয় সৃষ্টি হয়।

www.nagorikpathagar.org

কবি-সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ সংস্কৃতিসেবীগণ অকস্মাৎ পৃষ্ঠপোষকহীন, অসহায়, ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন ও অনিশ্চয়তার কারণে মানুষের মনে সদা সশংকভাব বিরাজ করে। এ পরিবর্তিত অবস্থায় মানুষের মানস-রাজ্য নিতান্তই অভিব্যক্তিহীন, ফ্যাকাশে ও সংক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। জনগণ সর্বদা ইংরাজ ও তাদের এদেশীয় অনুচরদের নানারূপ অত্যাচার, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক পীড়ন ও জুলুমের আশংকায় সদা চিন্তান্বিত থাকে। এরূপ উদ্বেগাকুল পরিবেশ সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উপযোগী নয়। তাই দেখা যায়, ইংরাজ আমলে প্রথম প্রায় এক শতাব্দীকাল উল্লেখযোগ্য সাহিত্য সৃষ্টি হয়নি। গ্রাম্য কবিগণ আউল-বাউল-দেহতত্ত্ব-মারফতী জাতীয় কিছু গান-কবিতা ইত্যাদি রচনা করেছে মাত্র। তবে সেগুলোকে উঁচুমানের সাহিত্য বলা যায় না।

ইংরাজগণ প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আগমন করে। কিন্তু অর্থ-লিপ্সা ক্রমে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়। এদেশীয় বিশ্বাসঘাতক স্বার্থপর কিছু ব্যক্তি তাদের এ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সাহায্য করে। এভাবে বেনিয়া শ্রেণীর ইংরাজগণ যখন তাদের এদেশীয় অনুচরদের সহযোগিতায় ছলে-বলে-কৌশলে রাজনৈতিক আধিপত্য লাভে সক্ষম হলো, তখন তাদের থেকে কল্যাণ-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন সুশাসন প্রত্যাশা করা ছিল দুরাশা মাত্র। ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্ন ইংরাজগণ নবলব্ধ রাজশক্তিকে অর্থনৈতিক শোষণের নিষ্ঠুর যন্ত্রে পরিণত করে। সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক কোন কর্মসূচীই তাদের ছিল না। এরূপ পরিবেশে জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক ও সুকুমার বৃত্তির চর্চা ও বিকাশ সম্ভব ছিল না। অবশ্য ক্ষমতা দখলের প্রায় অর্ধশত বছর পর তারা উপলব্ধি করে যে, রাজনৈতিক আধিপত্য স্থায়ী করতে হলে এদেশের মানুষকে মানসিক দিক দিয়ে তাদের গোলামে পরিণত করতে হবে। ফলে তারা এদেশে একশ্রেণীর রাজানুগত লোক তৈরির উদ্দেশ্যে ইংরাজি ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করে তার দ্বারা ইংরাজি ভাষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটাবার প্রয়াস পায়। সঙ্গে সঙ্গে তারা খৃস্টান ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এদেশে তাদের ঔপনিবেশিক স্বার্থকে স্থায়ী করার চেষ্টা চালায়। এদেশের মানুষকে পাশ্চাত্যের মত জ্ঞানী-গুণী-শিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে তারা ইংরাজি ভাষা ও শিক্ষা-পদ্ধতি চালু করেনি; বরং এদেশীয় একশ্রেণীর মানুষকে তাদের অনুগত গোলামে পরিণত করাই এর লক্ষ্য ছিল। এসব অনুগত গোলামদের মাধ্যমে এদেশে ইংরাজদের শাসন ও শোষণ-যন্ত্রকে মজবুত করা ও রাজনৈতিক

www.nagorikpathagar.org

গোলামীর সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-মনন ও সংস্কৃতির দিক থেকেও এদেশীয় মানুষের মধ্যে হীনমন্যতা ও দাসত্ব সৃষ্টি করাই ছিল এর লক্ষ্য। ইংরাজদের এ লক্ষ্য সম্পর্কে তাদের নিজেদের স্বীকারোক্তিঃ

"বর্তমানে আমাদের এমন একটি শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে, সমাজে যারা শাসক ও শাসিতের মধ্যে দোভাষীর কাজ করবে। তারা রক্ত-মাংসের গড়নে ও বর্ণে ভারতীয় হবে বটে, কিন্তু রুচি-চিন্তা ও মননের দিক দিয়ে হবে খাঁটি ইংরাজ। **(Woodrow: Macaulay's Minutes on Education in India-1862)**।

এ নব্য শিক্ষা-সভ্যতা প্রচলনের ফলে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণ জনগণ বিশেষত বাঙালি মুসলিম সমাজ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। পলাশীর বিপর্যয় বাঙালি হিন্দুদের নিকট ছিল শুধুমাত্র প্রভু বদল। তাদের মধ্যে একশ্রেণীর অতি স্বার্থপর লোক এ পরিবর্তন আগে থেকেই প্রত্যাশা করে আসছিল। বরং এ পরিবর্তন সাধনের ষড়যন্ত্রে তারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল। তাই তাদের নিকট এটা অপ্রত্যাশিত ছিল না। বরং এটাকে রাতারাতি ভাগ্য বদলের সুযোগ হিসাবে গ্রহণে তারা রীতিমত তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা-সভ্যতা অনুসরণ-অনুকরণেও তারা দ্রুত এগিয়ে আসে। কিন্তু এ পথে অগ্রসর হতে যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাঙালি মুসলিম সমাজের দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়। এ সম্পর্কে ইংরাজ লেখক ইউলিয়াম হান্টার বলেনঃ

"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের ধর্মের কাছে ঘৃণার্হ। ... আমাদের প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থা যেমন তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি, তেমনি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য যে আর্থিক সাহায্য এতকাল তারা পেয়ে এসেছিল, তাও আমরা বিনষ্ট করেছি।" **(ডবলিউ ডবলিউ হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান'**, পৃ. ১৫৪,১৬০)।

বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতি ইংরাজদের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে তারা শাসক শ্রেণীর প্রতি সন্দেহপ্রবণ হয়ে ওঠে। ফলে তারা ইংরাজদের সাথে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকে। তাছাড়া, বাঙালি মুসলিমগণ তাদের ধর্ম ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের কারণে ইংরাজদের ভাষা-শিক্ষা-সভ্যতা থেকে তারা আত্মরক্ষামূলক নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করে। অন্যদিকে, হিন্দুদের

www.nagorikpathagar.org

অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা শাসন কার্যে ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রে ইংরাজদেরকে শুরু থেকেই সহযোগিতা দিয়ে আসছিল এবং সেকারণে তারা ইংরাজদের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট হয়। ইংরাজি ভাষা-শিক্ষা-সভ্যতা দ্রুত রপ্ত করে, ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করে তাদের নিকট থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে উন্নতির সোপান বেয়ে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে। অন্যদিকে, মুসলমনারা সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হতে হতে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে।

ইউরোপীয় শিক্ষা-সভ্যতা আমদানির সাথে সাথে রাজভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও ইংরাজি ভাষা চালু হয়। এতদিন পর্যন্ত রাজ-ভাষা ছিল ফারসি এবং সাহিত্যের ভাষা ছিল বাংলা বা আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা। জনগণের ভাষাও ছিল তাই। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই এ আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষায় কথা বলতেন ও সাহিত্য চর্চা করতেন। তুলনামূলকভাবে মুসলমানদের ব্যবহৃত ভাষায় যদিও আরবি-উর্দু-ফারসি শব্দের পরিমাণ একটু বেশি ছিল। কারণ মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন আরবি ভাষায় লেখা এবং তাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় পরিভাষা হিসাবে তারা অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। তবু হিন্দুদের ব্যবহৃত ভাষায়ও আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কম নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ভরতচন্দ্রের সুবিখ্যাত 'অন্নদা মঙ্গল' তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইংরাজ আমলে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে প্রচলিত বাংলার পরিবর্তে ফোর্ট উইলিয়ামীয় সংস্কৃত বাংলা তথা 'সাধু বাংলা' চালু হয়। পরবর্তীতে ১৮৩৭ সনে রাজভাষা হিসাবে ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি প্রচলনের ফলে সকল বাঙালি এবং বিশেষভাবে বাঙালি মুসলমানের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরম বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়। অবশ্য হিন্দু সমাজে এ বন্ধ্যাত্ব দীর্ঘস্থায়ী না হলেও মুসলিম সমাজে নানা কারণে তা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইংরাজ আগমনের পূর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক আধিপত্য ছিল প্রধানত মুসলমানদেরই হাতে। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। পলাশী প্রান্তরে ষড়যন্ত্রমূলক যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়েষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হলে আকস্মিকভাবে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের আধিপত্য হারানোর বেদনা তাদেরকে চরমভাবে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ করে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেনঃ

"বস্তুতঃ ১৯৫৭ সনে পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ে রাজক্ষমতা-চ্যুতি, ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারির সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেয়াপ্ত আইনে

www.nagorikpathagar.org

নিষ্কর ভূমির রায়তি স্বত্ব লোপ, ১৮৩৭ সনে ফারসীর রাজভাষা চ্যুতি-পর পর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসক শ্রেণী নিঃস্ব-রিক্ত, নিরক্ষর, নিষ্ক্রিয়, নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এই রূপটি হয়েছে।" **(ড. ওয়াকিল আহমদঃ উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা-চেতনার ধারা, প্রথম খন্ড, পৃ. ৪১)।**

নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য, রাজ্য-হারানোর বেদনা ও বিগত দীর্ঘস্থায়ী ক্রুসেডের (মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্মযুদ্ধ) তিক্ততার কারণে ফিরিঙ্গি শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও ভাষাকে মুসলমানগণ কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। এদিক দিয়ে হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পার্থক্য ছিল স্পষ্ট। ইংরাজদের আগমনের ফলে হিন্দুদেরকে কিছু হারাতে হয়নি। শাসন-ক্ষমতা মুসলমানদের নিকট থেকে ইংরাজদের হাতে চলে যাওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন ক্ষতি হয়নি। বরং মুসলমানদের তুলনায় তারা সহজে ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেয়ায় অত্যল্পকালের মধ্যেই তারা ইংরাজদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয় এবং প্রশাসন, সেনাবাহিনী, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারী-জোতদারী ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্থলাভিষিক্ত হয়। ফলে একটি মুসলিম-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজ অতি দ্রুত হিন্দু-প্রাধান্যপূর্ণ সমাজে পরিণত হয়। ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও হিন্দুরা দ্রুত অগ্রসর হয়। এ সম্পর্কে জনৈক ঐতিহাসিক লিখেছেনঃ

"ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো, অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে তাদের নাম বৃটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।" **(সুরজিত দাশগুপ্ত ঃ ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ. ১৬৯)।**

শ্রী সুরঞ্জিত দাশগুপ্ত তাঁর বক্তব্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেনঃ "বৃটিশের সৌভাগ্য গড়ে তোলার কাজে তিন প্রকার দেশীয় মানুষ সামর্থ ও সাহায্য যুগিয়েছে ঃ পাইক সম্প্রদায়-এরা বৃটিশদের বাহুবল যুগিয়েছে; করণ সম্প্রদায় ও তৃতীয় এক ধরনের বিত্তবান সম্প্রদায়... এরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এ দেশীয় বাণিজ্য পরিচালনার ব্যাপারে যোগসূত্র হিসাবে কাজ করেছে। লক্ষণীয় যে, ধর্মের বিচারে বৃটিশদের সামর্থ্য ও সাহায্য যোগানদার এই তিন সম্প্রদায়ই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।"

www.nagorikpathagar.org

অন্যদিকে, মুসলমানগণ মানসিকভাবে ইংরাজ শাসন মেনে নিতে না পারায় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত হারানো রাজশক্তি ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ ও এ জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তারা কেবল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও আধিপত্য হারিয়েছে তাই নয়, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক পিছনে পড়ে গেছে। উপরন্ত, মুসলিম শাসনামলে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, মূলত সেটা তাদের ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে ছিল সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা এর বিপরীত। ফলে এটাকে তারা সহজে গ্রহণ করতে পারে নি।

১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহের (সিপাহী বিদ্রোহ) পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণ করায় এবং অদূর ভবিষ্যতে বড় কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের আয়োজন করার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়ায় মুসলমানদের রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের আকাঙ্ক্ষা সাময়িকভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। এরপর থেকে গত্যন্তর না দেখে মুসলমান সমাজের কেউ কেউ ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-দীক্ষা অনুসরণে উদ্যোগী হন। এসময় কতিপয় মুসলিম মনীষী ও সমাজসেবী এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজের সার্বিক অধঃপতন ও দুরবস্থা অবলোকন করে তাঁরা অতিশয় ব্যথিত হন এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যাতে দ্রুত এগিয়ে আসে, সে ব্যাপারে তাঁরা সর্বতোভাবে সচেষ্ট হন। ইতঃমধ্যে পুরো এক শতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয় এবং ততদিনে শিক্ষা-সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়ে। এ শোচনীয় অবস্থায় ও মহাবিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণের পটভূমিতেই মুসলমানগণ সর্বপ্রথম ব্যাপক ও কিছুটা সচেতনভাবে ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করে।

ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি অনেক দেরিতে মুসলমানদের আগ্রহ দেখা গেলেও বাস্তব ক্ষেত্রে তাদের সামনে অনেক অন্তরায় ছিল। প্রথমত ইংরাজদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা মুসলমানদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনধারা বিকাশের উপযোগী ছিল না। দ্বিতীয়ত ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতার নামে যে ধরনের ইয়াংকীপনা ও সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয়, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের সাথে তা ছিল সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। ফলে মুসলিম সমাজ ইংরাজি শিক্ষার প্রতি তখনও মনের সম্পূর্ণ সায় খুঁজে পায়নি। এ সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"আমাদের প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হিন্দুদেরকে শতাব্দীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত করে তাদের নিষ্ক্রিয় জনসাধারণকে মহৎ জাতিগত প্রেরণায় উজ্জীবিত করে তুলতে পারলেও তা মুসলমানদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাদের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং তাদের কাছে ঘৃণার্হ।" **(ডবলিউ ডবলিউ হান্টার : দি ইন্ডিয়ান মুসলমান, পৃ. ১৫৪)।**

এ কারণেই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থা নামে অন্য একটি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করা হয়। তবে এটা সমস্যার কোন সঠিক সমাধান ছিল না। মাদ্রাসা শিক্ষা-ব্যবস্থায় সীমিত অর্থে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও উক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থায় উচ্চতম ডিগ্রী হাসিলের পরও যথাযথ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ সম্ভব ছিল না; অর্থাৎ সরকারী চাকরী লাভ বা সামাজিক কোন দায়িত্ব পালন বা কোনরূপ উৎপাদনমুখী ভূমিকা পালনের যোগ্যতা সৃষ্টি হতো না বা সেসব ক্ষেত্রে তাদেরকে কোন রূপ সুযোগ দেয়া হতো না। মক্তব-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা অথবা মসজিদের ইমামতী ব্যতীত অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। তাই সরকারী চাকুরী লাভ ও সামাজিক স্বীকৃতি লাভের আশায় কিছুসংখ্যক মুসলমান ইংরাজি শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হয়। এভাবে মুসলমানগণ মূলত ত্রিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে, ইংরাজি শিক্ষিত আধুনিক সমাজ, অন্যদিকে আরবি-ফারসি শিক্ষিত ধর্মীয় সম্প্রদায়, আর এ দু'য়ের মাঝখানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত সমাজ। এরূপ ত্রিধা বিভক্ত সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ সুষ্ঠু সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ অতিশয় দুরূহ। বাঙালি মুসলমানদের জন্য এটা ছিল এক বিপর্যয়কর অবস্থা। এ প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা যেতে পারে।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধদের থেকে ধর্মান্তরিত। বিদেশাগত মুসলমানদেরকে তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে। প্রথমত, ধর্ম-প্রচারক, দ্বিতীয়ত ব্যবসায়ী বা বণিক সম্প্রদায়, তৃতীয়ত রাজ্য বিস্তারে আগত বীর, সৈন্য-সামন্ত ও তাদের সঙ্গী সাথীগণ। আরব মুবাল্লিগ বা ধর্ম-প্রচারকগণ, অষ্টম শতক থেকে বিভিন্ন সময়ে স্থল ও নৌপথে বাংলাদেশে আগমন করেন। ধর্ম প্রচার ছিল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে ঐ সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে আগত কিছুসংখ্যক আরব বণিকও ব্যবসা-বাণিজ্যের অবকাশে ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের অসংখ্য মাজার ও প্রাচীন মসজিদসমূহ এ সকল ইসলাম-প্রচারক অলি-আল্লাহদের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বিদেশাগত মুসলিম ও তাঁদের সঙ্গে আগত সিপাহী-সামন্ত

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর রাজকার্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে তুর্কী বীর ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে তাঁরা এদেশে বিজয়াভিযান পরিচালনা করে গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে মুসলিম রাজত্ব কায়েম করেন। বিদেশাগত মুসলমানদের মধ্যে উদ্দেশ্যগত পার্থক্য যেমন ছিল, তেমনি আখলাক বা আচরণগত পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট।

ধর্ম-প্রচারক মুসলমানদের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার ও তাওহীদের মন্ত্রে সকলকে দীক্ষিত করা। প্রচারক ও তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের চরিত্র ছিল ত্যাগ-তিতিক্ষায় পরিপূর্ণ, পূত-পবিত্র, মাধুর্যময় ও অনুসরণযোগ্য। ইসলামের সর্বজনীন মানবতাবাদ, সাম্য-ভ্রাতৃত্ব, সুবিচার-সৌন্দর্য ও সামাজিক ন্যায়বিচারের সুমহান আদর্শ শতধাবিভক্ত পৌত্তলিক বাঙালি সমাজে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করে। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী মুবাল্লিগদের আদর্শ জীবনাচরণও সকলকে মুগ্ধ ও আকর্ষিত করে। ফলে জাতিভেদ প্রথা ও নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ বিশেষত নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও নির্যাতিত বৌদ্ধগণ দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এভাবে মুসলিম বিজয়ের পূর্বেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলাম কবুল করে। ১২০৪ সালে বাংলায় মুসলিম রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর ইসলাম ধর্ম অপ্রতিহত গতিতে প্রসার লাভ করে। এ ব্যাপারে রাজশক্তির যদিও কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, তবু শাসক শ্রেণীর ধর্ম ইসলাম হওয়ার কারণে পরোক্ষভাবে ইসলামের প্রচার-প্রসারে এটা খানিকটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলে অত্যল্পকালের মধ্যেই বাংলার অর্ধেকেরও বেশি লোক ইসলামে দীক্ষিত হয়। বাংলার ইতিহাসে এত অল্প সময়ে বহিরাগত কোন ধর্ম এত অধিক সংখ্যক মানুষের নিকট গ্রহণীয় হয়েছে বলে জানা যায় না।

বাংলার জমিনে ইসলামের এ অভূতপূর্ব সাফল্যের কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত, ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক আবেদন; সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও ইনসাফপূর্ণ কল্যাণময় উদার আদর্শ। দ্বিতীয়ত, বাংলার তৎকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক চরম বিপর্যস্ত অবস্থা। বাংলার জমিন থেকে জৈনধর্ম অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের মধ্যে যেটুকু মানবতাবাদের অস্তিত্ব ছিল, তা নিয়ে বাংলার মাটিতে বৌদ্ধধর্ম হয়তো মোটামুটি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হতো। কিন্তু সেন আমলে ব্রাহ্মণদের রোষাণলে পতিত হয়ে বাংলার সমতলভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম সমূলে উৎক্ষিপ্ত হয়। পার্বত্য প্রত্যন্ত ও দুর্ভেদ্য বনাঞ্চলে এবং প্রচ্ছন্নভাবে লোকজ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে যদিও তার অস্তিত্ব কিছুটা বজায় ছিল কিন্তু সমাজে তার প্রকাশ্যে সদর্প প্রকাশ ছিল প্রায় অসম্ভব।

www.nagorikpathagar.org

বাঙালি সমাজে তখন একমাত্র হিন্দুধর্মেরই প্রচণ্ড দাপট। কিন্তু সে হিন্দুধর্ম বেদ-উপনিষদের হিন্দুধর্ম নয়; হিন্দুধর্মের নামে তখন বহিরাগত আর্য-ব্রাহ্মণদের সংকীর্ণ, বিভেদাত্মক, অনুদার পৌত্তলিক আদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। বৃহত্তর হিন্দু সমাজ তখন অস্পৃশ্য, ঘৃণিত, নিগৃহীত, মানবেতর জীবন যাপন করছিল। শতধাবিভক্ত হিন্দু সমাজে উচ্চ-নীচের ব্যবধান ছিল অতি প্রকট। তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, ছুঁতমার্গ, অবাঞ্ছিত অমানবিক সংস্কার, ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিদের শোষণ ও নৈতিকতাহীন স্বেচ্ছাচারে সমাজ-দেহ পঙ্কিল-বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ইসলামের আগমনকে তাই এ সমাজের নিগৃহীত, নিরীহ জাতীয় অগণিত মানুষ সোৎসাহে স্বাগত জানায়। ইসলামের প্রগতিশীল সাম্যবাদী মানবিক আদর্শ তখন বাংলার ভঙ্গুর সমাজ-ব্যবস্থায় এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি করে। মুসলিম রাজ-শক্তি তখন ইসলাম প্রচারে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা প্রদান করলে এবং শ্রীচেতন্য দেব প্রমুখ হিন্দু-সমাজপতি ও সংস্কারকগণ হিন্দুধর্মের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনে সচেষ্ট না হলে হয়তো সমগ্র বাঙালি সমাজই তখন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে পড়তো।

ইসলামের এ অপ্রতিরোধ্য প্রসারের যুগেও সর্বাধিক অনুধাবনযোগ্য বিষয় হলো এই যে, মুসলিম রাজশক্তি কিংবা মুসলিম মুবাল্লিগগণ বা ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে কখনো অসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। শাসক শ্রেণী তখন প্রতিরোধহীন রাজকীয় আধিপত্য লাভেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ধর্ম-প্রচারকগণ নিজেদের চেষ্টায় প্রায় স্বাধীনভাবেই ধর্ম-প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। অবশ্য বিরুদ্ধ - শক্তির মুকাবিলায় স্থানীয়ভাবে কখনো ছোট-খাট সংঘর্ষের সৃষ্টি হলেও সামগ্রিক ইতিহাসের পটভূমিতে তা ছিল উপেক্ষণীয়। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সাথে তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক ব্যাপক সামাজিক সংঘর্ষ, নৃশংস হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংস-লীলা সাধনের মাধ্যমে বৌদ্ধ-যুগের অবসান ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ সেন রাজাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটেছে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ফলে অকস্মাৎ বাঙালি সমাজে আদর্শ ও মূল্যবোধগত তাৎপর্যময় ব্যাপক পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন সংঘটিত হলেও তা কখনো ব্যাপক সামাজিক সংঘর্ষ সৃষ্টি করেনি বা সামাজিক অগ্রগতির পথে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বরং পরিবর্তিত অবস্থায় নতুন জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ সামাজিক কাঠামোতে নতুন প্রাণময় গতি সঞ্চারিত হয়েছে। মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের সাথে অমুসলিমদের সম্পর্ক ছিল সর্বদাই প্রীতিপূর্ণ ও

www.nagorikpathagar.org

সৌহার্দমূলক। রাজশক্তি মুসলিম হলেও সকল ধর্মের লোকদের প্রতি তাঁরা ছিলেন উদার ও সহনশীল। বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এমন সম্প্রীতিপূর্ণ দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষহীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গতিশীল অবস্থা আর কখনো দেখা যায় নি।

দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক থেকে আগত ব্রাহ্মণ সেন রাজাগণ সংস্কৃত ভাষাকে রাজ-দরবারের ভাষার মর্যাদা দেন। দেশীয় ভাষা বাংলা রাজ-দরবারে ঠাঁই পাওয়া তো দূরের কথা, বাংলা ভাষাকে তারা 'পক্ষীভাষা', 'ম্লেচ্ছ ভাষা' ইত্যাদি নানা তুচ্ছাত্মক অভিধায় আখ্যায়িত করে এ ভাষার চর্চাকারীগণ 'রৌরব' নামক নরকের অধিবাসী হবে বলে তারা ফতোয়া জারি করে। এ সত্ত্বেও সাধারণ বাঙালি মুখের ভাষা হিসাবে বাংলাই ব্যবহার করতো। কারণ এছাড়া মনের ভাব ব্যক্ত করার অন্য কোন উপায় তাদের ছিল না। তবে দেশী ভাষায় সাহিত্য চর্চা করার সাহস বা পরিবেশ তখন ছিল না। অন্যদিকে, মুসলিম শাসনামলে রাজভাষা প্রথমে তুর্কি এবং পরে ফারসি হলেও দেশীয় ভাষা বাংলাকে তারা কখনো অবজ্ঞা করেনি। বরং বাংলা ভাষা-সাহিত্যের চর্চায় তারা সর্বদাই যথোচিত পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছে। তাই বাংলা ভাষার প্রকৃত নবজন্ম ঘটেছে যেমন এ সময়েই বাংলা সাহিত্যেরও ব্যাপক চর্চা হয়েছে এ মুসলিম আমলেই। তার আগে বাংলা ভাষা ছিল যেমন দীন-হীন মৃতপ্রায়, বাংলা সাহিত্যের অবস্থাও ছিল তেমনি। পাল আমলের একমাত্র চর্যাপদ ছাড়া আর কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ইসলামের সাম্যবাদী আদর্শ এবং মুসলিম শাসক-সম্প্রদায়ের ঔদার্য ও পৃষ্ঠপোষতায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার যথাযোগ্য অধিকার লাভ করে। অবশ্য ধর্মীয় বিশ্বাস, সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐতিহ্যগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্য স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এ সময় চরম উৎকর্ষ লাভ করে।

ইংরাজ আগমনের সাথে সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। হতাশাগ্রস্ত সামাজিক পরিবর্তনের বিশৃঙ্খল পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব ছিল না। ফলে পলাশী যুদ্ধের পর প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য অবদান চোখে পড়ে না। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেন আমলকে যেমন 'তমসা যুগ' বলা হয় এ যুগকেও তেমনি অনেকটা 'নিষ্ফলা যুগ' বলা যায়। তবে সেন আমলের মত এ যুগটি অতটা তমসাচ্ছন্ন ছিল না। রাজ-পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত কবিরা এ সময় গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অবস্থায় এক ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, যেগুলোকে

www.nagorikpathagar.org

বাউল গান, কবিয়ালদের গান, গ্রাম্য ছড়া, গান, হেঁয়ালী, সারি, জারি, মুর্শিদী, বয়াতী, ফকিরী, কীর্তন, ভাটিয়ালী ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। এর অধিকাংশই ছিল নিম্নমানের। এ জাতীয় সাহিত্যের মধ্যে এক ধরণের মানসিক দৈন্য, হতাশা, নৈরাশ্য, বৈরাগ্য ও ক্ষেত্রবিশেষে হৃদয়বৃত্তির রুচিবিগর্হিত উৎকট প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র মতো উন্নত মানবিক গুণ ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে, এরূপ সাহিত্যের সৃষ্টিও হয়েছে এ আমলে। তবে এটাকে ব্যাতিক্রম বলে অভিহিত করা চলে।

উনবিংশ শতকের শুরুতেই সামাজিক অস্থিরতা ও মানসিক বৈরাগ্য ও দৈন্য ভাব বিদূরিত হওয়ার লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু সে লক্ষণ কেবল মাত্র বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কলকাতায় ১৮০০ সনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হওয়ার ফলে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত হিন্দুগণ বিদ্যাশিক্ষার দিকে এগিয়ে আসে। ফলে হিন্দু সমাজে নবজাগরণের সূচনা হয়। রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৪৪-১৮৩৩) এ নবজাগরণের প্রাণ-পুরুষ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর পরবর্তী যেসব শিক্ষিত প্রতিভাবান ব্যক্তি এ নবজাগরণের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-১৮৮৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মাইকেল মুধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), রঙ্গলাল (জন্ম ১৮২৭-), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৪), বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪), হেমচন্দ্র (১৮৩৬-১৯০৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক, সমাজ-সংস্কারক ও বিদ্বজ্জন ব্যক্তির আবির্ভাবের ফলে হিন্দু সমাজে জাগরণের এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে যায়। কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তখনো এমন কোন পরিবর্তন বা জাগরণ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং নবজাগ্রত হিন্দুদের বৈরিতা, ইংরাজদের বিরূপতা এবং রাজশক্তির অসহযোগিতার কারণে বাঙালি মুসলমান সমাজ তখনো চরম হতাশা ও দৈন্যদশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছিল। সামাজিক কর্মযোগ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা থেকে তাদের জীবন ছিল প্রায় বিচ্ছিন্ন। ফলে এ সময় তাদের মধ্যে বৈরাগ্য ভাব সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় তথা বাস্তব দিক থেকে নির্লিপ্ত ও নিরাসক্ত হয়ে পড়ায়, সামাজিক সকল ক্ষেত্রে শোষিত-বঞ্চিত হওয়ার ফলে এ সময় তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বৈরাগ্যভাবেরও জন্ম হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজে তখনও রাজা রামমোহন রায়ের মতো কোন নেতার আগমন ঘটেনি।

www.nagorikpathagar.org

তারফলে "বাংলাদেশে দু'একটি পরিবার ছাড়া মোটামুটি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরেই বাংলার মুসলমানেরা ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেনি।" **(বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঃ মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, পৃ. ১৬)।**

পলাশী যুদ্ধের ঠিক একশো বছর পর ১৮৫৭ সনে 'মহাবিদ্রোহ' বা 'সিপাহী বিদ্রোহ' ব্যর্থতা বরণের পর চরম বাস্তবতার নিদারুণ আঘাতে মুসলমানদের মধ্যে এ বৈরাগ্য ও নিরাসক্তভাবের অবসান ঘটতে থাকে। এরপর বাঙালি মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করে এবং তারা শিক্ষা, সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকে। এক্ষেত্রে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৬-৯৩) ও সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) বিশেষ অবদান স্মরণযোগ্য। নবাব আবদুল লতিফের প্রতিষ্ঠিত 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) এবং সৈয়দ আমীর আলীর 'ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮) তৎকালীন স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত মুসলিম সমাজে বিশেষ অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। অবশ্য 'সোসাইটি বা এ্যাসোসিয়েশন কোনটার প্রতিই বাঙালি মুসলমানদের বৃহত্তর অংশের কোনো আস্থা ছিল বলে মনে হয় না। **(আধুনিক বাংলা সাহিত্য মুসলিম সাধনাঃ কাজী আবদুল মান্নান, পৃ. ৮২),** এরূপ ভিন্ন মতও কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের উন্মেষলগ্নে নবাব আব্দুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর বিশেষ অবদানের কথা অধিকাংশ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন।

এভাবে দেখা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলমানদের আত্মগ্লানি অপনোদন, আত্ম-সচেতনতাবোধ সৃষ্টি ও আত্মজাগরণের স্পৃহা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সুপ্তির অবসান ঘটিয়ে নবউত্থানের প্রথম লগ্নে তাদের মধ্যে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা পরিলক্ষিত হয়। এ স্বাতন্ত্র্য জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যেও তেমনি তাদের স্বকীয় ধর্মীয়বোধ, ভাব-বিষয়-উপজীব্য ও ঐতিহ্য-চেতনা ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রেও পরিদৃষ্ট হয়। ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল, কিন্তু শুরুতেই তা অতটা স্পষ্ট ছিল না। বরং মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ(১৮৫৮-১৯৫১), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৭), ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখের রচনায় তথাকথিত সাধু বাংলার ব্যবহারই পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, সাহিত্যিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ তখন সহজসাধ্য ছিল না। কারণ সাহিত্য ক্ষেত্রে ঐসময় মোড়লী ছিল একচেটিয়াভাবে হিন্দুদের হাতে। অবশ্য ঐসময় একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩)। তিনিই প্রথম বাঙালি

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সাহিত্যিক, যিনি সাহিত্যে প্রবল আত্মবিশ্বাসের সাথে বাংলা ভাষায় প্রচলিত আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) হাতে তা অতিশয় সুস্পষ্ট ও মহিমান্বিত রূপ লাভ করে।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানগণ যখন শিক্ষা-সাহিত্য ক্ষেত্রে এগিয়ে এল, তখনকার অবস্থাও একবার বিবেচনা করা দরকার। এ শতকের শুরুতেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছত্রছায়ায় ইংরাজ পাদ্রী ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃত পণ্ডিতদের যৌথ চেষ্টায় বাংলা ভাষার রূপ পরিবর্তনের প্রয়াস চলে। আরবি-ফারসি উর্দু ভাষার অসংখ্য শব্দরাজি যা বিগত কয়েক শো বছর ধরে বাংলা ভাষার সাথে মিলেমিশে বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, সেগুলোকে 'মুসলমানী জবান' রূপে আখ্যায়িত করে অপাংতেয় করে রাখা হয়। বাংলা ভাষা থেকে আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ঝেটিয়ে তাড়িয়ে তার পরিবর্তে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দরাজিতে পূর্ণ করে 'সংস্কৃতের দুহিতা' রূপে নতুন কৃত্রিম বাংলা চালু করা হয়। এ কৃত্রিম ভাষায় পাঠ্য বই রচনা করে শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে রাতারাতি তা চালু করা হয়। অধিকাংশ হিন্দু লেখক যথাসাধ্য এ নতুন 'সংস্কৃত বাংলায়' সাহিত্য চর্চার প্রয়াস পান। 'বাংলা গদ্যের জনক' নামে পরিচিত রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক হিসাবে পরিচিত মধুসূদনের ন্যায় যুগ-প্রবর্তক কবি এ ভাষায় সাহিত্য চর্চা করে এ ভাষাকে অনেকটা সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলার প্রয়াস পান। তাই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানরা যখন শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় এগিয়ে আসেন তখন তাঁরাও বহুলাংশে এ ভাষাই গ্রহণ করেন। অবশ্য একথাও ঠিক যে, কালক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের হাতে ফোর্ট উইলিয়ামীয় 'সংস্কৃত বাংলা' বহুলাংশে মার্জিত ও সহজবোধ্য হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে উনবিংশ শতকের শুরুতেই বাঙালি হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস এবং সে সাথে নবজাগরণের আভাস পাওয়া যায়। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে শিক্ষিত অনেক হিন্দু যারা সনাতন হিন্দুধর্মকেই আঁকড়ে থাকতে চায় তারাও স্বধর্মে ব্যাপক সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এ ধর্মীয় সংস্কার সাধনের প্রয়াসে অনেকে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য ও প্রাধান্য প্রকাশার্থে অন্য ধর্ম বিশেষত ইসলাম ধর্ম তথা মুসলমানদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। বঙ্কিম ছিলেন এ ক্ষেত্রে সর্বাগ্রগণ্য। বঙ্কিম তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে ইসলাম, মুসলমান ও মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

ইতিহাস বিকৃত করে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য নানারূপ মিথ্যা ও বিকৃত ঘটনা ও অলীক কাহিনীর আশ্রয় নেন। ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে মুসলমানদের নবজাগরণ ও সাহিত্য চর্চার প্রয়াস প্রধানত এ সনাতনপন্থী হিন্দুদের বিদ্বেষমূলক প্রচারণা ও চরম বিদ্বিষ্ট মনোভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল। এ কারণে মুসলমানগণ তাঁদের সাহিত্যে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গৌরবময় অতীতের স্মৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এতে আবেগ-উত্তেজনা ও আত্মারক্ষামূলক প্রবণতার প্রকাশ ঘটেছে। প্রচ্ছন্নভাবে এটা মুসলমানদের আত্ম-পরিচয় লাভ ও নবজাগরণের চেতনা সঞ্চারে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত। কালগত বিচারে নয়, প্রধানত উপজীব্যগত ও শিল্পগত বিচারেই আধুনিকতার লক্ষণ বিচার করা হয়। সেকারণে মধুসূদনকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও সার্থক রূপকার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। মধুসূদনের শিক্ষা, জীবন-পরিবেশ, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে। ইউরোপীয় শিক্ষা, সভ্যতা ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য-প্রকরণ ইত্যাদি আত্মস্থ করে মুধূসূদন বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তকারী সাহিত্য সৃষ্টি করেন। তিনি ইংরাজি ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যয়ন করে তার অনুসরণে বিস্ময়কর কৃতিত্বের সাথে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতায়ন সম্পন্ন করেন। ইংরাজি ভাষা-সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার সাথে তাঁর তেমন কোন পরিচয় ছিল না। ইংরাজি সাহিত্যের আদলে বাংলা সাহিত্যের আধুনিকায়ন তাঁর জন্য সহজসাধ্য হয়। ইংরাজি ভাষার ছাত্র হিসাবে প্রচলিত বাংলা ভাষার জ্ঞানও তাঁর তেমন একটা ছিল না। তাই ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা ছেড়ে যখন তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চায় মনোনিবেশ করেন তখন পণ্ডিতদের সংস্কৃতবহুল বাংলাকেই তিনি মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন। তাছাড়া, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও চরিত্র নিয়ে রচিত ইউরোপীয় মহাকাব্যের আদলে তৈরি ধ্রুপদ সাহিত্য রচনায় সংস্কৃতবহুল ভাষাকে তিনি বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচনা করেন। মধূসূদনের পরে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁরা অনেকেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। বিশেষ করে এক্ষেত্রে রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, কায়কোবাদ প্রমুখ কবির নামোল্লেখ করা যায়।

কায়কোবাদসহ সমকালীন অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিক মধুসূদন-প্রবর্তিত সাহিত্যের আঙ্গিক, প্রকরণ ও অন্যান্য শিল্পগত বৈশিষ্ট্য অনুসরণ

www.nagorikpathagar.org

করলেও উপজীব্য, বিষয়, চরিত্র ও অনুপ্রেরণার দিক দিয়ে তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, স্বকীয় গৌরবময় ঐতিহ্য-চেতনা ও নব-জাগরণের উদ্দীপনা তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপজীব্য হিসাবে গণ্য হয়। ইংরাজদের প্রভাবে 'ইঙ্গ-বঙ্গ' সমাজের সৃষ্টি, 'ইয়ং বেঙ্গল' ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান'দের প্রাদুর্ভাব এ সময় যেমন বাঙালি হিন্দুসমাজকে ব্যাপকভাবে আলোড়িত করে, বাঙালি মুসলিম সমাজে তেমন কোন সমস্যা সৃষ্টি করেনি। ইসলামের প্রভাবে মুসলিম সমাজ এ সমস্ত সামাজিক অনাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল। বরং ইসলামী ভাবাদর্শ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা তখন মুসলমানদের মধ্যে নব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এসবকে উপজীব্য করেই কায়কোবাদ ও তাঁর সম-সমায়িক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ এ সময় সাহিত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ঊনবিংশ শতকের এ যুগ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৮-১৯১১) সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তিনি ঊনবিংশ শতকের প্রথম উল্লেখযোগ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক। গদ্য ছাড়াও কিছু পদ্য রচনায়ও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকরণ ও আঙ্গিকে তিনি ব্যাপক চর্চা করেছেন।

কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়া গ্রামে মশাররফ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের বেশির ভাগ সময়ে তিনি দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। তাঁর পূর্বে ঊনবিংশ শতকে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন মুসলমান লেখকের পরিচয় পাওয়া যায় না। মুনশী শেখ আজিম উদ্দীন, শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী, মুনশী নামদার, করিমুন্নেছা খানম, গোলাম হোসেন প্রমুখ মশাররফ হোসেনের পূর্বে যেসব মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা নামমাত্র এবং পুঁথি-রচয়িতা শ্রেণীর লেখক ছিলেন। তাই মশাররফ হোসেনের মত উঁচুমানের শক্তিশালী মুসলিম লেখকের আর্বিভাব ছিল যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। তাঁর সমকালে যেসব হিন্দু সাহিত্যিক বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনি তাঁদের সমপর্যায়ভুক্ত একজন যশস্বী সাহিত্যিক হিসাবে সমাদৃত। তাঁর গ্রন্থসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। মশাররফ হোসেনের উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ-রচয়িতা অধ্যাপক আব্দুল লতিফ চৌধুরীর মতেঃ

"আমরা আজ পর্যন্ত বিগত (ঊনবিংশ শতাব্দী) শ্রেষ্ঠ মুসলিম সাহিত্যসেবী মীর মশাররফ হোসেনের ৩৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি।"

www.nagorikpathagar.org

বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার'-এর সম্পাদক ডক্টর কাজী আব্দুল মান্নান বলেনঃ "এখন পর্যন্ত মশাররফ হোসেনের মোট ৩৬ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।" এখানে মীর মশাররফ হোসেন প্রকাশিত ২৭ খানা গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

১। রত্নাবতী (উপন্যাস, ১৮৬৯)
২। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু (কাব্য ১৮৭৩)
৩। বসন্ত কুমার নাটক (১৮৭৩)
৪। জমিদার দর্পণ (নাটক, ১৮৭৩)
৫। এর উপায় কি? (প্রহসন, ১৮৭৫)
৬। বিষাদ সিন্ধু (ঐতিহাসিক উপন্যাস মহরম পর্ব-১৮৮৫)
৭। সঙ্গীত লহরী (গান, ১৮৮৭)
৮। গো-জীবন (প্রবন্ধ, ১৮৮৯)
৯। বেহুলা গীতভিনয় (গদ্য-পদ্যে রচিত নাটক, ১৮৮৯)
১০। উদাসীন পথিকের মনের কথা (আত্মজৈবনিক উপন্যাস, ১৮৯০)
১১। তহমিনা (উপন্যাস, ১৮৯৭)
১২। টালা অভিনয় (প্রহসন, ১৮৯৭)
১৩। নিয়তি কি অবনতি (নাটক, ১৮৯৮)
১৪। গাজী মিয়ার বাস্তানী (আত্মজৈবনিক রচনা, ১৮৯৯)
১৫। মৌলুদ শরীফ (গদ্যে-পদ্যে লেখা মিলাদ শরীফ, ১৯০৩)
১৬। মুসলমানদের বাংলা শিক্ষা (পাঠ্য পুস্তক, ১ম ভাগ, ১৯০৩)
১৭। বিবি খোদেজার বিবাহ (কাব্য, ১৯০৫)
১৮। হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫)
১৯। হজরত বেলালের জীবনী (কাব্য, ১৯০৫)
২০। হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (কাব্য, ১৯০৫)
২১। মদীনার গৌরব (কাব্য, ১৯০৬)
২২। মোসলেম বীরত্ব (কাব্য, ১৯০৬)
২৩। এসলামের জয় (গদ্য, ১৯০৮)
২৪। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা (২য় ভাগ)
২৫। বাজিমাত (কাব্য, ১৯০৮)
২৬। আমার জীবন (১ম খণ্ড, ১৯১০)
২৭। আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী (গদ্য, ১৯১০)

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত তালিকা থেকে মীর মশাররফ হোসেনের সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর গ্রন্থ-সংখ্যা যেমন অনেক, তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি বিস্ময়কর। একাধারে তিনি উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা, জীবনীগ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তক ইত্যাদি লিখেছেন। তাঁর এসব রচনায় যেমন রয়েছে ধর্মভাব, ইতিহাস ও ঐতিহ্য-চেতনা, তেমনি রয়েছে সমাজ-সচেতনতা, সাময়িক প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক বিষয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়। সর্বোপরি মুসলমানদের উন্নয়ন ও নবজাগরণ প্রয়াসেও তিনি সর্বদা লেখনি পরিচালনা করেছেন। মশাররফ হোসেনের বিশাল সাহিত্যে বিচিত্র বিষয়, ভাবও অনুভূতি এক অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বর্ণিল পারঙ্গমতার বিষয়ই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মশাররফ হোসনের সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত এবং তাঁর অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জানা যায়, ছোটবেলায় তাঁর বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসর বসতো। তিনি ছিলেন তার একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা। বাউল কবি লালন শাহের এলাকায় তাঁর বাড়ি হওয়ার কারণে বাউল গানের দ্বারাও তাঁর মানস-প্রকৃতি কিছুটা প্রভাবিত হয়। গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সম্পাদক কুমারখালির কাঙ্গাল হরিনাথের পত্রিকায়ও মশাররফ হোসেন প্রতি সপ্তাহে বার্তা পরিবেশন করতেন। এছাড়া, তিনি কলকাতা থেকে প্রকাশিত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ-প্রভাকর'-এও সংবাদদাতার কাজ করতেন। এভাবে পুঁথিপাঠের আসরে বসার অভিজ্ঞতা, বাউল গানের অধ্যাত্ম-চেতনা, সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা এবং জমিদারের কাচারীতে কার্যরত অবস্থায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের বিচিত্র স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি প্রথম জীবনে যে কাজ শুরু করেন তারই সূত্র ধরে তিনি একসময় 'আজিজন নেহার' ও 'হিতকারী' নামক দুটি পত্রিকা প্রকাশেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

মীর মশাররফের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ 'রত্নাবতী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১। গ্রন্থের কাহিনী কৃত্রিম, উপকথা জাতীয়। তবে গ্রন্থকার এটাকে কৌতুকাবহ উপন্যাস হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। গ্রন্থের ভাষা কৃত্রিম, সাধু বাংলা। যেমন- "রাজনন্দিনী যুবরাজ সুকুমারকে দর্শন করিবা মাত্র সগর্ব্বে স্বীয় সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি যুবরাজের নিকট বিংশতি সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রার্থনা করি।" গ্রন্থটির ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) লেখক লিখেছেনঃ "গ্রন্থ রচনা করিয়া

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থকার নামে পরিচয় দেওয়া এই আমার প্রথম উদ্যম। অতএব, ইহার মধ্যে শত শত দোষ বিদ্যমান থাকা সম্ভব।" গ্রন্থ প্রকাশের পর 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেঃ "ইহার লেখা অতি সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটিতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।" মীর মশাররফের এ প্রথম গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণনায় তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনেকটা স্পষ্ট। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মত উপন্যাস রচনার প্রতিভা তাঁর এ গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় না ।

মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু'। এটি প্রকাশের পর, এর আলোচনা প্রসঙ্গে ১৮৭৩ সনে 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেনঃ "তাঁহার (মশাররফ হোসেন) রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুও লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়।" গোরাই ব্রিজ একটি কবিতার বই। তাই এ মন্তব্য করার সময় নিশ্চয়ই 'রত্নাবতী'র কথাই বঙ্কিম স্মরণ করে থাকবেন। তাছাড়া, মশাররফ হোসেনের কবিতার ভাষাও সহজ, প্রাঞ্জল ও সাধু প্রকৃতির। বঙ্কিমচন্দ্র তখন 'সাহিত্য সম্রাট' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাই মশাররফ হোসেন সম্পর্কে তাঁর উপরোক্ত মন্তব্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত হিন্দুদের নিকট তখন কোন মুসলমান সাহিত্যিক হিসাবে সহজে সম্মান পেতেন না। সেসময় বঙ্কিমের মত গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং চরম মুসলিম-বিদ্বেষী উঁচু দরের সাহিত্যিকের উপরোক্ত মন্তব্যকে মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-প্রতিভার যথার্থ স্বীকৃতি বলে গণ্য করা হয়।

গোরাই ব্রিজ প্রকাশের পর অক্ষয়কুমার সরকার 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেনঃ "গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে।... মীর মশাররফ হোসেনের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুরাগী হইবেন।"

১৮৭৩ সনেই মশাররফ হোসেনের 'বসন্ত কুমারী' ও 'জমিদার দর্পণ' নামে দু'খানি নাটক প্রকাশিত হয়। 'বসন্ত কুমারী' নাটকটি তাঁর লাহিনী পাড়ার নিজ বাড়িতে মঞ্চস্থ হয়। 'জমিদার দর্পণে'র নামকরণে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৪) 'নীল দর্পণ' নাটকের কথা হয়ত মনে জাগতে পারে। এটা অস্বাভাবিক নয়। ঐ সময় 'নীল দর্পণ' অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক ছিল। ১৮৬৩ সনে Nil Durpon, or the Indigo Planting Mirror' নাম দিয়ে A Native-এ ছদ্মনামে এর ইংরাজি অনুবাদও প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে তখন ইংরাজ নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে কৃষক সাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। নীলকরগণ বিনা পয়সায় কৃষকের জমি জবরদস্তি দখল করে, কৃষকদেরকে বিনা পয়সায়

www.nagorikpathagar.org

সেখানে নীল চাষে বাধ্য করে। নীল উৎপাদনের পর নীলকরগণ তা বিক্রি করে প্রচুর পয়সা রোজগার করে। কৃষকগণ তাতে কোন ফায়দা বা অংশ পায় না। কৃষকের জমি, শ্রম, কষ্ট এতে লগ্নী হলেও ফসলের কোন ভাগ তারা পায়। ফলে সারা বছর তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে না খেয়ে উপোস করে। এর প্রতিবাদ করতে গেলেও নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী তাদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালায়। এ দুঃসহ ও মর্মান্তিক কাহিনী নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণ' নাটক রচনা করেন। এ নাটক প্রকাশের পর ইংরাজ সরকারের টনক নড়ে এবং তারা আইন করে নীল চাষ বন্ধ করে দেয়।

'নীল দর্পণে'র এরূপ জনপ্রিয়তা দেখে মশাররফ হোসেন হয়ত 'জমিদার দর্পণ' নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু এর ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে জমিদার কাচারীতে। তাই জমিদারের স্বভাব-প্রকৃতি ও জীবন-বৃত্তান্ত তাঁর বিশদরূপে জানা ছিল। 'জমিদার দর্পণ' নাটকে তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ঘটেছে। এতে তাঁর সমাজমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত মশাররফ হোসেনের অধিকাংশ সাহিত্যই তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্ব।

১৮৭৬ সনে রচিত 'এর উপায় কি' মশাররফ হোসেনের একটি প্রহসন। ইতঃপূর্বে রচিত মধুসূদনের 'একেই বলে সভ্যতা' ও 'বুড়া শালিকের ঘাড়ে রোঁ' দুটো প্রহসনের খানিকটা প্রভাব এতে থাকলেও ভাব-বিষয় ও রচনা-শৈলির দিক থেকে এটা স্বতন্ত্র।

মশাররফ হোসেনের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। ১৮৮৫-১৮৯১ পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছরে মোট তিন খণ্ডে রচিত বিপুলায়তন 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। এ ঐতিহাসিক উপন্যাসটি মশাররফ হোসেনকে বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী অমরতা দান করেছে। এটি বাংলা ভাষায় সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এক সময় বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের প্রায় প্রতিটি ঘরেই 'বিষদ সিন্ধু' শোভা পেত এবং বিশেষভাবে মহরম মাসে আসর করে এটি পাঠ করা হতো। 'বিষাদ সিন্ধু'র প্রথম পর্ব প্রকাশের পর 'ভারতী (ফাল্গুন, ১২৯৩) পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়ঃ "ইহা মহরমের একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক-নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে 'গ্রাম-বার্তা প্রকাশিকায়' (১১ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) লেখা হয়ঃ "ইহার এক

www.nagorikpathagar.org

একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না। যাহারা মুসলমানদিগের মহররম পর্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি, তাহারা বিষাদ সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথপূর্ণ হইবে। মুসলমানদের গ্রন্থ এইরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গ ভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।"

"বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেনঃ "পুঁথি সাহিত্যে মহরমের কাহিনী ইতঃপূর্বেও প্রচলিত ছিল। 'মুক্তাল হোসেন', "জারী জঙ্গনামা' প্রভৃতি পুঁথি মশাররফ হোসেনের বহু পূর্বেই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং 'বিষাদ সিন্ধু'র গল্প এমন কিছু নূতন নয়। তবে তাহা মশাররফ হোসেনই সর্ব প্রথমে সাধু ভাষায় সঙ্কলন করেন। অবশ্য চরিত্র চিত্রণের মধ্যেও বহু স্থানে তাঁহার মৌলিকতা প্রকাশ পাইয়াছে।" **(বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, প্রকাশক-বাংলা সাহিত্য পরিষদ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা-৫১৫)**।

'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস হলেও এতে ইতিহাসকে হুবহু অনুসরণ করা হয়নি। উনবিংশ শতকে ইসলামী ভাব ও মুসলিম পুনর্জাগরণের যে উদ্দীপনাপূর্ণ প্রয়াস সমকালীন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, মীর সাহেবের রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষণীয়। 'বিষাদ সিন্ধু' এর সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। 'বিষাদ সিন্ধু'কে যেমন উপন্যাস বলা মুস্কিল, তেমনি একে ইতিহাস গ্রন্থ বলাও চলে না। কারণ পাঠকের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইতিহাসের কিছুটা অপলাপ ঘটিয়ে নিজস্ব কল্পনা ও কিছুটা অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, আধুনিক উপন্যাসের শিল্প-রীতিও এতে নিষ্ঠার সাথে অসুসরণ করা হয়নি। তবে এটাকে মধ্যযুগীয় পুঁথি সাহিত্যের ঢং-এ আধুনিক উপন্যাসের ভঙ্গীতে রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী রচনা বলা যেতে পারে। কাহিনী, চরিত্র, ভাষা ও বর্ণনার গুণে এটা এক অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসের এক বিষাদ-করুণ ঘটনাকে লেখক মানবিক সংবেদনা ও আর্তিতে পূর্ণ করে অপরূপ বর্ণনা ও চরিত্র-চিত্রণের আশ্চর্য কুশলতায় 'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থে পরিণত করেছেন। এটা বাংলা সাহিত্যের এক সফল ক্লাসিক গ্রন্থ এবং মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

'বিষাদ সিন্ধু'র আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো এর অপরূপ বাক-বিন্যাস। অলংকারপূর্ণ ভাষা, চিত্তাকর্ষক বর্ণনা, আবেগ-উচ্ছ্বাসপূর্ণ সুরময় স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ও নৈপুণ্যময় বর্ণনা 'বিষাদ সিন্ধু'কে এক অপরূপ কাব্য-মহিমা দান করেছে। ঘটনা ও কাহিনীর দিক থেকে এটা মহাকাব্যধর্মী। মহাকাব্যের ধ্রুপদ

www.nagorikpathagar.org

বৈশিষ্ট্য এতে বহুলাংশে বিরাজমান। তাই সবকিছু মিলিয়ে 'বিষাদ সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। গদ্য, পদ্য, ইতিহাস, উপন্যাস, মহাকাব্য, বাস্তবতা ও কল্পনার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে এখানে।

'বিষাদ সিন্ধু'র মত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য়ও উপন্যাসের শিল্পরীতি যথাযথ নিষ্ঠার সাথে অনুসৃত হয়নি। এ জাতীয় রচনায় ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্র-চিত্রণের মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয় করে তোলার ক্ষেত্রে লেখকের যতটা আন্তরিক প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, উপন্যাসের প্রকৃতি ও শিল্পরীতির প্রতি লেখকের ততটা সজাগতা লক্ষ্য করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের ঢং-এ লেখা হলেও এটা উপন্যাস নয়, নীলকর সাহেবদের জুলুম-নির্যাতনের মর্মন্তুদ কাহিনীতে পূর্ণ এক বাস্তব উপাখ্যান। লেখক নিজেই এখানে উদাসীন পথিক। ক্যানি সাহেব তার জমিদারীতে কীভাবে প্রজাসাধারণের উপর জুলুম করে ধানের বদলে নীলের চাষ করাতো, কীভাবে প্রজাদেরকে কুঠি পাহারায় নিয়োজিত করতো, অন্যান্য জমিদারগণ তার অত্যাচার থেকে প্রজাদেরকে বাঁচাবার জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, প্রজা-বিদ্রোহ, গভর্ণরের হস্তক্ষেপ ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে এখানে কাহিনীর পত্র-পল্লব বিকশিত হয়েছে। কাহিনী যেমন বাস্তবধর্মী, ভাষা ও বর্ণনা কৌশলে সাধারণ পাঠকের নিকট তেমনি তা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সমকালীন সমাজের এক বাস্তব চিত্র এ গ্রন্থে বিশ্বস্ততার সাথে বিবৃত হয়েছে।

'গাজী মিয়ার বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের আর এক বিস্ময়কর বিশালকার সৃষ্টি। এতে সর্বমোট ২৪টি নথি বা অধ্যায় রয়েছে। প্রথম খণ্ডে ২০টি এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৪টি নথি সন্নিবেশিত হয়েছে। এটাকেও ঠিক উপন্যাস বলা যায় না, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাচার নক্সা'র মত এটা একটি নক্সা জাতীয় রচনা। এতে এত বিচিত্র ধরনের ঘটনা, কাহিনী ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে যে, লেখক এ গ্রন্থে তাঁর নাম দিতে শংকা বোধ করেছেন। গ্রন্থের উপরে লেখা ছিল, 'স্বত্বাধিকারী উদাসীন পথিক'। অনেকে এটিকে মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করেন। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে যদিও এটা 'বিষাদ সিন্ধু'র সমকক্ষ নয়, কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রায়ণ, সমাজ-বাস্তবতার সার্থক উপস্থাপনা ও শিল্প-সম্ভাবনার দিক থেকে এটা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। অক্ষয়কুমার মৈত্রের মতেঃ 'গাজী মিয়ার বস্তানী' একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র সুশোভিত, সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ।"

www.nagorikpathagar.org

নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান 'গাজী মিয়ার বস্তানী'র কাহিনীর পরিচয় দিয়েছেন এভাবেঃ "গল্পের আরম্ভ বা 'বস্তানী শুরু'-অরাজকপুরের হাকিম ভোলানাথ, কুঞ্জনিকেতনের বিধবা বেগম পয়জারুন্নেসাকে লইয়া। দ্বিতীয় নথিটিতে 'সবলেট চৌধুরী'র কথা। বস্তানী প্রথম হইতে শেষ এমনি হালকা কথায় অনেকটা 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র রীতিতে লেখা। ইহা উনবিংশ খৃস্টাব্দের পর্যন্ত মুসলিম পতন যুগের সামাজিক চিত্র। অবশ্য সমাজের সব স্তরের চিত্র ইহাতে তেমন প্রতিফলিত হয় নাই যেমন হইয়াছে জমিদার, লম্পট ও অসৎচরিত্রের ছায়াপাত। 'হুতোম পেঁচার নক্সা', 'আলালের ঘরের দুলাল' আর 'গাজী মিয়ার বস্তানী' অনেকটা এক জাতীয় নক্সা' ঠিক সেই অনুপাতে বাস্ত বভিত্তিক কিনা স্থির নিশ্চয় হইয়া বলিবার উপায় নাই। 'গাজী মিয়ার বস্তানী'ও একটি 'জমিদার দর্পণ'। মোগল অধিকারের পর মৈমনসিংহের অনেক পাঠান জমিদার বহুকাল পর্যন্ত মধুপুরের জঙ্গলে গোপনে বাস করিতেন।... মোশাররফ হোসেন এই জমিদারের চরম পতনের যুগ দেখিয়াছেন এবং তাহাদের চিত্র আঁকিয়াছেন।...

"... উপন্যাস হিসাবে ইহা যে বিশেষ উঁচুদরের তাহা বলিবার উপায় নাই। কারণ ইহাতে ঘটনা অনেক থাকিলেও সবগুলি এক সূতায় গ্রথিত হইয়া জমাট বাঁধে নাই। অনেক কথা রাখিয়া-ঢাকিয়া বলিতে হইয়াছে। অনেক কথা অপ্রকাশ থাকিয়া গিয়াছে। তাছাড়া বস্তানীকে কাহিনী করিয়া তুলিবার দিকে লেখকের তেমন দৃষ্টি ছিল না। ... বস্তানীতে ঘটনা অনেক থাকিলেও ঘটনার ভিতর দিয়া চরিত্র ফুটিয়া উঠে নাই। চরিত্র সৃষ্টি হইয়াছে লেখকের বর্ণনায়, ধিক্কারে, অতিশয়োক্তিতে; নানা কাজের ভিতরে নানা আবেষ্টনীর সংঘাতে এ চরিত্র আপনা হইতেই পরিস্ফুট হয় নাই। ইহাতে কল্যাণবোধ আছে কিন্তু তাহা স্থূল, মানসতা ও মননশীলতা গভীর হইতে উদ্ভূত নয়। তবু যে এ গ্রন্থ মর্মস্পর্শী তাহার কারণ রসানুভূতি নয়- সামাজিক কল্যাণবোধ।" **(নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ ঐ, পৃ. ৫১৬,৫১২)**

মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী', 'গোজীবন', 'বেহুলা গীতাভিনয়', মৌলুদ শরীফ' প্রভৃতি কাব্য, প্রবন্ধ, গীতিনাটক, নাত-এ রাসূল ইত্যাদির মধ্যে একাধারে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা এবং প্রেম ও মরমী ভাবের প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।' তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কর্মকে মোটামুটি সাত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

এক. উপন্যাস জাতীয় রচনা। রত্নাবতী, বিষাদ সিন্ধু, উদাসীন পথিকের মনের কথা, তহমিনা এ শ্রেণীভুক্ত গ্রন্থ।

www.nagorikpathagar.org

দুই. আত্মচরিতমূলক রচনা। গাজী মিয়ার বস্তানী, আমার জীবন, আমার জীবনীর জীবনী, কুলসুম জীবনী প্রভৃতি এ শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য গাজী মিয়ার বস্তানী উপন্যাসের ঢং-এ লেখা আবার উদাসীন পথিকের মনের কথাও বহুলাংশে আত্মজীবনীমূলক রচনা।

তিন. নাটক। বসন্ত কুমারী নাটক, জমিদার দর্পণ, বেহুলা গীতাভিনয়, নিয়তি কি অবনতি এ শ্রেণীর অন্তর্গত।

চার. প্রহসন। এর উপায় কি? টালা অভিনয় এ শ্রেণীভুক্ত।

পাঁচ. কবিতা ও গান। গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরি সেতু, মৌলুদ শরীফ, বিবি খোদেজার বিবাহ, হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ, হজরত বেলালের জীবনী, হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ, মদীনার গৌরব, মোসলেম বীরত্ব, এসলামের জয়, বাজিমাত ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ।

ছয়. প্রবন্ধ। গো-জীবন মশাররফ হোসেনের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ।

সাত. পাঠ্য-পুস্তক। মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ১ম ভাগ, মুসলমানের বাংলা শিক্ষা ২য় ভাগ পাঠ্য-পুস্তক জাতীয় রচনা।

মশাররফ হোসেনের রচনায় মোটামুটি তিনটি বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছে।

১. ধর্মীয় ভাব, মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাস চেতনা।

২. স্বদেশ-প্রীতি, সমাজ-সচেতনতা, সমাজ-সংস্কার ও কল্যাণবোধ।

৩. মানবিক প্রেম ও মরমী সংবেদনশীলতা।

উনবিংশ শতকের সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের রচনায় এ বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি, মানবিক সংবেদনা ও লাঞ্ছিত-দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রতি আত্যন্তিক সহানুভূতি ও কল্যাণকামিতা তাঁর রচনার কেন্দ্রীয় ভাব।

মশাররফ হোসেনের সমকালে একদিকে বিদেশী শাসকের শোষণ, নীলকর সাহেবদের হৃদয়হীন পীড়ন এবং অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির দেশীয় প্রতিভূ নব্য জমিদার ও সামন্ত প্রভুদের অমানুষিক অত্যাচার, উপরন্ত উকিল-মোক্তার, পেশকার-ফরিয়া, পাইক-পেয়াদা-মুৎসুদ্দি, বরকন্দাজ ইত্যাদি শ্রেণীর অসৎ-বাটপার লোকদের শোষণ-জুলুমে সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন তখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মশাররফ হোসেনের দরদী মন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ নিগৃহীত মানবতার করুণ চিত্র অঙ্কন করেছে। সমাজের বিভিন্ন দুর্বলতা, স্খলন-পতন ও অন্যায়-অবিচারের কথা বিচিত্র রস ও ভঙ্গীতে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে

www.nagorikpathagar.org

তোলার ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের আশ্চর্য কুশলতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র অবদান বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। ভাষার ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের গদ্য-রীতির অনুসরণ করলেও শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অনুসরণ করেননি। তবে টেকচাঁদ, বঙ্কিম, কালীপ্রসন্ন, দীনবন্ধুর কিছু কিছু প্রভাব ক্ষেত্র বিশেষে মশাররফ হোসেনের উপর লক্ষ্যণীয়। তা সত্ত্বেও প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতাও অনেকটা স্পষ্টগ্রাহ্য। মশাররফ হোসেনের অনেকগুলো গ্রন্থ বিংশ শতকের প্রথম দিকে রচিত হলেও তাঁর প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলো উনবিংশ শতকে রচিত। তাছাড়া, তাঁর মানস-প্রকৃতি ও চিন্তা-চেতনা সবকিছুই উনবিংশ শতকের সমাজ পরিবেশ ও আবেগ-অনুভূতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ দিক দিয়ে যথার্থ অর্থেই তিনি উনবিংশ শতকের লেখক এবং নিঃসন্দেহে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-শিল্পী, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। গদ্য রচনার দিক দিয়ে তাঁর সমকালে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সাথেই তাঁর তুলনা চলে।

www.nagorikpathagar.org

মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা

মহান সমাজ-সংস্কারক, লেখক, অসাধারণ বাগ্মী ও কবি মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা বাংলা ১২৬৮ সনের ১০ পৌষ মুতাবিক ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর সোমবার দিবাগত রাতে যশোর জেলার বারবাজারের নিকটবর্তী খোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃ-নিবাস যশোর শহরের অদূরবর্তী ছাতিয়ানতলা গ্রামে। বাংলা ১৩১৪ সনের ২৪ জ্যৈষ্ঠ (১৯০৭ খৃস্টাব্দ) মাত্র ৪৫ বছর বয়সে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান ঘটে।

বিভিন্ন লেখক ও গবেষক মেহেরউল্লার নাম বিভিন্নভাবে লিখেছেন। যেমন, 'মুনসী' শব্দটি অনেকে লিখেছেন- মুন্সী, মুনশী, 'মহম্মদ' শব্দটি-মুহম্মদ, মোহাম্মদ এবং 'মেহেরউল্লা' শব্দটি-মেহেরউল্লাহ্, মেহেরুল্লাহ্ ইত্যাদিভাবে। কিন্তু মেহেরউল্লার জীবনীকার নাসির হেলাল বিশ্বস্ত সূত্রের বরাদ দিয়ে লিখেছেন, আলোচ্য ব্যক্তি নিজের নাম 'মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা'- এভাবে লিখতেন। তাই বর্তমান নিবন্ধে তাঁর নামটি সেভাবেই লেখা হলো।

মেহেরউল্লার পিতার নাম মুনসী ওয়ারেস উদ্দীন। বিদ্যাশিক্ষা অর্জনে মেহেরউল্লার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও শৈশবে তিনি পিতৃহীন হওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাশিক্ষায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেননি। নিম্ন প্রাইমারী পর্যন্ত পড়ালেখা করে তিনি মৌলবী মোসাহেব উদ্দীন ও মৌলবী ইসমাইলের নিকট তিন বছরকাল পারস্যের জগৎ-বিখ্যাত সূফী কবি শেখ সাদীর (র) গুলিস্তাঁ, বোস্তাঁ ও পন্দেনামাহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। উচ্চশিক্ষা লাভে বঞ্চিত হলেও নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা, আরবি, ফারসি এবং কিছুটা ইংরাজি ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও প্রখর ধীশক্তির অধিকারী। নিজের চেষ্টায় এবং অনেকটা প্রয়োজনে তিনি ইসলাম, হিন্দু ও খৃস্টান ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন।

www.nagorikpathagar.org

সে সময় মুসলমানদের অশিক্ষা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিধর্মীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে সব বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার চালায় তার জবাব দেয়ার উদ্দেশ্যে ইসলামের আসল পরিচয় ও মাহাত্ম্য তুলে ধরা এবং ইসলাম-বিরোধী বিশেষত খৃস্টান ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করার জন্যই তিনি প্রধানত বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন।

দরিদ্র পরিবারের পিতৃহীন সন্তান হিসাবে অতি অল্প বয়সেই মেহেরউল্লাকে জীবাকার্জনের চেষ্টা করতে হয়। এত অল্প বয়সে অতি অল্প শিক্ষিত বালকের পক্ষে উপযুক্ত চাকরী পাওয়া কঠিন। তাই তিনি রোজগারের আশায় দর্জির কাজ শুরু করেন। দর্জি হিসাবে অচিরেই তাঁর দক্ষতা ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। যশোর শহরের অভিজাত ব্যক্তিরা তাঁর দোকানে ভীড় করতে শুরু করে। যশোর জেলার তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর খদ্দের হন। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হয়ে দার্জিলিং গেলে মেহেরউল্লাকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে সেখানে তাঁকে একটি দোকান করে দেন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন তাঁর থাকা হয়নি। অল্প দিন পরই আবার তিনি যশোর ফিরে এসে শহরের দড়াটানাতে তাঁর পুরনো দোকানেই পুনরায় কাজ শুরু করেন।

মুনসী মেহেরউল্লার জীবিকার্জনের একমাত্র উপায় দর্জির কাজ হলেও এবং এতে তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা ও সুনাম অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও একাজে তিনি দীর্ঘকাল আত্মনিয়োগ করতে পারেননি। বৃহত্তর মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করে দেন। এ কাজটি হলো- সমাজ সংস্কার, ধর্ম প্রচার, জনসেবা এবং এসব কাজের সহায়ক হিসাবে লেখালেখি ও সাহিত্য চর্চায় তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। এর পাশাপাশি তাঁর আরেকটি অসাধারণ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, সেটা হলো বাগ্মিতা। তিনি তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে বিপুল জন সমাবেশকে জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ ও উল্লসিত-উদ্বেলিত করতেন, তর্কযুদ্ধেও তিনি সহজেই বড় বড় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে পারতেন। যুক্তি, তথ্য-উপাত্ত ও উপস্থিত বুদ্ধির সমন্বয়ে তাঁর বক্তৃতা ও তর্ক সর্বদা অব্যর্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। তিনি ছিলেন জননন্দিত, পণ্ডিতমান্য এক অনন্যসাধারণ বক্তা। তাঁর নাম শুনলে অগণিত মানুষ তাঁর বক্তৃতা-মঞ্চের সামনে ভীড় করতো। তাঁর বক্তৃতায় এমন জাদু ছিল যে, অমুসলিম শ্রোতারাও তা মুগ্ধ হয়ে শুনতো। ফলে বাংলা আসামের সর্বত্র মুনসী মেহেরউল্লা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

বলতে গেলে, সময়ের প্রয়োজন এবং বিদ্যমান অবস্থার প্রেক্ষিতেই মেহেরউল্লার সামগ্রিক কর্ম-তৎপরতার সূত্রপাত। ১৭৫৭ সনে পলাশীর

www.nagorikpathagar.org

আম্রকাননে ষড়যন্ত্রমূলক পাতানো যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার স্বাধীনতা-সূর্য অস্তমিত হবার পর উপমহাদেশে এক চরম দুর্যোগের সূচনা হয়। মুসলমানরা রাজ্য হারানোর সাথে সাথে সেনাবাহিনী ও সকল সরকারী পদ-পদবী থেকে বঞ্চিত হয়, জমিদারি-জোতদারি ইত্যাদি সবকিছু হারিয়ে তারা রাতারাতি একটি বঞ্চিত-সর্বহারা-অধঃপতিত জাতিতে পরিণত হয়। মুসলিম শাসনামলে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা একটি বিত্তশালী দেশ হিসাবে পরিচিত ছিল। তখন শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অবৈতনিক। সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় শাসকগণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। ইংরাজ আমলে সে অর্থনৈতিক-শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য চর্চার পরিবেশ বিনষ্ট হয়। শিক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থানগুলো পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধ্বংস হয়। অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুসলমানদের কাছ থেকে চাকুরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি-জোতদারি সব কেড়ে নিয়ে ইংরাজ রাজশক্তি সেগুলো তাদের বশংবদ হিন্দুদের হাতে তুলে দেয়। এভাবে বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উপরন্তু ইংরাজদের সীমাহীন শোষণ-নির্যাতনে বাংলায় চরম দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা মৃত্যুবরণ করে। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত এ দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে বেঁচে যাওয়া একশ্রেণীর ভাগ্যবানরাই পরবর্তীতে বেনিয়া ইংরাজদের রাজনৈতিক দোসর হিসাবে বাংলায় অপ্রতিহত ক্ষমতা ও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়।

ইংরাজ শাসন শুরু হবার প্রায় অর্ধশতক কাল পর কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০) ও হিন্দু কলেজ (১৮১৭) স্থাপিত হয়। পূর্বতন মুসলিম শাসনামলের উন্নত ও সম্পূর্ণ অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপে ইংরাজদের নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু হয়। ১৮৩৭ সনে ফারসির বদলে ইংরাজি ভাষাকে সরকারী ভাষা করা হয়। ইংরাজদের অনুগ্রহভাজন একশ্রেণীর হিন্দু এ নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়ে উঠলেও মুসলমানরা তা থেকে দূরে থাকে। ফলে শিক্ষিত হিন্দুরা ক্রমান্বয়ে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠা পেলেও মুসলমানদের দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পায়। ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতার প্রভাবে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নতুন ইঙ্গ-বঙ্গ সংস্কৃতির উদ্ভব ঘটে। ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতার পাশাপাশি ইংরাজ শাসকদের আনুকূল্যে খৃস্টান পাদ্রীগণ ব্যাপকভাবে খৃস্টান ধর্ম প্রচারে তৎপর হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে, বিভিন্ন স্থানে গীর্জা প্রতিষ্ঠা এবং নানা ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা খৃস্টধর্মের

www.nagorikpathagar.org

প্রচারে তৎপর হয়। ইংরাজদের সাহচর্যে আসার ফলে হিন্দুদের মধ্যে খৃস্টধর্মের প্রচার ব্যাপকতা লাভ করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক হিসাবে খ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্তসহ বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দু খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এ জন্য হিন্দু সমাজপতিগণ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। স্বধর্ম ও স্বজাতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) হিন্দুধর্ম সংস্কার করে নতুন ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। রামমোহন বাংলা,সংস্কৃত, ইংরাজি, আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আধুনিক মন-মানসিকতা ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী হিন্দুধর্মের সংস্কার করে হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই তাঁর এ নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। তৎকালে শিক্ষিত হিন্দু সমাজে এ নতুন ধর্মমত ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং বহু হিন্দুকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করতে তা অনেকটাই সফল হয়।

বাঙালি মুসলমানগণ ইংরাজদের শিক্ষা-সভ্যতা ও সাহচর্য যথাসম্ভব এড়িয়ে চললেও খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ মুসলিম সমাজেও ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। বিশেষত অশিক্ষিত দরিদ্র শ্রেণীর মুসলমানদেরকে অর্থ-বিত্ত, খাওয়া-পরা, চিকিৎসা নানাবিধ প্রলোভন দেখিয়ে খৃস্টান পাদ্রীগণ তাদেরকে ধর্মন্তরিত করার চেষ্টা চালায়। অনেক অসহায় মুসলিম তাদের প্রলোভনের শিকার হয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। বাংলার শহর-বন্দর-হাটবাজার, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র তখন খৃস্টানদের তৎপরতা ব্যাপকভাবে চলছিল। যশোর শহর ও তার আশেপাশেও অনেক মুসলিম খৃস্টানদের এ অপতৎপরতার ফাঁদে পা দিয়ে তাদের ঈমান-আকীদা নষ্ট করে। এ অবস্থা দেখে মুনসী মেহেরউল্লা নিজ পেশা ও ঘর-সংসার পরিত্যাগ করে খৃস্টানদের অপতৎপরতা রুখে দেয়ার সংকল্প নিয়ে মাঠে নামেন। এজন্য তিনি ইসলাম, খৃস্ট ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং লেখালেখি, বক্তৃতা-বিবৃতি, সভা-সমিতি, আলোচনা ও গণ-সংযোগের মাধ্যমে তিনি খৃস্ট ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন ও ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বাংলা ও আসামের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি মুসলমানদেরকে সচেতন করে তোলেন। এসম্পর্কে বিশিষ্ট গবেষক ডক্টর মুহম্মদ আবূ তালিব বলেনঃ

"উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের সেই ঘোর দুর্দিনে বাংলার অখ্যাত পল্লীর মেহেরউল্লা গর্জে উঠেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের ছত্র-ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিতে এগিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত মুসলামান এক আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার কোন

www.nagorikpathagar.org

শক্তিকে ভয় করে না। বৃটিশ রাজশক্তির নিকট মাথা নত না করে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সেদিন তিনি প্রচার করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বিপ্লবের বাণী। উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্যাতিত, নির্জীব মুসলিম সমাজকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্য বই লিখে, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে মৃতপ্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নব-জীবনের আশার বাণী। বিশ শতকে বাংলা তথা উপমহাদেশে যে যুগান্তকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাদের পিতৃপুরুষ ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে।"

খৃস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারের দাঁত-ভাঙ্গা জবাব দেয়া এবং মুসলমানদেরকে তাদের স্বধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা মুনসী মেহেরউল্লার জীবনের এক পবিত্র মিশনে পরিণত হয়। এ মিশনে জয়যুক্ত হবার জন্য তিনি আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। বিপুল উদ্দীপনা, বিরল দক্ষতা ও অসম সাহসিকতা নিয়ে তিনি ইসলামের প্রচার ও মুসলমানদেরকে অজ্ঞতা-অশিক্ষা ও বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মাঠ-ময়দান-জনপদ চষে বেড়িয়েছেন। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টায় তখন বাঙালি মুসলিম সমাজ সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। অন্যথায়, মুসলিম সমাজ কোন্ অন্ধকারের অতলে নিমজ্জিত হতো তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তাই মেহেরউল্লাকে শুধু একজন ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক বলাই যথেষ্ট নয়, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলমানদের এক অবিস্মরণীয় নেতা ও নবজাগরণের পথিকৃত।

মেহেরউল্লার সাহিত্য সাধনা ছিল মূলত তাঁর ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের এক অপরিহার্য পরিপূরক। ধর্ম প্রচারের আগ্রহ ও সমাজ সংস্কারের প্রবল বাসনা না থাকলে হয়তো সাহিত্য সাধনার পথে তিনি কখনো অগ্রসর হতেন কিনা সন্দেহ। তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ ও গ্রন্থের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে 'খ্রিষ্টিয় বান্ধব' নামের একটি মাসিক পত্রিকায় 'আসল কোর-আন কোথায়?' শিরোনামে খৃস্টান ধর্ম প্রচারক রেভারেন্ড জন জমিরউদ্দিন আল-কোরআন ও রাসূলুল্লাহ্ (স) সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য প্রকাশ করেন। শেখ জমিরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) ১৮৮৭ সনে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি যথাক্রমে কলকাতার সিএমএস হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেন্টপল ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সিএমএস ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খৃস্টধর্ম তত্ত্ব অধ্যয়ন ও সংস্কৃত, আরবি, গ্রীক, হিব্রু ভাষার ব্যাকরণ ও সাহিত্য

www.nagorikpathagar.org

অধ্যয়ন করে ১৮৯২ সনে মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে খৃস্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হন। সুবিজ্ঞ জমিরউদ্দীন উক্ত লেখার প্রতিবাদ হিসাবে মেহেরউল্লা 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ঈসায়ী বা খ্রিস্টানী ধোকাভঞ্জন' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে চারটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এর উত্তরে জমিরউদ্দীনও 'সুধাকর'পত্রিকায় একটি নিবন্ধ লেখেন। এর উত্তরে মেহেরউল্লা 'আসল কোর-আন সর্বত্র' এ শিরোনামে আরেকটি দীর্ঘ ও যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এরপর মেহেরউল্লার সাথে জমিরউদ্দীনের সাক্ষাতে এ বিষয়ে আরো আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে মেহেরউল্লার যুক্তির কাছে হার মেনে জমিরউদ্দীন খৃস্টধর্ম পরিত্যাগ করে পুনঃরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাকি জীবন মেহেরউল্লার সহযোদ্ধা হিসাবে ইসলাম প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে জমিরউদ্দীন শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। এভাবে মেহেরউল্লার নিকট তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেন্ড আলেকজেন্ডার প্রমুখ অনেক খৃস্টানই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

মুনসী মেহেরউল্লার মূল মিশন ছিল পাদ্রীদের ধর্ম প্রচার রোধ ও ইসলামের বিকৃতি সাধনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করা হলেও তিনি সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এটি হলো সামাজিক সংস্কার। ইংরাজ শাসনামলে মুসলিম সমাজ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই চরম বঞ্চনা, নিপীড়ন ও হতাশার শিকার হয়। বিশেষত অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে নানা কুসংস্কার মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়ে। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা মুসলমানরা বিস্মৃত হয়। এ অধঃপতনের যুগে মুনসী মেহেরউল্লা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সর্বত্র ওয়াজ-নসীহত করেন। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার কারণে মুসলিম সমাজ তখন সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এজন্য স্কুল মাদ্রাসা, নৈশ বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা, পাঠাগার স্থাপন, সভা-সমিতি গঠন, সর্বজনীন শিক্ষা বিশেষত স্ত্রী শিক্ষা, শিশু শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সকলকে সজাগ করে তোলার প্রয়াস পান। নিজের চেষ্টাতেও তিনি স্কুল ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া, বাল্য বিবাহের অপকারিতা ও সমাজের নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও বদভ্যাসের বিরুদ্ধে তিনি রীতিমত জিহাদ ঘোষণা করেন। এছাড়া, সভা-সমিতি, ক্রীড়া সংগঠন, ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি যুব সমাজকে আত্মগঠন ও সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুসলমানদের

www.nagorikpathagar.org

অগ্রসর হবার মাধ্যমে স্বসমাজের উন্নতি-অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য তিনি সকলকে অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। মোট কথা অধঃপতিত মুসলিম সমাজের অবনতির বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করে তা থেকে কীভাবে নিস্কৃতি পাওয়া যায়, সে সম্পর্কে তিনি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সমাজকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার কাজে সর্বাত্মাক চেষ্টা চালান। তাঁর অনুপ্রেরণায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা-আসামের সর্বত্র সমাজের অনেক কুসংস্কার, কুধারণা ও কুপ্রথার অবসান ঘটে। অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল ও সামাজিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। মোটকথা, অধঃপতিত মুসলিম সমাজের সার্বিক উন্নয়নে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এসম্পর্কে কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন বলেনঃ

"মেহেরুল্লা'র নানা দিকে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে কিন্তু তৈয়ার করতে জানে না। পান খাইয়া অজস্র পয়সা নষ্ট করতে জানে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করে। মুন্‌শী সাহেব মুসলমানগণের মিঠায়ের দোকান করতে পানের বরজ তৈয়ার করতে সর্বস্থানেই উৎসাহ দিতেন তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবতী হইয়াছিল।"

মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ও সর্বক্ষেত্রে তাদের উন্নতি-অগ্রগতি সাধনের কাজে মুনসী মেহেরউল্লা নিরলসভাবে কাজ করেন। তিনি কেবল একজন নিষ্ঠাবান ধর্ম প্রচারকই নন, একজন অক্লান্ত সমাজকর্মী ও মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত হিসাবে বাংলার অর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

ধর্মপ্রচারক ও সমাজ সংস্কারক হিসাবে মুনসী মেহেরউল্লার অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেও লেখক হিসাবেও তার অবদান কম নয়। বিশেষত উনবিংশ শতকের অনুন্নত মুসলিম সমাজের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক হিসাবে তাঁর অবদানকে অবশ্যই গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা প্রয়োজন। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, তাঁর সাহিত্য সাধনা তাঁর মূল লক্ষ্য ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারমূলক কাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ বা পরিপুরক। এ হিসাবে তাঁর সাহিত্যে সমাজ-চিন্তা ও সমকালিনতার প্রভাব অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই বাংলার সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য তাঁর রচিত সাহিত্য বিশেষভাবে সহায়ক। এছাড়া, নিজে সাহিত্য রচনা করা ছাড়াও অন্যদেরকে সাহিত্য-কর্মে উৎসাহ প্রদান, সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা, পত্রিকা প্রকাশ ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে তিনি

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। মূলত তিনি ছিলেন সমকালিন সমাজের গতিমান, প্রাণ-চঞ্চল ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী যুগান্তকারী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব । তাই তাঁর জীবনের সকল কর্ম প্রচেষ্টাকে সামগ্রিকভাবে বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মুনসী মেহেরউল্লার যর্থাথ মূল্যায়ন সম্ভব।

বিভিন্ন লেখক ও গবেষক মুনসী মেহেরউল্লা রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের নাম ও সংখ্যা সম্পর্কে নানারূপ তথ্য দিয়েছেন। বিশেষত তৎকালে সিরাজগঞ্জ নিবাসী মেহেরউল্লা (সানি) রচিত কয়েকটি গ্রন্থকেও অনেকে ভুলবশত মুনসী মেহেরউল্লা রচিত বলে উল্লেখ করে থাকেন। এ সম্পর্কে মেহেরউল্লার জীবনীকার গবেষক নাসির হেলাল প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁর গ্রন্থের যে তালিকা প্রণয়ন করেছেন, সেটিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করে নিচে মেহেরউল্লা রচিত সাহিত্যকর্মের একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

১. খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা; ২.মেহেরুল ইসলাম; ৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভান্ডার; ৪. পান্দেনামা; ৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা; ৬. খ্রীষ্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ; ৭. রদ্দে-খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম; ৭. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের 'ইসলাম গ্রহণ' (সংগৃহীত); ৯. শ্লোক মালা; ১০. উপদেশ মালা; ১১. নবরত্ন মালা বা বাংলা গজল; ১২. ইসলামী বক্তৃতামালা; ১৩. সাহেব মুসলমান; ১৪. জোওয়াবুন্নাছারা; ১৫. কারামতিয়া মাদ্রাসা (বিবরণ); ১৬. মানব জীবনের কর্তব্য; ১৭. হিন্দু ধর্ম রহস্য; ১৮. ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন; ১৯. বাংলা গজল।

উপরোক্ত গ্রন্থ-তালিকা দৃষ্টে সুস্পষ্ট হয় যে, তিনি প্রধানত পাদ্রীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। খৃস্টান ও হিন্দুধর্মের অসারতা প্রমাণ করে ইসলামধর্মের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য তুলে ধরে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষা করাই তাঁর সাহিত্য চর্চার প্রধান উদ্দেশ্য। খৃস্টান পাদ্রীদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন এক শাণিত কৃপাণ। প্রসঙ্গত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন কুসংস্কার সম্পর্কেও তিনি তাদেরকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন তৎকালে হিন্দুদের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সহমরণে বাধ্য করা হতো। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরসহ অনেক হিন্দু সমাজ-সংস্কারকের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং এর সময় আইন করে নিষিদ্ধ করা হলেও বিধবা রমণীদের পুনঃবিবাহ তখনও নিষিদ্ধ ছিল। এতে বিধবা রমণীগণ বিশেষত তরুণী-যুবতীগণ দুঃসহ ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হতো। ঈশ্বরচন্দ্রসহ অনেকেই বিধবা বিবাহের প্রচলন

www.nagorikpathagar.org

ঘটাবার চেষ্টা করেন। এজন্য তাঁদেরকে সনাতনপন্থী হিন্দুদের হাতে অনেক নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। মুনসী মেহেরউল্লাও এ ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অসারতা তুলে ধরে বিধবা রমণীদের দুঃসহ জীবনের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের চিত্র তুলে ধরে হিন্দু সমাজে যাতে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা করেন। তাছাড়া, হিন্দু সমাজের দেখাদেখি তখন মুসলিম সমাজেও অনেকে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা শুরু করে। মেহেরউল্লা তাদের কঠোর সমালোচনা করেন এবং বিধবা বিবাহ শরীয়তে সম্পূর্ণ জায়েজ বলে কোরআন হাদীসের উদ্ধৃতিসহ জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। এভাবে তিনি হিন্দু ও মুসলিম সমাজে প্রচলিত একটি অমানবিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনি পরিচালনা করেন। এভাবে তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থই সমাজের কল্যাণ ও হিতসাধনের উদ্দেশ্যে লেখা। সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি তাঁর লেখা ও বক্তব্যের মাধ্যমে একযোগে কাজ করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যকর্মকে কোনোভাবেই তাঁর মূল লক্ষ্য ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

নিজের সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে মুনসী মেহেরউল্লা লিখেছেনঃ "যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমূদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

উপরোক্ত মন্তব্যটিতে লেখকের বিনয়ের প্রকাশ ঘটেছে সন্দেহ নেই। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর সমকালে মুসলিম সাহিত্যকদের যে খরা চলছিল, সেখানে মেহেরউল্লার সাহিত্যকর্ম বিশেষ গুরুত্ব ও সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছে। তাছাড়া, সমসাময়িক বিষয় ও মুসলিম সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তাঁর সমাধান কল্পে রচিত তাঁর সাহিত্য সংগতভাবেই তখন সকলের নিকট জনপ্রিয় হয়। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে না পারলেও নিজ চেষ্টায় তিনি সুন্দর বাংলা ও অন্যান্য ভাষা আয়ত্ত করেন। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর যে গভীর অনুরাগ ছিল, তা তাঁর নিম্নোক্ত লেখা থেকে সুস্পষ্ট হয়। মাতৃভাষার প্রতি একশ্রেণীর মুসলমানদের অনীহা লক্ষ্য করে তিনি তাদেরকে ধীক্কার দিয়ে বলেনঃ "মাতৃভাষা বাংলা লেখাপাড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণাম কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া ওঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, গোশত,

www.nagorikpathagar.org

দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

মেহেরউল্লা প্রধানত গদ্য লেখক। কিন্তু কিছু কিছু কবিতা ও গান বা গজলও তিনি রচনা করেছেন। এছাড়া, তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের স্থানে স্থানে কবিতার আকারে অনেক জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা আছে। সম্ভবত সেগুলো মুখস্থ করে রাখার উদ্দেশ্যে তিনি সেগুলো কবিতাকারে বর্ণনা করছেন। কারণ কবিতা মুখস্থ করা ও মনে রাখা অনেক সহজ। তাই সাধারণ মানুষ যাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সহজে মুখস্থ করে মনে রাখতে পারেন, সে উদ্দেশ্যে তিনি সেগুলো কবিতাকারে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া, যতদুর জানা যায়, মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও রাসূলুল্লার জীবন কাহিনী নিয়ে গজল রচনা করেন। এগুলো বিভিন্ন সভা-সমিতিতে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় এবং এর আবেদন সহজেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায়, বাংলা গানের সম্রাট কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও অনেক আগে তিনি বাংলা গান-গজল রচনা করে ও গেয়ে অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করেন।

তিনি নিজে সাহিত্য চর্চা করার সাথে সাথে অন্যদেরকেও এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তৎকালে যে সকল মুসলিম কবি-সাহিত্যিক মেহেরউল্লার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে-সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪), মুনসী শেখ জমিরউদ্দিন বিদ্যাবিনোদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল করিম প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান কম নয়। তিনি 'ইসলাম প্রচারক', 'সুধাকর' ইত্যাদি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি ঐসব পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভুমিকা রাখছেন। পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি কর্তৃপক্ষকে নানারূপ উপদেশ-পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করেন। অর্থাভাবে যেসব মুসলিম কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচিত গ্রন্থাদি প্রকাশে করতে অক্ষম ছিলেন, তিনি সাধ্যমত তাঁদের গ্রন্থপ্রকাশে সহযোগিতা করেছেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থটি তাঁর অর্থানুকূল্যেই প্রকাশিত হয়। তবে সবসময় তিনি যে এরূপ সহযোগিতা করতে সক্ষম ছিলেন, তা নয়।

www.nagorikpathagar.org

খ্যাতনামা কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন এসম্বন্ধে লিখেছেন- "তিনি ১৩১২ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে তাঁহার ২৭৭ নং পত্রে আমাকে লিখিয়া ছিলেন, "আমার অর্থের অভাব না হইলে আপনার সম্পূর্ণ কাব্যখানি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতাম। খোদাতা'লা আমার জীবন সুস্থ রাখিলে যে গতিকেই হউক পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে আপনার লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করিবার যথাশক্তি চেষ্টা করিব। মহাপ্রলয় কাব্যও শেষ করিবার চেষ্টা করুন।"

অবিভক্ত বাংলার মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত অনলবর্ষী বক্তা, কবি, লেখক, সমাজ-সংস্কারক ও ইসলাম প্রচারক মুনসী মেহেরউল্লা মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি মুসলিম সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর মৃত্যুতে 'শোকাচ্ছ্বাস' কবিতায় লেখেন-

'যাঁর সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন ঊষা
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিশ্বময় অন্ধকার।'

'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত শোক বাণীতে বলা হয়ঃ "বঙ্গের সর্ব প্রধান বাগ্মী ও সমাজ সেবক, মুসলমানদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক, মুসলমান কবি, গ্রন্থকার ও ধর্মপ্রচারক, সর্বজনপ্রিয় মুনসী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার আর আশা নাই। আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছে। আমাদের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, বাহু ভগ্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণ আর কাহার বক্তৃতা-সুধাপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে! কাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আত্মা চরিতার্থ করিবে? কাহার অমূল্য উপদেশমালা শ্রবণে সমাজ সেবায় গা ঢালিয়া দিবে। আমার যে মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। মুনসী সাহেবের অভাবে বঙ্গীয় মোসলেম আকাশ যেন গভীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মেহেরউল্লা তাঁর সমকালে অত্যন্ত জনপ্রিয়, কর্মনিষ্ঠ, সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজের তিনি ছিলেন একজন অতি নির্ভরশীল অভিভাবকতুল্য ব্যক্তিত্ব। ধর্মপ্রচার, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য-সাংবাদিকতা চর্চা ইত্যাদি নানামুখী কর্মকাণ্ডে তাঁর ব্যাপক অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন

বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার ইতিহাস সুদীর্ঘ নয়। উনবিংশ শতকে ইংরাজি ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার উন্মেষ ঘটে, তারই সূত্র ধরে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্ভব হয়। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জনক রূপে আখ্যায়িত করা হয়। মূলত তাঁর বহুমুখী অসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা কাব্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগে। তিনি বাংলা কাব্যে আধুনিক চিন্তা-চেতনা, উদার মানবিকতার প্রকাশ ঘটাবার সাথে সাথে বাংলা কাব্যের রূপরীতিতেও পরিবর্তন নিয়ে আসেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন, ইংরাজি সাহিত্যের আদলে আধুনিক গীতি কবিতা, মহাকাব্য, সনেট, নাটক, প্রহসন ইত্যাদি রচনা করেন। তিনি উপন্যাস রচনা করেননি বটে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যে ধারার প্রবর্তন করেন, সে পথ ধরেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের সৃষ্টি।

বাংলা ভাষায় ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) রচিত 'নব বাবু বিলাস' (১৮২৩)-কে প্রথম উপন্যাস হিসাবে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। এটা কলকাতার তৎকালীন সামাজিক বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে রচিত একটি কাহিনীমূলক রচনা। প্রকৃতপক্ষে, উপন্যাসের শিল্পরূপ এতে অবর্তমান। তাই একে উপন্যাস না বলে নকশা জাতীয় রচনা বলাই শ্রেয়। এরপর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হিসাবে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮১৪-৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ সনে প্রকাশিত)-এর উল্লেখ করা যায়। 'আলালের ঘরের দুলাল' নীতিবোধশাসিত সামাজিক উপন্যাস। তৎকালীন সামাজিক অবস্থার একটি বাস্তব চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের যথার্থ শিল্পরূপ এতেও বহুলাংশে অনুপস্থিত। তাই এটাকেও অনেকে নকশা জাতীয় রচনা বলেই উল্লেখ করেছেন। তবু যথার্থ মূল্যায়নে

www.nagorikpathagar.org

এতে আধুনিক উপন্যাসের কিছুটা বৈশিষ্ট্য থাকায়, অনেকে এটাকেই বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক নিদর্শন হিসাবে গণ্য করে থাকেন।

ইংরাজি উপন্যাসের আঙ্গিক ও রূপ-রীতির যথার্থ অনুসারী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই (১৮৩৮-৯৫) বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক উপন্যাসিকের মর্যাদা দেয়া হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সার্থকতা সর্বজনস্বীকৃত। তিনি সর্বমোট চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেন। এগুলো হলো : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), রাধারাণী (১৮৭৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮১), আনন্দ মঠ (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ও সীতারাম (১৮৮৭)। মূলত বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের শুধু পথিকৃৎই নন, তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক। তিনি প্রখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের রোমাঞ্চ-আশ্রয়ী ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। এছাড়া, সমকালীন সমাজ-জীবনের ভিত্তিতেও তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন। পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৮৩-১৯৩২) প্রমুখ বাংলা উপন্যাসকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের লেখার মধ্যেই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১১)। তাঁর রচিত প্রথম উপন্যাস 'রত্নাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৯ সনে। কিন্তু এটাকে সার্থক উপন্যাস না বলে উপকথা জাতীয় রচনা বলাই যুক্তিযুক্ত। মশাররফ হোসেনের অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) মূলত ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস। এটা তাঁর ও বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁর রচিত 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) ও 'গাজী মিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) এ দু'টি আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস। এতে সমকালীন সমাজ ও জীবনের বিচিত্র দিক উঠে এসেছে। মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক। তাঁর প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী। তিনি গদ্য ও পদ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩৬টি গ্রন্থ রচনা করেন। উপরে তাঁর রচিত যে চারটি উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা হলো সেগুলোকে মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক. উপকথা, দুই. ঐতিহাসিক ও তিন. আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস। এগুলোকে উপন্যাসের আঙ্গিক ও রূপরীতির বিচারে যথার্থ

www.nagorikpathagar.org

উপন্যাস হিসাবে বিবেচনা করা যায় কিনা সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায়, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এগুলোর অবদান অপরিসীম। বিশেষত মুসলিম ঔপন্যাসিকদের জন্য তিনি ছিলেন পথ-প্রদর্শক। উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য লেখক হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন।

মীর মশাররফ হোসেনের পরবর্তী মুসলিম ঔপন্যাসিকগণের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৫৮-১৯০৩), আর্জুমন্দ আলী চৌধুরী (১৮৭০-১৯৪১) ও মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) এঁদের নাম করা যায়। ফয়জুন্নেসার গদ্যে-পদ্যে লেখা 'রূপজালাল' আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণ' একটি সামাজিক উপন্যাস। মোজাম্মেল হকের 'জোহরা'ও একটি সামাজিক উপন্যাস। এতে মুসলিম সমাজের অন্তরঙ্গ চিত্র রূপায়িত হয়েছে। তাঁর 'দরাফ খাঁ গাজী' একটি ধর্ম-প্রেরণামূলক ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে মীর মশাররফ হোসেনের অনুসরণে এঁরা উপন্যাস রচনা করলেও মশাররফ হোসেনের মতো জনপ্রিয়তা কেউ অর্জন করতে সক্ষম হননি। অবশ্য 'শান্তিপুরের কবি' হিসাবে পরিচিত মোজাম্মেল হক ঔপন্যাসিক হিসাবে না হলেও কবি হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

উপরোক্ত ঔপন্যাসিকদের সমকালে বা পরবর্তীতে বাংলা কথাসাহিত্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মুসলিম কথাসাহিত্যিক হলেন পণ্ডিত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩)। নজিবর রহমান তাঁর পূর্ববর্তীতের ধারা অনুসরণ করে সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেও নানা কারণে তিনি বাংলা কথা-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। তাঁর রচিত 'আনোয়ারা' (১৯১৪) উপন্যাস একসময় মুসলিম-রচিত প্রথম সার্থক সামাজিক উপন্যাস হিসাবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান লাভ করে।

নজিবর রহমানের জন্ম সিরাজগঞ্জ জেলার অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার চর বেলতৈল গ্রামে। চর বেলতৈলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম বেলতৈল। অনেকে ভুলবশত তাঁর গ্রামের নাম বেলতৈল বলে উল্লেখ করেছেন।[১] তাঁর জন্মকাল সম্পর্কেও বিশিষ্ট গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান বলেন ঃ "তাঁহার জন্ম তারিখ সরকারী লোয়ার সাবোর্ডিনেট এডুকেশনাল সার্ভিসের লিস্ট অনুসারে ১৮৭৮। চাকরীর বয়স অনেক সময় কিছু কম থাকে। কেহ কেহ তাঁহার জন্ম তারিখ ১৮৬০ খৃ. মনে করেন।"[২] ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকও সরকারী রেকর্ড অনুযায়ী নজিবর রহমানের জন্ম ১৮৭৮ সন বলে উল্লেখ করেছেন।[৩] ডক্টর গোলাম সাকলায়েন নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৬০ বলে উল্লেখ করেছেন।[৪]

www.nagorikpathagar.org

মুস্তফা নূরউল ইসলামের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ) গ্রন্থদ্বয়েও নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৭৮ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে মনে হয়, সরকারী নথিই এঁরা সকলে আশ্রয় করেছেন। ১৯৫৭-৫৮ সনে আমি (লেখক) আমার নিজ গ্রাম চর বেলতৈলের প্রবীণ ও নজিবর রহমানের নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে যে ধারণায় উপনীত হয়েছিলাম, সে অনুযায়ী আমার এক প্রবন্ধে লেখকের জন্ম সন ১৮৫২ বলে উল্লেখ করি।[৫] অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন আমার ঐ প্রবন্ধের বরাত দিয়ে নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৫২ বলে উল্লেখ করেন।[৬] ডক্টর আনিসুজ্জামান, আ.কা.শ. নূর মোহাম্মদ, আবুল হাসনাত, কবি-সমালোচক আব্দুল কাদির, গবেষক বুলবুল ইসলাম প্রমুখ সকলেই নজিবর রহমানের জন্ম সন ১৮৬০ বলে উল্লেখ করেছেন। ডক্টর গোলাম সাকলায়েন তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে লেখকের জন্ম সন ১৮৬০ বলে উল্লেখ করেও বাক্যের ভিতর বন্ধনীর সাহায্যে লিখেছেন, 'মতান্তরে ১৮৪৭ খ্রি.'। ডক্টর মাযহারুল ইসলাম বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে লেখকের জন্ম সন বাংলা ১২৬০-১২৬৬ অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৫৪-৬০এর মধ্যে বলে অনুমান করেছেন।[৭] পরবর্তীকালে[৮] আমি লেখকের পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে লেখকের জন্ম ১৮৬০ সনের ২২শে জানুয়ারী বলে উল্লেখ করেছি। এ যাবত নজিবর রহমানের জন্ম সন বিভিন্নভাবে অনেকেই উল্লেখ করলেও তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে কেউ কোন তথ্য সরবরাহ করেননি। আমার অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য মতে তাঁর জন্ম তারিখ হলো ২২ জানুয়ারী। এ তথ্যটি আমি তাঁর উত্তর-পুরুষদের নিকট থেকে পেয়েছি।[৯]

নজিবর রহমানের মৃত্যুর সন-তারিখ নিয়েও নানারূপ ধারণা বিদ্যমান। তবে এ সম্পর্কে ডক্টর গোলাম সাকলায়েনের দেয়া তথ্যটি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। ডক্টর গোলাম সাকলায়েন কলকাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোলতান' (নব পর্যায়)-এর ৯ই কার্তিক, শুক্রবার, ১৩৩০ (৮ম বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ২৬শে অক্টোবর, ১৯২৩)-এর বরাত দিয়ে ১৮ই অক্টোবর , ১৯২৩ নজিবর রহমানের মৃত্যু দিবস বলে উল্লেখ করেছেন।

নজিবর রহমান প্রধানত ঔপন্যাসিক। তবে তিনি কয়েকটি গল্প ও দুটি প্রবন্ধ পুস্তকও রচনা করেন। তিনি কতিপয় পাঠ্য-পুস্তকও রচনা করেন বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু অবগত হওয়া যায় না। তাঁর রচিত যে সব বইয়ের নাম জানা যায়, সেসব বইয়ের সন্ধান পাওয়া যেমন দুরূহ,

www.nagorikpathagar.org

তেমনি সেগুলো ব্যতীত তিনি আরো বই রচনা করেছিলেন কিনা সে সম্পর্কেও নিশ্চিত কিছু বলা কঠিন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তাঁর রচনাবলীর একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

এক. 'পূর্বস্মৃতি' ঃ কুতুবুদ্দিন আয়বক'। ১৯০১ সনের জুলাই-আগস্ট (৪র্থ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা) 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ। এটি তাঁর কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

দুই. 'সাহিত্য প্রসঙ্গ'। এটি সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য বিষয়ক একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রকাশকাল বাংলা ১৩১১, ইংরেজী ১৯০৪। প্রকাশের অল্পকাল পরেই সরকার এটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে।

তিন. 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য'। প্রকাশকাল বাংলা ১৩১১, ইংরেজী ১৯০৫। এটি মুসলিম স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা-চেতনাসমৃদ্ধ একটি স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিও প্রকাশের অল্পকাল পরেই সরকার বাজেয়াপ্ত করে।

'সাহিত্য-প্রসঙ্গ' ও 'বিলাতী বর্জ্জন রহস্য' সম্পর্কে 'উত্তর বঙ্গে মুসলমান সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে হামেদ আলী নামক জনৈক লেখক মন্তব্য করেন ঃ " ১। বিলাতী বর্জ্জন রহস্য, ২। সাহিত্য-প্রসঙ্গ ॥ সলঙ্গা মাইনর স্কুলের হেড পন্ডিত মুন্‌শী নজিবর রহমান প্রণীত। ভাষা সাধু বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ইহার বেশ অনুরাগ আছে, ইনি আরও পুস্তক লিখিতেছেন।"[১০]

পর পর দু'টি প্রবন্ধ গ্রন্থই প্রকাশের সাথে সাথে সরকার বাজেয়াপ্ত করায় নজিবর রহমান সম্ভবত হতোদ্যম হয়ে পড়েন। ফলে তিনি অন্য কোন প্রবন্ধ গ্রন্থ লিখেছেন বলে জানা যায় না। এরপর কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। অবশ্য দু'একটি পাঠ্যপুস্তকও তিনি লিখেছেন বলে জানা যায়। তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

এক. 'আনোয়ারা'। নজিবর রহমানের প্রথম ও সর্বাধিক সার্থক উপন্যাস। প্রথম প্রকাশ ১৯১৪ সনে। বাংলা ১৩৬৮ সনের চৈত্র মাসে এর সপ্তবিংশতি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং ঐ সময় পর্যন্ত এর সাড়ে পাঁচ লক্ষ কপি বিক্রয় হয় বলে জানা যায়। এ থেকে এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে ধারণা করা চলে। 'আনোয়ারা' একসময় কলেজে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। ষাটের দশকে প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও চলচ্চিত্রকার জহির রয়হান 'আনোয়ারা'র সফল চিত্রায়ণ করেন এবং ১৯৮৭ সনে বাংলাদেশ টেলিভিশন এর ধারাবাহিক নাট্যরূপ প্রচার করে।[১১]

দুই. 'প্রেমের সমাধি'। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের পরিশিষ্ট হিসাবে এটি রচিত। তবে এটা যে একটি সম্পূর্ণ সামাজিক উপন্যাস তাতে কোন সন্দেহ

www.nagorikpathagar.org

নেই। সম্ভবত 'আনোয়ারা'র পাঠকপ্রিয়তা লক্ষ্য করে লেখক এটিকে 'আনোয়ারার পরিশিষ্ট' হিসাবে প্রণয়ন করেন। এটিও একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। বাংলা ১৩৭০ সনে এর ১৯শ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ থেকে এর জনপ্রিয়তা আন্দাজ করা চলে।

তিন. 'গরীবের মেয়ে' একটি আত্মজীবনীমূলক সামাজিক উপন্যাস। এটিও একটি জনপ্রিয় উপন্যাস। ১৯২৩ সনে প্রকাশিত এ গ্রন্থটির সপ্তদশ সংস্করণ মুদ্রিত হয় বাংলা ১৩৯৪ সনের আষাঢ় মাসে (১৯৮৭ সনের জুলাই)।

চার. 'চাঁদ তারা বা হাসন গঙ্গা বাহমণি'। এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস।

পাঁচ. 'পরিণাম'। এটি একটি গল্পগ্রন্থ। কবি-সমালোচক আব্দুল কাদির এ গ্রন্থটি সম্পর্কে লেখেন ঃ "নজিবর রহমানের 'পরিণাম' উপন্যাসখানি নূতন আঙ্গিকে বিরচিত। ইহাতে তিনটি কাহিনী পরিশেষে একত্র সংযুক্ত হইয়া মনোহর পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহার অবয়ব নির্মাণে মোহাম্মদ দানেশের 'চাহার দরবেশ' (১৭৭১ খ্রী.) পুঁথির অভিনব প্যাটার্ন অনুসরণের দূরূহ প্রয়াস লক্ষণীয় এবং এর বর্ণনার টেকনিক বিশ্ববিশ্রুত আলফা-লায়লা নামক আরব্য কাহিনীগুচ্ছের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"[১২]

ছয়. 'মেহেরউন্নিসা'। ১৯২৩ সনে প্রকাশিত নজিবর রহমানের সর্বশেষ সামাজিক উপন্যাস। বাংলা ১৩৩০ সনে প্রকাশিত 'দুনিয়া আর চাইনা'র প্রথম সংস্করণে 'মেহেরউন্নিসা' উপন্যাসের বিজ্ঞাপন দেয়া হয় এভাবে ঃ "গ্রন্থকার প্রণীত আর একখানি উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস 'মেহেরউন্নিসা'। ভাবে, ভাষায়, ঘটনা-বৈচিত্র্যে ও স্বাভাবিকতায় উপন্যাস জগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থাপিত করিয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে অদ্যাবধি এরূপ ভাবোদ্দীপক মনোজ্ঞ উপন্যাস প্রকাশিত হয় নাই।" দুর্ভাগ্যবশত বইটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য।

সাত. 'দুনিয়া আর চাই না'। ১৯২৩ সনে প্রকাশিত। 'যুবকের কান্ড', ঈমানের পরখ', 'সতীর সাধনা', 'নারীর ধৈর্য্য', ও 'নারীর হৃদয়' শীর্ষক পাঁচটি গল্পের সংকলন।

আট. 'নামাজের ফল'। বাংলা ১৩৩০ সনে প্রকাশিত 'দুনিয়া আর চাই না' প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত এক বিজ্ঞাপনে বলা হয় ঃ "গ্রন্থকারের আর একখানি উপন্যাস। উপাসনার শ্রেষ্ঠ সোপান, খোদার সান্নিধ্য লাভের একমাত্র উপায় নামাজ, সেই নামাজের উপলক্ষ্যে গ্রন্থকার 'নামাজের ফল' লিখিয়াছে।" এ গ্রন্থটিও দুষ্প্রাপ্য।

www.nagorikpathagar.org

নয়. 'বেহেস্তের ফুল'। এটিও একটি উপন্যাস। বাংলা ১৩২৭-২৮ সনে লেখক রোগ-শয্যায় এটি লিখেছিলেন।

দশ. 'দুনিয়া কেন চাই না'। এটিও বাংলা ১৩২৭-২৮ সনে রোগ-শয্যায় লিখিত আর একখানি উপন্যাস।

এছাড়া, নজিবর রহমান কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন বলে জানা যায়। সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া না গেলেও এ সম্পর্কে যে জনশ্রুতি রয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কেননা, তিনি সারা জীবন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনায় তাঁর ভূমিকা ছিল, সর্বোপরি একজন নিষ্ঠাবান, আদর্শ চরিত্রের সমাজ-হিতৈষী, জাতির কল্যাণকামী মহৎ ব্যক্তি হিসাবে মুসলিম সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ও উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করা তাঁর পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক ছিল।

নজিবর রহমানের উপন্যাসকে মোট চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় ও আত্ম-জৈবনিক। তাঁর সামাজিক উপন্যাস গুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলোতে তৎকালীন গ্রাম বাংলার সমাজ-চিত্র বিশেষত মুসলিম পারিবারিক ও সমাজের চিত্র নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে। ইতঃপূর্বে এ ধরনের চিত্র বাংলা কথাসাহিত্যে নজিবর রহমানের মতো বাস্তবনিষ্ঠভাবে আর কেউ ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হননি। 'হাসন গঙ্গা বাহমণি' তাঁর রচিত একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পূর্ববর্তী ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র যেমন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার বশবর্তী হয়ে তাঁর রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের চরম বিকৃতি ঘটিয়েছেন, নজিবর রহমান সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি ঐতিহাসিক সত্য তুলে ধরার সাথে সাথে সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। 'গরীবের মেয়ে' তাঁর রচিত একমাত্র আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস। এতে তিনি তাঁর নিজের ও স্ত্রীর কথা বলার সাথে সাথে পারিপার্শ্বিক অবস্থারও বর্ণনা দিয়েছেন। তবে নিজের জীবন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও এটাকে তিনি যথাসম্ভব উপন্যাসের আদলে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। এছাড়া, বাকী উপন্যাসগুলো যথা–'দুনিয়া আর চাই না', 'নামাজের ফল', 'বেহেস্তের ফুল', 'দুনিয়া কেন চাই না' ইত্যাদি মূলত ধর্মীয় কাহিনীমূলক গ্রন্থ। শিল্প-বিচারে এগুলোকে যথার্থ উপন্যাস বলে গণ্য করা যায় না।

www.nagorikpathagar.org

নজিবর রহমানের অধিকাংশ উপন্যাসই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'আনোয়ারা', 'প্রেমের সমাধি', 'পরিণাম', 'গরীবের মেয়ে', 'হাসন গঙ্গা বাহমণি' প্রভৃতি উপন্যাস একসময় জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে নেয়। বিশেষত 'আনোয়ারা'র জনপ্রিয়তা ছিল কিংবদন্তীতুল্য। মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু'র জনপ্রিয়তার সঙ্গেই কেবল এর তুলনা চলে। নজিবর রহমানের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণগুলো নিম্নরূপভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

নজিবর রহমান তাঁর উপন্যাসে মুসলিম সমাজের বাস্তব চিত্র অতি বিশ্বস্ত তার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাঙালি মুসলমানদের আশা-আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-বেদনা, আচার-অনুষ্ঠান, কুটিলতা-দুর্বলতা, সফলতা-ব্যর্থতার এক জীবনধর্মী প্রাণবন্ত চিত্র এতে বাঙময় রূপ লাভ করেছে। লেখক শুধু একজন শিল্পী নয়, তিনি একজন সমাজ-হিতৌষী, সমাজের উন্নতি ও কল্যাণকামী আদর্শ মুসলিম। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো সবই গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ। তাদের জীবনে যেমন স্বপ্ন আছে, আশা-আনন্দ-প্রেম আছে, তেমনি আছে স্খলন, পতন, দুর্বলতা ও নানারূপ সীমাবদ্ধতা। লেখক অতি বাস্তব ও সূক্ষ্ম জীবনদৃষ্টির মাধ্যমে তা অবলোকন করেছেন ও কুশলী শিল্পীর ন্যায় তার হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন। এ শিল্পরূপ দানের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিশ্বাস, শাশ্বত জীবনবোধ ও আদর্শ জীবন-চেতনায় সর্বদা উদ্বুদ্ধ থেকেছেন। ফলে তাঁর সবগুলো উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাই হয়েছে তাঁর এ বিশ্বাস, জীবনবোধ, আদর্শ-চেতনা ও স্বকীয় স্বপ্ন-কল্পনার বিশ্বস্ত প্রতিভূ। যেকালে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত কথা-সাহিত্যে হিন্দু নর-নারী, হিন্দু ধর্ম-দর্শন-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথা ব্যতীত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জীবন-চিত্রের কোন পরিচয়ই পাওয়া যেত না, অথবা যৎসামান্য কিছু থাকলেও তা কেবল মুসলমানদের কুৎসা রটনা ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যেই তা সন্নিবেশিত হতো। সে রকম অবস্থায় মুসলিম সমাজ ও চরিত্র সংবলিত এ জাতীয় উপন্যাস ছিল অনেকটা অভাবিতপূর্ব। তাই মুসলিম সমাজে এ জাতীয় উপন্যাস বিপুল বিস্ময় ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিটি শিক্ষিত মুসলিম পরিবারে তৎকালে এসব উপন্যাস বিশেষ সমাদৃত হয়। যে মুসলিম সমাজে এককালে নাটক-নভেল পড়া এক রকম নিষিদ্ধ ছিল, সে সমাজে নজিবর রহমানের উপন্যাসগুলো কেবল সমাদৃতই হলো না, বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে তা উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করা একরকম রেওয়াজে পরিণত হয়। এমনকি, বিবাহযোগ্য কনেদের জন্য ঐ সময় এসব উপন্যাস পাঠ একটি বিশেষ যোগ্যতা হিসাবে বিবেচিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

নজিবর রহমানের জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ হলো তাঁর অসাধারণ প্রাঞ্জল, সহজ, সরল, অনবদ্য ভাষা। মুসলিম সমাজে নিত্য ব্যবহৃত অসংখ্য আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ তিনি অসংকোচে ব্যবহার করেছেন। যে সময় হিন্দুরা তো বটেই মীর মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর মত প্রতিভাশালী মুসলমানরা পর্যন্ত সংস্কৃতবহুল সাধু বাংলায় সাহিত্য চর্চা করতেন, সে সময় নজিবর রহমান এক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব শব্দ-সম্পদকে ব্যবহার করে। বিশেষত ইসলামের বিভিন্ন আরবি পরিভাষা তিনি অসংকোচে ব্যবহার করে অনেকটা দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামেরও পূর্বসূরী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। অবশ্য নজরুল এক্ষেত্রে তাঁকে অতিক্রম করে অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। তবে নজিবর রহমান এক্ষেত্রে যে অগ্রপথিকের দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ বিশেষ ভাষাভঙ্গীর কারণে গ্রামের অল্পশিক্ষিত মহিলারা পর্যন্ত নজিবর রহমানের উপন্যাস অনায়াসে পাঠ করে আনন্দ লাভ করতো। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে এটাও একটি বিশেষ কারণ।

তাছাড়া, নজিবর রহমানের উপন্যাসের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অসাম্প্রদায়িক, মানবিক উদার দৃষ্টিভঙ্গী। তিনি মুসলিম সমাজের চিত্র অংকন করতে গিয়ে কখনো সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দেননি বা অমুসলমানদের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে এমন কোন কাজ করেননি। বরং মুসলমান চরিত্রের পাশাপাশি তিনি অমুসলিমদের চরিত্রও অংকন করেছেন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। ফলে তাঁর উপন্যাসসমূহ শুধু বাঙালি মুসলমানের কাছেই নয়, অমুসলিম পাঠকের কাছেও সমাদৃত হয়েছে।

বাংলা কথাসাহিত্যে নজিবর রহমানের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। মুসলিম কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনের পরেই তাঁর স্থান। তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন কথাসাহিত্যিকগণ এ দু'জন অমর কথা-শিল্পীর পদাংক অনুসরণ করে বাংলা কথাসাহিত্যকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন– সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), একরাম উদ্দিন (১৮৮২-১৯৩৫), লুৎফর রহমান (১৮৯১-১৯৩৭), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), নুরুন্নেসা খাতুন

www.nagorikpathagar.org

(১৮৯৪-), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৫-১৯৭৩), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), আবুল ফজল (১৯০৫-৮৩), সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৫-৭৪), আবু জাফর শামসুদ্দীন (১৯১১-৮৮) প্রমুখ।

এঁদের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'রায় নন্দিনী' (১৯১৫), বেগম রোকেয়ার 'সুলতানার স্বপ্ন' ও 'অবরোধ বাসিনী', কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩), একরাম উদ্দিনের 'কাঁচ ও মণি' (১৩২৫), লুৎফর রহমানের 'পথহারা' (১৩২৬) ও 'প্রীতি উপহার' (১৩৩৩), নুরুন্নেসার 'স্বপ্নদ্রষ্টা' (১৯২৩), কাজী আব্দুল ওদুদের 'নদীবক্ষে' (১৩২৫) ও 'আজাদ', গোলাম মোস্তফার 'রূপের নেশা' (১৩২৬), কাজী নজরুল ইসলামের 'বাঁধন হারা' (১৯২৭) ও 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০), আবুল ফজলের 'চৌচির' (১৯৩৪) ও 'রাঙ্গা প্রভাত', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'অবিশ্বাস্য' ও 'শবনম', আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পরিত্যক্ত স্বামী' (১৯৪৬), 'মুক্তি' (১৯৪৭) ও 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪) ইত্যাদি।

বাংলা উপন্যাসের যুগ-বিবর্তনের ধারায় নানা বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাস হলো জীবন ও সমাজের রসময় বাস্তব চিত্র। জীবন ও সমাজের নানা বিবর্তন, পরিবর্তন ও উত্তরণের চিত্র স্বভাবতই রসময়ভাবে উপন্যাসে স্থান লাভ করে থাকে। মীর মশাররফ হোসেন থেকে নজিবর রহমানের কাল ভিন্ন। নজিবর রহমান থেকে তাঁর পরবর্তীদের কালও ভিন্ন এবং নানা বৈচিত্র্যে পূর্ণ। উপন্যাসে এ যুগ-বিবর্তন, জীবন-বৈচিত্র্য ও নানা বাস্তব অভিজ্ঞতার রসগ্রাহী চিত্র আমরা উপরোক্ত লেখকদের লেখায় বিভিন্নভাবে লক্ষ্য করেছি। তার সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই যে, প্রত্যেক লেখকেরই একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। তাঁদের লেখার মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় ফুটে ওঠাই স্বাভাবিক। সে কারণেও উপন্যাসে বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে।

নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন তাঁর উপন্যাসে তাঁর সমকালীন জীবন ও সমাজকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। সমকালীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা ও স্খলন-পতনকে তিনি যথাযথভাবে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাছাড়া, মানব জীবনের কতগুলো চিরায়ত মূল্যবোধ যেমন প্রেম, ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের প্রতি মানুষের মমত্ববোধ ইত্যাদি তাঁর লেখায় যথাযথভাবে ফুটে উঠেছে। এজন্যই তাঁর রচনা সমকালে যেমন ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তেমনি তা চিরকালীন মানুষের কাছেও সমাদৃত হয়েছে। এদিক থেকে তিনি যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন বাংলা কথাসাহিত্যের এক অমর শিল্পী। তবে দূর্ভাগ্যবশত তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি। বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিমদের মধ্যে অন্যতম পথিকৃৎ এবং একজন অসাধারণ জনপ্রিয় ঔপন্যাসিককে আমরা এখন প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু তিনি তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। বিশেষত তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত সমকালীন সামাজিক অবস্থার বিবরণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের নবজাগরণের চিত্র যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা সাহিত্য-রসিকদের মনে চিরকাল আগ্রহ সৃষ্টি করবে নিঃসন্দেহে।

তথ্য-পঞ্জী ঃ

১. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন ঃ বঙ্গসাহিত্যে মুসলিম সাধনা, মাহে নও, কার্তিক, ১৩৬২, ৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা, ও ডক্টর এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য।

২. নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ৫৮৩

৩. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক ঃ মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ. ৩২৫।

৪. ডক্টর গোলাম সাকলায়েন ঃ মোহাম্মদ নজিবর সাহিত্য-রত্ন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪।

৫. দৈনিক আজাদ, ২২শে চৈত্র, ১৩ ৬৫।

৬. অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন ঃ বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, প্রকাশকাল ১৩৭১, পৃ. ১৭৭।

৭. ডক্টর মযহারুল ইসলাম ঃ মোহাম্মদ নজিবর রহমান, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২।

৮. মুহম্মদ মতিউর রহমান ঃ কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, জুলাই ২০০২– জুন ২০০৩, পৃ. ২৮-২৯।

৯. ঐ

১০. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। রংপুর শাখা। পৃ. ১২৯, ত্রৈমাসিক, তৃতীয় ভাগ, সন ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। সম্পাদক শ্রীপঞ্চানন সরকার, এম-এ, বি-এল।

১১. দ্র. বুলবুল ইসলাম ঃ আনোয়ারা ঃ প্রাসঙ্গিক ইতিহাস।

১২. আব্দুল কাদির ঃ কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান, উত্তরাধিকার, ৯ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, জুন, ১৯৮১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক হিসাবে খ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (জন্ম- ইংরাজি ১৮৬৮, বাংলা ১২৭৫ সনের ২৪ জ্যৈষ্ঠ, মৃত্যু- ইংরাজি ১৮ আগস্ট ১৯৬৮) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক বিরল ব্যক্তিত্ব। একাধারে রাজনীতি, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চির স্মরণীয় হয়ে আছে। এরূপ ক্ষণ-জন্মা ব্যক্তির আবির্ভাব যে কোন দেশ ও জাতির জন্যই অত্যন্ত গৌরবের। তিনি নিরলস কর্ম-প্রচেষ্টার দ্বারা দেশ ও জাতির বিশেষত বাঙালি মুসলমান সমাজের সীমাহীন খেদমত করে গেছেন, সেজন্য তিনি চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, বাঙালি মুসলিম জাগরণ, সামাজিক সংস্কার, ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, ভাষা, সাহিত্য, সাংবাদিকতা, সংস্কৃতি ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যবান অবদানের জন্য তিনি অবিস্মরনীয় হয়ে আছেন।

তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হাজী আবদুল বারী খাঁ গাজী। আব্দুল বারী খাঁ ছিলেন একজন আলেম ও জিহাদী-চেতনাসম্পন্ন মানুষ। প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর আকরম খাঁর পিতা- আব্দুল বারী খাঁ মাত্র ১০/১২ বছর বয়সে তৎকালীন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রপথিক সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভীর নেতৃত্বে পরিচালিত শিখ ও ইংরাজ-বিরোধী জিহাদে অংশগ্রহনের উদ্দেশ্যে সীমান্ত প্রদেশে গমন করেন। ফলে তিনি 'গাজী' খেতাব লাভ করেন। এহেন একজন গাজীর পুত্র হিসাবে আকরম খাঁও ছিলেন জিহাদী মনোভাবাপন্ন এক লড়াকু ব্যক্তিত্ব। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন 'কুর' বা ব্রাহ্মণ। পরবর্তীতে তারা ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম কবুল করেন। কথিত আছে, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই বংশদ্ভূত। উভয়েরই পূর্বপুরুষ ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ।

www.nagorikpathagar.org

শৈশবে পিতৃ-মাতৃহীন হওয়ার কারণে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ভাগ্য-বিড়ম্বিত হন। অতি কষ্ট এবং দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর শৈশব-জীবন অতিবাহিত হয়।

কিন্তু তাঁর মনোবল ছিল দৃঢ় এবং তার মধ্যে ছিল প্রবল উচ্চাকাংক্ষা। এ কারণে তিনি নানা দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্যেও বিদ্যাশিক্ষা চালিয়ে যান এবং কঠোর নিষ্ঠা ও সাধনায় কৃতিত্বের সাথে মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রী হাসিল করেন।

১৯০১ সনে তিনি কলকাতা মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে এফ.এম. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ সময় মাদ্রাসার সিলেবাস অনুযায়ী আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা শেখার সুযোগ থাকলেও বাংলা ভাষা শেখার কোন সুযোগ ছিল না। তাই ছাত্র-জীবনে তিনি ইংরাজি-বাংলা শেখার সুযোগ না পেলেও পরবর্তীতে নিজ চেষ্টায় বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা রপ্ত করেন। আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। ছাত্র-জীবনেই তিনি ফারসিতে কবিতা লেখায় অভ্যস্থ ছিলেন। ঐ সময় কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ছিলেন জনৈক ইংরাজ, তাঁর নাম স্টিন। স্টিন সাহেবের উপস্থিতিতে মাদ্রাসার এক অনুষ্ঠানে মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্বরচিত ফারসি কবিতা আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন।

ইংরাজ শাসনামলে মোহাম্মদ আকরম খাঁর জন্ম। তখন মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। একদিকে, ইংরাজ রাজশক্তি, অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অত্যাচার-নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনায় বাঙালি মুসলিম সমাজের দুরবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ অবস্থা দেখে আকরম খাঁর হৃদয় রুধিরাক্ত হয়। তিনি এ অবস্থার পরিবর্তন সাধনে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। মূখ্যত বাঙালি মুসলমানদের দুরবস্থা দূরীকরণার্থে এবং তাদের উন্নতির জন্য কাজ করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। তাঁর জীবনের সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে আমরা এর প্রতিফলন লক্ষ্য করি।

প্রথমত, শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমান তখন ছিল অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমিদারি-জোতদারি সবই ছিল তখন হিন্দুদের হাতে। তৃতীয়ত, সামাজিক ক্ষেত্রেও মুসলমানরা ছিল চরমভাবে উপেক্ষিত-অবহেলিত। চতুর্থত, অশিক্ষার কারণে মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল। নানারূপ কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসের দ্বারা তাদের মন-মানসিকতা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আকরম খাঁ উপায় অনুসন্ধান করতে লাগলেন। এজন্য তিনি প্রথমেই লেখালেখি ও সাংবাদিকতার মাধ্যমকে বেছে

www.nagorikpathagar.org

নিলেন। ১৯০৫ সনে কুষ্টিয়া নিবাসী জনৈক বিদ্যোৎসাহী আব্দুল্লাহ নাসের কলকাতা থেকে 'মোহাম্মদী' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কিন্তু অল্প দিনেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আকরম খাঁ উক্ত পত্রিকাটি পুনঃপ্রকাশের উদ্দেশ্যে কলকাতার ধনাঢ্য ব্যবসায়ী হাজী আলতাফের শরণাপন্ন হন। ঐ সময় হাজী আলতাফ একজন বড় চামড়া ব্যবসায়ী হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। কলকাতায় তাঁর একটি প্রেসও ছিল। প্রেসটির নাম ছিল 'আলতাফী প্রেস'।

হাজী আলতাফ ছিলেন একজন সমাজ-দরদী, উদারপন্থী ব্যক্তি। আকরম খাঁকে তিনি সহযোগিতা করতে রাজি হন। তাঁর সহযোগিতায় 'আলতাফী প্রেস' থেকে ১৯১০ সনে আকরম খাঁ প্রথমে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ সময় থেকেই আকরম খাঁর কর্ম-জীবনের শুরু। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশের সময় 'বলকান যুদ্ধ' চলছিল। এ সময় মুসলমানগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মুসলমানদের এ আবেগ ও ক্ষোভের বিষয় 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় বিশেষভাবে তুলে ধরার কারণে পত্রিকাটি যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু ইংরাজ সরকার এ পত্রিকাটি সহ্য করতে পারেনি। তাই সরকারের আদেশে তা অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়।

১৯১৩ সনে তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলায় 'আঞ্জুমায়ে ওলামায়ে বাংলা' নামে আলেমদের একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। পরবর্তী বছর ১৯১৪ সনে এ প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসাবে মাসিক 'আল ইসলাম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এ পত্রিকার সম্পাদক এবং আকরম খাঁ ছিলেন এর যুগ্ম-সম্পাদক ও প্রকাশক।

১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। এ নতুন প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয় ঢাকায়। নতুন প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল মুসলিম। ফলে এ এলাকার অধঃপতিত মুসলমানদের ব্যাপক উন্নতির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এজন্য ভারতীয় হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের প্রবল বিরোধিতা করে। তাদের বিরোধিতার ফলে ১৯১১ সনে ইংরাজ সরকার 'বঙ্গভঙ্গ রদ' করে। এতে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ নবাব আব্দুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব সলিমউল্লাহ, সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরী প্রমুখসহ মুসলিম সমাজ অতিশয় ক্ষুব্ধ হন।

১৯০৬ সনে ঢাকার শাহবাগে নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের রাজনৈতিক অধিবেশনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগে'র জন্ম হয়। আকরম খাঁ এতে যোগদান করেন। ১৯১৪ সনে তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস অধিবেশন এবং ১৯১৬ সনে লক্ষ্ণৌয়ে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে যোগদান

www.nagorikpathagar.org

করেন। এ সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 'সরাজ আন্দোলনে'র সাথেও যুক্ত হন। ১৯১৯-২১ সন পর্যন্ত 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়' নামে মশহুর মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর সঙ্গে তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। 'আলী ভ্রাতৃদ্বয়ে'র খিলাফত আন্দোলনের সাথে তিনি গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন এবং প্রাদেশিক খিলাফত আন্দোলন কমিটির সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করেন। এভাবে প্রায় একই সময় তিনি একাধারে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, খেলাফত আন্দোলন, সরাজ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

মুখ্যত 'খিলাফত আন্দোলন'কে জোরদার করার উদ্দেশ্যে আকরম খাঁ ১৯২০ সনের ২১ মে উর্দু 'দৈনিক জামানা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। দীর্ঘ চার বছরকাল তিনি এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। উর্দু দৈনিকের পাশাপাশি ১৯২১ সনে তিনি 'সেবক' নামে একটি বাংলা দৈনিকও প্রকাশ করেন। এ সময় একই সাথে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'দৈনিক সেবক' ও 'দৈনিক জামানা'র (উর্দু) সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন।

'দৈনিক সেবক' পত্রিকায় ব্রিটিশ-বিরোধী মতামত প্রকাশের অভিযোগে আকরম খাঁ রাজরোষে পতিত হন। ফলে এক বছরের জন্য তিনি কারাবরণ ভোগ করেন। এ সময় দৈনিক সেবক পত্রিকার প্রকাশনাও কিছু দিনের জন্য বন্ধ হয়। কারাগারে থাকা অবস্থায় আকরম খাঁ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন। ঐ সময় তিনি পবিত্র কোরআনের বাংলা তাফসির রচনার কাজে হাত দেন এবং আমপারার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন। ১৯২২ সনে আকরম খাঁ কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে 'দৈনিক সেবক' পত্রিকা পুনঃপ্রকাশ করেন। তবে বিভিন্ন কারণে তা বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। অতঃপর উর্দু 'দৈনিক জামানা' পত্রিকাও বন্ধ হয়ে গেলে তিনি শুধু 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন।

১৯২৭ সনে আকরম খাঁ একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে 'মাসিক মোহাম্মদী' প্রকাশ করেন। এটি ঐ সময় বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-লেখকদের জন্য একটি প্রতিনিধিত্ব স্থানীয় পত্রিকা হিসাবে গণ্য হয়। এতে নবীন-প্রবীণ বহু বাঙালি মুসলমান কবি-সাহিত্যিক অবাধে সাহিত্য-চর্চার সুযোগ পান। অতঃপর ১৯৩৬ সনের ৩১ অক্টোবর মাওলানা আকরম খাঁর পরিচালনায় এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের সম্পাদনায় 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসাবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক-সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, আকবর উদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, হাবিবুল্লাহ বাহার, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ তরুণ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ নিযুক্ত হন।

www.nagorikpathagar.org

এছাড়া, এসব পত্রিকায় কাজ করার সুযোগ পেয়ে অসংখ্য মুসলিম প্রতিভাবান তরুণ সাংবাদিকতায় হাতে-খড়ি লাভ করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রবীণ সাংবাদিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাঁদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য আকরম খাঁর নিকট বহুলাংশে দায়ী। তাঁদের অগ্রপথিক হিসাবে আকরম খাঁর কৃতিত্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যমণ্ডিত। তাই তাঁকে যথার্থই মুসলিম বাংলার 'সাংবাদিকতার জনক' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সাংবাদিকতার পেশাকে সমুন্নত রাখা এবং সাংবাদিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এমনকি, এজন্য তিনি আন্দোলন-সংগ্রামও পরিচালনা করেছেন। পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খাঁর সাংবাদিক নির্যাতনের বিরোধিতা করে তিনি সংবাদ-কর্মীদের নিয়ে এক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলেন।

'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ পত্রিকার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক জাগরণ, সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার প্রতিফলন ঘটে। বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 'দৈনিক আজাদ' অফিস থেকে একই সাথে 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী' ও 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। একই সাথে আকরম খাঁ দৈনিক আজাদ অফিসে 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী' নামে একটি প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তোলেন। এ প্রকাশনা সংস্থা থেকে তৎকালীন খ্যাতনামা বিভিন্ন মুসলিম লেখকের অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এভাবে 'দৈনিক আজাদ', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'মোহাম্মদী বুক এজেন্সী' তৎকালীন বহু নবীন-প্রবীণ মুসলিম লেখকের সাহিত্য চর্চায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে।

একাধারে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ এবং প্রকাশনা সংস্থার মাধ্যমে আকরম খাঁ অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে একদিকে যেমন রাজনীতি-সচেতন করে তোলেন, অন্যদিকে তেমনি সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, বিকাশ ও উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখেন। ঐ সময় দৈনিক আজাদ পত্রিকার অফিসেই ১৯৪৩ সনে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠিত হয়। সেখানে রেনেসাঁ সোসাইটির সকল সভা ও কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হতো। এ সংস্থার প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক প্রখ্যাত সাহিত্যিক-সাংবাদিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং এর আহ্বায়ক ছিলেন দৈনিক আজাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক মুজীবুর রহমান খাঁ। সোসাইটির কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন হাবিবুল্লাহ বাহার, আবুল মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী, কবি ফররুখ আহমদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

www.nagorikpathagar.org

১৯২১ সনে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে এবং নিগৃহীত কৃষক, প্রজা সাধারণের ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে স্যার আব্দুর রহীম ও মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ। ১৯৩৬ সনে 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' 'কৃষক প্রজা পার্টি'তে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৭ সনে আকরম খাঁ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলিম লীগের মনোনয়ন পেয়ে সদস্য নির্বাচিত হন।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একজন অতিশয় সমাজ ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি সবসময় জনগণের দাবী-দাওয়ার কথা জোরালোভাবে তুলে ধরতেন। দেশের স্বাধীনতার সপক্ষেও তিনি সর্বদা সোচ্চার ছিলেন। তিনি একজন ওজস্বী ও জ্বালাময়ী বক্তা ছিলেন। ফলে, জনগণের মধ্যে তাঁর ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ছিল।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১৯৩৬ সনে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ অধিবেশনে যোগদান করেন। মুসলিম লীগের ঐ অধিবেশনেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপিত ও গৃহীত হয়। উক্ত প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে-দ্বীন ও ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সিপাহসালার হযরত মাওলানা হাসরাৎ মোহানী। উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বেও কংগ্রেসের এক অধিবেশনে মাওলানা হাসরাৎ মোহানী ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী সংবলিত এক প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তখন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মোহন চাঁদ করম চাঁদ গান্ধীর বিরোধিতার কারণে সে প্রস্তাব পাশ হতে পারেনি। কংগ্রেস ও তার নেতা গান্ধী তখন পর্যন্ত উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেননি। 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসে'র দাবী নিয়েই তখনও পর্যন্ত তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার দাবী নিয়মতান্ত্রিকভাবে মুসলিম লীগই প্রথম উত্থাপন করে। এ দাবী তখন থেকেই সর্বভারতীয় মুসলমানদের দাবীতে পরিণত হয়। ফলে ইংরাজ সরকার মুসলমানদের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়। এর অনেক পরে কংগ্রেস বা ভারতীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করেন।

অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও বেঙ্গল প্যাক্ট ইত্যাদি বিষয়ে কংগ্রেসের চিন্তাধারার সাথে আকরম খাঁর মতের অমিল হওয়ায় তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। এ সময় আর একটি বিতর্ক হিন্দু-মুসলিম বিরোধকে ব্যাপকভাবে উস্কানী দেয়। সেটা হলো, ভারতীয় হিন্দু-নেতৃবর্গ প্রায় সকলেই হিন্দুদের নিকট 'ঋষি' নামে খ্যাত চরম মুসলিম-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বন্দে মাতরম' গানটিকে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত এবং

www.nagorikpathagar.org

'শ্রীপদ্ম'কে ভারতের জাতীয় প্রতীক হিসাবে গণ্য করার দাবী জানায়। এতে মুসলিম সমাজ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয়। কেননা, 'বন্দে মাতরম' হিন্দু-দেবীর বন্দনামূলক গান এবং 'শ্রীপদ্ম' হিন্দু-দেবীর আসন হিসাবে পরিচিত। মুসলমানের দৃষ্টিতে এ দুটোই সুস্পষ্টভাবে শিরক হিসাবে গণ্য। ফলে, সমগ্র মুসলিম সমাজ এতে ক্ষুব্ধ হয়। মাওলানা আকরম খাঁ মুসলমানদের এ আবেগ ও আকীদার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন এবং তিনি এ দু'টির বিরোধিতায় মুসলমানদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে, হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাই গায়ের জোরেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের উপর তারা তাদের দাবী চাপিয়ে দিতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে থাকে। কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও কবি রবীন্দ্রনাথসহ সকল হিন্দু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তাদের দাবীর ব্যাপারে অনড় ছিলেন।

এদিকে, 'বন্দে মাতরম' ও 'শ্রীপদ্ম'-কে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে চরম বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শ্রীপদ্ম' অংকিত মনোগ্রামকে পাঠ্য-পুস্তক ও কাগজ-পত্রে ব্যবহৃত হতে দেখে মুসলিম ছাত্ররা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হয় ও প্রতিবাদ করতে থাকে। এ সময় আকরম খাঁর পত্রিকা মাসিক ও সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে 'শ্রীপদ্ম' মনোগ্রাম ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদসূচক নিবন্ধ লেখা হয়। 'শ্রী' হিন্দুদের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী 'সরস্বতী' এবং 'পদ্ম'-কে তার আসন হিসাবে মনে করা হয়। এ পৌত্তলিক ভাবধারার মনোগ্রাম কখনো কোন মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না, এটা তাদের ঈমান ও আকীদার খেলাপ। মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ তাঁর বিভিন্ন লেখায় এ সম্পর্কে অকাট্য যুক্তিসহ তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেন এবং মুসলমান সমাজ দৃঢ়ভাবে তাঁর পক্ষ সমর্থন করে। কবি রবীন্দ্রনাথসহ অনেকেই 'বন্দে মাতরম' অর্থে দেশ মাতৃকা ও 'শ্রীপদ্ম' অর্থে বাংলাদেশের একটি বিশেষ ফুল বলে ব্যাখ্যা দিলেও মুসলমান সমাজ তা গ্রহণ করেনি। এ আন্দোলনের ফলে দীর্ঘকাল থেকে মুসলমানদের নামের আগে হিন্দুরা ইচ্ছাকৃতভাবে যে 'শ্রী' শব্দ ব্যবহার করতো, মুসলমানরা সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ঐ সময় থেকে তারা নামের আগে 'শ্রী'র পরিবর্তে ব্যাপকভাবে 'জনাব', 'মৌলভী' ইত্যাদি ব্যবহার শুরু করে। এটা ছিল মুসলমানদের এক ধরনের সাংস্কৃতিক সচেতনতা। এ সচেতনতা থেকেই মুসলমানদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ দৃঢ়বদ্ধ হয় এবং পাকিস্তান আন্দোলনেও তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আকরম খাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি সদ্য স্বাধীন মুসলিম দেশকে একটি খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

১৯৩৬ সনে মুসলিম লীগে যোগদান করার পর মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। ঐ সময় থেকে তিনি

www.nagorikpathagar.org

সর্বতোভাবে মুসলিম লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফলে ১৯৩৭ সনে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ঐ সময় তিনি নিখিল ভারত মুসলিম লীগের কেন্দ্রিয় কমিটিরও সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন সংস্কার আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে'র সদস্য পদে নির্বাচিত হন। এভাবে, মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে দীর্ঘকাল তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের খেদমত করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গিত করেন। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রায় অর্ধ-যুগ পর্যন্ত তিনি মুসলিম লীগের নেতা হিসাবে শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৪ সনে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু তারপরও তাঁর 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা ও 'মাসিক মোহাম্মদী'র মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ইসলামী দাবী-দাওয়ার সপক্ষে কাজ চালিয়ে যান।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকার মাধ্যমে এবং আজাদের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে তিনি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৯ সনে তৃতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে বাঙালি মুসলমানরা বাংলা ভাষার প্রশ্নে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেন। উক্ত সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ

"দুনিয়ায় অনেক রকমের অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা কী ? উর্দু না বাংলা ? এ প্রশ্নটা সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত।– বঙ্গ মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায়ই তাহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে।" **(মুহম্মদ মতিউর রহমান ঃ বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৩৫)।**

১৯৩৭ সনে মাওলানা আকরম খাঁ বাংলা ভাষার প্রশ্নে আবার তাঁর সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ সময় দৈনিক আজাদেও সম্পাদকীয় কলামে তিনি লেখেন ঃ "সাহিত্যের মধ্যেও বাংলা সমস্ত প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাংলা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশি। অতএব বাংলা সবদিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা ভাষার চেয়ে হিন্দীর যোগ্যতা কোন দিক দিয়াই বেশি নহে।" **(পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫)।**

১৯৪৮ সনের ২৩ ফেব্রুয়ারি 'পাকিস্তান গণ-পরিষদে'র প্রথম অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরাজির পাশাপাশি

www.nagorikpathagar.org

বাংলাকেও গণ-পরিষদের অন্যতম ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার দাবী জানান। কিন্তু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খাঁ এর বিরোধিতা করেন। তাঁর সমর্থনে পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বলেন ঃ "পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসীই চায় যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।"

আকরম খাঁ এর তীব্র প্রতিবাদ করে 'দৈনিক আজাদে' সম্পাদকীয় লেখেন ঃ "খাজা সাহেব কবে রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের গণভোট গ্রহণ করিলেন, তাহা আমরা জানি না। ... আমরা বিশ্বাস করি গণভোট গ্রহণ করিলে বাংলা ভাষার পক্ষে শতকরা ৯৯ ভোটের বড় কম হইবে না। এ অবস্থায় এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি এইরূপ একটি দায়িত্বহীন উক্তি করিয়া শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মৌলিক স্বার্থকেই ক্ষতি করেন নাই, এ দেশবাসীর পক্ষে আপন প্রতিনিধিত্বের অধিকারের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ন করিয়াছেন।" **(দৈনিক আজাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮)।**

আকরম খাঁ তৎকালীন 'পাকিস্তান গণ-পরিষদ' ও 'তালীমাতে ইসলামিয়া বোর্ডে'র সদস্য ছিলেন। জেনারেল আইয়ুব খাঁর সামরিক শাসনামলে সরকার তাঁকে ইসলামী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত করেন। ঐ সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার অভিযোগে মাওলানা আকরম খাঁ তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং প্রায় আশি বছর বয়সে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে, সারা জীবন তিনি দেশ, জাতি, জনগণ ও ইসলামের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখে ১৯৬৮ সনে তিনি ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব। দেশ-জাতি ও জনগণের কল্যাণে তিনি সর্বদা কাজ করেছেন। ইসলামের প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট ছিল প্রশ্নাতীত। তিনি যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসন মেনে চলার পক্ষপাতী ছিলেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে আকরম খাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নরূপঃ 'কোরান শরীফ' (অনুবাদ ১৯০৫), 'যীশু কি নিষ্পাপ' (১৯১৫), 'এসলাম দর্শন' (১৯১৭), 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার রিপোর্ট '(১৯১৩, ১৯১৮), 'কোরআন শরীফ 'আমপারা' (১৯২৪), 'মোস্তফা চরিত' (১৯২৫), 'উম্মুল কেতাব' (১৯২৯), 'সমস্যা ও সমাধান' (১৯৩১), 'মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্বাচন', 'মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য' (১৯৩২), 'পাকিস্তাননামা বা নয়া রাহে নাজাত' (১৯৪৩), 'তাফসীরুল কোরান' (১৯৫৯), 'বাইবেল নির্দেশ ও প্রচলিত খ্রিস্টান ধর্ম' (১৯৬২), 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫) ইত্যাদি।

www.nagorikpathagar.org

'মোস্তফা চরিত' রাসূলুল্লাহর (স) জীবনী গ্রন্থ। বাংলা ভাষায় রচিত সীরাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ এবং নানা কারণে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। এর ভাষা, সংগৃহীত তত্ত্ব-তথ্য ও বিবরণ অত্যন্ত হৃদয়-গ্রাহী। তবে দু'একটি ক্ষেত্রে বিতর্কমূলক বিষয় স্থান লাভ করায় অনেকে এ গ্রন্থটির কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর রচিত 'তাফসিরুল কোরআন' সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় রচিত কোরআনের তাফসীর গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে এক অনন্য গ্রন্থ। এর ভাষা উন্নত ও সাহিত্য-গুণসম্পন্ন, আরবি ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা থাকার কারণে তাঁর অনুবাদও হয়েছে অত্যন্ত স্বচ্ছ, সুন্দর, সাবলীল ও মূলানুগ। কিন্তু ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রে দু'একটি স্থানে তাঁর চিন্তার সাথে অধিকাংশ আলেম একমত হতে পারেন নি। ফলে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে অনেকেই এর তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মননশীল রচনায় মৌলিকতার পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর মতের সাথে সকলে একমত হতে পারেন নি। ফলে কিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এ দু'একটি মতদ্বৈততার বিষয় বাদ দিলে এ তাফসীর গ্রন্থটির গুরুত্ব অপরিসীম।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর রচিত 'মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ইতিহাস, বাঙালি মুসলমানের সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা, তাদের অধঃপতন ও উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক গভীর ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে। বাংলাদেশে মুসলমানদের সামাজিক ইতিহাস জানার জন্য এ গ্রন্থটি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যেও ঐতিহাসিক বিষয়, সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যা বিশেষত মুসলিম সমাজের দুরবস্থার কারণ অনুসন্ধান করে তা দূরীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তাঁর ইসলাম-বিষয়ক রচনাবলী গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বের পরিচায়ক। মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তাদেরকে নব-জাগরণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে তিনি লেখনি পরিচালনা করেন। তাঁর লেখায় এর পরিচয় সুস্পষ্ট।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একাধারে বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। এছাড়া ইংরাজি ভাষায়ও তাঁর মোটামুটি দখল ছিল। মাদ্‌রাসায় বাংলা ভাষা শেখার সুযোগ না পেলেও, নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা ভাষার চর্চা করে এক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। এটা তাঁর অসাধারণ প্রতিভারই পরিচয় বহন করে। তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন শুধু তাই নয়, বাংলা গদ্যের তিনি ছিলেন এক অনন্যসাধারণ শিল্পী। তাঁর ভাষা সাবলীল, প্রাঞ্জল ও অলংকারবহুল, তবে কিছুটা সংস্কৃতানুগ। তিনি একজন আলেম এবং আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বাংলা ভাষা

www.nagorikpathagar.org

অনেকটা সংস্কৃতানুগ ও ক্লাসিক-ধর্মী। ফলে তা যেমন ওজস্বিতা সম্পন্ন, তেমনি অলংকার বহুল ও কাব্য-গুণ মণ্ডিত।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ একাধারে ছিলেন রাজনীতিবিদ, ধর্মীয় নেতা, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমাজ-সংস্কারক। এসব ক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা ছিল পথিকৃতের। তবে তাঁর সকল কর্ম-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের নবজাগরণ ও উন্নয়ন। তিনি ছিলেন একজন যুক্তিবাদী। যুক্তির সাথে গভীর পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা তাঁকে এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল। তিনি একজন আলেম হলেও অনেকের মতো গোঁড়া বা পশ্চাৎমুখী ছিলেন না। প্রাগ্রসর চিন্তা ও আধুনিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তাই তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত ছিলেন। সমকালীন সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হলেও পরবর্তীতে এটা উপলব্ধি করেন যে, কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থেকে কখনো মুসলিম সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে এ উপলব্ধি আসার সাথে সাথে তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করে ১৯০৬ সনে গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশের একমাত্র মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগে' যোগদান করেন। মুসলিম লীগে যোগদান করার পরই তাঁকে অবিভক্ত বাংলার 'মুসলিম লীগের' সভাপতি নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর নেতৃত্বে অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম লীগ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পাকিস্তান আন্দোলনও জোরদার হয়। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৩৭ সনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে বাংলায় মুসলিম লীগ বিশেষ সাফল্য অর্জন করে।

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁকে মুসলিম বাংলার 'সাংবাদিকতার জনক' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যেরও একজন কালজয়ী অমর প্রতিভা। ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, সমাজিক উন্নয়ন ও মুসলিম বাংলার নব-জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক জাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবি আদায়, ধর্মীয় চেতনার পুনর্গঠন, সাংবাদিকতা জগতের পুরোধা ব্যক্তি এবং বাংলা গদ্য সাহিত্যের এক অনবদ্য কালজয়ী লেখক হিসাবে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ জাতীয় ইতিহাসের এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হিসাবে চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণের সূচনা। এ নবজাগরণের প্রধান প্রাণ-পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। ঐ সময় বাঙালি হিন্দুর নবজাগরণে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন, তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর (১৮১৪-৮৩), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-৯৬), মাইকেল মধুসুধন দত্ত (১৮২৪-৭৩), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৪), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নানা কারণে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ শুরু হয় অনেক পরে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্থে। বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের মূলে যাঁদের বিশেষ অবদান ছিল তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন- মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মোহাম্মদ কাজেম আলী কোরেশী ওরফে কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), শেখ আব্দুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), শেখ রেয়াজ অল দীন মাশ্‌হাদী (১৮৬০-১৯১৯), কবি মোজ্জামেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মওলানা মনিরুজ্জামন ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৯), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭৯-১৯৫৩) সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩),প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ।

www.nagorikpathagar.org

বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণের অন্যতম প্রধান প্রাণ-পুরুষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই আগস্ট সিরাজগঞ্জ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, লেখক, গীতিকার, সাংবাদিক, পর্যটক ও সর্বোপরি একজন অনন্যসাধারণ বাগ্মী। জন্মের পর নানা বাবু খান ও নানী গোলাপ বানু তাঁর নাম রাখেন যথাক্রমে 'রুস্তম' ও 'সেরাজুদ্দীন'। কিন্তু মা নূরজাহান খানম প্রদত্ত 'ইসমাইল হোসেন' নামেই তিনি পরবর্তীতে পরিচিত হন।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে ছয় বছর বয়সে নানার বাড়ির অদূরে সাহেবউদ্দীন পণ্ডিতের পাঠশালায় তাঁর বিসমিল্লাহখানি হয়। পাঠশালার পাঠ খতম করে তিনি সিরাজগঞ্জ শহরের জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। ঐ সময়েই তাঁর কবিতা লেখায় হাতেখড়ি এবং স্কুলের বিতর্ক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেবার এবং রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে লেখালেখি শুরু করেন।

মাইনর স্কুলের শিক্ষা শেষ করে শিরাজী সিরাজগঞ্জ বনোয়ারীলাল হাইস্কুলে (B. L High School) সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ঐ সময় রেয়াজউদ্দিন মাশহাদীর লেখা 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থটি পড়ে তিনি বিশ্ববিখ্যাত প্যান ইসলামী আন্দোলনের নেতা প্রাচ্যের অগ্নি-পুরুষ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী সম্পর্কে অবগত হয়ে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। এরপর তাঁর ধারণা হয় যে, আফগানীর মত আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হলে তাঁকে দেশত্যাগ করতে হবে। অতঃপর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে তিনি তুরস্কে যাবার সংকল্প নিয়ে গোপনে গৃহত্যাগ করে কলকাতা রওয়ানা হন। কলকাতায় ৯নং কড়েয়া গোরস্তান লেনে 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকার অফিসে সম্পাদক রেয়াজউদ্দীন আহমদের নিকট তাঁর সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তুরস্কে যাবার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় শিরাজী ৪২ দিন কলকাতা অবস্থানের পর বাড়ি ফিরে পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন।

শিরাজী যখন বি এল স্কুলে নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন বাংলার তৎকালীন প্রখ্যাত ইসলাম-প্রচারক, সমাজ-সংস্কারক, লেখক ও বাগ্মী মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা সিরাজগঞ্জের বড়ইতলা মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করেন। সে সভায় তরুণ শিরাজী তাঁর লেখা 'অনল-প্রবাহ' কবিতা আবৃত্তি করেন। দরাজ কণ্ঠে ওজস্বিতাপূর্ণ কবিতা পাঠ শুনে মুনসী মেহেরউল্লা মুগ্ধ হন এবং নিজ ব্যয়ে তিনি বাংলা ১৩০৬ সনে উক্ত কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। এরপর ১৩০৬-০৭ সনে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় যথাক্রমে তাঁর লেখা 'কাজীর

বিচার','মালাবারে ইসলাম-প্রচার', 'আইয়ুব নবীর স্ত্রী', 'সুলতান মাহমুদ' ইত্যাদি প্রবন্ধ এবং 'শোকোচ্ছ্বাস', 'অতীত-কাহিনী', 'উদ্‌গাথা', 'শোক-লহরী', 'আবর','আশুরা', 'চোখ গেল' ইত্যাদি কবিতা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩০৭ সনে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাসহ মোট ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' কাব্য প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের অগ্নিঝরা বাণী, ভাব ও ভাষার ওজস্বিতা অবিভক্ত বাংলায় ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কবি হিসাবে শিরাজী সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৩১১ সনে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় সিরজীর লেখা 'মহাশিক্ষা' মহাকাব্যের 'বন্দনা' অংশ ও 'মন্ত্রণা' নামক প্রথম সর্গ প্রকাশিত হয়। ১৩১৪ সনে তাঁর রচিত 'বোধন-গীতি', 'নব-উদ্দীপনা' নামে তিনটি কাব্য প্রকাশিত হয়। প্রথম দুটির মূল প্রেরণা হলো স্বাধীনতা, দেশাত্মবোধ ও মানবতা। তৃতীয় কাব্যটি প্রখ্যাত উর্দু কবি হালীর মুসাদ্দাসে হালীর অনুকরণে রচিত জাতীয় কাব্য। এতে মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরবোজ্জ্বল বিষয়ের উল্লেখ করে বর্তমান মুসলিম জাতির প্রতি জাগরণের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

১৩১৫ সনে (১৯০৮) 'অনল-প্রবাহ' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হলে পরবর্তী বছর সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে লেখককে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলে শিরাজী আত্মগোপন করেন। ঐ সময় তিনি ভারতের ফরাসী-অধিকৃত চন্দননগরে গিয়ে আট মাস অতিবাহিত করেন। তাঁকে ধরার জন্য বৃটিশ সরকার ৫০০/- টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু সরকারের সকল তৎপরতা ব্যর্থ করে তিনি আত্মগোপনে থেকে তাঁর 'মহাশিক্ষা' মহাকাব্য রচনার কাজ সমাপ্ত করেন ১৩১৭ সনের ২১ আষাঢ় তারিখে। অতঃপর তিনি কলকাতায় এসে আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জি। কিন্তু আদালত তাঁর 'অনল-প্রবাহ' কাব্যে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তাঁকে দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করে। অর্থাভাবে তিনি উচ্চ আদালতে আপীল করতে পারেননি। দীর্ঘ কারাভোগের পর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাঁর 'কারা-কাহিনী' পরবর্তীতে মাসিক 'সাধনা' পত্রিকায় ধারাবাহিকতভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৮ অক্টোবর 'বলকান যুদ্ধ' শুরু হয়। রাশিয়া ও বৃটেনের প্ররোচণায় বলকান শক্তিপুঞ্জ মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্ক আক্রমণ করে। যুদ্ধে তুরস্ককে সাহায্য করার জন্য 'অল ইন্ডিয়া মেডিক্যাল মিশনে'র সদস্য হয়ে শিরাজী ২

www.nagorikpathagar.org

ডিসেম্বর সিরাজগঞ্জ থেকে রওয়ানা হয়ে বম্বে (মুম্বাই) যান। সেখান থেকে জাহাজযোগে সমুদ্র পথে তিনি ২৭ ডিসেম্বর মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে ৩১ ডিসেম্বর তুরস্কের কনস্টান্টিনোপলে পৌছেন।

যুদ্ধের পর তিনি দেশে ফিরে তাঁর সফর-অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে ১৯১৩ সনে 'তুরস্ক-ভ্রমণ' গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তাঁর সফরের বর্ণনা, বলকানদের অত্যাচার, তুর্কীবাহনীর বিপর্যয়, রণক্ষেত্রের বিবরণ, নব্য তুর্কীদের উত্থান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেন। এরপর তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় এবং সাহিত্য চর্চায় পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৪ সনের সেপ্টেম্বরে তাঁর 'স্পেন-বিজয়' কাব্য প্রকাশিত হয়। এটি একটি ঐতিহাসিক কাব্য। মুসলমানগণ একসময় সুদীর্ঘ সাতশ' বছর স্পেনে রাজত্ব করেন। মুসলমানদের গৌরব যুগে সেনাপতি তারেকের নেতৃত্বে মুসলমানদের স্পেন বিজয়, মুসলিম আমলে স্পেনের উন্নতি, খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রের ফলে মুসলমানদের পতন, এবং তাদের নিশ্চিহ্ন হবার মর্মান্তিক কাহিনী এতে ওজস্বিতাপূর্ণ, অলংকারময়, কাব্যিক ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। একাব্যের বর্ণনায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাথ বধ কাব্যে'র বর্ণনার মিল লক্ষ্য করা যায়।

১৯১৫ সনে শিরাজীর 'সঙ্গীত-সঞ্জীবনী প্রকাশিত হয়। এতে ৩৩টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯১৬ সনে তাঁর আরেকটি গানের সংকলন 'প্রেমাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। এতে ১২৮টি গীতিকবিতা স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি অনুসারে তিনি প্রেমাঞ্জলি লেখেন। তাঁর আগে মুসলমান কবিদের মধ্যে মুনসী মেহেরউল্লা গান লিখে ও জনসমাবেশে তা গেয়ে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

পূর্বসুরি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন উপনাসে চরম মুসলিম-বিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা লক্ষ্য করে শিরাজী সংক্ষুব্ধ হন। তিনি বঙ্কিমের 'দুর্গেশ নন্দিনী' উপন্যাসের জবাব হিসাবে 'রায়-নন্দিনী' উপন্যাস লেখেন। এর পর যথাক্রমে তিনি 'তারাবাঈ' 'ফিরোজা বেগম' ও 'নুরুদ্দীন উপন্যাস লেখেন। তাঁর এসব উপন্যাসে স্বসমাজ ও স্বদেশপ্রীতি ও ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাঁর উপন্যাসের ভাষাও বঙ্কিমানুগ, অলংকারবহুল ও ওজস্বিতাপূর্ণ।

শিরাজীর গদ্য রচনার মধ্যে 'স্ত্রী শিক্ষা', 'তুরস্ক-ভ্রমণ' 'তুর্কী নারী জীবন', 'আদব-কায়দা শিক্ষা', 'সুচিন্তা', 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব গন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, অংলকারবহুল ও ভাবাবেগপূর্ণ।

www.nagorikpathagar.org

মাতৃভাষা বাঙলার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। তাঁর 'সুচিন্তা' গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি' প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখেছেনঃ "মাতৃভাষা ব্যতীত কোনো জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে নাই।... বাঙ্গালা না জানায় শুধু আরবী-ফারসি পড়া মৌলবী সাহেবদিগের সমাজের উপকার হওয়া দূরে থাকুক, অনুদিন ক্ষতি ও অবনতির মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছে।... বঙ্গভাষাকে হিন্দুর ভাষা মনে করিও না।...হে মাদ্রাসার তালেব-এলেমগণ! মাতৃভাষা বাঙ্গালাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে সযত্ন হও।"

শিরাজী সর্বমোট ৩২টি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁর জীবদ্দশায় পাঁচটি কাব্য, চারটি উপন্যাস, পাঁচটি প্রবন্ধ গ্রন্থ, একটি ভ্রমণ কাহিনী ও দুটি সঙ্গীত গ্রন্থসহ মোট সতেরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জনৈক গবেষকের মতে, "গত শতকের ষাটের দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে দেশের উল্লেখযোগ্য মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর রচনাবলি প্রকাশের উদ্যোগ গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রখ্যাত নেতা, কবি ও লেখক সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা শিরাজী ও কনিষ্ঠ জামাতা কবি ইজাব উদ্দীন আহমদ শিরাজীর সব প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা একত্র করে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডে জমা দেন। বোর্ড বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪)-কে তা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে। এ প্রক্রিয়ায় (১৯৬৭ সালে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে আব্দুল কাদিরের সম্পাদনায় শিরাজীর চারটি উপন্যাসের সমন্বয়ে 'শিরাজী রচনাবলী' উপন্যাস খণ্ড প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬৯ সালে 'মহাশিক্ষা কাব্য' প্রথম খণ্ড ও ১৯৭১ সালে 'মহাশিক্ষা কাব্য' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের কিছু দিন পর কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড ও বাংলা একাডেমী উভয়ে মিলে বাংলা একাডেমী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর শিরাজীর রচনাবলির আর কোনো খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। তখন অবস্থাদৃষ্টে এটাই উপলব্ধি হয়েছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশে শিরাজী ও তার সাহিত্যকর্ম প্রকাশকে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যক মনে করেছে। এ রকম পরিস্থিতিতে জমা দেয়া শিরাজীর রচনাবলীর অপ্রকাশিত বাকি পাণ্ডুলিপি যেমন তার পরিবারকে ফেরত দেয়া হয়নি তেমনি সেগুলোর কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি। ফলে জাতি চিরদিনের জন্য শিরাজীর সাহিত্যের বেশির ভাগ অংশের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পরে ২০০৩ সালে বাংলা একাডেমী ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'শিরাজী রচনাবলী' উপন্যাস খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

পুনঃপ্রকাশ করে। কিন্তু তার 'মহাশিক্ষা কাব্য' পুনঃপ্রকাশ করেনি। অন্যদিকে শিরাজীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ইংরেজ শাসনের বাকি সময়ে তা আর আলোর মুখ দেখেনি। পাকিস্তান আমলে ১৯৫১ সালে এ বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রত্যাহার করার পর ১৯৫৩ সালে এটি পুনরায় প্রকাশ লাভ করে। এর দীর্ঘ ২৭ বছর পর ১৯৮০ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে 'অনল প্রবাহ' আবার প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৯২ ও ২০০৪ সালে তা পুনর্মুদ্রণ করা হয়। মোট কথা শিরাজীর সমগ্র রচনার মধ্যে তার চারটি উপন্যাস ও একটি কাব্য ছাড়া আর কোনো গ্রন্থের দেখা এখন পাওয়া যায় না।" **(হোসেন মাহমুদঃ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২০ জুলাই, ২০১২)**।

সাংবাদিক হিসাবেও শিরাজীর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৯ সনে তিনি মাসিক 'নূর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এতে কাজী নজরুল ইসলামের 'মেহের-নিগার', 'ঘুমের ঘোরে' ও 'রিক্তের বেদন' ছোট গল্পসমূহ প্রকাশিত হয়। শিরাজীর মহাকাব্য 'মহাশিক্ষার' ও কয়েকটি সর্গ ধারাবাহিকভাবে এতে প্রকাশিত হয়। ১৯২৩ সনে মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর যৌথ সম্পাদনায় নবপর্যায় সপ্তাহিক 'ছোলতান' প্রকাশিত হয়। এতে শিরাজীর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। প্রবন্ধগুলিতে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সহ মুসলিম সমাজের উন্নতি-অগ্রগতি সম্পর্কিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থান লাভ করে।

ইসমাইল হোসেন শিরাজী একাধারে কবি ও অনবদ্য গদ্য লেখক। বাংলা কবিতার বিভিন্ন আঙ্গিক যথা-গীতিকবিতা, মহাকাব্য, গান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি যেমন উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তেমনি বাংলা গদ্যের নানা আঙ্গিক অর্থাৎ উপন্যাস, প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অননসাধারণ অবদান বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সুসমৃদ্ধ করেছে। তাঁর ভাষা সংস্কৃতানুগ, প্রাঞ্জল, অলংকারবহুল ও ওজস্বিতাপূর্ণ। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি কামনা করেছেন। সমকালিন বিশিষ্ট মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও সমাজনেতাদের সংস্পর্শে এসে এবং তাদের সহযোগে তিনি সমাজ উন্নয়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদি দূরীকরণে বিশেষত নারী শিক্ষার প্রবর্তনে তিনি নানাভাবে সচেষ্ঠ ছিলেন। অধঃপতিত মুসলিম জাতির উন্নয়নে, সর্বপরি পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে স্বাধীন জাতি গড়ার স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি সাহিত্য রচনা

www.nagorikpathagar.org

করেছেন, বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এমনকি, ইংরাজ-বিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি সুদূর তুরস্কে গমণ করেছেন। তিনি বলিষ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন–

আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া...।

মুসলিম নবজগারণের জন্য তিনি যেমন উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি স্বাধীনতার তূর্যবাদক হিসাবেও তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছেন–

বিনা জলে তরুলতা হয়না বর্ধিত
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত...।

এ জন্য শিরাজী-গবেষক ডক্টর বদিউজ্জামান বলেছেন, 'শিরাজীর সাহিত্য ও জীবনের অন্যতম মূল সুর এই স্বাধীনতা।

ইসলমাইল হোসেন শিরাজী ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি মুসলিম সমাজকে জাগাবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। জাতীয় জাগরণের অন্যতম নকীব হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ছিলেন যথার্থই মুসলিম নবজাগরণের পথিকৃৎ। ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই এ মহান কর্মবীরের জীবনাবসান ঘটে। সিরাগঞ্জ শহরে নিজ বাড়ি 'বাণীকুঞ্জে' তাঁর কবর রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ও মা রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী।

তৎকালীন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে শৈশবে নিজ গৃহে রোকেয়া ও তাঁর বোনদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা হয়। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তখন আরবি ও উর্দু ভাষা শিক্ষাদানের রেওয়াজ ছিল। সে অনুযায়ী রোকেয়া নিজগৃহে আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষা রপ্ত করেন। এছাড়া, রোকেয়ার বড় ভাই ইব্রাহীম সাবেরের অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে এবং রোকেয়ার একান্ত আগ্রহে তিনি নিজ গৃহে গোপনে বাংলা ও ইংরাজি ভাষা শেখেন। এভাবে বাল্যকালে পারিবারিক পরিবেশে বেগম রোকেয়া বেশ কয়েকটি ভাষা শেখার সাথে সাথে জ্ঞান চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। এছাড়া, বিভিন্ন বিষয়ে লেখা পুস্তকাদি অধ্যয়ন করে তিনি জ্ঞানানুশীলন অব্যাহত রাখেন।

সেকালে শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ছিল। বিশেষত মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল। উপরন্তু নানা অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মুসলিম সমাজ তখন অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। নিজে শিক্ষা-দীক্ষা লাভের সাথে সাথে স্বসমাজের বিশেষত অধঃপতিত ও অশিক্ষিত মুসলিম নারী সমাজের দুরবস্থা দূরীকরণে বেগম রোকেয়া অল্প বয়স থেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক কারণে তখন তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। অল্প বয়সে বিয়ের পর শিক্ষিত ও সমাজমনস্ক স্বামীর সাহচর্যে তিনি তাঁর এ সুপ্ত বাসনা পরিপূরণের যথাযথ সুযোগ লাভ করেন।

১৮৯৬ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে রোকেয়ার বিয়ে হয় ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। তাঁর স্বামী ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ইংরাজি জানা আধুনিকমনস্ক উদার মানুষ।

www.nagorikpathagar.org

বিয়ের পর রোকেয়াকে তিনি পড়াশোনা ও লেখালেখিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তাঁর উৎসাহে রোকেয়া পড়াশোনার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। ১৯২০ সালে 'পিপাসা' শিরোনামে একটি গল্পের মাধ্যমে সাহিত্যজগতে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি। এরপর তিনি তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'Sultana's Dream' (যার অনূদিত রূপের নাম 'সুলতানার স্বপ্ন') রচিত হয়। এটি মূলত রোকেয়ার জীবন-স্বপ্নেরই বাস্তব প্রতিফলন। তিনি যেভাবে নারী জাতির উন্নতি প্রত্যাশা করেছেন, সে প্রত্যাশারই রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে তাঁর এ গ্রন্থে। রোকেয়ার এ স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ছিল সুদূর-প্রসারী। তাঁর এ স্বপ্ন ও প্রত্যাশা কালক্রমে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করে। বেগম রোকেয়ার রচিত অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো- পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী ও মতিচুর। 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে নারীর দুঃখদুর্দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। 'পদ্মরাগ' ও 'মতিচুর' তাঁর রচিত দুটি উপন্যাস। প্রখ্যাত সাহিত্যিক কাজী আব্দুল ওদুদ তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, প্রসঙ্গত এখানে তা উদ্ধৃত হলো। তিনি বলেন, "মিসেস আর এস হোসেনের প্রতিভা একালের ভগ্নহৃদয় মুসলমানের জন্য যেন এক দৈব আশ্বাস। নিবাত নিষ্কম্প মুসলমান অন্তঃপুরে যদি এহেন বুদ্ধির দীপ্তি, মার্জিত রুচি,আত্মনির্ভরতা ও লিপিকুশলতার জন্ম হয় তবে আজো ভয় কেন বাংলার মুসলমানের ঘোচে না।"

বেগম রোকেয়া প্রবন্ধ, গল্প ও উপন্যাসের মধ্য দিয়ে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও নারী জাতির মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরেন। তিনি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার ফলে এবং বাল্যকাল থেকে কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন করে এটা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি। নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূরক, কেউ কারো প্রতিপক্ষ নয়, উভয়ের মানবিক মর্যাদা ও অধিকার সমান। উভয়ের সমঅধিকার ও সমউন্নয়নের দ্বারাই সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। তাই তাঁর বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে তিনি সাধারণভাবে শিক্ষার উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তেমনি বিশেষভাবে নারীশিক্ষা ও নারীর সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজে ভারসাম্য সৃষ্টি করে সমাজের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব বলে প্রত্যাশা করেছেন। এছাড়া, তৎকালিন পরাধীন যুগে মুসলিম সমাজে বিদ্যমান অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নানারূপ কুসংস্কার এবং কুপ্রথার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া তাঁর লেখনি পরিচালনা করেন। বিভিন্ন হাস্যরস আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সাহায্যে তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর অসম

www.nagorikpathagar.org

অবস্থান তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন সংস্কারবাদী সাহসী মহিলা। এজন্য ইতিহাসে তিনি নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

১৯০৯ সালে বেগম রোকেয়ার স্বামী ও তাঁর স্বপ্নপূরণের একান্ত সহযোগী সাখাওয়াত হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর বেগম রোকেয়া স্বামীর স্মৃতিকে ধারণ করে ভাগলপুরে 'রোকেয়া সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নামে মেয়েদের একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন । ১৯১০ সালে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধের ফলে স্কুলটি আকস্মিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বেগম রোকেয়া কলকাতায় চলে যান। সেখানে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ তিনি 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' নতুনভাবে চালু করেন। স্কুলে প্রাথমিক অবস্থায় ছাত্রী ছিল মাত্র আটজন। চার বছরের মধ্যে বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তা বেড়ে দাঁড়ায় ৮৪ জনে। ১৯৩০-এর মধ্যে এটি হাইস্কুলে পরিণত হয়। স্কুল পরিচালনা ও সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রোখেয়া নিজেকে সাংগঠনিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত রাখেন। ১৯১৬ সালে তিনি মুসলিম বাঙালি নারীদের সংগঠন 'আঞ্জুমানের খাওয়াতিনে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বরে তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি এ প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত থেকে নারী উন্নয়নে বিভিন্ন গঠনমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।

নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে পরিচিত বেগম রোকেয়া সার্বিকভাবে নারী জাতির উন্নয়ন কামনা করেছেন। সমাজে বিদ্যমান অশিক্ষা, সামাজিক চেতনার অভাব, নানা কুসংস্কার, কুপ্রথা ও কুধারণার বশবর্তী মুসলিম সমাজ তখন অধঃপতনের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। এ অবস্থার হাত থেকে নারী জাতিকে উন্নতির পথে অগ্রসর করার জন্য তিনি একদিকে যেমন নারী শিক্ষার প্রচলনে ব্যাপকভাবে আত্মনিয়োগ করেন, অন্যদিকে তেমনি নানারূপ কুসংস্কার ও কুপ্রথার বিরুদ্ধেও ব্যাপক গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস পান। প্রধানত লেখনির মাধ্যমেই তিনি জাগরণের বাণী ছড়িয়ে দেন। এ সম্পর্কে কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি উক্তি স্মরণীয়। তিনি বলেন–

"বেগম রোকিয়া (১৮৮০-১৯৩২) লেখিকা হিসাবে বিংশ শতাব্দীর সমবয়সী, এবং চৈতন্যেও তিনি বিংশ শতাব্দীর সন্তান। বুদ্ধিজীবী, লেখিকা ও কর্মী-এই তিন রূপে তাঁর বিকাশ। আবার তাঁর প্রতিভার তাবৎ বিচ্ছুরণ এ একটিই জ্যোতিষ্মান কেন্দ্র থেকে, কিংবা তারা পরস্পরে মধ্যে প্রবিষ্ট ও

www.nagorikpathagar.org

ওতপ্রোত। বাঙালি জাতি, বাঙালি-মুসলমান, নারীশিক্ষা, নারীজাগরণ–তাঁর ভাবনাশীলতা এইসব কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, সংস্থা প্রতিষ্ঠা-এইসব তাঁর কর্মের পরিধি। লেখিকা হিসাবে চিন্তাবাহী গদ্যই তাঁর প্রধান মাধ্যম। গল্প, কবিতা, নকশা ও উপন্যাসের মধ্য দিয়েও তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সেই সবের ভিতরে একটি উৎকাঙ্খাই তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছে– নারীজাগরণ তথা সমাজহিত। ১৯০৪-৩২, এই আটাশ বছর ছিল বেগম রোকেয়ার সাহিত্য চর্চার কাল। তাঁর প্রথম প্রবন্ধ 'নিরীহ বাঙ্গালী' (১৩১০ শালে প্রথম প্রকাশিত), শেষ প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার' (তাঁর মৃত্যুর পরে ছাপা হয়েছে)।...তাঁর প্রথম পর্যায়ের দুটি প্রবন্ধঃ 'বোরকা' (প্রথম প্রকাশঃ 'নবনূর-বৈশাখ ১৩১১) ও 'আমাদের অবনিত' (প্রথম প্রকাশ 'নবনূর', ভাদ্র ১৩১১)। দুটি প্রবন্ধই 'মতিচূর' প্রথম খণ্ডের (১৯০৫) অন্তর্ভূক্ত হয়। তবে দ্বিতীয় প্রবন্ধটির নাম হয় 'স্ত্রীজাতির অবনতি' এবং তার পাঁচটি পরিচ্ছেদ বর্জিত হয়।" **(আব্দুল মান্নান সৈয়দঃ 'বেগম রোকেয়ার অন্তঃপরিবর্তন', পুনর্বিবেচনা, পৃষ্ঠা-৭)।**

পর্দা প্রথার নামে তখন মুসলিম নারীদেরকে গৃহবন্দী করে রাখা হতো। তিনি এর বিরোধী ছিলেন। তাঁর রচিত 'অবরোধ বাসিনী' গ্রন্থে তিনি নারী জাতিকে এ বন্দীত্বদশা থেকে মুক্ত করে নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে সমাজ উন্নয়নে সমঅংশীদার হবার আহ্বান জানিয়েছেন। তবে নারীকে বন্দীত্ব দশা থেকে মুক্ত করে তিনি নারীকে বেপর্দা করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি নারীর বন্দীত্ব দশার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন না। বরং তিনি ব্যাক্তিগত জীবনে পর্দা প্রথা মেনে চলতেন এবং অত্যন্ত শালীন ও মার্জিত রুচির অধিকারী একজন মহীয়সী নারী ছিলেন। তিনি নারীকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তার মধ্যে সম্ভ্রমবোধ সৃষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হবার প্রেরণা যুগিয়েছেন।

তাঁর রচিত 'বোরকা' প্রবন্ধটিতে তিনি যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন, তা থেকে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করলে এ সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট হবে। উক্ত প্রবন্ধের একস্থানে তিনি বলেছেন– "আমাদের ত বিশ্বাস যে অবরোধের সহিত উন্নতির বেশী বিরোধ নাই।" অন্যত্র তিনি বলেন– "অবরোধ প্রথা স্বাভাবিক নহে, নৈতিক।" একস্থানে তিনি লিখেছেন–" মোটের উপর আমরা দেখিতে পাই সকল সভ্য জাতিদেরই কোন-না-কোন রূপ অবরোধ-প্রথা আছে। এই অবরোধ-প্রথা না থাকিলে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ কি থাকে? এমন পবিত্র অবরোধ প্রথাকে যিনি 'জঘন্য' বলেন তাঁহার কথার ভাব আমরা বুঝিতে অক্ষম।" তিনি আরো বলেন, "সভ্যতার সহিত অবরোধ প্রথার বিরোধ নাই। তবে সকল

www.nagorikpathagar.org

নিয়মেরই একটি সীমা আছে। এ দেশে আমাদের অবরোধ-প্রথাটা বেশী কঠোর হইয়া পড়িয়াছে। যেমন অবিবাহিতা বালিকাগণ স্ত্রীলোকের সহিতও পর্দা করিতে বাধ্য থাকেন। কখন কোন প্রতিবেশিনী আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে নবম বর্ষীয়া বালিকা প্রাঙ্গণ বাহির হয় না। এইভাবে সর্বদা গৃহকোণে বন্দিনী থাকায় তাহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়।...সম্প্রতি আমরা যে এমন নিস্তেজ, সংকীর্ণমনা ও ভীরু হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অবরোধে থাকার জন্য হয় নাই- শিক্ষার অভাবে হইয়াছে।" অবশেষে তিনি বলেছেন, "বোরকা জিনিসটা মোটের উপর মন্দ নহে।"

অথচ বেগম রোকেয়াকে আজ অনেকেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভুলভাবে ব্যাখা করে থাকেন। তিনি বোরকা বা পর্দা প্রথার বিরোধী ছিলেন না। বরং পর্দার নামে যারা নারী জাতিকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখেছে, তাদেরকে সমাজে মুক্ত আলো-হাওয়ায় স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও দুরবস্থার অন্ধকার দেয়ালের আড়ালে রেখে দিয়েছে, তিনি তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। পর্দা নারীর স্বাভাবিক ভূষণ এবং এটা সম্ভ্রম ও শালীনতার প্রতীক। বিপর্দা নারী পুরুষের লালসার শিকার। বেগম রোকেয়া এ লালসার শিকার থেকে নারী জাতিকে উদ্ধার করে পর্দার মধ্যে তার আত্ম-বিকাশের সুযোগ দানের সপক্ষে কথা বলেছেন।

সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারের মধ্যে যৌতুক প্রথা, পণপ্রথা, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি নানা অমানবিক প্রথা তৎকালে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বেগম রোকেয়া এসবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান। মূলত এসব প্রথা ইসলাম সমর্থন করে না। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম সমাজে এধরণের কুপ্রথার অনুপ্রবেশ ঘটে। ইসলাম যৌতুক ও পণপ্রথার ঘোর বিরোধী। বরং ইসলাম বিয়ের সময় নারীকে দেনমোহর প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে। কিন্তু মুসলিম সমাজে তখন দেনমোহরের পরিবর্তে কণে পক্ষকে যৌতুক, পণ ইত্যাদি প্রদান করতে হতো। একারণে কণ্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করতে হতো। অনেক সময় দরিদ্র পিতা টাকার অভাবে কণ্যাকে পাত্রস্থ করতে অক্ষম ছিলেন। এখনও মুসলিম সমাজে এধরণের কুপ্রথা অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত রয়েছে। বাল্যবিবাহও এক ধরণের কুপ্রথা। হিন্দু সমাজের অনুকরণে মুসলিম সমাজে এর অনুপ্রবেশ করে। এরদ্বারা মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে যেমন বঞ্চিত হয়, তেমনি অপরিণত বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণের ফলে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটে। এটা নারী জাতির জন্য এক চরম দুর্গতি।

www.nagorikpathagar.org

তাই বেগম রোকেয়া এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করেন। তাঁর এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার, কুপ্রথা ও কুঅভ্যাসের বিরুদ্ধে ছিল এক তুমুল প্রতিবাদ। তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে এ সম্পর্কিত দু' একটি উদ্ধৃতি দিলেই এটা স্পষ্ট হবেঃ

১. "কবে মুসলমান 'মানুষ' হইবে? রসনা পূজা ছাড়িয়া ঈশ্বর পূজা করিতে শিখিবে? জগতের অনেক জাতি জাগিয়া উঠিয়াছে, ভাল-মন্দ বুঝিয়াছে; কেবল ইহাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। এখনত আমাদের আর সে জরির মনসদ তাকিয়ে বা দুগ্ধফেননিভ শুভ্র কুসুম-কোমল 'শাহানা বিছানা' নাই, তবে নিদ্রা যাইতেছি কোন সুখে? ... পরিশেষে বলি, জীবন-ধারণের নিমিত্ত আহার করিতে হয়, খাইবার আশায় জীবন-ধারণ করা উচিত বোধ হয় না। ভরসা করি, এবার রমযান শরীফে আপনারা সাবধান থাকিবেন।" (**'রসনা-পূজা', 'নবনূর', অগ্রহায়ণ ১৩১১)**

২. "ঈদ-সমাগমে আজি আমাদের সে দুঃখ যামিনীর অবসান হউক। ঈদের বালার্কের সহিত আমাদের অন্ধকার হৃদয়ে নব-আশার নবনূর উদ্দীপ্ত হউক। সমষ্টির মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ পদদলিত হউক! বলিয়াছি ত, এবার আমরা একতা মসজিদে ফেলিয়া আসিব না। আমাদের এ মহাব্রতে ঈশ্বর সহায় হউন।" (**'ঈদ-সম্মিলন', 'নবনূর', পৌষ ১৩১২**)।

৩. "আজি ১০/১২ বৎসর হইতে দেখিতেছি, আমাদের মুসলমান সমাজে জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে-চারিদিকে বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, নানা প্রকার সভা সমিতি গঠিত হইয়াছে।... কিন্তু প্রকৃত মুক্তির দ্বার উদঘাটনের মন্ত্রটি, অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষার বিষয় ভুলিয়া ছিলেন দেখিয়া আমি মৃদু হাস্য করিতাম।... এখন মুসলমান সমাজ বুঝিয়াছেন, স্ত্রী শিক্ষা ব্যতীত এ অধঃপতিত সমাজের উন্নতির আশা নাই।" (**'সিসেম ফাঁক, 'সওগাত', অগ্রহায়ণ ১৩২৫**)।

৪. বেগম রোকেয়ার স্বপ্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল' প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' নামক লিখিত বক্তৃতায় তিনি বলেন– "এ স্কুলের উন্নতি কেন চাই? চাই নিজের সুখ্যাতি বাড়াবার জন্য নয়, স্মৃতি রক্ষার জন্য নয়, চাই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য।"

বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন নিষ্ঠাবতি মুসলিম। স্বসমাজের সমস্যা, অবনতি ও দূরবস্থার কথা চিন্তা করে তিনি সেগুলো সমাধানের মাধ্যমে স্বসমাজের উন্নতি ও জাগরণের জন্য মনে-প্রাণে কাজ করে গেছেন। লেখনি ও সমাজসেবার মাধ্যমে তিনি এসব কাজ আনজাম দিয়েছেন। স্বাজাত্যপ্রীতির ফলে তিনি কখনও অন্য ধর্ম বা জাতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন নি। তাঁর এ

www.nagorikpathagar.org

স্বাজাত্যপ্রীতিকে কোন কোন প্রগতিবাদী বিরূপ দৃষ্টিতে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমালোচক ডক্টর গোলাম মুরশিদের একটি মন্তব্য স্মরণ করা যায়–

"তাঁর (রোকেয়ার) মুসলমান পরিচয়ই শেষ জীবনে প্রকট। 'আমরা' 'মসলমান' শব্দের সমার্থক তখন। একদা যিনি ধর্মীয় উৎসবের দিনেও হিন্দু ভাইদের ভুলে থাকতে পারেননি, বলেছেন সমুদয় বাঙালি এক বঙ্গের সন্তান, কেবল মুসলমান বলে নিজেকে চিহ্নিত করার তাঁর পরবর্তী প্রয়াস তাই বিস্ময়কর। সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে যে মানসিক ঔদার্যের কথা তিনি এককালে বলেছিলেন, সে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে ছিলো। কিন্তু স্ব-সম্প্রদায়ের উন্নতি, সংস্কার এসব তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়। এমনকি খৃষ্টানরা মুসলমানদের নানা কৌশলে ধর্মান্তরিত করেছেন- এ-ও তাঁর রচনার বিষয়ভুক্ত হয়েছে।' **(ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ: বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা, শিবনারায়ণ রায়-সম্পাদিত 'জিজ্ঞাসা', কার্তিক ১৩৮৭, ১:৩)।**

উপরোক্ত মন্তব্যের যথাযথ জবাব খুঁজে পাওয়া যায় প্রখ্যাত কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দের পূর্বোক্ত নিবন্ধটিতে। উক্ত নিবন্ধের একস্থানে তিনি বলেছেনঃ "আমরা দেখিয়েছি রোকেয়ার রচনার পৃষ্টপট হিশাবে সব সময়ই মুসলমান সমাজ উপস্থিত। তাঁর নারীজাগরণও তো পরিস্কার বাঙালি-মুসলমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই ('মুসলমানদের যাবতীয় দৈন্য-দুর্দশার একমাত্র কারণ স্ত্রী শিক্ষায় ঔদাস্যা'– 'বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সমিতি', 'সওগাত', চৈত্র ১৩৩৩) উপান্ত জীবনে রোকেয়া যদি স্বধর্ম ও স্বসমাজ সম্পর্কে আরো চিন্তিত হয়ে থাকেন, তাহলে বলতে হবে তিনি হয়েছেন আরো ব্যাপক-গভীর। স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি বা সংস্কারের চেষ্টা সাম্প্রদায়িকতা নয়– মনুষ্যত্বেরই প্রথম প্রস্ফুটন। রোকেয়া ঐতিহ্যের সঙ্গে আপোষ করেননি–তিনি ছিলেন ঐতিহ্যসচেতন শিকড়সংলগ্ন, উন্মুল বা অক্ষিত নন।" **(আব্দুল মান্নান সৈয়দঃ ঐ, পৃষ্ঠা-১০)**

বেগম রোকেয়া ছিলেন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ মহিলা। তিনি তাঁর অধীত জ্ঞান-শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, কর্মপ্রচেষ্টা ও সাহসিকতার দ্বারা মুসলিম সমাজের অবক্ষয় রোধ করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষা ও প্রযুক্তি অর্জনের মাধ্যমে স্বসমাজের উন্নতি কামনা করেছেন। বিশেষত অবহেলিত ও দুর্দশাগ্রস্ত নারী জাতির উন্নয়নে তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাই বাঙালি মুসলমানের বিশেষত নারী জাগরণের ইতিহাসে তিনি একজন মহিয়ষী নারী হিসাবে চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর স্বপ্ন পুরণে সাহিত্য চর্চা ও সমাজসেবা পরস্পর সম্পূরক হিসাবে কাজ করেছে।

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

বহু ভাষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক, শিক্ষাবিদ, ধর্মবেত্তা, জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (জন্ম ঃ ১০ জুলাই, ১৮৮৫ মৃত্যু ঃ ১৩ জুলাই, ১৯৬৯) জীবন-কালে Moving Encyclopeadia বা 'চলন্ত বিশ্বকোষ', Living Dictionary বা 'জীবন্ত অভিধান' হিসাবে সর্বমহলে সুপরিচিত ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-৮২) তাঁর সম্পর্কে বলতেন, "He is a walking encyclopedia of oriental lore" বা তিনি একটি চলিষ্ণু প্রাচ্য বিদ্যাকল্পদ্রুম। তাঁর সমকালে জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি কিংবদন্তীতুল্য খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বিশিষ্ট পণ্ডিত ও ভাষাতত্ত্ববিদ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সম্পর্কে বলেন ঃ "সত্তরের উপরে বয়সের যে বৃদ্ধরা বাঙালি জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং মানসিক সংস্কৃতির প্রসার সাধন করিয়া যাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের নাম প্রাবীণ্যে এবং পাণ্ডিত্যে।"

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় আরো বলেন ঃ "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁহাকে আমরা একজন যুগনায়ক মুসলমান বাঙালি বলিয়া অভিবাদন করি। তিনি তাঁহার বাঙালিত্বের মর্যাদা ভুলিয়া যান নাই। তিনি পুরাপুরি মুসলমান বাঙালি, কেবল বাঙালি মুসলমান নহেন- অর্থাৎ আন্ত র্জাতিক মুসলমানত্বের খাতিরে তাঁহার সাধনার বাঙালিত্বকে বিসর্জন দেন নাই। মুসলমান আদর্শ ও সাধনা এবং বাঙালির জীবন, এই দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার চরিত্রে দেখা যায়। কিন্তু সেটাই শেষ বা বড় কথা নহে। তিনি একজন সংস্কারমুক্ত চিত্তের মানুষ এবং এই মানুষই Full Man পূর্ণ-মানব অথবা ইনসান আল-কামিল পদবীতে পৌঁছবার পথে জয়যাত্রা করিবার যোগ্য।"

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জ্ঞান-সাধনার এমন উঁচু স্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, তিনি এরূপ পরিচিতি সহজেই লাভ করতে পেরেছিলেন। এরূপ অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি যেকোন সমাজের জন্য মহাগৌরবের তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অনুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা ও অধীত বিদ্যার এক বিস্ময়কর সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে।

জীবনকালে তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা পেয়েছিলেন অকাতরে। বিংশ শতাব্দীর অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল বাঙালি মুসলমান এ জ্ঞান-বৃক্ষের ছায়াতলে থেকে ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম, সংস্কৃতি তথা মনন-চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধনায় নিয়োজিত থেকে উন্নতির সোপান বেয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীতে বাঙালি মুসলমানের যা কিছু অর্জন ও সাফল্য তার পেছনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অবদান রয়েছে, তার মধ্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নাম এক অনন্য ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্ম পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার পেয়ারা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম মুন্সী মফিজউদ্দীন আহমদ, মায়ের নাম হুরুন্নেসা। শৈশবে নিজ বাড়িতে পড়াশোনায় বিসমিল্লাহ্খানির পর তিনি হাওড়ার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং ১৯০৪ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর কলকাতা মাদ্রাসা থেকে ১৯০৬ সনে এফ.এ. পাশ করেন। তারপর হুগলী মহসীন কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯০৬ থেকে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বি.এ. পড়েন। অসুস্থতার কারণে তিনি যথাসময়ে বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এরপর অল্প কিছুদিন তিনি সাতক্ষীরায় একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৯১০ সনে তিনি কলকাতা সিটি কলেজ থেকে সংস্কৃতে অনার্সসহ বি.এ. পাশ করেন। ঐ বছরই তিনি মারগুবা খাতুনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে এম.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু সংস্কৃত বিষয়ের ব্রাহ্মণ শিক্ষক তাঁকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দিতে অস্বীকার করেন। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্যের অনুরোধে তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব (Comparative Languages) নিয়ে এম.এ. পড়েন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর জন্যই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব বিষয় চালু করা হয়। ১৯১২ সনে তিনি ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করেন। তিনিই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম.এ. ডিগ্রিধারী প্রথম ব্যক্তি।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯১৩ সনে জার্মানীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি লাভ করেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য তখন তাঁর বিদেশ যাওয়া সম্ভব হয়নি। ১৯১৪

www.nagorikpathagar.org

সনে তিনি এল.এল.বি. পাশ করেন। ঐ বছরই তিনি চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৫ সনে তিনি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বশিরহাট মহকুমা আদালতে ওকালতী শুরু করেন। ১৯১৬ সনে তিনি বশিরহাট পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। ১৯১৭ সনে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনে'র সভাপতি এবং ১৯১৮ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র যুগ্ম-সম্পাদক হন। পত্রিকার অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক।

১৯২০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর স্যার আশুতোষ ভট্টাচার্য মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎকুমার লাহিড়ী' গবেষণা সহায়ক হিসাবে নিযুক্তি দেন। একই সময় তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ মুসলিম ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ উক্ত সনের জুন মাসে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের লেকচারার হিসাবে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অতঃপর উক্ত বিভাগে অধ্যক্ষ হিসাবে সর্বমোট ২৩ বছর অধ্যাপনা করে ১৯৪৪ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইতঃমধ্যে ১৯২৬-১৯২৮ সনে প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি.লিট. ডিগ্রি লাভ করেন এবং জার্মানী থেকে ধ্বনিতত্ত্বে ডিপ্লোমা কোর্স করেন।

১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বগুড়া আজিজুল হক কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি ১৯৪৮ সনে পুনরায় সুপারনিউমারী প্রফেসর হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এর কয়েক বছর পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান ও কলা অনুষদের ডীন হিসাবে যোগদান করেন। তিনি উক্ত পদে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর ১৯৫৯ সনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাকিস্তানের করাচীতে 'উর্দু উন্নয়ন বোর্ডে'র অধীন উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক পদে যোগদান করেন। এরপর তিনি ১৯৬০ থেকে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান প্রকল্পের প্রধান সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি বাংলা একাডেমী থেকে অবসর গ্রহণ করার পর থেকে আমৃত্যু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রফেসর ইমেরিটাস' পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। গদ্য ও পদ্য উভয় রীতিতেই তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরাজি, বাংলা, উর্দু, ফারসি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় রচিত তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ রয়েছে। এসব গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

www.nagorikpathagar.org

১. হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় সিদ্ধ কানুপার গীত ও দোহা [সম্পাদিত] ১৯২৫
২. LES CHANTS MYSTIQUES DE KANNA AT DE SARAHA [ফরাসী ভাষায় রচিত]; ১৯২৮
৩. LES SONS DU BENGLIE [ফরাসি ভাষায় রচিত]; ১৯২৯
৪. ভাষা ও সাহিত্য; ১৯৩১
৫. রকমারী; ১৯৩২
৬. বাংলা ব্যাকরণ; ১৯৩৫
৭. দিওয়ান-ই হাফিজ [অনুবাদ]; ১৯৩৮
৮. অমীয় বাণী শতক [অনুবাদ]; ১৯৩৮
৯. রুবাইয়াত-ই- উমর খয়্যম [অনুবাদ]; ১৯৪২
১০. শিকওয়াহ ও জরয়াব-ই-শিকওয়াহ ; ১৯৪২
১১. বিদ্যাপতি শতক ; ১৯৪৫
১২. ইকবাল; ১৯৪৬
১৩. HUNDRED SAYINGS OF THE HOLY PROPHET; ১৯৪৫
১৪. মহাবাণী ; ১৯৪৬
১৫. বাইআতনামা; ১৯৪৮
১৬. ESSAYS ON ISLAM; ১৯৭৫
১৭. আমাদের সমস্যা; ১৯৪৯
১৮. পদ্মাবতী [সম্পাদিত]; ১৯৫০
১৯. প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষ নবী; ১৯৫২
২০. গল্প সঞ্চয়ন [সম্পাদিত। সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে]; ১৯৫৩
২১. বাংলা সাহিত্যের কথা [প্রথম খণ্ড]; ১৯৫৩
২২. হজ্জের ও রওযা পাকের যিয়ারতে দোআ দরূদ; ১৯৫৭
২৩. বাংলা আদব কী তারিখ [উর্দু ভাষায় রচিত]; ১৯৫৭
২৪. তাজরীদুল বোখারী [অনুবাদ]; ১৯৫৮
২৫. বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত; ১৯৫৯
২৬. শেষ নবীর সন্ধানে; ১৯৬০
২৭. BUDDHIST MYSTIC SONGS; 1960
২৮. TRADITIONAL CULTURE IN EAST PAKISTAN [মুহম্মদ আব্দুল হাই সহযোগে]; ১৯৬১
২৯. মহরম শরীফ;
৩০. ছোটদের রাসূলুল্লাহ; ১৯৬২

www.nagorikpathagar.org

৩১. রোযাহ্ ঈদ ও ফিৎরা; ১৯৬৩
৩২. অমর কাব্য [অনুবাদ]; ১৯৬৩
৩৩. ইসলাম প্রসঙ্গ; ১৯৬৩
৩৪. বাংলা সাহিত্যের কথা [দ্বিতীয় খণ্ড]; ১৯৬৪
৩৫. পূর্ব পাকিস্তানী আঞ্চলিক ভাষার অভিধান [সম্পাদিত]; ১৯৬৫
৩৬. ঈদুল আযহা কুরবানীর আহকাম; ১৯৬৯
৩৭. কুরআন প্রসঙ্গ; ১৯৬৯
৩৮. TALES FROM THE QURAN; ১৯৭০
৩৯. PEARLS FROM THE HOLY PROPHET; ১৯৭০
৪০. নবী করীম হযরত মুহম্মদ (স.); ১৯৭৫।
[স্কুল পাঠ্য গ্রন্থাবলী এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়নি।]

পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা ঃ

১. আঙ্গুর [শিশু মাসিক পত্রিকা, কলকাতা, ১৯১৩, সম্পাদক]
২. আল ইসলাম [মাসিক পত্রিকা, কলকাতা, ১৯১৫ সহ-সম্পাদক]
৩. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা [ত্রৈমাসিক, কলকাতা, ১৯১৮, যুগ্ম-সম্পাদক]
৪. The Peace [ত্রৈমাসিক ও মাসিক, ঢাকা, ১৯২২, সম্পাদক]
৫. বঙ্গভূমি [মাসিক, ঢাকা, ১৯৩৮, সম্পাদক]
৬. তকবীর [পাক্ষিক, বগুড়া, ১৯৪৬, সম্পাদক]
৭. কাজের কথা [পাক্ষিক, ১৯৫১, সম্পাদক]।

পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তি

১. প্রেসিডেন্ট পুরস্কার ঃ 'প্রাইড অফ পারফরমেন্স' (১৯৫৮)।
২. সংবর্ধনা ঃ পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ (১৯৫৮)। আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্য পত্রিকার' শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা সংখ্যা (১৯৬৫) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা পত্রিকা 'সাহিত্যিকা'র শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা সংখ্যা (১৯৬৬) প্রকাশ করে। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত 'Shahidullah Felicitation Volume' (১৯৬৬), মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ' (১৯৬৭) এবং ডক্টর আনোয়ার এস দীল সম্পাদিত 'Shahidullah Presenttation Volume' (১৯৬৭)।

৩. ২০০২ সনে একুশের মাতৃভাষা ইনিস্টিটিউট পদক(মরণোত্তর) লাভ।

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে সকলের নিকট সমাদৃত ছিলেন। পৃথিবীর অনেক ভাষা শিখে তিনি তা থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করেছেন। তিনি যেসব ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন তার সংখ্যা হলো ২০টি। এগুলো হলো ঃ বাংলা, ইংরাজি, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, হিব্রু, আরবি, প্রাচীন ফারসি, ফারসি, উর্দু, হিন্দি, ওড়িয়া, মৈথিলি, অহমিয়া, নেপালি, তিব্বতি, প্রাচীন সিংহলি, পোশতু, ফরাসি, জার্মান প্রভৃতি। এছাড়া, তামিল, তেলেগু, মালায়ালম, সিন্ধি, মহারাষ্ট্রি, বেলুচি, ল্যাটিন, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, ড্যানিশ, ইতালীয়, মালদ্বীপি, তুর্কি প্রভৃতি আরো প্রায় দু'ডজন ভাষায় তাঁর যৎসামান্য দখল ছিল।

এ থেকে ধারণা করা যায় যে, তাঁর মতো বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ আছেন কিনা সন্দেহ। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উদ্ভব, বিকাশ ও তাঁর তুলনামূলক বিচারে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে তাঁর মতো অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। বাংলা ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ ও কাল-নিরূপণে তাঁর সমকালীন পণ্ডিত-গবেষকদের মতামত খণ্ডন করে তিনি নিজের মতকে অকাট্য যুক্তিসহ উপস্থাপন করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়নেও তিনি অনেক অজানা তথ্যের উপস্থাপন করে আমাদের ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর অবদান কেবল তুলনাহীনই নয়, অনন্য বলা চলে।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একাধারে ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত, সাহিত্য-সাধক, শিক্ষাবিদ, ধর্মবেত্তা, গবেষক, দার্শনিক, সম্পাদক, অনুবাদক ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের তুলনায় তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা হয়ত পর্যাপ্ত নয়। কিন্তু তিনি যা লিখেছেন তার অধিকাংশই আকর গ্রন্থ হিসাবে সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যের কথা' এবং ভাষাতত্ত্বের উপর গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়। তাঁর রচিত 'ভাষা ও সাহিত্য' এবং 'বাংলা ব্যাকরণ' গ্রন্থ দুটিও এক সময় পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' গ্রন্থটি আমাদের লৌকিক ভাষার পরিচয় সন্ধানে এক অসামান্য গ্রন্থ হিসাবে চিরকাল সমাদৃত হবে। তাঁর সম্পাদিত 'হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালায় সিদ্ধ কানুপার গীত ও দোহা' সম্পর্কে অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ "শতাব্দীর পর শতাব্দী পার হয়ে যাবে, পৃথিবীর পরিবর্তন ঘটবে, কিন্তু শহীদুল্লাহর দোহাকোষ তার মূল্য হারাবে না।"

www.nagorikpathagar.org

ভাষাতত্ত্বে তিনি ছিলেন উপমহাদেশের একজন স্বীকৃত ও সর্বজনমান্য পণ্ডিত ব্যক্তি। প্রাচীন ও আধুনিক ভাষাসমূহের ইতিহাস, উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর মতামতকে সকলে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে তাঁর যুক্তিপূর্ণ মতামতকেও সকলে শ্রদ্ধার সাথে বিবেচনা করে থাকেন। ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি শুধু উপমহাদেশেরই নয়, প্রাচ্য-গবেষকদের মধ্যেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর গবেষণা ও মতামত বিশ্ব-বিদ্বজ্জন মহলে বিশেষভাবে সুপরিচিত ও সমাদৃত।

ভাষার ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠির প্রচলিত মত মেনে নিয়েও যুক্তিসংগত কারণে তিনি বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। স্যার জন গ্রীয়ারসন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং আরো অনেকের মতে মধ্য-ভারতীয় আর্য ভাষার মধ্য স্তর মাগধী প্রাকৃত থেকে মাগধ অপভ্রংশ এবং তা থেকে প্রাচীন 'বঙ্গকামরূপী' ভাষার উদ্ভব। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষাগত বিবর্তন ও বৈয়াকরণিক লক্ষণাদি বিশ্লেষণ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বাংলা ভাষার জন্ম মাগধী প্রাকৃত ও মাগধ অপভ্রংশ থেকে নয়, বরং প্রাকৃত স্তরে গৌড়ী প্রাকৃত নামে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সে গৌড়ী প্রাকৃত থেকে গৌড় অপভ্রংশ ভাষার জন্ম এবং তা থেকে কালক্রমে বঙ্গকামরুপী ভাষার উদ্ভব ঘটে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ মত প্রায় সকলেই যুক্তি-যুক্ত বলে মনে করেন। তিনি ১৯৬৫ সনের ৪ আগস্ট টেলিভিশনে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ

"বাংলা এবং পাক-ভারতীয় অন্যান্য আধুনিক ভাষা মূলতঃ আদিম প্রাকৃত থেকে এসেছে, সংস্কৃত থেকে নয়। বাংলা ও উর্দু ভাষায় এমন শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে যাদের মূল সংস্কৃত নয়। যেমন 'তুমি দেখো' কিংবা 'তুম্ দেখো'। সংস্কৃতে এ হচ্ছে 'ইয়ম পশ্য য'-এর কোন শব্দ থেকে 'তুমি' বা 'দেখ' আসেনি। এসেছে প্রাচীনকালের জনসাধারণের কথ্য ভাষা প্রাচীন প্রাকৃত থেকে 'তুম্মে দেক্খ হ'। এ রকম বহু শব্দ ও বাক্য গঠন চোখে পড়ে বাংলা উর্দু প্রভৃতিতে সংস্কৃতে যার মূল খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেমন ঃ বড়, ছোট এগুলো সংস্কৃতের বৃহৎ বা ক্ষুদ্রের ভিন্নরূপ নয়, বরং আদিম প্রাকৃতের 'বড্ড' 'কষুট' কিংবা পরবর্তীকালে প্রাকৃত 'বড্ড' 'ছুটট' থেকে। এমনি ধ্বনিতত্ত্বের দিক দিয়েও বাংলা উর্দুর জন্ম প্রাকৃতের কাছে যতটা ঋণী সংস্কৃতের কাছে ততটা নয়। সংস্কৃত ছিল দ্বিজ বর্ণের / ভাষার ভাষা, উচ্চ শ্রেণীর ধর্মীয় ও পোশাকী ভাষা-প্রাকৃত ছিল জনসাধারণের ভাষা, সেদিন পর্যন্ত সংস্কৃত তেমনি বেঁচে ছিল– কিন্তু আদিম প্রাকৃত জনসাধারণের ভাষা হয়ে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে নানারূপ গ্রহণ করে।"

www.nagorikpathagar.org

বাংলা ভাষার ইতিহাস রচনায় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান অসামান্য। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ও বিকাশে মুসলমানদের ঐতিহাসিক অবদান সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এতকাল পর্যন্ত এর ইতিহাস রচনা করেছেন হিন্দু ঐতিহাসিকেরা। তাঁরা অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন, অনেক সত্য চাপা দিয়েছেন এবং মুসলমানদের অবদানকে বিকৃত বা অবমূল্যায়িত করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এক্ষেত্রে সত্যসন্ধ গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে অনেক অজানা, ভুলে যাওয়া এবং বিকৃত তথ্যের সঠিক মূল্যায়ন ও যথাযথভাবে তা উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

প্রধাণত ভাষাতাত্ত্বিক গবেষক হিসাবে তাঁর অবদান অনন্যতুল্য হলেও মৌলিক সাহিত্য রচনা ও অনুবাদ-কর্মেও তাঁর বিশিষ্ট অবদান রয়েছে। উপরে প্রদত্ত গ্রন্থ- তালিকা থেকে তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। মৌলিক গ্রন্থ সমূহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রচিত ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের উপযোগী। বিশেষত এখানে তাঁর অনুবাদ গ্রন্থসমূহের উল্লেখ একান্ত জরুরী। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ-কর্মে তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরাজি, ফরাসি, জার্মানি, অপভ্রংস, মৈথেলি ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা থেকে তিনি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ করেছেন। এসব অনুবাদের মধ্যে 'আল-কুরআন', 'অমিয় বাণী-শতক' (একশটি হাদিসের অনুবাদ), মহাকবি হাফিজের 'দিওয়ান-ই হাফিজ', মহাকবি ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াত-ই- উমর খয়্যম', মহাকবি আল্লামা মুহম্মদ ইকবালের 'শিকওয়াহ ও জরয়াব-ই-শিকওয়াহ', 'বিদ্যাপতি শতক' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাঁর অনুবাদ সর্বদা মূলানুগ ও অতিশয় বিশ্বস্ত। তাঁর অনূদিত আল-কুরআন অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ও দক্ষ অনুবাদক হিসাবে তাঁর অনুদিত আল-কুরআন প্রকাশিত হওয়া জরুরী। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের স্মৃতিচারণ থেকে অংশত উদ্ধৃতি দিচ্ছি। তিনি বলেনঃ

"শহীদুল্লাহ সাহেবের আজীবন বাসনা ছিল কোরান শরীফের একটি বাংলা তরজমা করা। তাঁর ধারণা ছিল যে বাংলাতে যতগুলো অনুবাদ হয়েছে তার কোনোটাই যথার্থ নয়। ভাই গিরীশচন্দ্র সেনের অনুবাদের কথা তুললে বলতেন একজন অমুসলমানের পক্ষে যতটা করা সম্ভবপর তা তিনি করেছেন কিন্তু একজন বিশ্বাসীর হাতে কোরান শরীফের যে ব্যাখ্যা প্রকাশিত হবে তা অন্যরকম হতে বাধ্য। মওলানা আকরম খাঁ-ও কোরান শরীফের অনুবাদ করেছিলেন, সে অনুবাদ নিয়ে শহীদুল্লাহ্ একবার বিতর্কে নেমেছিলেন। মাসিক মোহাম্মদীতে

www.nagorikpathagar.org

'কোরান অনুবাদ আলোচনা' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখে মওলানা আকরম খাঁর অনুবাদের কিছু ত্রুটি ধরে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কোরান শরীফে অনেক শব্দের দু'তিন রকম অর্থ হয় তার ফলে যারা মুতাজিলাপন্থী অথবা যুক্তিবাদী তারা সে অর্থটাকেই গ্রহণ করেন, যেটাকে তারা যুক্তির সাহায্যে গ্রহণ করতেন। তাই দেখা যায় স্যার সৈয়দ আহমদ এবং মওলান মোহাম্মদ আলী এঁদেরকে অনুসরণ করে মওলানা আকরম খাঁ যুক্তিগ্রাহ্য অর্থকে মান্য করেছেন।... ১৯৫০ কি ১৯৫১ সালে শহীদুল্লাহ্ সাহেব কোরান অনুবাদে হাত দেন, সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালে তার অনুবাদটি সম্পন্ন হয়। এ অনুবাদটি প্রকশিত হলে একজন ভাষাতাত্ত্বিক এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানের একটি বিশিষ্টার্থক অনুবাদ আমাদের হাতে আসতো।"

শিক্ষাবিদ হিসাবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এক প্রবাদতুল্য অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। ক্লাস রুমে বক্তৃতারত অবস্থায় তাঁকে মনে হতো যেন তিনি জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্রের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন। সমুদ্র সিঞ্চন করে মণি-মুক্তা আহরণ করে তিনি তা অকাতরে বিলিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষার্থীদের মাঝে। ক্লাস রুম ছাড়াও সারা বাংলাদেশ জুড়ে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বার্ষিক মিলাদ মাহ্ফিল, সাধারণ ওয়াজ মাহফিল, সভা-সেমিনার, সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ইত্যাদি হিসাবে তিনি যোগদান করতেন এবং সর্বশ্রেণীর শ্রোতার সামনে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করতেন। এদিক দিয়ে তিনি একজন 'চারণ শিক্ষকে'র ভূমিকা পালন করেছেন। তাই ক্লাস রুমের শিক্ষার্থী ছাড়াও বলতে গেলে, তিনি ছিলেন সমগ্র দেশবাসীর সম্মানিত শিক্ষকতুল্য এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পেলেও যথার্থ অর্থে তিনি ছিলেন আমাদের 'জাতীয় শিক্ষক'।

শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর মতামত ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেন ঃ "প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অভাব পাঁচটি– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা। প্রথম চারটি তার জৈব ও সামাজিক অভাব, এদের অভাবে সে সমাজে জীবনধারণ করতে পারে না। কিন্তু শিক্ষার অভাবে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনও ভেদ থাকে না।" (সভাপতির ভাষণ ঃ ফরিদপুর শিক্ষা সম্মিলনী ২৮-০১-১৯৫০)।

অন্যত্র তিনি বলেন ঃ "আমি মনে করি শিক্ষার আদর্শ হচ্ছে VIM. V অর্থাৎ Vernacularization অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা, এতে হবে মনের পরিপুষ্টি; I হলো Islamization অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা; এতে হবে আত্মার পরিপুষ্টি; M হলো Militarization অর্থাৎ সামরিক শিক্ষা, এতে হবে দেহের

www.nagorikpathagar.org

পরিপুষ্টি।" (সভাপতির ভাষণ ঃ জাতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন, যশোর ৩১-০৮-১৯৬৩)।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন, কিন্তু কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। সকল মানুষকে তিনি সমমর্যাদা দিতেন। গবেষকের নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তিনি সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বজাতির ইতিহাস ও অবদান তুলে ধরার ক্ষেত্রে তিনি কখনো অন্য জাতির ইতিহাস বা অবদানকে অবমূল্যায়ন করেন নি। সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরে পরবর্তীতে মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন (১৯০৪-৮৭), ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০৬-১৯৮২), নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (১৯০৬-১৯৮২), আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী (১৯০৮-৭৯), মুহম্মদ আব্দুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), আবদুল হক (১৯২০-৯৭), ডক্টর আহমদ শরীফ (১৯২১-৯৯), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), ডক্টর গোলাম সাকলায়েন (১৯২৬–), ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭–২০১১), ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-৯৪), ডক্টর মুহম্মদ আবু তালিব (১৯২৮–), ডক্টর এস এম লুৎফর রহমান (১৯৪১–), প্রমুখ বাংলা ভাষা-সাহিত্যের সঠিক ইতিহাস রচনায় মূল্যবান অবদান রেখেছেন বা রেখে চলেছেন।

আজ আমাদের আত্ম-পরিচয় তথা জাতীয় পরিচয় নিয়ে এক শ্রেণীর লোক বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপপ্রয়াসে লিপ্ত। এক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর প্রজ্ঞাচিত উক্তি আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতেন ঃ "আমি আগে মুসলমান তার পরে বাঙালি।" বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি যেমন ছিলেন দৃঢ়, আচরণগতভাবেও তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তবে বাঙালি হিসাবেও তাঁর গর্ব ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা। বাংলা যে উপমহাদেশের অন্য সকল ভাষার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, একথা তিনি অকাট্য যুক্তিসহকারে সর্বদা গর্বের সাথে উল্লেখ করতেন। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে তিনি অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, আমরা মুসলমান বলেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল, বাংলা বিভক্ত হয়েছিল এবং তার ফলেই ১৯৪৭ সনে আমরা প্রথমে পাকিস্তান এবং পরবর্তীতে ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছি। মুসলমানিত্বই আমাদের প্রধান ব্যক্তি-সত্তা, জাতিসত্তা এবং আমাদের স্বাধীনতার মূলভিত্তি। একথা অস্বীকার করলে আমাদের জাতীয়তা বা অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়, আমাদের স্বাধীনতার

www.nagorikpathagar.org

মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। আমরা যদি 'আগে বাঙালি' হতাম তাহলে ভারত বিভাগের দাবি কখনোই উঠতো না, বাংলা বিভক্ত হতো না, স্বতন্ত্র জাতীয়তার বা স্বাধীনতার দাবিও উঠত না। তাই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উপরোক্ত উক্তি আমাদের আত্ম-পরিচয় তথা জাতিগত পরিচয় নির্ধারণে এক উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা স্বরূপ। আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রেও তা সহায়ক।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সাংগঠনিক যোগ্যতা ও জাতীয় নবজাগরণে তাঁর যে ভূমিকা এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিশেষত শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে তিনি বাঙালি মুসলমানের মনে নবজাগরণের চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্য সংগঠন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' কথা উল্লেখ করা যায়। এ সমিতির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ লিখেছেন ঃ

"ইংরাজী ১৯১০ সালে আমি বি.এ. পাশ করি। ঐ সময় কলকাতায় কয়েকটি উৎসাহী যুবকের সাথে আমার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাহাদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মৌলভী আহমদ আলী, মঈনুদ্দীন হুসেন প্রভৃতি। সকলের মধ্যে জ্বলন্ত উৎসাহী ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক। আমরা কয়েকজন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সভ্য ছিলাম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদ না থাকলেও আমাদের সাহিত্যিক দারিদ্র্যের দরুণ আমরা বড় লোকের ঘরে গরীব আত্মীয়ের মতন মন-মরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হলো 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য-সমিতি থাকা উচিত। এ উদ্দেশ্যে কলকাতার ৯নং আন্তনি বাগান লেনে মৌলভী আব্দুর রহমান খানের বাড়িতে ১৯১১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বরে এক সভা আহুত হয়। আমার যতদূর মনে হয়, এ সভায় আমি ব্যতীত মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী, মুনশী হাতিম আলী, মুনশী শেখ আব্দুর রহীম, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রওশন আলী চৌধুরী, মৌঃ মঈনুদ্দীন হুসেন, মৌলবী মুজিবুর রহমান ('দি মুসলমান' পত্রিকার সম্পাদক), মৌলভী আহমদ আলী, ডা. আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদী ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সভায় আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই। আমার যতদূর মনে হয়, মৌলভী আব্দুল করীম (অবসরপ্রাপ্ত ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর অব স্কুলস) সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।"

১৯১১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে প্রায় দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাল উক্ত প্রতিষ্ঠান বাঙালি মুসলমানের সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ডক্টর

www.nagorikpathagar.org

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ চাকরির সুবাদে স্থানান্তরে গমন করার ফলে সব সময় উক্ত সমিতির দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম না হলেও বিভিন্নভাবে তিনি এর কার্যক্রমের সাথে সর্বদাই যুক্ত থেকে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি' এবং এর মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা' বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের সাহিত্য ও জ্ঞান-চর্চায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি, বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের অগ্নি-পুরুষ কাজী নজরুল ইসলামও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বাঙালি পল্টন থেকে ফিরে এসে এ সমিতির অফিসেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। কাজী নজরুল ইসলাম এ সমিতির সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র সাথে আমার যোগাযোগ বহুদিনের– কয়েকজন বন্ধুর আহবানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির আশ্রয় নিই। ... সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত, তবে হয়ত কোথায় ভেসে যেতাম, তা আমি জানি না। এ ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হ'ত কি না, আমার জানা নেই।" (১৯৪১ সালের ৫-৬ এপ্রিল তারিখে কলকাতার মুসলিম ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র রজত জুবিলী উৎসবে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ। **(দ্র. আব্দুল কাদির সম্পাদিত 'কাজী নজরুল ইসলাম রচনা-সম্ভার', পৃ. ১৪৬)।**

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর বাংলা ভাষা-প্রীতি সর্বজনবিদিত। তাঁর সারা জীবনের সাধনা, গবেষণা, লেখালেখি, সভা-সমিতি-বক্তৃতায় একথার যথার্থতা প্রমাণিত। বাংলা ভাষাকে আমাদের শিক্ষার বাহন, অফিস-আদালতের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত করার জন্য তিনি সর্বদা সোচ্চার ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে দু'একটি উদ্ধৃতি ও উদাহরণ পেশ করছি ঃ

এক. ১৯১৫ সনে কলকাতায় বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি হিসাবে ভাষণ দিতে গিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন ঃ "একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা সার্থক হতে পারে। ...চীন ও জাপানে যদি তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে আণবিক বিজ্ঞান শিক্ষা সম্ভব, তবে বাংলা ভাষাতেই বা তা হবে না কেন? তবে ইংরাজি, ফারসি, ল্যাটিন, জার্মান, রুশ ভাষা থেকে অনেক শব্দ আমাদের গ্রহণ করতে হবে– তা সবাই করেছে। ইংরাজি ভাষাতেও বহু বিদেশী শব্দ আছে। আরবী ভাষাতেও ফালসাফা, জিওগ্রাফিয়া প্রভৃতি বিদেশী শব্দ রয়েছে। এতে ভাষা শক্তিশালীই হবে।"

www.nagorikpathagar.org

দুই. বাংলা ১৩২৪ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ "আমরা বঙ্গদেশবাসী। আমাদের কথাবার্তার, ভয়-ভালবাসার, চিন্তা-কল্পনার ভাষা বাংলা। তাই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। ... মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন ভাষা কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া পরাণ আকুল করে ? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষার ধ্বনির জন্য প্রবাসীর কান পিয়াসী থাকে ? মাতৃভাষা ব্যতীত আর কোন্ ভাষায় কল্পনা-সুন্দরী তাহার মনমজান ভাবের ছবি আঁকে ?... সেদিন অতি নিকট, যেদিন বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিবে। বিদেশীয় ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মতন সৃষ্টি ছাড়া প্রথা কখনও টিকিতে পারে না।"

তিন. ভারতের রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেস-নেতা মোহনচাঁদ করমচাঁদ গান্ধী বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতামত চেয়ে চিঠি লিখলে রবীন্দ্রনাথ তার জবাবে লেখেন ঃ 'The only possible national language for inter-provincial intercourse is Hindi in India'. ১৯৮১ সনে বিশ্বভারতীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ভবিষ্যত ভারতের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জন্য সর্বভারতীয় পর্যায়ে বিশিষ্ট পণ্ডিতজনদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সকলেই হিন্দীর পক্ষে মতামত দিলেও সে সভায় উপস্থিত একমাত্র মুসলিম পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ "শুধু ভারত কেন, সমগ্র এশিয়া মহাদেশেই বাংলা ভাষার স্থান হবে সর্বোচ্চে। ভাব-সম্পদ ও সাহিত্য-গুণে বাংলা ভাষা এশিয়ার ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে অদ্বিতীয়।"

সেদিন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ সত্যোচ্চারণে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অনেকেই অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেও শহীদুল্লাহ তাঁর যুক্তিসঙ্গত মতের উপর ছিলেন দৃঢ়-অবিচল। সততা, বলিষ্ঠতা ও সত্যোচ্চারণ ছিল জ্ঞান-তাপস ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। এর দ্বারা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মাতৃভাষা-প্রীতির পরিচয়ও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

চার. ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ডক্টর জিয়া উদ্দিন আহমদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার কঠোর সমালোচনা করে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন, যা ২৯ জুলাই ১৯৪৭ তারিখে 'দৈনিক আজাদে' ছাপা হয়। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলেন ঃ

"আরবী ভাষাকেই আমি বিশ্বের মুসলমানদের জাতীয় ভাষা রূপে গণ্য করি। কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দীর অনুকরণে উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে।... যদি বিদেশী ভাষা বলিয়া ইংরাজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। (কারণ উর্দু পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোন অঞ্চলের ভাষা নয়। এ অর্থে উর্দুও বিদেশী ভাষা) যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবী বিবেচনা করা কর্তব্য। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সাহিত্যিক ভাষা। পাকিস্তান ডোমিনিয়নের অধিকাংশ অধিবাসীর মাতৃভাষা বাংলা এবং বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধশালী। সুতরাং পাকিস্তানে ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাটি শ্রেষ্ঠ।... পূর্ব পাকিস্তানের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডক্টর জিয়াউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদ রূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষানীতি বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ছিল। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার প্রতি তিনি যেমন শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তেমনি একটি পুরনো সমৃদ্ধ ভাষা হিসাবে বাংলার জন্য তিনি গর্ববোধ করতেন এবং বিশ্বের দরবারে এর মর্যাদা সমুন্নত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। শব্দ-সম্পদে বাংলা ভাষা অতিশয় সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যও একটি সমৃদ্ধ সাহিত্য। বর্তমানে বাংলা সাহিত্য বিদেশী ভাব ও নানারূপ প্রভাবের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ক্ষুণ্ণ হয়েছেন। আমাদের জাতীয় ভাব-আদর্শ-ঐতিহ্য সমন্বিত সাহিত্যকেই তিনি শ্রেয় মনে করেছেন। তাই তিনি তাঁর এক ভাষণে এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"আধুনিক বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষায় রচিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহার স্বভাব বিদেশের আমদানী। খদ্দরের কাপড়ে আমরা বিলেতী স্যুট তৈয়ার করিতেছি। দেশী খাটে শুইয়া বিলাতের স্বপ্ন দেখিতেছি। আজ আমাদের মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, গীতিকাব্য, কবিতা, গান, শিল্প, নাটক, উপন্যাস সবই পশ্চিমের ভাবে ভরপুর। বাঙালি সাহিত্যিক 'আজ তুমি ঘরের দিকে ফের।' বিলেতী ডেইজী, ডেফোডিল, ক্রিসানথেমম এর চটকে গন্ধরাজ, জুঁই, বেলী, চামেলী, চাঁপা, অপরাজিতাকে উপেক্ষা করিও না। বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করা ভালই, কিন্তু স্বদেশী ভাষা ও স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় ত্রুটি

www.nagorikpathagar.org

করিও না। স্বদেশী সাহিত্যের সেবায় দেশপ্রীতি জাগিবে, হিন্দু মুসলমানদের ভেদ ঘুচিবে, স্বরাজ্য আসিব।" **(সভাপতির ভাষণ ঃ পূর্ব ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলন, একাদশ অধিবেশন কিশোরগঞ্জ ১৯৩৮)**।

ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আগ্রহ ও পাণ্ডিত্য ছিল গভীর। তিনি উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করেন। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে পৃথিবীর সব বড় বড় ধর্মের সাথে তুলনামূলক বিচার করে ইসলামকে তিনি শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করলেও অন্য ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন সহিষ্ণু। সর্বক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন ছিল তাঁর অন্যতম চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। তিনি কখনো অন্য ধর্ম বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন নি। নিজ ধর্মের প্রতি তাঁর যে গভীর আকর্ষণ ও তা পালনে তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত আচরণেও তার প্রকাশ ছিল সুস্পষ্ট। ইসলামী বিষয় নিয়ে লেখা কয়েকটি গ্রন্থ তাঁর এ নিষ্ঠাপূর্ণ, অনুসন্ধিৎসূ ধর্মীয় আবেগেরই প্রমাণ বহন করে। এ কারণে অনেকের নিকট তিনি ধর্মবেত্তা হিসাবে বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বাংলা সাহিত্যে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। বড়দের জন্য, শিশুদের জন্য তথা সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। অনুবাদেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের তালিকা থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক রচনায়ও তাঁর কৃতিত্ব তুলনাহীন। এ সম্পর্কে ডক্টর সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য। তিনি বলেনঃ "ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ শব্দবিদ্যাবিদ ছিলেন, সেই সঙ্গে সাহিত্যিকও ছিলেন। তিনি চমৎকার ঝরঝরে বাংলা লিখতেন এবং তাঁর প্রসন্ন সাহিত্যবোধও ছিল।" এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে আমরা সাহিত্যিক হিসাবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র যথার্থ পরিচিতি খুঁজে পাই।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, জাতীয় জাগরণ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অসামান্য অবদান রয়েছে। বিংশ শতাব্দির উন্মেষ-লগ্ন থেকে প্রায় সাত দশক কাল পর্যন্ত তিনি এসব ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তার ফলে জাতি নানাভাবে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, গবেষণা ও মনন-চর্চার ক্ষেত্রে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এক অনুকরণীয় অনন্য ব্যক্তিত্ব। যেসব মহান ব্যক্তির কাছে জাতি নানাভাবে চিরদিন ঋণী হয়ে থাকবে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহীম খাঁ

ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতা-সাহিত্যের প্রভাবে বাঙালি হিন্দু সমাজে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা-লগ্নেই নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। বাঙালি মুসলিম সমাজে এ নবজাগরণ সৃষ্টি হয় এর অর্ধশতাব্দি কাল পরে। কারণ পলাশি যুদ্ধের পর ইংরাজদের বৈরি আচরণের ফলে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষভাব ছিল। এ কারণে তারা ইংরাজি শিক্ষা লাভে অগ্রসর হয়েছে অনেক পরে। মূলত ১৮৫৭ সনে মহাবিদ্রোহ তথা সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতা বরণের পর তারা নিরূপায় হয়ে ভাগ্যোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ইংরাজি শিক্ষা লাভে অগ্রসর হয়। ১৮৬৩ সনে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' গঠনের পর ভারতীয় মুসলমানগণ ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হন। ফলে বাঙালি মুসলিম সমাজে নবজাগরণ ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। এক্ষেত্রে দানবীর হাজী মোহাম্মদ মুহসীন, স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-৯৩), স্যার সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখের অবদান ছিল অসামান্য। বাঙালি মুসলিম সমাজে যে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে, তার শ্রেষ্ঠ ফসল হলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুনসী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯১৪), মুনসী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), আব্দুল করীম সাহিত্য-বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৬), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), কাজী এমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), একরাম উদ্দীন (১৮৮২-১৯৩৫), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রমুখ। নজরুল ইসলাম এ নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ ফসল।

www.nagorikpathagar.org

নজরুলের সমসাময়িক অন্য যাঁরা এ নবজাগরণের ধারাকে সমুন্নত রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন : শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৯), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন (১৯০১-৮১), বেনজির আহমদ (১৯০৩-৮৩), জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), আবুল ফজল (১৯০৫-৮৩), ফররুখ আহমদ ১৯১৮-৭৪ প্রমুখ। উপরোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। বর্তমান নিবন্ধে বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম প্রাণ-পুরুষ ইব্রাহিম খাঁর অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়াস পাব।

ইব্রাহিম খাঁ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি একাধারে প্রবন্ধকার, নাট্যকার, গদ্য-লেখক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ ও সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সুপরিচিত। ১৮৯৪ সনের ২ সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল জেলার বিরামদী গ্রামে তিনি এক মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহবাজ খাঁ এবং মাতার নাম রতন খানম। তিনি ১৯১২ সনে পিংনা হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৯১৪ সনে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ থেকে এফ.এ, ১৯১৬ সনে কলকাতা সেন্ট পলস কলেজ থেকে ইংরাজিতে বি.এ অনার্স ও ১৯১৯ সনে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে এম.এ পাশ করেন। টাঙ্গাইলের করটিয়া ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসাবে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯২০ সনে তিনি ভারতীয় কংগ্রেস পার্টিতে যোগদান করেন। অতঃপর তিনি অসহযোগ ও খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০-২২) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর চেষ্টায় করটিয়া ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয় জাতীয় বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়।

১৯২৪ সনে তিনি আইন পাশ করে শিক্ষকতা পেশা পরিত্যাগ করে ময়মনসিংহ জজকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। ঐ সময় তিনি ময়মনসিংহে 'আল হেলাল সাহিত্য সমিতি' গঠন করে তরুণদেরকে সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। উক্ত সাহিত্য সমিতি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম বিষয়ক রচনা আহ্বান করত এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে তিনটি ভাল রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান করত। এর উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন ও তরুণ সাহিত্যিক সৃষ্টিতে প্রেরণা দান। (দ্র. "বিবিধ প্রসঙ্গ", 'সাম্যবাদী', ৩য় বর্ষ-

www.nagorikpathagar.org

২য় সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৩১, পৃ. ৬)। প্রথম বছরের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এ রচনা প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন তৎকালিন চট্টগ্রাম কলেজের মেধাবী ছাত্র মুহাম্মদ এনামুল হক (পরবর্তীতে ডক্টর) এবং রৌপ্য পদক পেয়েছিলেন হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র মুহাম্মদ মনসুর ও ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী মোসাম্মত জোবেদা খাতুন।

ওকালতি পেশায় সততা বজায় রেখে কাজ করা অসম্ভব বিবেচনা করে ইব্রাহীম খাঁ দু'বছর পর আইন ব্যবসা পরিত্যাগ করে ১৯২৬ সনে করটিয়ার জমিদার দানবীর ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর অর্থ সাহায্যে করটিয়া সা'দত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কলেজে তিনি প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। তৎকালিন যুক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম এ পদ অলংকৃত করেন। পরবর্তীতে উক্ত কলেজ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা ও দক্ষ পরিচালনায় তদানীন্তন যুক্ত বাংলায় এক ঐতিহ্যবাহী নামকরা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এক সময় উক্ত কলেজ 'বাংলার আলীগড়' হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এ কারণে সমসাময়িককালে তাঁর নামের সাথে 'প্রিন্সিপাল' শব্দটি অনিবার্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। তিনি এ নামেই বিশেষভাবে পরিচিত হন। শিক্ষাব্রতী হিসাবে তাঁর অবদান সম্পর্কে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষক ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন : "বাংলার উচ্চ শিক্ষাব্রতী মুসলমান সমাজে তিনি ছিলেন এক অনুপ্রেরণা স্বরূপ। তাঁর প্রেরণা ও উৎসাহে অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে ফেলে শিক্ষার আলোতে ছুটে আসতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে এ কালের বহু মুসলমান। তাই তাদের চেতনায় প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মুসলিম সমাজে সকলের আগে প্রিন্সিপাল হয়ে যে অসাধ্য তিনি সাধন করেছেন তার জন্য দেশবাসী 'প্রিন্সিপাল' শব্দটি অতিশ্রদ্ধাভরে তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।"

১৯৩৭ সনে ইব্রাহীম খাঁ কংগ্রেস পরিত্যাগ করে ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ঐ বছর তিনি মুসলিম লীগের মনোনয়নে অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের অধিবেশনে শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেন, যেখানে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা নিয়ে আরেকটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি জানানো হয়। এ ঐতিহাসিক প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হবার পর সমগ্র উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন জোরদার হয়। প্রিন্সিপাল

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহিম খাঁ এ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন।

১৯৪৬ সনে ইব্রাহীম খাঁ মুসলিম লীগের টিকিটে মধুপুর-গোলাপপুর কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী করটিয়া সা'দত কলেজের অধ্যক্ষ পদে সুদীর্ঘ ২২ বছর দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি (১৯৪৭-৭১) ও ১৯৪৮-৫২ পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৩ সনে তিনি পাকিস্তান গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কিন্তু পরবর্তী বছর ১৯৫৪ সনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যুক্তফ্রন্টের নিকট পরাজিত হন। ১৯৫৭ সনে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৬২ সনে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার অধীনে ময়মনসিংহ ২ আসন থেকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ক্ষমতাসীন কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদান করেন। ১৯৭০ সনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে মুসলিম লীগের (কাইয়ুমপন্থী) মনোনয়নে টাঙ্গাইল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। বিভিন্ন সময় তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে যোগদান করেন। এ উপলক্ষে তিনি তুরস্ক, মিশর, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরান, চীন ইত্যাদি দেশ পরিভ্রমণ করেন।

আজীবন শিক্ষাব্রতী হিসাবে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ বাঙালি মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো জ্বালাতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। অধঃপতিত মুসলিম জাতি তখন অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি আশা করা যায় না। তাই ইব্রাহীম খাঁ নিজে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে আজীবন শিক্ষাদান কাজে নিরত থাকেন। পাঠ্য বই রচনা ও শিক্ষামূলক নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেন। শিক্ষার উন্নয়নে তিনি অসংখ্য সভা-সেমিনারে যোগদান করেন। বিভিন্ন স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারে অসামান্য অবদান রাখেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভুয়াপুর হাই স্কুল, ভুয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়, ভুয়াপুর কলেজ, করটিয়া জুনিয়র গার্লস মাদ্রাসা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশ ও জাতির খেদমত করা। রাজনীতির মাধ্যমে তিনি সারাদেশে শিক্ষা বিস্তার, মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণ ও জাতীয় উন্নয়নে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর মত নিঃস্বার্থ সমাজকর্মী ও জনকল্যাণকামী মহান ব্যক্তি আমাদের দেশে অতিশয় দুর্লভ।

www.nagorikpathagar.org

ব্যক্তিগতভাবে ইব্রাহিম খাঁ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান, অমায়িক, বিনয়ী ও সজ্জন ব্যক্তি। নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়ে এবং মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করা সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক উদার ব্যক্তি। ১৯৫০ সনে ঢাকায় ও ১৯৬৪ সনে টাঙ্গাইলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সূত্রপাত হলে তিনি সর্বাগ্রে তা প্রতিরোধ করার জন্য সচেষ্ট হন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁর আচার-আচরণ ছিল অতিশয় উদার, অমায়িক ও মানবিক। এ প্রসঙ্গে তাঁর একজন বিখ্যাত ছাত্র 'জাদু সম্রাট' পি.সি. রায়ের উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে তাঁর শিক্ষক ইব্রাহীম খাঁকে 'হৃদয় সম্রাট' হিসাবে আখ্যায়িত করেন।

একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম হিসাবে ইসলামের মধ্যেই মুসলমানদের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং এ লক্ষ্যে সারা জীবন কাজ করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। তৎকালিন ভারতের বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা কমরেড মুজাফফর আহমদ তাঁকে একবার জার্মানি ও রাশিয়ায় পাঠানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন সাংবাদিকতা ও কমিউনিজম অধ্যয়নের জন্য। তিনি সবিনয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যন করে বলেছিলেন ঃ "বলশেভিকরা শোষক আর জালিমের সঙ্গে আল্লাহকে আক্রমণ করেছে, ধার্মিক বলে আমার কোনো দাবি নেই, নেই অহঙ্কার কিন্তু আমি বিশ্বাস করি আল্লাহর পথই ব্যথিত দরিদ্র মানুষের মুক্তির পথ। কাজেই আল্লাহহীন পথ আমার পথ নয়।"

বহুবিধ কাজের মধ্যে ইব্রাহীম খাঁর প্রধান পরিচয় হলো লেখক হিসাবে। এক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিচিত্র ও বিশাল। তিনি একাধারে প্রবন্ধ, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী, স্মৃতিকথা ও শিশুতোষ গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ :

নাটক : কামাল পাশা (১৩৩৪), আনোয়ার পাশা (১৩৩৭), ঋণ পরিশোধ (১৯৫৫), ভিস্তি বাদশা (১৯৫৭), কাফেলা।

উপন্যাস : বৌ বেগম (১৯৫৮)।

গল্পগ্রন্থ : আলু বোখরা (১৯৬০), উস্তাদ (১৯৬৭), দাদুর আসর (১৯৭১), মানুষ, হিরকহার।

স্মৃতিকথা : বাতায়ন (১৩৭৪)।

ভ্রমণ কাহিনী : ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র (১৯৫৪), নয়া চীনে এক চক্কর, পাকিস্তানের পথে-ঘাটে।

শিশু সাহিত্যঃ ব্যাঘ্র মামা (১৯৫১), শিয়াল পণ্ডিত (১৯৫২), নিজাম ডাকাত (১৯৫০), বেদুঈনদের দেশে (১৯৫৬), ইতিহাসের আগের মানুষ

www.nagorikpathagar.org

(১৯৬১), গল্পে ফজলুল হক (১৯৭৭), ছোটদের মহানবী, ছেলেদের শাহনামা, ছোটদের নজরুল, গুলবাগিচা, নবী জীবনের ঝাণ্ডা বহিল যারা, তুর্কী উপকথা, নীল হরিণ, সোহরাব রোস্তম ইত্যাদি।

ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ: মহানবী মুহাম্মদ, ইসলাম সোপান, ছোটদের মিলাদুন্নবী।

শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ : আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সংস্কৃতির মর্মকথা, ইসলামের মর্মকথা, নীতিকাহিনী ইত্যাদি।

ইব্রাহীম খাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১১৮টি। এর মধ্যে ১৮টি অনুবাদ গ্রন্থ, ইংরাজিতে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা ১২ এবং বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৮৮টি। ইংরাজিতে লেখা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এনেকডোটস ফ্রম ইসলাম' একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও লেখক ইব্রাহীম খাঁর একটি সাধারণ পরিচয় হলো তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে একজন সমাজ-সচেতন, জনদরদী, মানব কল্যাণকামী ও সর্বোপরি অধঃপতিত মুসলিম সমাজের নবজাগরণে বিশ্বাসী এক মহৎ প্রাণের মানুষ। তাঁর সাহিত্যে সর্বত্র এ বিশ্বাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ থেকে তাঁর লেখাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। তাঁর সাহিত্যের ভাষা অতি সহজ, সরল ও সকল শ্রেণির মানুষের নিকট বোধগম্য। তাঁর সাহিত্যের বিষয় ও বিভিন্ন চরিত্রও পরিচিত সমাজ ও পরিপার্শ্ব জগত থেকে সংগৃহীত। সব ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের চিত্র তিনি অতিশয় আন্ত রিকতার সাথে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা ও অনাচার-কুসংস্কারের বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন, মূলত সেগুলোর যুক্তিযুক্ত সমাধান বাতলে দেয়ার জন্য। অধঃপতিত-বঞ্চিত মুসলিম সমাজের উন্নতিকল্পে তিনি নবজাগরণের প্রেরণায় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। সাহিত্য-সাধনা তাঁর নিকট কোন পেশা বা নেশা ছিল না। মূলত সমাজের প্রতি অসীম দায়বদ্ধতা থেকে তিনি সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তাঁর লেখা এক পত্রে তিনি বলেন ঃ "আমার কর্মজীবনের এক বিশাল এক অংশ আমি সাহিত্য সেবায় যাপন করেছি। সাহিত্য সাধনা আমার বিলাস ছিল না, এ ছিল আমার জীবনের অন্যতম তপস্যা। এ তপস্যার মারফত আমি তন্দ্রাহত জাতিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আমার সে আহ্বানে সমাজের সকল মানুষের নিন্দ্রা ভঙ্গ হয় নাই সত্য, তবে অনেকে মোচড় দিয়ে অর্ধজাগ্রত হয়েছে, আর কতক পূর্ণ জাগ্রত হয়ে উঠে বসেছে। আমার এই ক্ষুদ্র সাফল্যকে আমি আমার জীবনের অন্যতম সার্থকতা বলে মনে করি।...."

www.nagorikpathagar.org

ইব্রাহীম খাঁর সাহিত্যের ভাষা সহজ, সরল ও সকলের বোধগম্য হওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব একটি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। ইংরাজ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত (১৮০০) হওয়ার পর সংস্কৃতবহুল, দুর্বোধ্য এবং অলংকারপূর্ণ ভাষায় অনেকে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। এ ভাষা স্বল্প সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সাধারণের জন্য ছিল অনেকটা দুর্বোধ্য। পরবর্তীতে ভাষাকে সহজিকরণ করার চেষ্টা চলে। ভাষার এ সহজিকরণ প্রক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মোহাম্মদ নজিবর রহমান প্রমুখ বিশেষ সফলতা অর্জন করেন। বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সময় নানা জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। ইতঃপূর্বে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে বাংলা ব্যাকরণ লেখার যে প্রচেষ্টা, তার ফলেই এ ধরনের জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার সাথে লেখ্য ভাষার দূরতিক্রম্য ব্যবধানের ফলেও এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা বানান রীতি প্রবর্তনে বাংলা একাডেমী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ ক্ষেত্রে ইব্রাহীম খাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। তিনি মনে করেন, সাহিত্য মানুষের জন্য–সাধারণ মানুষ যাতে সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হয় এবং সহজে সাহিত্য রস আস্বাদন করতে সক্ষম হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই সাহিত্য রচিত হওয়া উচিত। এ সম্পর্কে তিনি ১৯৬৮ সনে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সম্মেলনে বলেন ঃ "একটি হরফ জ্ঞান নেই এমন লাখ লাখ লোক নয়, কোটি কোটি লোক বাংলার পুঁথিপুঞ্জ থেকে পেয়ে আসছে সাহিত্যের রস, চিত্তের আনন্দ, প্রাণের খোরাক। আমরা জনগণের সাহিত্য জনগণের জন্য ফিরিয়ে দিতে চাই, পুঁথি সাহিত্য চাই না, আমরা চাই সহজ-সুন্দর ভাষায় লিখিত জনগণের উপযোগী ভাষা। অকারণে হরফের জুলুম অকারণে বানানের জুলুম এ আমরা বরদাশত করতে চাই না।"

ইব্রাহীম খাঁর রচিত নাটক ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। তাঁর রচিত 'কামাল পাশা' ও 'আনোয়ার পাশা' নাটকে তুরস্কের নবজন্মের কথা বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করাই তাঁর মূল্য লক্ষ্য। তাঁর রচিত 'ঋণ পরিশোধ', 'ভিস্তি বাদশা', 'কাফেলা' প্রভৃতি নাটক সামাজিক বিষয় নিয়ে লেখা। এসব নাটকে আমাদের সমাজে যে সব সমস্যা, অনাচার ও কুসংস্কার বিরাজমান তার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। লেখক সে সব সমস্যার সমাধানও বাতলে দিয়েছেন, সামাজিক অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণার্থে তিনি নাটকের পাত্র-পাত্রীর সংলাপ, ঘটনা ও আখ্যানের বিন্যাস ঘটিয়েছেন। তাঁর রচিত সামাজিক নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ইত্যাদি সবকিছুই চলমান সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন থেকে সংগৃহীত। নাটকের

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন ঘটনা, সংলাপ ও চরিত্রের বর্ণনায় লেখক অত্যন্ত সহজ, সরল, অনেক ক্ষেত্রে হাস্যতরল ও ব্যঙ্গাত্মক ভাষা ও ভঙ্গী ব্যবহার করেছেন।

উপন্যাস ও গল্প রচনায় ইব্রাহিম খাঁ সমাজের বিভিন্ন বিষয় ও জীবনের বিচিত্র দিক তুলে ধরেছেন। এখানেও মূলত সমাজ-সেবা ও সমাজ-সংস্কারই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষা সহজ, সরল ও রসঘন। তাঁর গল্প বলার আয়েশী ভঙ্গী সকলকে মুগ্ধ করে। তাই সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট তা সহজেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

ছোটদের জন্য তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা অনেক। এগুলো অধিকাংশই পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে রচিত। সেকালে লেখকের সংখ্যা ছিল কম, ভাল পাঠ্য-পুস্তকেরও নিদারুণ অভাব ছিল। বিশেষত শিশু-কিশোরদের ভাল ভাল কথা, উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের চরিত্র গঠন ও সাহসী মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইব্রাহীম খাঁ এ সকল গ্রন্থ রচনায় সচেষ্ট হন। শিশু-কিশোরদের উপযোগী গ্রন্থে শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে সহজ, সরল ভঙ্গীতে হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে তিনি অনায়াসে তাদের উপযোগী মনোগ্রাহী গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা শিশু-সাহিত্য শাখায় তাঁর অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রচনায় শিক্ষাবিদ ইব্রাহীম খাঁর চিন্তা-চেতনা, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ ও তা নিরসনের উপায়-নিরূপণ সম্পর্কে তিনি মূল্যবান পরামর্শ দান করেছেন।

ইসলাম বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি ইসলামের মূল আদর্শ ও শিক্ষা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা পেশ করেছেন। শিক্ষিত সমাজকে বিশেষত তরুণদেরকে ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান দানের উদ্দেশ্যেই তিনি এসকল গ্রন্থ রচনা করেন।

ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনায় তিনি পৃথিবীর যে সব দেশ সফর করেছেন, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে সে সব দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক নানা বিষয় রসঘন ও চিত্তাকর্ষকভাবে তুলে ধরেছেন। এসব গ্রন্থ পাঠে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। তাঁর স্মৃতিকথামূলক রচনা 'বাতায়নে' জীবনের ব্যাপক অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ বর্ণনা স্থান পেয়েছে। এটি তাঁর সমকালিন জীবনের এক অবিস্মরণীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রান্তিলগ্নে ইব্রাহীম খাঁর আবির্ভাব। দীর্ঘকাল ইংরাজের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে এবং একাধারে ইংরাজি ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের জুলুম-নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হয়ে বাঙালি মুসলমানগণ অধঃপতনের চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে অধঃপতিত ও আত্ম-সম্মিতহারা মুসলিম জাতির

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে নবজাগরণের এ চেতনা তাদেরকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যোগায়। দীর্ঘ আন্দোলন, সংগ্রাম ও নানা তিক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মুসলমানগণ উপলব্ধি করে যে, এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তারা কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এজন্য শুধু ইংরাজদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন নয়, মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সংকল্পবদ্ধ হয়। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের এ কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়। বাঙালি মুসলমানদের পুনর্জাগরণ, তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম ও স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় যে সব বরেণ্য ব্যক্তির অপরিসীম ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সীমাহীন অবদান রয়েছে, তাদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ অন্যতম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলমানদের কাংক্ষিত স্বাধীন রাষ্ট্রের বুনিয়াদ সঠিক ভিত্তির উপর গড়ে তোলার জন্য তিনি আমাদের রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার প্রয়াস পান।

ইসলামের প্রতি অনুরাগ, মুসলমানদের প্রতি দরদ ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নে ইব্রাহীম খাঁর কত গভীর আগ্রহ ছিল এবং এ জন্য তিনি কতটা আন্তরিকতা সহকারে চিন্তা-ভাবনা করতেন, কাজী নজরুল ইসলামকে লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে তা সুস্পষ্ট হয়। উক্ত চিঠি ১৩৩৪ সনের ভাদ্র সংখ্যা 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমাদের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে উক্ত চিঠির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে তা হুবহু উদ্ধৃত হলোঃ

"ভাই নজরুল ইসলাম,

তোমাকে কখনো দেখি নাই। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগও ঘটে নাই– দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তঃস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি। বলেছি– 'প্রভু, এ কাঙ্গাল বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে একটি রত্ন দিয়েছ, একে রক্ষা করো– সমাজকে দিয়ে ওর কদর করিয়ে নাও।' তোমায় এত আপন ভাবি, এত কদর করি বলেই আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে তোমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছি। তোমার গুণমুগ্ধ, তোমার প্রীতি আকাংক্ষী, তোমার ভক্ত ভাইয়ের এ আবদার তুমি রক্ষা করবে, তাও জানি।

আজ তোমায় কয়টি কথা বলব, গুরুরূপে নয়– ভাইরূপে, ভক্তরূপে। এ কথাগুলি বলব বলে অনেকবার তোমার সাক্ষাৎ খুঁজেছি। পাই নাই। কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

কথাগুলিও বুকের তলে অনুদিন তোলপাড় করছে। তাই পত্র মারফতই বলতে চেষ্টা করছি। আমি আগেই বলেছি, বাংলার মুসলমান সমাজ কাঙ্গাল : শুধু ধনে নয়, মনেও। তাই বাংলার অ-মুসলমানরা তোমায় যে কদর করছেন, মুসলিমরা তা করেন নাই, করতে শেখেন নাই। এ কথা ভেবে অনেক সময় লজ্জায় মাথা নত করেছি, সমাজকে নিন্দা করেছি, বন্ধু মহলে রোষ প্রকাশ করেছি। কিন্তু সে শুধু নিন্দায় ফায়দা কি? শুধু আস্ফালনে ফলল কি? সমাজ যে পতিত, দয়ার পাত্র; তাই সেই ভাবে তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে হবে, পথে আনতে হবে। আর তাদের কাছে ত আমার সে আবদারের অধিকার নাই, যে আবদার তোমার কাছে আমি করতে পারি। তাই এবার সমাজ ছেড়ে তোমার দিকে ফিরেছি। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা। কে সে সুধার পাত্র হাতে নিয়ে এই মরণোম্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে? কোন্ সুসন্তান আপন তপোবনে গঙ্গা আনয়ন করে এ অগণ্য সগরগোষ্ঠীকে পুনঃ জীবনদান করবে, কাঙ্গাল সমাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে করুণ নয়নে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছে। কেন জানি না; কিন্তু মনে হয় তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভাণ্ডের কিঞ্চিত দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধনার বীজ জমা আছে। হাত বাড়াবে কি? একবার সাহসে বুক বেঁধে সে তপশ্চারণে মনোনিবেশ করবে কি?

সুদূর অতীত ইতিহাসের প্রান্তসীমানার ওপর হতে যে অস্পষ্ট, অর্দ্ধশ্রুত মায়াধ্বনি ভেসে আসে সে কবির কণ্ঠস্বর। কবি যে যুগে যুগে সত্যের গীতি, কল্যাণের গীতি, বিরাট অনন্ত মহাজীবনের নিগূঢ় ভিত্তিকর্মের উদ্বোধন গীতি গেয়ে এসেছে। স্নেহবাৎসল্য ভরপুর মাতৃক্রোড়ে আধ নিমিলিত আঁখি শিশুর শয্যাপার্শ্বে, নবীন-নবীনার মিলন তীর্থ-বিবাহবাসরে, ধর্ম যাজকের উন্নত বেদীতে, কর্মবীরের উলঙ্গ অসি-বর্শার রঙ্গ ভূমি যুদ্ধক্ষেত্রে সমরশেষে বিজয়ের উল্লাস নিনাদে, শহীদের শোকে নিহতের কল্যাণ-কামনায়, মহাযাত্রীর সমাধি ধারে কবির লীলায়িত বাণী-ধ্বনি যুগে যুগে ঝংকৃত হয়েছে; মহামানবের মনোজ্ঞ করে যখনই যিনি যে বাণী প্রচার করতে চেয়েছেন, তিনি যত বড় মহাসত্যই প্রচার করুন না, তিনি কবির বচন লালিত্যে মধুর করে তা বলতে চেয়েছেন, বলেছেন। কারণ বিশিষ্ট শক্তি স্ফুরিত স্বল্পসংখ্যক-বিশেষজ্ঞ রসশূন্য নির্মম বাণীর মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু বিশ্ব-মানবের চিত্ত স্পর্শ করতে হলে সেইভাবে উদ্বেলতরঙ্গায়িত বচন-প্রবাহেই তো করতে হবে, যাকে ধরবার জন্য খোদাতা'লার স্থাপিত রাজধানীর দুই পার্শ্বের বেতার স্টেশন দুইটি অনুদিন এত উদগ্রীব এবং যার মৃদু আঘাতে প্রাণের বীণায় নীরব তারে সহসা আকুল রাগিণী ঝংকার জেগে উঠে মানব দেহের স্নায়ুর তন্ত্রীতে উন্মাদনার তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়ে দেয়। তুমি সেই কবিদের একজন; তোমার কণ্ঠে

www.nagorikpathagar.org

সেই সঞ্জীবনী সুধার উন্মাদনা আছে।

কিন্তু ভাই তোমায় জিজ্ঞাসা করছি, কোন্ ব্রতে তোমার সে কণ্ঠস্বর তুমি নিয়োজিত করেছ? তোমার প্রতিভা অদ্ভুত, কিন্তু তারো চেয়ে গুরুতর তোমার দায়িত্ব। কড়ির মালিক যে, তার নিকাশ না দিলেও বড় আসে যায় না, কিন্তু মানিকের মালিকের নিকাশ দিতেই হবে; তোমার প্রতিভাকে ত তোমায় সার্থক করতে হবে।

কোন্ পথে সে সার্থকতার অন্বেষণ করবে? বিদ্রোহে?– উত্তম। কিন্তু বিদ্রোহকেও সুনিশ্চিত উদ্দেশ্যযুক্ত করতে হবে, শুধু তোমার 'যখন চাহে এ মন যা' উন্মাদ ঝঞ্ঝার মত চললে তোমার জীবনের সার্থকতার নৈকট্য কোথায়? তৈমুরের বিরাট দুর্বার অভিযানের দিকে আমরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকি, তারপর ক্লান্ত চোখ ফিরিয়ে নেই, এবং তাঁর কথা ভুলে যাই; কিন্তু বাবরের ক্ষুদ্রতর অভিযানের কথা ভুলতে পারি না। তাঁর অভিযান আমাদেরকে দিয়েছে দিল্লী, আগ্রা, ময়ুরাসন; সর্বোপরি দিয়েছে তাজমহল। তোমার কাছে আমরা চাই বাবরের অভিযান, সে অভিযানের দক্ষিণে-বামে অগ্রে-পশ্চাতে নব নব সৃষ্টির সৌধ বাংলার মুসলিমরা তোমার কদর করে নাই; কিন্তু তাই কি তাদেরে তুমি ছেড়ে যাবে? তোমার ক্ষেত্র মুসলিম-সাহিত্য। বাঙ্গালী মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণবাণীর পুনঃ প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। বাংলার আর দশজন কবির মত যদি তুমি কবিতা লেখ, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি পাবে, কিন্তু সে আসন আসন মাত্র, সিংহাসন নয়। আজ বাংলার মুসলমান-সাহিত্য রাজ্যে সিংহাসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি শুধু দখল করলেই হয়। মধুসূদন যদি শুধু ইংরাজী কাব্যই লিখতেন, তবে হয়ত একজন বায়রন হতে পারতেন, কিন্তু মধুচক্র রচয়িতা হতে পারতেন না। কিন্তু আমি শুধু যশের, শুধু প্রতিষ্ঠার দিক দিয়ে এ প্রশ্নের বিচার করছি না।

আমার বক্তব্য এই : যেখানে দশটা অভাব আছে, সেখানে যদি সব অভাবগুলি একসঙ্গে দূর করা না যায়, তবে যেটি সবচেয়ে বড় অভাব, সেইটি আগে দূর করতে চেষ্টা করতে হবে। এখন বিচার করতে হয়; তুমি বাঙ্গালী কবি, তুমি মুসলমান। বাঙলার কোন্ কল্যাণ সাধনে তোমার আগে অগ্রসর হওয়া দরকার?

বাঙ্গালীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ, সবচেয়ে কলঙ্কিত, সবচেয়ে নিন্দিত, কুলিখিত বিষয় ইসলাম। যিনি বাঙলার সাহিত্যে ইসলামের সত্য সনাতন নিষ্কলঙ্ক চিত্র দান করবেন, যিনি 'এইসব ভগ্ন শুষ্ক শ্রান্ত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তুলবেন, যিনি ইসলামের সত্যস্বরূপ দেশের সম্মুখে ধরে মুসলিমের বুকে

www.nagorikpathagar.org

বল দিবেন, অমুসলিমের বুক হতে ইসলামের অশ্রদ্ধা দূর করতে হিন্দু-মুসলমান মিলনের সত্য ভিত্তির পত্তন করবেন, তিনি হবেন বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূত।' তুমি চেষ্টা করলে তাই হতে পার; তুমি সেই মহাগৌরবের আসন দখল করতে পার; তুমি এইরূপে তোমার কবি প্রতিভাকে, তোমার জীবনকে, তোমার মানবতাকে সহজতমরূপে সার্থক করতে পার।

আরো এক কথা। এই বাঙ্গালী মুসলিমের মুক্তির অগ্রদূতরূপে যে তুমি আসবে, সে কোন্ পথে? বিদ্রোহের পথে? আমার মনে হয়, না, তা নয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, 'Line of least resistance' বা লঘুতম বাধার পথে অগ্রসর হওয়া সমীচীন। সত্যিকার ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কিছু নাই; ইসলাম আধুনিকতার উন্নততম ধর্ম, তবে যা বাংলার মুসলিমরা অনেক কুসংস্কারে পড়েছে, সে ইসলামের দোষ নয়, এই হতভাগারা ইসলামের সাথে ঐ কুসংস্কারগুলি পোষণ করছে। এখন এই কুসংস্কারগুলি দূর করতেই হবে, কিন্তু সেগুলি যে ইসলামের অনুশাসন নয়, বরং ইসলামের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে, ইসলামকে ইসলামের কোন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধ মত, এই বলে সেগুলির নিন্দা করতে হবে, ইসলামকে পবিত্র নামে হয়ত অজ্ঞাতে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করছে, তারাও ইসলামের নিন্দা সইতে পারে না, সুতরাং ইসলামের নিন্দার নামে খুব ভাল কথা বললেও তারা শুনবে না। যাদের শুনাবার জন্য বলা, তারাই যদি না শোনে তবে সে বলায় লাভ কি? কিন্তু মুসলিমদের একটা গুণ আছে, তারা ধর্মের নামে পাগল নয়; তাই সে হাফিজ-রুমীকে সত্য সাধক বলে বরণ করে নিয়েছে, তাই সে শেখ সাদীকে দৈনন্দিন জীবনের বহু কাজে আদর্শ মেনে নিয়েছে। 'তোমার বিদ্রোহী' পড়ে যাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন, তাঁদের একজন তোমার 'ছুবহে উম্মিদ' পড়ে আনন্দে গর্বে লাফিয়ে উঠেছিলেন, আর নাচতে নাচতে এসে আমায় বলেছিলেন, 'নজরুল যদি এমনি ধারায় লিখত তবে বাংলার আলিমরা যে তাকে মাথায় করে রাখত' [যিনি বলেছিলেন, তিনি একজন আলীম]। একথা কয়টা তোমায় ভেবে দেখতে বলি। বাংলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে রয়েছে, তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাংলার মুসলিমকে বাংলার সাহিত্যকে ধন্য কর।

তাই আজ বড় আশায়, বড় ভরসায়, বড় সাহসে, বড় মিনতির স্বরে তোমায় বলছি, ভাই কাঙ্গাল মুসলিমের বড় আদরের ধন তুমি, তুমি এই পতিত মুসলিম সমাজের দিকে, এই অবহেলিত ইসলামের দিকে একবার চাও; তাদের ব্যথিত চিত্তের করুণ রাগিণী তোমার কণ্ঠে ভাষা লাভ করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে তুলুক, তাদের সুপ্ত প্রাণের জড়তা তোমার আকুল আহ্বানের উন্মাদনায় চেতনাময়ী হোক,

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের মহান উদার আদর্শ তোমার কবিতায় মূর্তি লাভ করুক, তোমার কাব্য সাধনা ইসলামের মহান নীতিতে চরম সার্থকতায় ধন্য হোক। আমিন।

অনেক কথা বলে ফেল্লাম ভাই– মাফ করো। ভাইয়ের কাছে ভাই যদি এমন প্রাণ খুলে কথা না বলবে, তবে বলবে কোথায়? গুণমুগ্ধ– ইব্রাহীম খাঁ।"

নজরুলের নিকট লেখা ইব্রাহীম খাঁর উপরোক্ত পত্রটি থেকে ইসলামের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা ও মুসলিম সমাজের উন্নয়নে গভীর আগ্রহ ও উদ্বেগের বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নজরুল ৩ বছর পর এক দীর্ঘ পত্রে এর জবাব দিয়েছিলেন। সে পত্রটি নানা দিক থেকে ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। নজরুল জীবনের নানা দিক, না বলা দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-চেতনার বিষয় তাতে বর্ণিত হয়েছে।

ইব্রাহীম খাঁ তাঁর অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সময় নানা খেতাব ও পুরস্কার পেয়েছেন। বৃটিশ সরকার তাঁকে প্রথমে 'খান সাহেব' ও পরে 'খান বাহাদুর' উপাধি প্রদান করে। খান সাহেব উপাধি তিনি সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেন এবং খান বাহাদুর খেতাব তিনি পরবর্তীতে বৃটিশ সরকারের মুসলিম-বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদে প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৬৩ সনে পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'তঘমা-এ-কায়দে আযম' খেতাব প্রদান করেন। ১৯৭১ সনে পাক বাহিনীর নৃশংসতার প্রতিবাদে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৭৩ সনে তিনি নাটকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৭৬ সনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক 'একুশে পদক' লাভ করেন। ১৯৭৭ সনে তিনি ভুয়াপুর 'সাহিত্য সংসদ' গঠন করে একুশে পদকের সব অর্থ ও কিছু জমি উক্ত সাহিত্য সংসদে দান করেন। মুসলিম নবজাগরণ, শিক্ষা-সাহিত্য ও সমাজকল্যাণে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখে এ মহান ব্যক্তি ১৯৭৮ সনের ২৯ মার্চ ইন্তেকাল করেন।

www.nagorikpathagar.org

গোলাম মোস্তফা

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের আলোকোজ্জ্বল যুগে কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪) জন্মগ্রহণ করেন। কবি হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিচরণ ছিল স্বচ্ছন্দ। তিনি একাধারে কবি, গীতিকার, সুরকার, গায়ক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, শিশুতোষ-রচয়িতা, অনুবাদক, পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, সমাজ-সেবক ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভা ও গুণের অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্র-যুগে রবিকরোজ্জ্বলে উদ্ভাসিত বাংলা সাহিত্যাকাশে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র-সদৃশ। অন্যদিকে, তাঁর সমসাময়িক কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিভার খর-রৌদ্রতাপে বাংলা সাহিত্য যখন দীপ্ত-সমুজ্জ্বল, গোলাম মোস্তফা সে সময়কার একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে সমাদৃত। মূলত নজরুলের আবির্ভাবের পূর্বেই গোলাম মোস্তফার কবি-খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি হিসাবে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্র-যুগে (১৮৬১-১৯৪১) জন্মগ্রহণ করে গোলাম মোস্তফা যেমন রবীন্দ্র প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত ছিলেন না, পরবর্তীতে তাঁর সমসাময়িক যুগ-স্রষ্টা কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) প্রভাবকেও তেমনি অস্বীকার করতে পারেন নি। উভয় কবির প্রভাব সত্ত্বেও গোলাম মোস্তফা স্বকীয় নিজস্ব বিনম্র ধারা নির্মাণে সক্ষম হয়েছেন। এখানেই তাঁর যথার্থ সার্থকতা। তাঁর এ সাফল্যকে রবীন্দ্র-যুগের কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (১৮৭৮-১৯৫৫), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪), মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২), কালীদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩) প্রমুখ কবির সাথে তুলনীয়। তবে প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বহুমুখিনতার দিক দিয়ে তিনি অনন্যতুল্য।

www.nagorikpathagar.org

১৮৯৫ ঈসায়ী মুতাবিক বাংলা ১৩০২ সন ৭ পৌষ রবিবার মনোহরপুর, শৈলকুপা, ঝিনাইদহ্‌তে গোলাম মোস্তফার জন্ম। অনেকে তাঁর জন্ম সন ১৮৯৭ বলে উল্লেখ করে থাকেন। এর কারণ তাঁর প্রকৃত জন্ম সন আর সার্টিফিকেটে লেখা জন্ম তারিখ এক নয়। তাঁর সার্টিফিকেটে উল্লিখিত জন্ম সন ১৮৯৭ কিন্তু প্রকৃত জন্ম সন ১৮৯৫। এ সম্পর্কে 'আমার জীবন স্মৃতি'তে গোলাম মোস্তফা নিজেই উল্লেখ করেছেন ঃ "আমার জন্ম পল্লী হলো ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) শৈলকুপা থানার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রামে। আমার ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটের বর্ণনানুসারে দেখা যায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে আমার জন্ম। কিন্তু আমার মনে আছে শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হবার সময় আমার আব্বা আমার বয়স প্রায় বছর দুই কমিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই প্রকৃত জন্ম হয়েছিল সম্ভবত ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে। তবে এটা ঠিক যে, যেদিন আমার জন্ম হয় সেদিন বাংলা তারিখ ছিল ৭ই পৌষ রবিবার।"

বিখ্যাত কুমার নদীর তীরবর্তী মনোহরপুর গ্রামের শান্ত, নিরিবিলি, শ্যামল, মনোরম পরিবেশে সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবারে বাংলা কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি গোলাম মোস্তফার জন্ম। কবির পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী এবং দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তাঁরা উভয়েই শিক্ষিত ও কাব্য-রসিক ছিলেন। আরবি ও ফারসি ভাষায়ও তাঁদের যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। কবির আদি পিতৃভূমি ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা) পাংশা থানার অন্তর্গত নিভেকৃষ্ণপুর গ্রামে। পরবর্তীতে কবির পিতা শ্বশুরালয়ে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এ সম্পর্কে কবির দ্বিতীয় পুত্র শিল্পী মোস্তফা আজিজ লিখেছেন ঃ

"বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও কবি গোলাম মোস্তফা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে (?) যশোর জেলার (সাবেক ঝিনাইদহ মহকুমা, বর্তমানে জেলা) মনোহরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী আর দাদার নাম কাজী গোলাম সরোয়ার। তিনিও ছিলেন আরবি এবং ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত। তখন তাঁর আদি বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে রাজবাড়ী জেলা) অন্তর্গত পাংশা থানার 'নিভেকৃষ্ণপুর' গ্রামে।... এরপরে আমার দাদা মরহুম কাজী গোলাম রব্বানী মনোহরপুরে বিয়ে করে এখানেই বসতবাটি হিসাবে বসবাস করার পরিপ্রেক্ষিতে মনোহরপুরেই আমাদের জন্মভূমি নামে সুপরিচিতি লাভ করেছে।"

মনোহরপুর কাজী পরিবারে পূর্ব থেকেই বিদ্যাশিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চা চলে আসছিল। বাংলা ছাড়াও আরবি-ফারসি ভাষার ব্যাপক চর্চা ছিল সেখানে। কবির পিতা ও পিতামহ উভয়েরই গ্রাম্য কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ছিল। মনোহরপুর গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিজুলিয়া গ্রামে এক সময় নীল কুঠি ছিল। ইংরাজ নীলকরদের

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারে নিরীহ গ্রামবাসী কৃষক অতিষ্ঠ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এ বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক ছিলেন কবির পিতামহ কাজী গোলাম সরোয়ার। তিনি নীলকরদের অত্যাচার-নির্যাতনের বর্ণনা সংবলিত একটি গান রচনা করেন, যা ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথিত আছে, কবির পিতা গোলাম রব্বানী তৎকালে প্রকাশিত হিতবাদী, মিহির ও সুধাকর, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন এবং নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করতেন। তৎকালে মুসলিম সমাজে রাত্রিবেলা বাড়ি বাড়ি পুঁথি পাঠের আসর বসতো। কবির পিতা গোলাম রব্বানী নিজ বাড়িতে পুঁথি পাঠের আসরে সুর করে পুঁথি পাঠ করতেন। এসব পুঁথির মধ্যে জঙ্গনামা, আমীর হামজা, কাসাসুল আম্বিয়া, গুলে বকৌলি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির পরিবার ও তাঁর পূর্ব পুরুষদের সম্পর্কে কবির জ্যৈষ্ঠা কন্যা ফিরোজা খাতুন তাঁর রচিত 'আমার আব্বা কবি গোলাম মোস্তফা' নামক স্মৃতিকথায় লিখেছেন ঃ

"কবি গোলাম মোস্তফার পিতার জন্ম কাজী বংশে। তিনি মুন্সীগিরি করতেন পোস্ট অফিসে, তাই তাঁর নাম ছিল মুন্সী গোলাম রব্বানী। পুঁথি পড়ার আসর বসাতেন, বিয়ের উপহারপত্র লিখতেন, নীলকর বিরোধীদের কবিতা ও শ্লোগান লিখে দিতেন। তবু আমার মনে হয় আব্বার প্রতিভা ও পরিবেশ দাদীর কাছ থেকেই বেশি প্রভাবিত।... এক দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে, আব্বাস উদ্দীন সাহেবকে নিয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে আব্বা সাত দিন ধরে এক বিরাট গানের জলসা বসিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের মান্যগণ্য গায়ক, শ্রোতা, সাধারণ মানুষের ভিড়ে বাড়িসহ সারা গ্রাম মুখরিত। প্রতিদিন গরু-ছাগল-মুরগী, পুকুরের মাছ রাঁধা হত, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা. গল্প-গুজবের সে যে কি আনন্দমুখর পরিবেশ– তা উপভোগ করা ছাড়া বর্ণনায় বলা সম্ভব নয়। তখন গায়ক আব্বাস চাচা গিয়েছেন দাদীর সঙ্গে দেখা করতে বাড়ির মধ্যে। দাদী বললেন, 'কি দেখতে আসছো বাবা। খোকা (আব্বার ডাক নাম) আমার সরোবরের পদ্মফুল– ওপর থেকে দেখাই ভাল... বোঁটা বেয়ে গোড়ায় গেলে শুধু পাক (কাদা) পাবে'। চাচা মুগ্ধ হয়ে উত্তর দিলেন– 'যে স্থান থেকে ঐ পদ্মফুলের উৎপত্তি সেই পাক স্থানকেই (পবিত্র) সালাম করতে এলাম'। এ রকমভাবে সব সময় তিনি শ্লোক, উপমা, ছড়া ও স্বরচিত সুরসিক, সুমধুর বাক্যে কথা বলে মানুষকে আকর্ষণ করতেন।" **(নতুন কলম, অক্টোবর ১৯৯৭, পৃ. ১৯)**।

মাত্র চার বছর বয়সে পিতার নিকট গোলাম মোস্তফার লেখাপড়ায় বিস্‌মিল্লাহখানি হয়। এরপর প্রথমে পার্শ্ববর্তী দামুকদিয়া গ্রামের পাঠশালা অতঃপর ফাজিলপুর গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এরপর কবি শৈলকুপা হাইস্কুলে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পাশ করেন

www.nagorikpathagar.org

১৯১৪ ঈসায়ীতে। অতঃপর ১৯১৬ সনে খুলনায় দৌলতপুর কলেজ থেকে আই.এ. ও ১৯১৮ সনে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। এরপর তিনি শিক্ষকতা পেশায় যোগ দেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত থাকাকালে কবি ১৯২২ সনে কলকাতা ডেভিড হেয়ার কলেজ থেকে বি.টি পাশ করেন।

মূলত গোলাম মোস্তফা পেশাগতভাবে ছিলেন শিক্ষক। শিক্ষকতা কাজে তাঁর দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। শিক্ষক হিসাবে তিনি যেখানেই গেছেন, সেখানেই বিশেষ সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত হয়ে তিনি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর সরকারি হাইস্কুলে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯২৪ সনে সেখান থেকে কলকাতা হেয়ার স্কুলে বদলি হন। এরপর ১৯৩২ সনে কলকাতা মাদ্রাসায় যোগ দেন। সেখান থেকে ১৯৩৫ সনে বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট ডিমনস্ট্রেশন হাইস্কুলে প্রথমে সহকারী প্রধান শিক্ষক ও পরবর্তীতে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর কিছুকাল হুগলি কলেজিয়েট হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক ও পরে বাঁকুরা জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের (১৯৪০-১৯৪৬) দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষে ফরিদপুর জেলা স্কুলে ১৯৪৬-১৯৫০ সন পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি ঢাকায় শান্তিনগরে বাড়ি করে সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। এ সময় তাঁর বাড়ি 'মোস্তফা মঞ্জিল' সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯৬৪ সনে ১৩ অক্টোবর সেরিব্রাল থ্রম্বসিস্ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ৬৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

শিক্ষকতার পাশাপাশি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার সাথেও জড়িত ছিলেন। ১৯২৭ সনে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মুখপাত্র 'সাহিত্যিকা' পত্রিকা প্রকাশিত হলে তিনি সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাথে যৌথভাবে এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। বাংলা ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ডের ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'পূরবী'র তিনি যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল হাই। 'পূরবী'র মাত্র একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর গোলাম মোস্তফার একক সম্পাদনায় রাইটার্স গিল্ডের মুখপত্র 'লেখক সংঘ পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। 'নও বাহার' পত্রিকাটিও তিনি পরিচালনা করতেন। এ পত্রিকাটির সম্পাদিকা ছিলেন কবির দ্বিতীয়া স্ত্রী মাহফুজা খাতুন।

কবি গোলাম মোস্তফা প্রকাশনা ও পুস্তক পরিবেশনার কাজেও কিছুটা জড়িত ছিলেন। কলকাতার ৪৫নং মির্জাপুর স্ট্রীটে 'মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরি'

www.nagorikpathagar.org

নামে তাঁর একটি লাইব্রেরি ছিল। ১৯৪৫ সনে তিনি উক্ত একই নামে ঢাকায় ৯৫নং ইসলামপুর রোডে একটি লাইব্রেরি স্থাপন করেন এবং সে সাথে জিন্দাবাহার লেনে স্থাপন করেন 'মুসলিম বেঙ্গল প্রেস'। এ লাইব্রেরি ও প্রেস যতটা না তাঁর জীবিকার্জনের সহায়ক ছিল, তার চেয়ে বেশি সহায়ক ছিল তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশ ও পরিবেশনার কাজে।

কবি গোলাম মোস্তফা বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠনের সাথে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। কলকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি', 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি', বিভাগ-পরবর্তীকালে পাকিস্তান আমলে ঢাকায় 'পাকিস্তান মজলিশ', 'রওনক', 'পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড', 'পাক-সাহিত্য সংঘ' প্রভৃতি সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। রাইটার্স গিল্ড-এর কেন্দ্রিয় ও এর পূর্ব পাকিস্তান শাখার তিনি অন্যতম কর্মকর্তা ছিলেন। 'রওনক'-এর বেশির ভাগ অনুষ্ঠান তাঁর নিজ বাড়ি 'মোস্তফা মঞ্জিলে'ই অনুষ্ঠিত হতো। ১৯৬১ সনে ঢাকায় নবগঠিত 'পাক সাহিত্য সংঘে'র দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত সেমিনারের (১১-১২ নভেম্বর, ১৯৬১) প্রথম দিনে তিনি মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল ঃ 'ইসলামী সাহিত্যের স্বরূপ'। এতে সভাপতিত্ব করেন জ্ঞানতাপস বহু ভাষাবিদ ও শিক্ষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এতে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ আব্দুল হাই, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, কায়দে আজম কলেজের (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী কলেজ) অধ্যাপক মহিউদ্দিন আহম্মদ, অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র শাহ আব্দুল হান্নান ও মুহম্মদ মতিউর রহমান (গ্রন্থাগার)। উক্ত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধে গোলাম মোস্তফা ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন, তা উপস্থিত সকলের প্রশংসা অর্জন করে।

'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সাথে কবি গোলাম মোস্তফার সম্পৃক্তি সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন ঃ "আমার স্পষ্ট মনে আছে ১৯১৭ সনের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউটে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম। সেই সভায় গোলাম মোস্তফা সাহেব 'কবি ও বৈজ্ঞানিক' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি আমার এত ভাল লেগেছিল যে আমি আমার গলার হার তাঁর গলায় পরিয়ে দিয়েছিলাম।" **(ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ কবি গোলাম মোস্তফা ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ)।**

www.nagorikpathagar.org

এভাবে দেখা যায়, বহু সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোলাম মোস্তফা সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ১৯৪১ সনে তিনি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে'র সপ্তম অধিবেশনের কাব্য শাখার সভাপতি ছিলেন। সভাপতির ভাষণে তিনি যে উদ্দীপনাপূর্ণ মূল্যবান বক্তৃতা দেন, প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক ও ভাষা-সৈনিক আবুল কালাম শামসুদ্দিন তাঁর 'অতীত দিনের স্মৃতি' গ্রন্থে সে সম্পর্কে লেখেন ঃ "কবি গোলাম মোস্তফা কাব্য-সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। তিনি মুসলমান কবিগণকে তাঁদের কাব্য সৃষ্টিকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, হিন্দু কবিদের অনুকরণ নয় বরং মুসলমানের বিশিষ্ট অনুভূতির রূপায়ণেই মুসলিম কাব্য-সাধনা সার্থক ও স্বকীয়তামণ্ডিত হবে।"

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবে গোলাম মোস্তফার আন্তরিকতা ছিল অপরিসীম। জাতীয় জাগরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে তিনি সাহিত্য সংগঠনের কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। লেখার মাধ্যমে যেমন সংগঠনের মাধ্যমেও তেমনি তিনি বাঙালি মুসলমানের আত্ম-সচেতনতা সৃষ্টি ও নবজাগরণের প্রয়াস চালিয়েছেন। এ সম্পর্কে সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন ঃ

"সমাজের জন্য কবির কতখানি দরদ ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছিলাম ১৯২৪ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র রক্ষাকল্পে তাঁর প্রচেষ্টার ভিতর। ঐ সময় ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ কলকাতা ছেড়ে সম্ভবত ঢাকায় আসেন। কাজী আব্দুল ওদুদও চাকরি নিয়ে ঢাকা কলেজে যোগদান করেন। অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (তখন অধ্যক্ষ হননি) ল. পাস করে ময়মনসিংহ যান। কবি মোজাম্মেল হক (বরিশালী) নিজস্ব এক পাবলিকেশান কোম্পানী খুলে তাই নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েন। এইভাবে পুরাতন উদ্যোগী সদস্যগণ সকলেই দূরে যাওয়ায় সমিতি অচল হয়ে পড়ে। বাড়ী ভাড়ার দায়ে তার লাইব্রেরী নীলামে ওঠে। তখন অবশিষ্ট সভ্যেরা লাইব্রেরীর মূল্যবান বইগুলি মীর্জাপুর স্ট্রীটের এক বাড়ীতে সরিয়ে এনে কোনও মতে রক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু সমিতি চালাতে হলে অর্থের প্রয়োজন। কবি তখন হুগলী জেলা স্কুলে চাকরি করেন। সভ্যেরা তাঁকে সম্পাদক করে অর্থের চেষ্টায় বের হন। কবি প্রতি রবিবারে হুগলী হতে কলকাতা এসে সমিতির জন্য পরিশ্রম করতেন।... কবির যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে আমি নিজে এবং আরও কতিপয় সদস্য কবির সঙ্গে চাঁদার খাতা নিয়ে কলকাতার সাহিত্যামোদী ও শিক্ষিত মুসলমানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি।" (**মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮-৫৯**)।

www.nagorikpathagar.org

গোলাম মোস্তফা প্রধানত কবি হিসাবে সুপরিচিত হলেও তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমাত্রিক। তিনি একাধারে কবিতা, গান, শিশু-সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী গ্রন্থ, অনুবাদ প্রভৃতি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কবিতার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বৈচিত্র্যময়। তিনি একাধারে গীতি কবিতা, মহাকাব্য, শিশুতোষ কাব্য, গান ইত্যাদি রচনা করেন। তিনি নিজে গান রচনা করেছেন, সুর দিয়েছেন এবং স্বকণ্ঠে তা গেয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন কবি ও প্রকৃত শিল্পী। জানা যায়, কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী গান রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করার ফলে গোলাম মোস্তফা ঐ যুগের অন্য সকল কবি-সাহিত্যিকদের মতোই রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তবে ক্রমান্বয়ে তিনি সে প্রভাবের ঊর্ধ্বে ওঠার প্রয়াস পান। ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষত ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য-চেতনা ও মুসলিম নবজাগরণের প্রেরণা থেকেই তাঁর মধ্যে এ স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এছাড়া, তাঁর সমসাময়িক যুগান্তকারী কবি-প্রতিভা কাজী নজরুল ইসলামের বর্ণাঢ্য আবির্ভাব গোলাম মোস্তফাকেও বহুলাংশে স্পর্শ করে। উভয়ের ভাব, বিষয় ও আদর্শিক চেতনা ছিল একই ধরনের। তাই সহজেই তিনি নজরুলের যুগান্তকারী প্রতিভার সাথে ঐক্যসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর রচিত 'আমাদের জাতিসত্তার কবি গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ

"এ কবির জন্মের পরেই ১৯১৩ সালে কবিগুরু নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং এদেশীয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বশালী প্রতিভাধর বলে স্বীকৃতি লাভ করেন। রবীন্দ্র-প্রভাব ক্রমে এ দেশীয় কবি সমাজে অত্যন্ত অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় এবং আমাদের কবিদের মধ্যে একটা বলয়ের সৃষ্টি করে। এ বলয়ের মধ্যে তখন চারজন কবি অবস্থান করেও স্বকীয় প্রতিভার বদৌলতে আমাদের ভাষাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় ও যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী। সেই বলয়ের মধ্যে অবস্থান করেও পূর্বোক্ত কবিগণ তাঁদের নিজস্ব চিন্তা-ধারণা ও প্রত্যয়কে তাঁদের নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হন। তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিগুরু থেকে স্বীকৃতি ও প্রশংসা লাভ করেছেন। কবি গোলাম মোস্তফা এ বলয়ের মধ্যেও ছিলেন। তাঁর 'রক্তরাগ' প্রকাশের পর তাঁকেও কবিগুরু স্নেহ ও উৎসাহ দান করেছেন।"

উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয়েও গোলাম মোস্তফা ছিলেন উপরোক্ত চার কবির

www.nagorikpathagar.org

মতই কিছুটা স্বাতন্ত্র্যধর্মী। এ স্বাতন্ত্র্য তাঁর নিজস্ব ভাব, বিষয় ও মননের ক্ষেত্রে। মুসলমান হিসাবে কবি এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, তৌহিদী চেতনা ও ভাব-সম্পদে উদ্বুদ্ধ-অনুপ্রাণিত হন। তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ও গদ্য-রচনায় এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। তাই উপরোক্ত বলয়ের মধ্যে থেকেও রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত চার কবি থেকে গোলাম মোস্তফা ক্রমান্বয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। এ সম্পর্কে কবির নিজস্ব মতামত উদ্ধৃত করছি। তিনি তাঁর এক অভিভাষণে বলেন ঃ

"যে যুগে আমার জন্ম, সে যুগ বাংলার মুসলমানদের অবসাদের যুগ। সে যুগে আমাদের সাহিত্যের না ছিল কোন স্বাতন্ত্র্য, না ছিল কোন স্বকীয়তা। প্রত্যেক জাতির মননশক্তি, ঐতিহ্য, ধ্যান-ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হয় মাতৃভাষার মধ্যে। জাতির অন্তরমূর্তি ছায়া ফেলে তার সাহিত্যের মনোমুকুরে। সাহিত্য তাই জাতির মনের প্রতিধ্বনি। সাহিত্যের ভিতর দিয়েই গোটা জাতির সাচ্চা চেহারা দেখা যায়। সেই হিসাবে বাংলার মুসলমানদের কোন সাহিত্যই তখন রচিত হয়নি। আমি তাই ছোটবেলা থেকেই চেয়েছিলাম মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করতে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথের অনুরাগী হলেও আমার মনে জেগেছিল আমাদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির একটা দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির তাগিদেই নয় সহজভাবেই আমি বাংলা সাহিত্যে চেয়েছিলাম ইসলামী কৃষ্টির রূপায়ণ। মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎ এঁরা প্রত্যেকে ছিলেন হিন্দু জাতির মর্মবাণীর উদ্গাতা।... বাঙালীর অর্ধেকের বেশি হলো মুসলমান। কাজেই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের জীবনের প্রকাশ যদি না থাকে তবে সে সাহিত্য কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই অনিবার্য হয়েছিল এবং এখনো আছে।"

গোলাম মোস্তফার সাহিত্য-চর্চার মূল প্রেরণা ও অন্তর্গত তাগিদের বিষয় কবির নিজের ভাষায় উপরে বিধৃত হয়েছে। সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে এ প্রেরণা ও তাগিদই তাঁর মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও আবেদন সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথ ও উপরোক্ত চার কবির চিন্তা-চেতনা, ভাব-বিষয় ও ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণা থেকে গোলাম মোস্তফার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। তাই রবীন্দ্র-বলয়ের মধ্যে থেকেও তিনি তাঁর স্বতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হন। তাঁর লেখায় তাঁর কাঙ্ক্ষিত 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের রূপায়ণ' তথা 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ বলেন ঃ "গোলাম মোস্তফা যে নিঃসন্দেহে কাব্য-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন,

www.nagorikpathagar.org

সে সম্বন্ধে কারো মতভেদ নাই। তাঁর প্রতিভা কোন স্তরের অন্তর্গত ছিল, তাঁর সৃষ্টির কোন এবং কত অংশ নিছক কাব্য হিসাবে মহাকালের পরীক্ষায় অনাগত ভবিষ্যতের অমর ফলকে স্থান লাভ করবে, সে আলোচনায় আপাততঃ না গিয়ে আমরা অকুণ্ঠ-কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, প্রায় অর্ধ শতাব্দী কাল তক তিনি মুসলিম বাংলার তরুণদের চিত্তে উদ্দীপ্ত প্রেরণার অন্যতম প্রতীক হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। যেকালে বাংলা সাহিত্যের আকাশে নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন কারো আবির্ভাব ঘটে নাই, সেকালে মুসলিম বাংলায় গোলাম মোস্তফাই প্রায় একমাত্র কাব্য-পথযাত্রী, যাঁর কবিতা দেশময় স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা ক্লাসে পড়তো, বাইরে আবৃত্তি করতো, মজলিশ-মাহফিলে সুর সংযোগে গাইতো। বাংলার সেই অবসাদক্লিষ্ট মুসলিম সমাজের ভীরু সমাজে গোলাম মোস্তফার কবিতা ছিল ভ্রাম্যমান চারণের উদ্দীপ্ত কণ্ঠের জাগরণী গান।" **(ইব্রাহীম খাঁ ঃ কবি গোলাম মোস্তফার আদর্শ ও অন্তরঙ্গতা)।**

বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও গোলাম মোস্তফার জীবনীকার মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ বলেন ঃ "বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে আধুনিক বাংলা কাব্যে গোলাম মোস্তফার ভূমিকা ও অবদানের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে হলে তাঁর আবির্ভাবকালের পটভূমি এবং মুসলিম সমাজ প্রেক্ষিতের দিকে অবশ্যই বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।... যেকালে অতি অল্প বয়সেই তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন, সেকালে ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালি মুসলিম সমাজ ছিল শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ।" **(গোলাম মোস্তফা ঃ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, পৃ. ১০)।**

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী গোলাম মোস্তফা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

কাব্য ঃ রক্তরাগ (১৯২৭), হাস্নাহেনা (১৩৩৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্য-কাহিনী (১৯৩২), সাহারা (১৩৩৬), শেষ ক্রন্দন, তারানা-ই-পাকিস্তান (১৯৪৮), বুলবুলিস্তান (১৯৪৯)।

মহাকাব্য ঃ বনি আদম (১৯৫৮)।

গান ঃ গীতি-সঞ্চয়ন (১৯৬৮)।

শিশুতোষ ঃ আমরা নতুন আমরা কুঁড়ি।

অনুবাদ ঃ এখওয়ানুস সাফা (১৯২৭), মুসাদ্দাস-ই-হালী (১৯৪১), কালামে ইকবাল (১৯৫৭), আল-কুরআন (১৯৫৭), শিকওয়া ও জবাব-ই-শিকওয়া (১৯৬০)।

উপন্যাস ঃ রূপের নেশা (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ), ভাঙ্গাবুক (১৯২৮)।

www.nagorikpathagar.org

জীবনী গ্রন্থ ঃ হজরত আবু বকর।

প্রবন্ধ ঃ বিশ্বনবী (১৯৪২), মরুদুলাল (বিশ্ব নবীর কিশোর সংস্করণ), আমার চিন্তাধারা, গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন (১৯৬৮), বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ।

পাঠ্য-পুস্তক ঃ আলোকমালা (সিরিজ গ্রন্থ), আলোক-মঞ্জুরী (সিরিজ গ্রন্থ), মঞ্জু-লেখা (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), মণি-মুকুর (কথাশিল্পী মনোজ বসু সহযোগে), খোকা খুকুর বই, নতুন বাংলা ব্যাকরণ, School Boys Translation.

এছাড়া, The Mosolman, The Star of India, The Morning News, The Pakistan Observer, The Dawn ইত্যাদি দৈনিক এবং অন্যান্য সাময়িক পত্র-পত্রিকায় তিনি ইংরাজিতে বহুসংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখেন। এগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা গোলাম মোস্তফার অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে। এগুলো এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, যদিও শিশু-সাহিত্য হিসাবে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। বাংলা শিশু-সাহিত্যে যাঁরা মূল্যবান অবদান রেখেছেন, গোলাম মোস্তফা তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম। তাঁর রচিত শিশুতোষ ছড়া-কবিতা অতিশয় জনপ্রিয়। তাঁর এসব রচনার ভাব, ভাষা, ছন্দ শিশু-কিশোরদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বয়সের দিক দিয়ে গোলাম মোস্তফা কাজী নজরুল ইসলামের চার বছরের বড় ছিলেন। কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে তিনি নজরুলের আগেই আবির্ভূত হন এবং কাব্য-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। অবশ্য কাব্য-ক্ষেত্রে নজরুলের আর্ভিভাবের পূর্বে গোলাম মোস্তফার কাব্য-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় অনেক পরে। গোলাম মোস্তফা সম্পর্কে গবেষক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান লিখেছেন ঃ "কাব্য জগতে গোলাম মোস্তফা নজরুল ইসলামেরও বহু পূর্ব হইতে বাংলা সাহিত্যে পরিচিত। আধুনিক কালের অনেক কবির নামও যখন শোনা যায় নাই, গোলাম মোস্তফা সেইকাল হইতেই কবিতা রচনা করিয়া আসিতেছেন।" **(বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬১০)।**

www.nagorikpathagar.org

১৩১৩ সনে গোলাম মোস্তফা যখন মাত্র দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শীর্ষক একটি কবিতা 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে ছাপা হয়। এটাই তাঁর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এ প্রথম প্রকাশিত কবিতার মাধ্যমেই তিনি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং কবি হিসাবে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হন। এ সম্পর্কে কবি বন্দে আলী মিয়ার একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "সেই সময় ইউরোপ খণ্ডে বলকান যুদ্ধ চলছিল। তুরস্ক সেনাবাহিনী বুলগেরিয়ানদের হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সমগ্র মুসলিম জাহানে একটি বিমর্ষতার ছায়া নেমে এসেছিল। এমন সময় সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, কামালপাশা বুলগেরিয়ানদের নিকট থেকে 'আন্দ্রিয়ানোপল' পুনরুদ্ধার করেছেন, এ খবরে স্বজাতিবৎসল কিশোর কবির প্রাণ আনন্দে নেচে উঠলো। তিনি 'আন্দ্রিয়ানোপল উদ্ধার' নাম দিয়ে এক রাত্রির মধ্যে একটি নাতিদীর্ঘ কবিতা লিখে ফেললেন। অতঃপর কবিতাটি তিনি 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী'তে পাঠিয়েছিলেন। পরবর্তী সপ্তাহে কবিতাটি মুদ্রিত হলো। কবিতাটির সূচনা এইরূপ ঃ

'আজিকে প্রভাত কি বারতা নিয়া
ধরায় আসিলি নামিয়া।'

"কবিতার ছন্দ, ভাব এবং প্রকাশভঙ্গী তখনকার দিনে ছিল নতুন। এই কবিতায় পাঠক মহলে তাই একটা সাড়া পড়ে গেল। বাংলার মুসলিম সমাজে যে একজন আধুনিক কবির আবির্ভাব হয়েছে, একথা সহজেই স্বীকৃতি লাভ করলো। গোলাম মোস্তফাও নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেন। সেই থেকে তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখতে শুরু করলেন।"

মূলত কবি হলেও গোলাম মোস্তফার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ হলো একটি উপন্যাস– 'রূপের নেশা'। কবি তখন সবেমাত্র বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ভাঙাবুক' প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সনে। এতে সমকালীন বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত জীবনের আলেখ্য রূপায়িত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে তেমন কোন বিশিষ্টতার ছাপ পরিলক্ষিত হয় না। ঔপন্যাসিক হিসাবে গোলাম মোস্তফা খুব একটা সাফল্য অর্জন করেছেন বলেও মনে হয় না। তবে এর দ্বারা কবি-প্রতিভার বহুমুখিনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রক্তরাগ' প্রকাশের পর তিনি এর একটি কপি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থটি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ উৎসাহব্যঞ্জক ভাষায় তাঁকে দু'লাইনের একটি চমৎকার কবিতা উপহার দিয়েছিলেন। লাইন দুটি এই ঃ

'তব নব প্রভাতের রক্তরাগখানি
মধ্যাহ্নে জাগায় যেন জ্যোতির্ময়ী বাণী।'

www.nagorikpathagar.org

'রক্তরাগ' পাঠক সমাজে যথেষ্ট আদৃত হয়, বিশেষত মুসলিম পাঠক সমাজে। কারণ এর ভাব-ভাষা-বিষয় মুসলিম সমাজের উপযোগী ছিল। অবশ্য এ বইটি প্রকাশিত হবার বেশ কয়েক বছর আগেই কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রতিভার সূর্যকান্তি নিয়ে বাংলা কাব্য-জগতকে আলোড়িত করে তোলেন। সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি তখন নজরুল ইসলামের দিকেই আবদ্ধ। তাই 'রক্তরাগে'র মাধ্যমে গোলাম মোস্তফা সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম না হলেও এ গ্রন্থে তাঁর কবি-প্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত দু'লাইনে এ উক্তির সমর্থন মেলে। ১৩৩৮ সনের কার্তিক সংখ্যায় 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বলা হয় ঃ "রক্তরাগ' তাঁহার কবি পরিচয় বাঙ্গালী পাঠক সমাজে পূর্ণভাবেই করিয়া দিবে।"

'রক্তরাগ' কাব্যে মোট ২৮টি কবিতা স্থান লাভ করেছে। কবিতাগুলোকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে ধর্মীয় ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা। যেমন ঃ মরুর মহিমা, ঈদ উৎসব, মোস্তফা কামাল, বিজয় উল্লাস, স্বাধীন মিসর, হযরত মোহাম্মদ ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে প্রেমের কবিতা। যেমন ঃ প্রেমের জয়, পাশের বাড়ীর মেয়ে, প্রথম চিঠি ইত্যাদি। ফলে বিষয়গতভাবে এ প্রথম কাব্যেই গোলাম মোস্তফার অনেকটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ফুটে উঠেছে। ইসলামী চেতনা, স্বাজাত্যবোধ, প্রেম ও মানবতা গোলাম মোস্তফার সমগ্র সাহিত্যে মূলত এ কয়টি ভাবধারাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ বিষয়গুলো মোটামুটি তাঁর এ প্রথম কাব্যগ্রন্থেই প্রতিফলিত হয়েছে।

'রক্তরাগ' সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আব্দুল কাদির বলেন ঃ "তাঁর 'রক্তরাগ' কাব্যখানি 'জাগরণ', 'প্রীতি', ও 'প্রেম' এই তিন ভাগে চিহ্নিত। 'জাগরণ' বিভাগে জাতীয় চেতনা পেয়েছে প্রধান সুর, 'প্রীতি' বিভাগে নিসর্গ-প্রীতি ও মানবতা হয়েছে সোচ্চার এবং 'প্রেম' বিভাগে 'চির সঙ্গিনী মহীয়সী নারী নমস্কার' স্থান লাভ করেছে।"

গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হাস্নাহেনা' প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সনে (ইংরাজি ১৯২৭)। এ গ্রন্থের কবিতাগুলো প্রধানত গীতিধর্মী। এ গ্রন্থে ইসলামী ভাবধারাসম্পন্ন কবিতা নেই বললেই চলে। প্রেম ও সমসাময়িক জীবন-চিত্র এ গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর 'সওগাত' পত্রিকা এ সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ "ইহা কবি গোলাম মোস্তফা সাহেবের দ্বিতীয় কবিতা পুস্ত ক। 'রক্তরাগে' তাঁহার যে শক্তি 'ফুটেও ফুটে না' অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, 'হাস্নাহেনা'য় তা অনেকটা ফুটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। কবি গোলাম মোস্তফার কাব্য সাধনা ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহা আমরা আজ আনন্দ সহকারে ঘোষণা করিতেছি। প্রার্থনা করি কবির শক্তি দিন দিন পরিবর্ধিত হউক এবং তাহাতে

www.nagorikpathagar.org

দরিদ্র মুসলিম বঙ্গ সাহিত্য উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক।" **(সওগাত, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৩৪)।**

গোলাম মোস্তফার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'খোশরোজ' প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সনে। এ গ্রন্থে কবির ধর্মীয় চেতনার প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম, শবে বরাত, কোরবানী, আল হেলাল, তরুণের অভিযান, তরুণের গান প্রভৃতি কবিতায় কবির এ ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবির অন্যান্য কাব্যেও ইসলাম, জাতীয় চেতনা, প্রেম ও মানবতাবাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

গোলাম মোস্তফা একটি মহাকাব্য রচনায়ও হাত দেন। তবে তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর রচিত অসম্পূর্ণ মহাকাব্য 'বনি আদম' প্রকাশিত হয় ১৯৫৮ সনে। ইংরাজ কবি মিল্টনের The Paradise Lost and The Paradise Regained–এর কাব্যাদর্শ, ভাব ও কাহিনীর অনুসরণে তিনি এটি রচনার প্রয়াস পান। এতে হযরত আদমের (আ) বেহেশত থেকে বহিষ্কার ও পুনরায় সেখানে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কবি হিসাবে এতে তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

গোলাম মোস্তফা মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবিদের পক্ষে ক্লাসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মহাকাব্য রচনা করা সত্যিই দুরূহ, একরকম দুঃসাধ্যই বলা চলে। তাছাড়া, আধুনিক যুগ-পরিবেশও মহাকাব্য রচনার উপযোগী নয় বলে অনেকের ধারণা। তাই মহাকাব্য হিসাবে 'বনি আদম' তেমন সাফল্য অর্জন করতে না পারলেও বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন এবং এতে গোলাম মোস্তফার বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় বিধৃত।

কাব্যানুবাদের ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফা বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তাঁর অনুবাদ কাব্যের মধ্যে 'আল-কুরআন'– মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের কতিপয় নির্বাচিত সূরা ও আয়াতের অনুবাদ। তাঁর অনূদিত অন্য সব কবিতাই উর্দু কবিদের কবিতার অনুবাদ। আল-কুরআনের প্রায় অর্ধাংশ তিনি কাব্যাকারে অনুবাদ করেন। তাঁর এ অনুবাদ সবটা যদিও প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু তা কাব্য-গুণে যে মাধুর্যময় হয়ে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর 'সূরা ফাতিহা'র অনুবাদ এত মনোমুগ্ধকর ও জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে, পাকিস্তান আমলে এটি সকল বিদ্যালয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসাবে ক্লাস শুরুর পূর্বে সমবেত কণ্ঠে গীত হতো। তাঁর উর্দু কাব্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের মন্তব্য এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেন ঃ

"বাঙ্গালী হিসাবে একদিকে এ বাংলার জনগণ, আকাশ-বাতাস, নদ-নদী, ষড়ঋতু তাঁকে যেমন প্রভাবান্বিত করেছে–তাঁর পূর্ববর্তী মহাজ্ঞানী-মহাজনেরা

www.nagorikpathagar.org

যেমন তাঁর জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছেন তেমনি এ উপমহাদেশে তখনকার মুসলিম কবিদের মধ্যে শেখ আলতাফ হোসেন হালী, আল্লামা ইকবাল প্রমুখ কবিদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন।... এতে স্পষ্ট বুঝা যায়, গোলাম মোস্তফা রবীন্দ্রনাথ থেকে ক্রমেই মুক্ত হয়ে ইসলামী রেনেসাঁর দ্বারা ক্রমেই প্রভাবান্বিত হয়েছেন। এ উপমহাদেশে মুসলিম রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি আল্লামা ইকবালের প্রধান কাব্যগুলোর তিনি কেবল অনুসরণ করেননি অনুবাদও করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যসাধনার দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন স্বদেশের ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। কবি ও সাহিত্যিকগণ এক সঙ্গে দু'টো ঐতিহ্যের গৌরবে অনুপ্রাণিত হতে পারেন।"

গান রচয়িতা হিসাবে গোলাম মোস্তফার জনপ্রিয়তা অসাধারণ। ইসলামী গান– হামদ্, নাত ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা ও সাফল্য অর্জন করেন। গোলাম মোস্তফা রচিত 'অনন্ত অসীম প্রেমময় তুমি', 'বাদশাহ তুমি দীন ও দুনিয়ার', 'নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি', 'হে খোদা দয়াময় রহমানুর রহিম', 'আমার মোহাম্মদ রসূল', 'তুমি যে নূরের রবি নিখিলের ধ্যানের ছবি' প্রভৃতি হামদ্ ও নাত বাংলার ঘরে ঘরে একসময় সকলের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল এবং এখনো এসব গানের জনপ্রিয়তা ও আবেদন সকলকে মুগ্ধ করে। এসব ইসলামী গানের জনপ্রিয়তা একমাত্র বাংলা গানের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট কাজী নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তার সাথেই তুলনীয়। গোলাম মোস্তফা পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের বাংলা অনুবাদক। পাকিস্তান আমলে এ গানটি ব্যাপকভাবে গাওয়া হতো। এছাড়া, গোলাম মোস্তফা আরো বিপুল সংখ্যক হামদ্, নাত, মৌলুদ শরীফ (রাসূলের শানে গীত), আধুনিক, দেশাত্মবোধক ও প্রেমের গানের রচয়িতা হিসাবে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সুরকার ও গায়ক হিসাবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তাঁর নিজের বিশাল বৈঠকখানায় বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র ছিল। ঘরোয়া পরিবেশে বিশেষত সমঝদার অতিথি-অভ্যাগতদের আগমনে আবেগপ্রবণ কবি স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি ও গানের চর্চায় বিভোর হয়ে যেতেন। ১৯৬১ সনে আমি (গ্রন্থকার) প্রথম যেদিন 'মোস্তফা মঞ্জিলে' তাঁর সাথে দেখা করতে যাই সেদিন আমিও এরূপ আবেগ-তাড়িত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তাঁর অনবদ্য আবৃত্তি ও গানে বিস্মিত-বিমুগ্ধ হয়েছিলাম। ঘরোয়া অনুষ্ঠান ছাড়া বাইরে জনসমক্ষেও তিনি মাঝে-মধ্যে গাইতেন এবং শ্রোতাদেরকে মুগ্ধ করে দিতেন। এরূপ একটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন বিশিষ্ট কবি-সমালোচক-গবেষক আব্দুস সাত্তার। 'কবি গোলাম মোস্তফা ও

www.nagorikpathagar.org

আমি' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন ঃ

"সময়টা খুব সম্ভব ১৯৮৫ সাল। চট্টগ্রামে সাহিত্য সম্মেলনের তোড়জোড় চলছে। দর্শক শ্রোতা হিসাবে আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। অগণিত জনসমুদ্রে আমরাও ছোট ঢেউ হিসাবে মিশে গিয়েছিলাম সেইখানে। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতা শুনলাম। আমাদের ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন সবাই। কিন্তু সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলেন কবি গোলাম মোস্তফা সুললিত কণ্ঠে গান গেয়ে এবং নিজেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে। চট্টগ্রামের স্থানীয় শ্রোতা-দর্শকরা যারা কোনো দিন গোলাম মোস্তফা কিংবা সুরসম্রাট আব্বাস উদ্দীনকে দেখেননি, তারা কানাকানি শুরু করলেন। উনিই কি গায়ক আব্বাস উদ্দীন? গোলাম মোস্তফা তো কবিতা লেখেন, তিনি তো কবি, গায়ক হলেন কবে থেকে?"

আজীবন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত গোলাম মোস্তফা ছিলেন কৃতবিদ আদর্শ শিক্ষক, পাঠ্য-পুস্তক রচয়িতা হিসাবেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। বিভাগ-পূর্বকালে এক সময় সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্কুলে গোলাম মোস্তফার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তকের সিরিজ পাঠ্য ছিল। পাকিস্তান আমলেও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্কুলসমূহে তাঁর বই পাঠ্য ছিল। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে এগুলো যেমন সহজ পাঠ্য, শিক্ষণীয় আবার তেমনি শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্বের বিকাশেও সহায়ক। পাঠ্যপুস্তক হিসাবে তাই এগুলোর জনপ্রিয়তাও ছিল অপরিসীম।

গোলাম মোস্তফার প্রকৃত সাফল্য সম্ভবত মননশীল প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে। ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেন। সম-সাময়িক বিষয় থেকে শুরু করে ইতিহাস-ঐতিহ্য ও গবেষণামূলক বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচনায় তিনি অসামান্য সাফল্য অর্জন করেন। কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ-রচয়িতা হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। অনেকের ধারণা, গদ্যশিল্পী হিসাবে গোলাম মোস্তফা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশেষত তাঁর রচিত 'বিশ্বনবী' তাঁকে চির অমর করে রাখবে। কবি হিসাবে গোলাম মোস্তফা নিঃসন্দেহে শিল্প-সচেতন ছিলেন। কিন্তু সর্বদা তিনি তাঁর স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। বিশেষত শব্দ ব্যবহার ও শিল্প-রীতির ক্ষেত্রে তিনি প্রথাগত গতানুগতিকতার উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হন নি। তাঁর যেটুকু স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা তা শুধু তাঁর কবিতার ভাব, বক্তব্য, ঐতিহ্যানুসারিতা ও আবেদনের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করে নজরুল যেমন সর্বক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন, গোলাম মোস্তফা তেমনটি পারেননি। এমনকি, জসীমউদ্‌দীন ও তিরিশোত্তর যুগের কতিপয় কবি যেমন গতানুগতিক প্রথার

www.nagorikpathagar.org

বাইরে স্বতন্ত্র কবি-ভাবনা ও কাব্য-রীতির সাধনা করেছেন, গোলাম মোস্তফার মধ্যে তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। অবশ্য পরবর্তীতে তিনি রবীন্দ্র-প্রভাব বলয়ের বাইরে স্বকীয়তার সন্ধানে ব্যাপৃত হন। কিন্তু সেখানেও তিনি অতি সহজ-স্বচ্ছন্দে খানিকটা নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছেন। তাই দেখা যায়, স্বতন্ত্র কবি-কর্মের ক্ষেত্রে নয়; প্রথাগত কবিতা-চর্চায়ই তিনি সর্বদা স্বাচ্ছন্দবোধ করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়; এসব ব্যতিক্রমী কবি-কর্মই গোলাম মোস্তফাকে অমরত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। শিশুতোষ কবিতা রচনায়, দেশাত্মবোধক ও ইসলামী ভাবধারা সমৃদ্ধ গান-কবিতা ও মৌলুদ শরীফ জাতীয় রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। এ কারণেই 'যুগ-স্রষ্টা কবি' হতে না পারলেও রবীন্দ্র-নজরুল যুগে একজন উল্লেখযোগ্য প্রধান কবি হিসাবে তিনি সর্বদা যথাযোগ্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফার কৃতিত্ব অসাধারণ। প্রবন্ধ রচনার জন্য যে সূক্ষ্ম মনন, বিচার-বিশ্লেষণ করার মত প্রখর বুদ্ধিদীপ্ততা, গভীর জ্ঞান, অধ্যবসায়, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য প্রয়োজন গোলাম মোস্তফার মধ্যে তার কোনটির অভাব ছিল না। তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। কবিরা সাধারণত স্বপ্ন-কল্পনার অতীন্দ্রিয় জগতের অধিবাসী হয়ে থাকেন। প্রকৃতি, প্রেম, সৌন্দর্যানুভূতি ও মানব-মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁদের হৃদয়কে সর্বদা চঞ্চলিত করে। কবি হিসাবে গোলাম মোস্তফার মধ্যে এগুলোর উপস্থিতি অবশ্যই লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য আর এক স্বতন্ত্র শিল্প-সত্তার প্রচণ্ড উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তোলে। সেখানে তাঁর গভীর সমাজ-সচেতনতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ইতিহাস-জ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অপরিসীম অধ্যবসায় সকলকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর কবিত্বময় স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাষা। প্রাবন্ধিকের তত্ত্ব, তথ্য, যুক্তি ও বিশ্লেষণধর্মিতার সাথে কাব্যিক ছন্দময় ভাষা লেখকের বক্তব্যকে শুধু পাঠকের সচেতন বিচার-বুদ্ধির কাছে নয়; হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির গোপন তন্ত্রীতেও সাড়া জাগায়। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ তাঁর 'প্রবন্ধ লেখক গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন ঃ

"তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই প্রমাণ করে তিনি তাঁর সমাজ-চিন্তায় অনুগত ছিলেন এবং সমাজের বিচিত্র বিষয় যে তাঁকে চিন্তান্বিত করতো এবং সে সমস্যার সমাধান কী তা নিয়ে যে তিনি ভাবিত হতেন তাঁর লেখার বিষয়-বৈচিত্র্য তা প্রমাণ করে। ভাষা, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প ছাড়াও তাঁর প্রবন্ধের বিষয় সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শন। তাঁর লেখায় প্রকাশিত

www.nagorikpathagar.org

তাঁর হৃদয়-ব্যাকুলতা এনে দেয় একটি কল্যাণধর্মী সমাজ নির্মাণে তাঁর ইচ্ছা কতটা প্রচেষ্টাধর্মী। সুনির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণের জন্য অনেকের সঙ্গে ঐক্যমত্যে আবদ্ধ হতে পারতেন; কিন্তু সে জন্য যুগধর্মের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিতেও তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি তাঁর বিশ্বাসের অনুকূলে যুক্তি দাঁড় করিয়ে প্রাচীর দৃঢ়তায় তাকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। এই যুক্তির প্রাচীর তৈরীতে উপাদান অন্বেষণে তিনি যে পরিশ্রম করেছেন তাঁর প্রতিটি পংক্তি এর স্বাক্ষর বহন করছে। আর এজন্য রুশো, টলস্টয়, শেক্সপীয়ার, মিল্টন থেকে মুসলিম-বৌদ্ধ-ইহুদি ও হিন্দু কোন শাস্ত্র পাঠেই যেমন তিনি অনীহা প্রকাশ করেন নি তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি পাঠেও অজ্ঞানতাকে অনায়াসে মাড়িয়ে যেতে ছিলেন কুণ্ঠামুক্ত।"

প্রবন্ধ লেখক হিসাবে গোলাম মোস্তফার সাফল্য সম্পর্কে তাঁর সমকালীন বিশিষ্ট গদ্য-লেখক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র মন্তব্য স্মরণীয় ঃ "কবি গোলাম মোস্ত ফা ছিলেন মনে-প্রাণে মুসলিম কবি। এদিক দিয়ে তাঁকে তাঁর অগ্রসূরী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর ভাবশিষ্য বলা যেতে পারে। শিরাজী সাহেব আজীবন ওজস্বিনী বক্তৃতা, উদ্দীপনাময়ী কবিতা এবং তেজগর্ভ উপন্যাস ও প্রবন্ধমালার দ্বারা অবহেলিত ও অবসাদগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে এবং প্রবলতর ও চোখ-ঝলসানো হিন্দু কৃষ্টির আওতা হতে মুক্ত করে নিজ পায়ে দাঁড় করাতে চেষ্টা করে গিয়েছেন। গোলাম মোস্তফার জীবনের লক্ষ্য ছিল পারিপার্শ্বিক অনগ্রসর মুসলিম সমাজের ভিতর প্রাণ সঞ্চার করা, শুধু প্রাণ নয়, ইসলামী প্রাণ সঞ্চার করা। এদিক দিয়ে কালানুসারে তিনি তাঁর সমধর্মী কবি নজরুল ইসলামের অগ্রবর্তী বলে তাঁর মনে গর্ব ছিল।" (**মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৬৯**)।

বিশ্বনবী (১৯৪২ সনে প্রকাশিত), ইসলাম, বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, ইসলাম ও কমিউনিজম, ইসলামে জেহাদ, মরু দুলাল (বিশ্বনবীর কিশোর সংস্করণ), হজরত আবু বকর ইত্যাদি ক্ষুদ্র-বৃহৎ আকারের কতিপয় গ্রন্থ ছাড়াও ১৯৬২ সনে তাঁর জীবৎকালে ৩৭টি প্রবন্ধের সংকলন 'আমার চিন্তাধারা' ও তাঁর ইন্তেকালের পর ১৯৬৮ সনের জুনে সৈয়দ আলী আহসানের ভূমিকা সংবলিত ও তাঁর স্ত্রী মাহফুজা খাতুন সম্পাদিত ২৮টি প্রবন্ধের সংকলন 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন' প্রকাশিত হয়।

শেষোক্ত দুটি গ্রন্থ তাঁর শেষ জীবনের অবদান হিসাবে এগুলোতে তাঁর চিন্তা, মনন ও অভিজ্ঞতার পরিপূর্ণ রূপ বিধৃত। চল্লিশের দশকে বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের সর্বত্র যখন কমিউনিজমের প্রচার-প্রসার কিছুটা দানা বেঁধে ওঠে গোলাম মোস্তফা তখন 'ইসলাম ও কমিউনিজম' বই লিখে কমিউনিজমের

www.nagorikpathagar.org

অন্তঃসারশূন্যতা যুক্তিসহ সপ্রমাণ করেন এবং ইসলামের স্রষ্টা-প্রদত্ত শাশ্বত কল্যাণের আদর্শের সামনে তা মুক্তা খণ্ডের নিকট চোখ-ঝলসানো কাচের সমতুল্য বলে উল্লেখ করেন। এভাবে ইসলাম, স্বজাতি, স্বদেশ, স্বীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। তবে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে তিনি কখনো অন্ধ আবেগে তাড়িত হন নি; যুক্তি-তর্ক, তত্ত্ব-তথ্য ও বৈজ্ঞানিক সত্যের আলোকে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয় উপস্থাপন করেছেন। অবশ্য কবির আবেগ অনিবার্যভাবেই তাতে প্রচ্ছন্ন ছায়া ফেলেছে, তাতে ভাষা ও বিষয় অধিক প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। গোলাম মোস্তফার অসাধারণ গদ্য রচনার প্রকৃত সৌন্দর্য্য এখানেই।

গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো তাঁর রচিত 'বিশ্বনবী'। এ ব্যাপারে সাহিত্য-সমালোচকেরা সকলে একমত। সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই এ গ্রন্থটি একটি অসাধারণ পাঠকপ্রিয় গ্রন্থ। জনপ্রিয়তার দিক থেকে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' এবং মোহাম্মদ নজিবর রহমানের 'আনোয়ারা' উপন্যাসের সাথে এর তুলনা চলে। ১৯৪২ সনের অক্টোবর-এ বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর ১৯৪৬ সনের এপ্রিলে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কবির জীবনকালে ১৯৬৩ সনের জুলাই মাসে এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক সংস্করণেই লেখক কিছু কিছু পরিমার্জনা ও সংযোজন করেছেন। ফলে প্রথম সংস্করণের প্রায় পাঁচশো পৃষ্ঠার এ বইটি অষ্টম সংস্করণে গিয়ে ৫৮৭ পৃষ্ঠায় দাঁড়িয়েছে। এটা কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়; লেখকের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গভীর ভক্তি-ভাব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-চেতনা সর্বোপরি কবিত্বময় সাবলীল ভাষা গ্রন্থটিকে যেমন অনবদ্য করে তুলেছে তেমনি করেছে একে সর্বশ্রেণীর পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য। এ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেছেন ঃ

"হজরতের জীবনী সংক্রান্ত আরবী-উর্দু-ইংরেজী-বাংলা বহু গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু সেগুলির মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন (Emotional appeal) খুব কম গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখাই হজরতের জীবনীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই। মহাপুরুষের জীবন শুধু ঘটনার ফিরিস্তি নহে; শুধু যুক্তি-তর্কের শয্যাও নহে; সে একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু; তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দর্যানুভূতি, দার্শনিকের অন্তর্দৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রাসূল না হইলে সত্যিকার রাসূলকে দেখা যায় না।"

পরবর্তী সকল সংস্করণে লেখক কিছু কিছু পরিমার্জন ও সংযোজন করেছেন তার প্রমাণ গ্রন্থটির উত্তরোত্তর কলেবর বৃদ্ধি। গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

www.nagorikpathagar.org

থেকেও এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক সেখানে বলেছেন ঃ "বিশ্বনবীর আগমনের আগাগোড়া এবার দেখিয়া দিয়াছি। বহুস্থানে ফুটনোট দিয়া অথবা কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া আমার ধারণাগুলোকে অধিকতর সুস্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। 'হজরতের বহু বিবাহের তাৎপর্য' স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 'থিওসফি ও মিরাজ', 'ইসলাম কি?' এবং 'হজরত মোহাম্মদ কে?' এই তিনটি নতুন প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে।"

কিন্তু লেখক এতেও পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, তিনি আরো বলেন ঃ "এ অনেকটা চূড়ান্ত নয়-নির্দেশনা। আরও এমন কথা আছে- যাহা এখনও বলা হয় নাই-যাহা এখনও এই অধম লেখকের মনে। চিন্তা ও দৃষ্টি-সীমার বাহিরে পড়িয়া আছে।"

'বিশ্বনবী' সাধারণ পাঠকের জন্য নয়; এটা শিক্ষিত বিদগ্ধ পাঠকের উপযোগী। এটা সাধারণ কোন জীবনীগ্রন্থও নয়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ইতিহাস, যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী, রিসালত, কারামত, অন্য সকল মহাপুরুষের উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করার জন্য তিনি এ অমর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এ সম্পর্কে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ "এই আলোকের যুগে ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদকে উন্নতভাবে বুঝিবার সময় আসিয়াছে। 'বিশ্বনবী'তে আছে সেই প্রয়াস। আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকা তাই পাঠক-পাঠিকার জন্য অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জড়বাদ, অদ্বৈতবাদ, ডায়ালেকটিকস (Dialectics) ইত্যাদি কাহাকে বলে, স্থান-কাল-পাত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানের মত কি, বৈজ্ঞানিকদের লক্ষ্য এখন কোন দিকে- এসব বিষয়ে পাঠক-পাঠিকার সজাগ হইতে হইবে। মননশীলতার উৎকর্ষ না হইলে জাতীয় জীবন শক্তিশালী হয় না।"

'বিশ্বনবী' প্রণয়নে লেখক যে কী ধরনের পরিশ্রম ও অসাধারণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এর অষ্টম সংস্করণের শেষে প্রদত্ত এ গ্রন্থ রচনায় সহায়ক গ্রন্থসমূহের তালিকা থেকে তা সুস্পষ্ট। এ তালিকায় বিশ্ববিখ্যাত মোট ৬২টি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়েছে। এতে রয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আল-হাদীস, আরবি-উর্দু-ইংরেজী-বাংলা ভাষায় রচিত বহু খ্যাতনামা সীরাত গ্রন্থ। এমনকি, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকদের রচিত গ্রন্থ থেকেও তিনি এতে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য ও যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে ইসলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ধরনের মাত্র কয়েকটি বইয়ের নাম নীচে উল্লিখিত হলো। এ থেকেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

আর জীন জীন্‌স রচিত ঃ The Mystrious Universe, The Universe Around Us, স্যার জেম্‌স জীন্‌স রচিতঃ The New Background of

Science, The Growth of Physical Science, জে.ডব্লিউ.এন.সার্লিভ্যান রচিত ঃ Bases of Modern Science, Limitations of Science, আর্থার এডিংটন রচিত ঃ The Expanding Universe, The Nature of the Physical World, এ.এন. হোয়াইটহেড রচিত ঃ Science and the Modern World, আলবার্ট আইনস্টাইন রচিতঃ The Theory of Relativity, বার্ট্রান্ড রাসেল রচিত ঃ The A.B.C. of Relativity, ই.স্লোসোন রচিত ঃ Eassy Lessons in Einstein, আইভর.এল.টাকেট রচিত ঃ Evidence for the Supernatural, জর্জ গ্যামো রচিত ঃ One, Two, Three... Infinity, বার্নরেড-ব্যানেট-রাইচ রচিত ঃ New Handbook of the Heavens, আর্থার.সি.ক্লার্ক রচিত ঃ The Exfloration, হ্যারোল্ড লেল্যান্ড গুড-উইন রচিত ঃ Space Travel, জে.এন.লিওন্যার্ড রচিত ঃ Flight into Space, ভন ব্রাউন এন্ড হুমিপ্লল রচিত ঃ Man on the Moon ইত্যাদি।

এছাড়া, খ্রিস্টান ধর্ম, জোরাথ্রুস্ট, হিন্দু প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম ও সেসব ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ এবং এসব ধর্মের উপর লেখা বহু গ্রন্থ তিনি পাঠ করেন। এ থেকে তাঁর কঠোর পরিশ্রম, সীমাহীন অধ্যবসায় ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে 'বিশ্বনবী' সর্বদিক দিয়েই হয়েছে এক অসাধারণ কালজয়ী মহৎ গ্রন্থ। এতে উচ্চাঙ্গের অলংকারবহুল কাব্যময় ভাষা, অপূর্ব ভক্তি-ভাব, ইতিহাস-চেতনা, যুক্তি-তর্ক, মননশীলতা ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের একত্র সুসমন্বয় ঘটেছে। 'বিশ্বনবী' প্রকাশের পর বহু ভাষাবিদ সুপণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সম্পর্কে বলেন ঃ

"মৌলভী গোলাম মোস্তফা কবিরূপে সুপরিচিত। তাঁর নব অবদান 'বিশ্বনবী'। বলাবাহুল্য, ইহা বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদের (সঃ) একটি সুচিন্তিত প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠাব্যাপী জীবন চরিত্র। এই গ্রন্থকার হজরত সম্বন্ধে তাঁর দীর্ঘকালের গভীর চিন্তা ও গবেষণার সুষ্ঠু পরিচয় দিয়েছেন। আমরা এই পুস্তকখানিতে গোলাম মোস্তফা সাহেবকে একজন মোস্তফা-ভক্ত দার্শনিক ও ভাবুকরূপে পাইয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছি। ভাষা, তথ্য ও দার্শনিকতার দিক হইতে গ্রন্থখানি তুলনীয় হইয়াছে।"

'বিশ্বনবী' সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্যিক মনোজ বসুর মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ "আপনার 'বিশ্বনবী' পড়লাম। অপূর্ব! জাতির একটা বড় কাজ করলেন আপনি। আমি ও আমার মত আরও অনেকে ধর্মে মুসলমান না হয়েও হজরতকে একান্ত আপনার বলে অনুভব করতে পারলাম। মহানবীর

www.nagorikpathagar.org

কাছে পৌঁছবার আপনার এ সেতু-রচনা আপনার তুলনীয় সাহিত্য রীতি। ভাষা, কবিত্ব-ঝংকার ও ভাব-লালিত্যে অপরূপ মহিমা লাভ করেছে।"

অধ্যাপক আব্দুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান-এর যৌথভাবে প্রণীত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'–এ 'বিশ্বনবী' সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' (১৯৪২) হজরত মোহাম্মদের (সা) জীবনী এবং ইসলাম ধর্মের প্রচার ও বিস্তৃতি সম্পর্কে এ শতাব্দীতে রচিত একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী'তে তাঁর কবি মনের প্রকাশ সুস্পষ্ট এবং রচনাও আবেগ প্রণোদিত। 'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সাহিত্যিক জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।"

'বিশ্বনবী'র নবম সংস্করণের ভূমিকা (প্রসঙ্গ-কথা) লিখতে গিয়ে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৭ সনে লেখেন ঃ "বাংলা সীরৎ গ্রন্থগুলির মধ্যে কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' যেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে অন্য কোনটির ভাগ্যে তা হয়নি। এর ভাব যেমন উচ্চস্তরের, ভাষাও তেমনি প্রাঞ্জল, গতিশীল ও ওজস্বিনী। গোলাম মোস্তফা সাহেব একাধারে সুনিপুণ বাক্‌শিল্পী, কবি ও ভক্ত। তাই তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তির ভাবোচ্ছ্বাস ও কাব্যের লালিত্য গ্রন্থটিকে সুষমামণ্ডিত করেছে। তাঁর ভাব ও ভাষায় ভক্তিপ্রবণ বাঙালি অন্তরের মর্মকথাই কাব্যের ললিত রচনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভক্ত প্রেমিকের মধুঢালা রচনা-বিন্যাস বইটিকে অসাধারণ জনপ্রিয়তার অধিকারী করেছে।"

'বিশ্বনবী'র অষ্টম সংস্করণের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন ঃ "বিশ্বনবী'র উর্দু অনুবাদ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এখন মুদ্রণ ও প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। ভারতীয় মুসলমানদের আগ্রহের ফলে বিশ্বনবীর একটি ভারতীয় সংস্করণ কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।"

'বিশ্বনবী'র সংস্করণের ভূমিকায় ২৭ আগস্ট, ১৯৬৮ তারিখে সৈয়দ আলী আহসান আবার লেখেন ঃ "কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' একটি আশ্চার্যরূপ সফল গ্রন্থ। হৃদয়ের আবেগ বিশ্বাস শব্দে যেভাবে সমর্পিত হয়েছে, আন্তরিক অনুভূতির বর্ণনায় যেভাবে উচ্চকিত হয়েছে এবং চিত্তের উপলব্ধিজনিত আনন্দ ভাষার আবহে যেভাবে জাগ্রত হয়েছে তার তুলনা আমাদের গদ্য সাহিত্যে সত্যিই বিরল। যদিও কখনও কখনও কবি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিষ্ঠায় যুক্তির সমর্থন খুঁজেছেন কিন্তু সে সমস্ত যুক্তি উচ্ছ্বাসে সচকিত এবং বিশ্বাসের অবিচল নিষ্ঠায় প্রবহমান।"

www.nagorikpathagar.org

'বিশ্বনবী' গোলাম মোস্তফার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এর সমতুল্য গ্রন্থ অতিশয় দুর্লভ। গোলাম মোস্তফা অন্য কিছু না লিখে শুধু 'বিশ্বনবী' লিখলেও বাংলা সাহিত্যে চির অমর ও স্মরণীয় হয়ে থাকতেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাই বলে কবি হিসাবেও তাঁকে একেবারে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখের মত যুগ-প্রবর্তক কবি না হলেও সমকালের তিনি একজন বিশিষ্ট কবিকণ্ঠ তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাঁর সামগ্রিক অবদানের প্রেক্ষিতেই তাঁর প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সবশেষে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। তিনি বলেন ঃ "রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যিকেরা গোলাম মোস্তফাকেই আধুনিক কবিরূপে প্রথমে স্বীকৃতি দেন। ইহার পরে শাহাদাত হোসেন, নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব-ধারার রূপায়ণই তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু মনীষীর আওতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেন নাই। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীকালে নজরুল ইসলামের দ্বারা তিনি অনেকাংশে প্রভাবিত হইলেও তাঁহার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা তিনি হারান নাই।"

সন্দেহ নেই, এখানে 'স্বকীয়তা' বলতে গোলাম মোস্তফার ভাব, বিষয় ও জীবন-দৃষ্টির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। গোলাম মোস্তফা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, ভাব, বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন সে জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এছাড়া, জাতীয় জাগরণ, দেশাত্মবোধ, মানবতা ও উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্য তিনি সর্বদা সকল শ্রেণীর পাঠকের মনের মণিকোঠায় শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

স্বদেশ ও স্বাজত্য-প্রীতি গোলাম মোস্তফার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। তাঁর সমকালীন সকল কবি-সাহিত্যিকেরই এটা ছিল একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। গোলাম মোস্তফা তাঁর যুগের এ প্রবণতাকে ধারণ করে যুগ-সচেতনারই পরিচয় দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, গোলাম মোস্তফা মুসলিম নবজাগরণের কথা বাংলায় অনেকে তাঁকে সাম্প্রদায়িক মনে করে থাকেন। নিজের ধর্ম ও আদর্শের প্রচার কোন অবস্থাতেই দূষণীয় নয়। সকল বড় কবি ও শিল্পীই তা কোন না কোনভাবে

www.nagorikpathagar.org

করে থাকেন। তবে নিজের ধর্ম ও আদর্শের কথা বলতে গিয়ে অন্যের ধর্ম বা আদর্শকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার নাম সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু গোলাম মোস্তফা স্বধর্মের কথা বললেও অন্যের ধর্ম, আদর্শ বা ভাবাবেগের উপর কখনো আঘাত করেন নি। তাই তাঁকে মুসলিম নবজাগরণের কবি বলা যায়, কিন্তু কোন মতেই সাম্প্রদায়িক বলা সঙ্গত নয়।

বস্তুত গোলাম মোস্তফা মুসলিম নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। লেখার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র নেই। কবি হিসাবে তিনি ছিলেন উদার ও মানবিক গুণসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি। ইসলামই তাঁকে এমন মহৎ ও উদার হতে শিক্ষা দিয়েছে। তাঁর লেখার মধ্যে সর্বত্র ইসলামের উদার-মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ সুস্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলা হয় কারণ তিনি ছিলেন ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। কবি গোলাম মোস্তফার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যমূলক। কবি, লেখক ও শিল্পীদের সৃষ্টি-সম্ভারই তাঁদের আসল পরিচয় বহন করে। গোলাম মোস্তফার বিপুল সৃষ্টি-কর্মের মাধ্যমেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় সুস্পষ্ট।

www.nagorikpathagar.org

আবুল মনসুর আহমদের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা

আবুল মনসুর আহমদ (জন্ম ঃ ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, মৃত্যু ঃ ১৮ মার্চ ১৯৭৯) একজন প্রথিতযশা সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ হিসাবে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বিশেষ করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন ও মুসলিম নবজাগরণের ক্ষেত্রে যে কয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন আবুল মনসুর আহমদ তাঁদের অন্যতম। এক্ষেত্রে তাঁর সম-সাময়িক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নাম প্রথমেই স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন– মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, কাজী নজরুল ইসলাম, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, হাবীবুল্লাহ বাহার, আকবর উদ্দীন, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী প্রমুখ।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলিম নবজাগরণের লক্ষ্যে যে ভূমিকা পালন করেন তারই পরিপূরক হিসাবে তিনি সাহিত্য-চর্চা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। রাজনীতিক হিসাবে পাকিস্তান পূর্বকালে তাঁর হাতেখড়ি হলেও পাকিস্তান আমলে এমনকি, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও তিনি এক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখেছেন। বিভিন্ন সময় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব সম্ভবত সাহিত্যিক হিসাবে। সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য তিনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮৯৮ সনের ৩ সেপ্টেম্বর সাবেক ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালে ধানীখোলা গ্রামে তাঁর জন্ম। গ্রামের পাঠশালা ত্রিশাল দরিরামপুরে পড়াশোনা করার পর তিনি ১৯১৭ সনে ময়মনসিংহের নাসিরাবাদে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক, ১৯১৯ সনে ঢাকা জগন্নাথ কলেজ (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) থেকে আই.এ, ১৯২১ সনে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. ও ১৯২২ সনে কলকাতা রিপন কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে বি.এল. পাশ করেন। অতঃপর তিনি কলকাতায় সাংবাদিকতা শুরু করেন।

১৯২৩ সনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন সম্পাদিত 'মুসলিম ভাগ্য' নামক সাপ্তাহিকে তাঁর সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এরপর ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সন পর্যন্ত তিনি যথাক্রমে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাপ্তাহিক 'সুলতান' ও মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সাপ্তাহিক 'মোহাম্মদী'তে সহকারী সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৫-২৯ পর্যন্ত মৌলভী মজীবর রহমান সম্পাদিত 'দি মুসলমান' পত্রিকায় কাজ করেন। অতঃপর ১৯২৯-৩৮ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জজকোর্টে আইন ব্যবসায় নিয়োজিত থাকেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করতে না পারায় তিনি পুনরায় ১৯৩৮ সনে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৪৬-৪৮ সনে শেরেবাংলা এ. কে. ফজলুল হকের 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগে কাজ করেন। ১৯৪৬-৪৮ পর্যন্ত তিনি কলকাতাস্থ 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিকতার পাশাপাশি আবুল মনসুর আহমদ রাজনৈতিক তৎপরতাও শুরু করেন। খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, স্বরাজ আন্দোলন, কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টি এবং পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম লীগের প্রচার সম্পাদক ও আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। ১৯৫৩-৫৮ পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৯৫৫ সনে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যমন্ত্রী, ১৯৫৬ সনে শিক্ষামন্ত্রী এবং ১৯৫৬-৫৭ সনে হোসেন শহীদ সোহরাওর্দীর প্রধান মন্ত্রিত্বকালে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

সাংবাদিক-রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদের প্রধান পরিচয় সাহিত্যিক হিসাবে। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদানের জন্য তিনি চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। মননশীল রচনা ছাড়াও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর অবদান যেমন বিশাল তেমনি

www.nagorikpathagar.org

বৈচিত্র্যপূর্ণ। একাধারে গল্প, উপন্যাস, রম্য-রচনা, আত্মজীবনী, রাজনীতি বিষয়ক রচনা ও ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ মননশীল রচনায় তিনি বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে বিপুলভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প রচয়িতা, প্রাবন্ধিক, শিশু-সাহিত্যিক, ব্যঙ্গ রচয়িতা ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনায় বিশেষ অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলো ঃ

উপন্যাস ঃ ১. সত্য মিথ্যা (১৯৫০), ২. জীবন ক্ষুধা (১৯৫৫), ৩. আবেহায়াত (১৯৬৮)

গল্পগ্রন্থ ঃ ১. আয়না (১৯৩৫), ২. ফুড কনফারেন্স (১৯৫০), ৩. আসমানী পর্দা (১৯৫৫)

প্রবন্ধ ঃ বাংলাদেশের কালচার (১৯৬৬)

রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ ঃ ১. আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৮), ২. শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭৩)

স্মৃতিকথা ঃ আত্মকথা (১৯৭৮)

শিশু-কিশোর সাহিত্য ঃ ১. ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া (১৯৬৬), ২. গালিভারের সফরনামা (১৯৪৯)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আবুল মনসুর আহমদের ছিল অকৃত্রিম মমত্ববোধ। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। পাকিস্তান পূর্বকালেই তাঁর সম্পাদিত কলকাতাস্থ 'দৈনিক ইত্তেহাদ' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সনের ১ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারী প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়। ১৯৪৭ সনের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিসে'র উদ্যোগে 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা না উর্দু' শিরোনামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে জোরালো যুক্তিসহ তিনটি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়। প্রবন্ধ তিনটি লেখেন যথাক্রমে আবুল মনসুর আহমদ, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন ও অধ্যক্ষ আবুল কাশেম। ভাষা আন্দোলনের সূচনা-লগ্নে এ গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। উক্ত প্রবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য যুক্তিসহ জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন। এতে তিনি বলেনঃ

"তমদ্দুন মজলিশের তরফ হইতে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিবার যে চেষ্টা চলিতেছে, সে চেষ্টায় আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। আমি অন্যান্য কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণসমূহে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে চাই ঃ

www.nagorikpathagar.org

১। জনগণের ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা এক না হইলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতে পারেনা।

২। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি 'অশিক্ষিত ও সরকারী চাকুরির 'অযোগ্য' বনিয়া যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ফারসীর জায়গায় ইংরেজীকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম সমাজকে রাতারাতি সরকারী কাজের 'অযোগ্য' করিয়াছিল।

৩। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলেও বাংলাকেই শিক্ষার মিডিয়াম রাখা হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইতেছে, উহা কার্যত ভাওতা ও রাজনৈতিক প্রবঞ্চনায় পরিণত হইবে, কারণ জীবনের সকল ক্ষেত্রের 'যোগ্যতার মাপকাঠি' হইবে রাষ্ট্রভাষায় জ্ঞানের বিস্তৃতি ও গভীরতা।

৪। উর্দু বাংলার চেয়ে সহজ বলিয়া যে কথা বলা হইতেছে উহা প্রচারণা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উর্দু বাংলার চেয়ে অনেক বেশী কঠিন।

৫। উর্দু সুপ্রচলিত ও সদৃশ লখ্নৌভী হরফে ছাপা, মুদ্রণ, টাইপ রাইটিং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক কাজের অনুপযোগী। কলকাতা ও মিশরী হরফ ভ্রম-প্রমাদপূর্ণ ও কষ্টে শিক্ষণীয়। উভয় ছাপারই হরফের রূপান্তর বড় বেশী জটিল।

৬। বাংলা ভাষা সংস্কৃত ঘেঁষা ও হিন্দু প্রভাবপূর্ণ-এ অভিযোগও ভ্রান্ত। বাংলা ভাষা মুসলিম কৃষ্টির উপযোগী নয়, এ অভিযোগও ঠিক নয়। আমরা যে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করতে চাই, সেটা 'ব্যাকরণ মঞ্জুষার বঙ্গভাষা নয়, জনগণের মুখের বাংলা জবান'।

৭। হরফ সম্পর্কে আমাদের কোন গোঁড়ামী নাই। বিজ্ঞানের নিক্তিতে ওজন করিলে যদি বাংলা হরফ অযোগ্য প্রমাণিত হয় এবং সম্ভাব্য রদবদলেও যদি উহা যথেষ্ট যোগ্যতা লাভ না করে, আর আমরা রোমান হরফ নিতে রাজি হই, তবে উর্দুর পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তিই খসিয়া পড়ে। কারণ, আরবী হরফে লেখা হয়, এটাই উর্দুর পক্ষে মুসলিমের মনে সবচেয়ে বড় অবদান। উপরে আমি যে সাতটি যুক্তি দিলাম, তা ছাড়াও অনেক যুক্তি আছে, বাস্তব জীবনে যার মূল্য কম।" **(দ্রঃ মুহম্মদ মতিউর রহমানঃ বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন, ১ম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯২, পৃ-৪১)**।

রাজনীতি, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর যে কোনো ক্ষেত্রে তাঁর অবদান জাতীয় পর্যায়ে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তবে বর্তমান নিবন্ধে তাঁর সামগ্রিক অবদান নয়, শুধুমাত্র ভাষা-চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর যে দূরদর্শী ও বাস্ত বধর্মী চিন্তা-চেতনা সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো।

www.nagorikpathagar.org

ভাষার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা বিশেষ গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে এবং আমাদের স্বতন্ত্র জাতিগত পরিচয় বিনির্মাণে তাঁর এ ভাষাগত চিন্তা অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী। ফলে দীর্ঘকাল পরেও বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাঁর ভাষাগত চিন্তা এখনো গুরুত্বের সাথে বিবেচ্য।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন। ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশেরই বাহন নয়; সাহিত্য, সংস্কৃতি জাতি ও রাষ্ট্রীয় পরিচয়েরও মাধ্যম। তাই ভাষার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বহুমাত্রিকতা লাভ করছে।

আদিতে মানুষের ভাষা ছিল একটাই। আদম-সন্তানের বংশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিম ভাষাও নানা শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, বংশ-গোত্র-অঞ্চলভেদে ভাষারও রূপ-বৈচিত্র্য ঘটে এবং সেই সাথে বিভিন্ন সংস্কৃতিরও জন্ম হয়। মনের ভাব প্রকাশের আকুতি যখন শুধু কথ্য-রূপে সীমাবদ্ধ না থেকে লেখ্য-রূপ লাভ করে তখন সৃষ্টি হয় সাহিত্য। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ও ভাষার লেখ্য-রূপের মধ্যে পরিস্ফূট হয়ে ওঠে। মানব-সভ্যতা বিকাশের বিচিত্র দিকও ভাষার লেখ্য-রূপের মধ্যে প্রকাশ লাভ করে এবং তা দেশে দেশে, এক সমাজ থেকে আরেক সমাজে, এমনকি কাল থেকে কালান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, ভাষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন বা প্রকাশ-মাধ্যম হিসাবে মানব-সভ্যতার অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় গড়ে উঠেছে। জাতিগত ও রাষ্ট্রীয় পরিচয় নির্ধারণেও ভাষা অনেক সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই আধুনিক বিশ্বে ভাষার বহুমাত্রিক গুরুত্ব সর্বজন স্বীকৃত।

চলমান বা প্রবাহমান জলধারাকেই যেমন নদী বলা হয়, ভাষার ধর্মও তেমনি গতিময়তা বা প্রবাহমানতা। নদী যেমন বাঁকে বাঁকে গতি-পথ বদলায়, ভাষারও তেমনি বংশ-গোত্র-অঞ্চল ও কালভেদে রূপ বিভিন্নতা ঘটে। এটাই ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বাংলাদেশের আদি ভাষা বাংলা ছিল না। নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আদি ভাষা বর্তমান বাংলা ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে। আদিতে বাংলা ভাষার যে রূপ ছিল; নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। এটাই ভাষার ধর্ম। এ প্রবাহমানতা বা পরিবর্তনশীলতাই ভাষার বাস্তবতা। এক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তি খাটে না। ইংরেজ আমলে আমরা এর দৃষ্টান্ত লাভ করেছি। ১৮০০ ঈসায়ীতে প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত ও খ্রিস্টান পাদ্রীগণ সংস্কৃত শব্দবহুল কৃত্রিম বাংলা ভাষা প্রচলনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অত্যল্পকাল পরে এমন কি, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো গোড়া

ব্রাহ্মণ ও বেদান্তকে যিনি জীবন-বেদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সে ভাষাকে অস্বীকার করে বাংলা ভাষাকে অনেকটা জনগণের ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আসেন। তবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সে ভাষাও ছিল পশ্চিমবঙ্গের অঞ্চল বিশেষের ভাষা, যেটাকে কালক্রমে স্ট্যান্ডার্ড বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু সেটা অধিকাংশ বাঙালির ভাষা ছিল না, বিশেষত পূর্ববঙ্গের ত নয়ই। পূববঙ্গ বা বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত বাংলা ভাষার সাথে তার পার্থক্য ছিল অনেক।

ইংরাজ আমলে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাজধানী কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত ভাষার যে স্টান্ডার্ডাইজড রূপ গড়ে ওঠে, কালক্রমে সেটাই সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গৃহীত হয় এবং পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিন্দু-মুসলমান সকলেই গোটা উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সে ভাষাতেই সাহিত্য চর্চা করেন। বিংশ শতাব্দীতে এ ধারায় কিছু পরিবর্তন আসতে শুরু করে। প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতা মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের হাতেই এ পরিবর্তনের সূচনা এবং কাজী নজরুল ইসলামের হাতে তা প্রবল ও ওজস্বিতাপূর্ণ ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। নজরুল মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে আধুনিক অবয়বে সরাসরি তুলে ধরেন তাঁর সাহিত্যে।

একথা সর্বজনবিদিত যে, মুসলিম শাসনামলে মুসলিম শাসকদের পৃষ্টপোষকতায়ই বাংলা ভাষার নবজন্ম ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত বিজয়ী মুসলিম শাসকদের ভাষা আরবি, ফারসি ও তুর্কী হওয়ায় এসব ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত হয়। ফলে বাংলা ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং নানা ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে ওঠে। তখন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই মুসলিম শাসনামলে গড়ে ওঠা বাংলা ভাষার এ ঐতিহ্যের ভাগীদার ছিল। ইংরেজ আমলে ফোর্ট উইলিয়ামীয় ষড়যন্ত্রের ফলে এ মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হয়। এর প্রায় দেড়শো বছর পর নজরুল তাঁর অসাধারণ প্রতিভার বলে মুসলিম বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে অত্যন্ত সফলতার সাথে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে এনে বলিষ্ঠভাবে দাঁড় করালেন। উপমহাদেশে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা তথা পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে মুসলমানরা তাদের এ স্বতন্ত্র ভাষার ঐতিহ্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে ওঠে। এ ভাষা-সচেতনতা যাঁদের মধ্যে প্রবলভাবে লক্ষ্য করা যায়, আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। কাব্য-ক্ষেত্রে এ সচেতনতার উজ্জ্বল ও সার্থক পথিকৃত ছিলেন জসীম উদ্‌দীন, বেনজীর আহমদ, বন্দে আলী মিয়া, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মোফাখ্‌খারুল ইসলাম, রওশন ইজদানী প্রমুখ।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে বিশেষত ১৯৪০ ঈসায়ীতে 'লাহোর প্রস্তাব' গ্রহণের পর কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে এ ভাষা-সচেতনতা সংগঠিত রূপ লাভ করে। ১৯৪৪ সনের ৫ মে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ মিলনায়তনে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রথম সম্মেলনে মূল সভাপতির ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ বলেন ঃ

"বস্তুত বাংলার মুসলমানদের যেমন একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা সাহিত্য বা পুঁথি সাহিত্য।... পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসাঁ আসবে এই পুঁথি সাহিত্যের বুনিয়াদে। আমরা আবার পুঁথি সাহিত্যে ফিরে যাব সে কথা বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্যের প্রাণ হবে মুসলমানদের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই মুখের ভাষা। এই দুই দিকেই আমরা পুঁথি সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রেরণা ও উপাদান পাব।... আজকার তথাকথিত জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনই যে শুধু বাদ পড়েছে তা নয়, তার মুখের ভাষাও সে সাহিত্যে অপাংক্তেয় রয়েছে। মুসলমানদের আল্লা-খোদা, রোযা-নামায, হজ্জ-যাকাত, ইবাদাৎ-বন্দেগি, অযু-গোসল, খানাপিনা সমস্তই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা। এ জুলুমবাজির মধ্যে কোনো জাতির সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত হবে পূর্ব পাকিস্তানীদের মুখের ভাষায়।"

১৯৪৪ সনে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে আবুল মনসুর আহমদ যে কথা বলেছিলেন তা ছিল তৎকালীন বাঙালি মুসলমানদের সত্যিকার প্রাণের কথা। পাকিস্তান তথা ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূলেও মুসলমানদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার আকাংক্ষা অন্যতম প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। আবুল মনসুর আহমদ যখন উপরোক্ত প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন, তখন যথারীতি নজরুলের হাতে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের সুস্পষ্ট রূপরেখা তৈরি হয়েছে। সে রূপরেখার আদলে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জসীম উদ্‌দীন, মঈনুদ্দীন, বেনজীর আহমদ, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মোফাখ্‌খারুল ইসলাম প্রমুখ আমাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও বিনির্মাণে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এ নতুন প্রাণাবেগ পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও কিছুকাল অব্যাহত ছিল।

www.nagorikpathagar.org

আবুল মনসুর আহমদ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে এ ধারণায় উপনীত হন যে, মুসলিম শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ বঙ্গ, পুণ্ড্র ও বঙ্গাল এ তিনটি জনপদে বিভক্ত ছিল। ভাষা-সাহিত্যের দিক দিয়ে এ তিনটি জনপদ আবার দুটি সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল– বর্তমান বাংলাদেশ মানে তৎকালীন পুণ্ড্র-বঙ্গাল ছিল বঙ্গ এলাকা এবং অন্যটি ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ মানে তৎকালীন বঙ্গ ছিল অবঙ্গ বা অঙ্গ এলাকা। গুপ্ত ও পাল শাসনামলে উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্যের অঙ্গ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ ছিল বিশুদ্ধ সংস্কৃতের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে, পুণ্ড্র-বঙ্গাল বৌদ্ধ-সংস্কৃতির আওতাভুক্ত ছিল। বৌদ্ধ-সংস্কৃত ছিল মাগধী-প্রাকৃত দেশজ ভাষাসমূহের সংমিশ্রণে সৃষ্ট চলতি ভাষা। পরবর্তীতে এ ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এভাবে গোটা বাংলা তৎকালে দুটি স্বতন্ত্র ভাষিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত হয়।

মুসলিম শাসনামলে বিশেষত সুলতানী আমলে রাজনৈতিকভাবে এক অবিভক্ত বাংলাদেশ গঠনের প্রয়াস চলে। ভাষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও জনগণের মুখের ভাষাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়। এ মুখের ভাষার সাথে সমসাময়িক যুগের বাস্তবতা ও অনিবার্য তাগিদে আরবি-ফারসি-তুর্কি-উর্দু ভাষার অসংখ্য শব্দ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বাংলা ভাষাকে সুসমৃদ্ধ ও বিশ্বমানের উন্নত ভাষায় পরিণত করে। কিন্তু ইংরাজ আমলে কলকাতা রাজধানী হবার সুবাদে বঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গীয় সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পণ্ডিতেরা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ভাষার রূপ বদলের অপপ্রয়াস চালায় এবং পুনরায় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক রূপ পরিবর্তন করে দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দাবলীতে কন্টকাকীর্ণ করে এক নতুন কৃত্রিম বাংলা ভাষা চালু করে তার নাম দেয় 'সাধু বাংলা'। তবে এবারে সরাসরি সংস্কৃত ভাষা নয়; চতুরতার সাথে বাংলার পিঠে সংস্কৃতকে সওয়ার করানো হয়। তবে সে প্রয়াস যে সম্পূর্ণ সার্থক হয়নি, তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। কলকাতায় যখন এভাবে বাংলা ভাষাকে সংস্কৃতায়নের চেষ্টা চলছিল পুণ্ড্র-বঙ্গাল তথা বর্তমান বাংলাদেশে কিন্তু তখনও জনগণের মুখে মুখে সনাতন বাংলা ভাষা তথা আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ মিশ্রিত বাংলা ভাষাই যথারীতি চালু ছিল। ফলে পুণ্ড্র-বঙ্গাল, বিশেষত বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের ভাষা কলকাতা-কেন্দ্রিক ভাষা থেকে ছিল স্বতন্ত্র। বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ মুসলমান। তাদের ধর্ম ইসলাম। ফলে উভয় অঞ্চলের সংস্কৃতি, জীবনাচার ও আরো অনেক কিছুই ছিল স্বতন্ত্র। ভাষার এ স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর মাত্র দু'বছর পূর্বে ১৯৩৯ সনে তাঁর 'ভাষা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "বাংলা একটা নয়, দুইটা। বাংলাদেশের ইতিহাস খণ্ডতার ইতিহাস। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ রাঢ়-বরেন্দ্রের ভাগ কেবল ভূগোলের ভাগ নয় অন্তরেরও ভাগ। সমাজেরও মিল নাই।

www.nagorikpathagar.org

এতকাল যে আমাদের বাঙালী বলা হয়েছে, তার সংজ্ঞা হচ্ছে আমরা বাংলা বলে থাকি।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আট বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন। আজ যারা শুধু ভাষার ভিত্তিতে নিজেদেরকে বাঙালি বলে দাবি করেন, তাদের দাবি যে কত অসার রবীন্দ্রনাথ তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ যে ভাষার ঐক্যের কথা বলে গিয়েছেন সেটাও যে পূর্ণ সত্য নয়, আবুল মনসুর আহমদসহ অনেকেই তা যথাযথভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই নজরুল আমাদের জাতীয় ভাষায় আমাদের জাতীয় সাহিত্যের ভীত নির্মাণ করে গেছেন। শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), গোলাম মোস্ত ফা (১৮৯৫-১৯৬৪), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৯), মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-৮৩), আবুল ফজল (১৯০৫-৮৩), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯), মোফাখ্‌খারুল ইসলাম (১৯২১-২০০৭), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) প্রমুখ সে ভীত-এর উপর সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এখন চাই সে পথ ধরে নবীনেরা এগিয়ে চলবেন আত্মবিশ্বাস ও প্রতাপের সাথে। অতএব, রবীন্দ্রনাথের এ ভাষার ঐক্যের দাবি অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়।

বিভাগ-পূর্বকাল থেকেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মুজীবর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রমুখ সে কথা বলে আসছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আবুল মনসুর আহমদ তাঁর এ স্বতন্ত্র ভাষার দাবিকে সুস্পষ্ট ও অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ

"আমাদের নিজস্ব কালচার বিকাশের ও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির জন্য চাই আমাদের নিজস্ব ভাষা। আমাদের নিজস্ব ভাষা বাংলা, একথা আজ যথেষ্ট নয়। যথেষ্ট নয় দুই কারণে। এক কারণ ঐতিহাসিক, অপর কারণ রাজনৈতিক।

"ঐতিহাসিক কারণ বাংলা ভাষার ইতিহাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষার স্রষ্টা ও বাংলা সাহিত্যের পিতা আসলে বাংলার নবাব-বাদশারাই। সে হিসাবে বাংলা মুসলমানদের নিজস্ব ভাষা। কিন্তু প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে।... উনিশ শতকের গোড়া হইতে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলা, ছিল পণ্ডিতী ভাষা। উনিশ শতকের শেষ দিক হইতে টেকচাঁদ ঠাকুর, দ্বিজেন ঠাকুর ও রবিঠাকুরের

www.nagorikpathagar.org

শক্তিশালী কলমের জোরে ভদ্রলোকের পণ্ডিতী বাংলা জনগণের ভাষায় রূপান্তরিত হইবার চেষ্টা করে। এমন কি, স্বয়ং, বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেও এ চেষ্টা প্রতিফলিত হয়।... দ্বিজেন ঠাকুর, রবিঠাকুর ও শরৎচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা ভাষা বড় জোর পশ্চিমবাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাষা হইতে পারিয়াছিল। প্রকৃত জনগণের ভাষা হইতে পারে নাই। কারণ বাংলার আসল জনগণ যে মুসলমানরাও এবং তাদের ভাষাও যে জনপদের ভাষা, এ সত্য হয়ত ঐ মনীষীদের নিকট ধরাই পড়ে নাই।

"তারপর নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়া ধূমকেতুর মত বাংলা সাহিত্য ও ভাষার আকাশে উদিত হন এবং মুসলিম বাংলার ভাষাকে বাংলা সাহিত্যের ভাষা করিবার সফল চেষ্টা করেন। নজরুলের এই চেষ্টার যে বিরুদ্ধতা আসে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে, তাতে শুধু সাম্প্রদায়িক তিক্ততাই বাড়ে না, হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলার কালচারের পার্থক্যও তাতে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।...

"রাজনৈতিক কারণ একেবারে আধুনিক। আজ বাংলা ভাগ হইয়াছে। এক বাংলা দুইটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের রূপ নিয়াছে। এতে বাংলা সাহিত্য ও ভাষার কি পরিবর্তন হইয়াছে, এইটাই আমাদের ভাল করিয়া বিচার করিতে হইবে।... (এক) বাংলা ভাগ হওয়ার আগেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলিম-বাংলার ভাষা ও হিন্দু-বাংলার ভাষায় একটা পার্থক্য ছিল।... (দুই) বাটোয়ারার আগে বাংলার রাজধানী সুতরাং সাহিত্যিক কেন্দ্র ছিল কলিকাতা। এখন সে জায়গা দখল করিয়াছে ঢাকা।" **(১৯৫৮ সালের ৩ মে চাটগাঁয় অনুষ্ঠিত পূর্ব-পাক সাহিত্য-সম্মিলনীর কালচার ও ভাষা শাখার সভাপতির ভাষণ)**।

উপরোক্ত ভাষণে আবুল মনসুর আহমদ আমাদের ভাষা কী, কীভাবে তা গঠিত হবে, কী তার রূপ– এসব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর এ সম্পর্কে সাতটি প্রস্তাব পেশ করেন, যা আজো স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ গুরুত্বসহ বিবেচনাযোগ্য। তাই নিচে তা হুবহু উদ্ধৃত হলো ঃ

"১. ভাষা ও সাহিত্যের উপর প্রভাব কলিকাতার বদলে এখন ঢাকা হইতে হইবে।

২. পদ্মার পশ্চিম পারের আমাদের যে সব জিলা এতদিন রাষ্ট্রীয় কারণে নিজেদের 'বাঙ্গালা' হইতে স্বতন্ত্র ভাবিত, 'অধিকতর ভদ্র' পশ্চিম-বাংলার অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া গৌরব বোধ করিত এবং প্রেরণার জন্য স্বভাবতঃই কলিকাতার দিকে চাহিদা থাকিত, তারা এখন ঢাকার দিকে নযর দিতে শুরু করিয়াছে স্বাভাবিক কারণেই।

৩. প্রায় চল্লিশ লাখের মত পশ্চিম-বাঙ্গালী মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী

www.nagorikpathagar.org

বাশেন্দা হইয়াছেন। সমাজ-সাহিত্য ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এঁদের অনেকেই প্রভাব-প্রতিপত্তির স্থান দখল করিয়া আছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কথ্য ভাষায়, সুতরাং সাহিত্যে, এঁদের প্রভাবের ছাপ থাকিবেই।

৪. কথ্য ভাষার দিক হইতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক বাংলার মধ্যে যে প্রকট পার্থক্য দেখা যায়, তার বেশির ভাগই উচ্চারণে সীমাবদ্ধ।

৫. প্রায় দশ লাখের মত উর্দু-ভাষী অবাঙ্গালী পূর্ব-পাকিস্তানের স্থায়ী বাশেন্দা বনিয়া গিয়াছেন। তাঁদেরও প্রভাব আমাদের কথ্য ভাষায় পড়িবে।

৬. রাজধানী ঢাকায় বাটোয়ারার আগের মুদ্দতে কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের মত বাংলা-ভাষী কোন প্রভাবশালী উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না।

৭. ঢাকা শহরে বাটোয়ারার প্রাক্কালের যুগের বাংলা-সাহিত্যে পূর্ব-বাংলাবাসী প্রভাবশালী কোন সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল না।

"সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যেমন হইবে স্বাভাবিক কথ্য ভাষা তেমনি সেটা হইবে উপরোক্ত সমস্ত পরিস্থিতি-পরিবেশের সৃষ্ট ও হরেক ভাষার সংমিশ্রণের ফল এক নয়া ভাষা। সে ভাষার সৃষ্টিকার্য ইতঃমধ্যেই শুরু হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ শুধু আমাদের সাহিত্যিকদের নযরেই সে বিপুল নির্মাণকার্য আজো ধরা পড়ে নাই।"

ভাষা-চিন্তায় আবুল মনসুর আহমদ কতটা বাস্তববাদী ও প্রাগ্রসর তা উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। ১৯৫৮ সনে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে তিনি আমাদের ভাষার রূপ, পরিচয় ও ভবিষ্যতে তা কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে বা করা বাঞ্ছনীয় সে সম্পর্কে যে বক্তব্য পেশ করেছেন, দীর্ঘকাল পরে বর্তমান স্বাধীন বাংলার পরিবর্তিত পরিবেশেও তা একান্তভাবে বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়। বাংলা ভাষা স্বাধীন বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বাংলাদেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে। ঢাকা শুধু বাংলাদেশেরই রাজধানী নয়, বাংলা ভাষা-সাহিত্য চর্চা ও বিকাশেরও প্রধান কেন্দ্র। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আমরা দীর্ঘকাল ধরে দাবী জানিয়ে ও সংগ্রাম করে আসছিলাম। অবশেষে ১৯৫২ সনে রক্তের বিনিময়ে আমরা বাংলা ভাষার দাবি আদায়ে সক্ষম হই।

মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য পৃথিবীর অন্যকোন দেশ বা জাতির মানুষ রক্ত দেয় নি। তাই পৃথিবীর ইতিহাসে এটা এক অনন্য ঘটনা। এ ঐতিহাসিক ও অনন্য ঘটনার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০০ সনে ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্ত-

www.nagorikpathagar.org

র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেয়। এর প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষার মর্যাদা ও বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে আবুল মনসুর আহমদের ভাষা-চিন্তা ও তাঁর যৌক্তিক অভিমতকে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার সময় এসেছে।

স্বাধীন বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ কেবলমাত্র রাজনৈতিক দিক দিয়েই বিভক্ত নয়, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়েও উভয় অঞ্চলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। অনুরূপভাবে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে আমাদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে পার্থক্য তা যেমন সুস্পষ্ট, তেমনি ভাষিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যও উপেক্ষা করার মত নয়। পাকিস্তান আন্দোলনের মূলে শুধু ধর্মীয় পার্থক্য নয়, এ ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যও আমাদেরকে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। আবুল মনসুর আহমদ এ বাস্তবতার দৃষ্টিতেই লিখেছেন ঃ

"অবিভক্ত বাংলায় বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। তার মানে বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত এবং প্রধানত হিন্দু কালচারের বাহক। সে সাহিত্য বাংলার মুসলিম কালচারের বাহক ত ছিলই না বরঞ্চ তার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সাহিত্যে গোটা-কতক মুসলমানী শব্দ ঢুকাইয়া দিলেই তা মুসলিম কালচারের বাহক সাহিত্য হইয়া যাইত না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাল-ভাল বই-এর হিন্দু চরিত্রগুলির জায়গায় মুসলমান নাম বসাইয়া দিলেই ওগুলি মুসলিম চরিত্র হইয়া যাইবে না। তাতে মুসলিম-সাহিত্যও হইবে না। পক্ষান্তরে, 'বাঙ্গাল' বা 'মুসলমান' বলিয়া নিজেদের বাপ-দাদার আমলের মুখের লফ্যগুলি বাদ দিলেই আমরা 'আধুনিক' ও 'প্রগতিশীল' হইয়া যাইব না। গোশতের বদলে 'মাংস', আন্ডার বদলে 'ডিম', জনাবের বদলে 'সুধী', আরযের বদলে 'নিবেদন', তসলিমবাদ-এর বদলে 'সবিনয়', দাওয়াতনামার বদলে 'নিমন্ত্রণপত্র', শাদি-মোবারকের বদলে 'শুভ বিবাহ', ব্যবহার করিলেই আমরা 'সভ্য', 'কৃষ্টিবান' ও 'সুধী বিদগ্ধ হইলাম, নইলে হইলাম না, এমন ধারণা হীনমন্যতার পরিচায়ক। কৃষ্টিক চেতনা রেনেসাঁর জন্য এটা অশুভ ইঙ্গিত। আমাদের তরুণ 'প্রগতিবাদীদের মধ্যে ইদানীং এই বাতিক খুব জোরসে দেখা দিয়াছে। এটা আশংকার কথা।" (**বাংলাদেশের কালচার, বর্দ্ধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৭৬, পৃ. ২১৭**)।

১৯৫৮ সনে আবুল মনসুর আহমদ যে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন, সেটা ক্রমান্বয়ে অনেকটাই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে। বাঙালি মুসলমানের ব্যবহৃত শব্দ আর বাঙালি হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ বহু ক্ষেত্রে ভিন্ন এবং মুসলমানের ব্যবহৃত শব্দ হিন্দুদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে শ্রেয়তর এবং ব্যাপক জনমণ্ডলীর পক্ষে বোধগম্য এ বিষয় বুঝাবার জন্য আবুল মনসুর আহমদ নিম্নোক্ত দুটি

www.nagorikpathagar.org

দৃষ্টান্ত পেশ করেনঃ

"ফজরের আউয়াল ওয়াকতে উঠিয়া ফুফু-আম্মা চাচীজীকে কহিলেন ঃ আমাকে এক বদনা পানি দাও। আমি পায়খানা ফিরিয়া গোসল করিয়া নামায পড়িয়া নাশতা খাইব।' হিন্দু বাঙালীর মুখের বাংলার দৃষ্টান্ত ছিল নিম্নরূপ ঃ "অতি ভোর বেলা উঠিয়া পিসিমা খুড়া মশায়কে বলিলেন ঃ আমাকে শীগ্‌গির এক গাড় জল দাও। আমি প্রাতঃক্রিয়া সারিয়া চ্যান করার পর সন্ধ্যা করিয়া মাধাগ্নি খাইব।'...মুসলমানদের মুখের ঐ বাংলা ভাষা বিহার হইতে কুমারিকা পর্যন্ত জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ভারতবাসী বুঝিবে। পক্ষান্তরে হিন্দুদের মুখের ঐ বাংলা বাংলাদেশের বাইরের হিন্দুরা বুঝিবে না, অন্য ত পরের কথা।"

এভাবে আবুল মনসুর আহমদ বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু একই ভাষা-ভাষী হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মুখের ভাষার মধ্যে যে ফারাক রয়েছে তা উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন এবং মুসলমানের মুখের ভাষা যে ব্যাপকতর জনগোষ্ঠীর বোধগম্য তা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এভাবে উভয়ের মুখের ভাষা যে দুই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিসীমায় উত্তরোত্তর আরো আলাদা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"অবিভক্ত বাংলা সাহিত্য-কেন্দ্র ছিল যেমন কলিকাতা, পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে বাংলাদেশ) সাহিত্য-কেন্দ্র হইবে তেমনি ঢাকা। অবিভক্ত বাংলা সাহিত্যকে গণ-সাহিত্য করিবার প্রয়োজনের তাগিদে যে কারণে কলিকাতার কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষার সম্মান দিতে হইয়াছিল, ঠিক সেই প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের রাজধানী ঢাকার কথ্য ভাষাকেও আমাদের সাহিত্যের ভাষার মর্যাদা দিতে হইবে। সাহিত্যে ব্যবহারোপযোগী কোন নিজস্ব ভাষা ঢাকার নাই। তাতে ভয় পাইবার কিছু নাই। গোড়াতে কলিকাতারও ছিল না। জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির তাগিদে কলিকাতার পার্শ্ববর্তী পশ্চিম-বাংলার জিলাসমূহের কথ্য ভাষার সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে যেমন একটি 'কোলকেতেয়ে' কথ্য ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং সেই কলিকাতার কথ্য ভাষা পশ্চিম বাংলার তথা গোটা বাংলা সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশের) সাহিত্যিকদের সমবেত চেষ্টায় তেমনি ঢাকায় পুর্ব বাংলার (বাংলাদেশের) বিভিন্ন জিলার ভাষার সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ে একটি 'ঢাকাইয়া' কথ্য বাংলা গড়িয়া উঠিবে এবং সেই ভাষাই পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) সাহিত্যের ভাষা হইবে। পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জিলার আঞ্চলিক ডায়লেক্টের মধ্যে বিপুল পার্থক্য থাকায় শান্তিপুরী ডায়লেক্ট যেমন তাদের ভাষিক একতার নিউক্লিয়াস হইতে পারিবে।

"আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের চিন্তা-নায়ক হিসাবে তাই বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের তাই করিতে হইবে দুইটি কাজ। প্রথমত পূর্ব বাংলার (বাংলাদেশে) প্রাচীন সভ্য

www.nagorikpathagar.org

মানুষের নয়া রাষ্ট্র ও নয়া জাতি গঠনে সাহায্য করার জন্য তাদের নয়া যিন্দিগির ও নয়া কালচারের ধারক ও বাহক নয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত ঃ সেই সাহিত্যের মিডিয়াম রূপে পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশের) সমস্ত অঞ্চলের বোধগম্য ও ব্যবহারোপযোগী একটি ঢাকাইয়া কথ্য বাংলা গড়িয়া তুলিতে হইবে।" **(প্রাগুক্ত, পৃ. ২২১-২২২)**।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে আমাদের নিজস্ব ভাষা-সাহিত্যের চর্চা করার জন্য আবুল মনসুর আহমদ আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ১৯৫৮ সনেই। ইতঃমধ্যে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মর্যাদা নিয়ে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি। তাই নিজস্ব ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। একবিংশ শতাব্দীর নতুন সম্ভাবনার দ্বার-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ আমাদেরকে আত্মমর্যাদাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাওয়ার দুর্জয় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমানে নিজস্ব ঐতিহ্য-কৃষ্টি, আত্মমর্যাদা, জীবনবোধ ও স্বাধীনতাকে সংহত ও সংরক্ষণের চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

আবুল মনসুর আহমদের সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি নিজে এ ভাষার প্রবক্তা। বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ও গঠন-প্রকৃতি অবলম্বনে তৈরি তাঁর এ ভাষা যথেষ্ট বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত। বাংলাদেশের পলিমাটির সোঁদাগন্ধে তা সিক্ত। এ ভাষা বাংলাদেশের মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি এবং এখানকার আপামর জনসাধারণের নিকট তা সহজেই বোধগম্য। এ ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো একটি সহজ-সরল, হাস্য-তরল নিজস্ব ভঙ্গী। আবুল মনসুর আহমদ ব্যক্তিগত জীবনে যেমন রসিক ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁর লেখার ভাষাতেও সে ভঙ্গী বিদ্যমান। তাছাড়া, সহজ-সরল ও ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীতেও তিনি অতি কঠিন ও মননশীল চিন্তা-চেতনার বিষয় সাবলীলভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য বিচারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ভাষার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। তাঁর এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভাষাভঙ্গী ও আমাদের নিজস্ব ভাষার স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা অবশ্যই স্বীকার করা প্রয়োজন।

আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তার ক্ষেত্রে আবুল মনসুর আহমদের চিন্তা-চেতনা কতটা বাস্তবসম্মত ও প্রাজ্ঞচিত ছিল তা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ একসময় বলেছিলেনঃ

"সাহিত্যের প্রাণধারা প্রবাহিত হয় রাজধানীকে কেন্দ্র করিয়া। ঢাকাই যদি সারা বাংলার রাজধানী হইত তাহা হইলে ঢাকা-কেন্দ্রিক উপভাষাই হইত সমগ্র

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যের ভাষা। এই নিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা মুখ বাঁকা করিলে সেই বক্রতা আপনিই সোজা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইতনা।"

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যপূর্ণ সার্থক অবদানের জন্য আবুল মনসুর আহমদ ১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (ছোটগল্প) লাভ করেন। কিন্তু শুধু এ একটি মাত্র পুরস্কারের দ্বারাই বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তিনি ছোটগল্প ছাড়াও উপন্যাস, ব্যঙ্গ রচনা, স্মৃতিচারণা ও মননশীল গদ্য রচনায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। এ সামগ্রিক অবদানের প্রেক্ষিতেই তাঁর যথার্থ সাহিত্যিক মূল্যায়ন সম্ভব।

আমাদের রাজনীতি, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ভাষা-চিন্তার ক্ষেত্রে অসামান্য ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন আবুল মনসুর আহমদ। এসব ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি যেমন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, তেমনি ভাষা-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান আমাদের স্বতন্ত্র ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রকৃত রূপরেখা বিনির্মাণে চিরকাল অনুপ্রেরণা যোগাবে। এক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে একজন পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

গদ্যশিল্পী মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ

বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত আধুনিককালে। যাঁরা এক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি একজন বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য তথা মননশীল রচনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান তাঁর সমকালেই সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়।

১৮৯৮ সনের ২মার্চ সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার অন্তর্গত বেলতৈল ইউনিয়নের ঘোড়াশাল গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। ১৯৭৪ সনের ২নভেম্বর মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী আজম আলী, মাতার নাম তছিরন বিবি। হাজী আজম আলী ছিলেন শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি নিজ গ্রামে কবিরাজী চিকিৎসা করতেন। তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ পুত্র রহমতুল্লাহ গ্রামে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তাঁর একমাত্র কন্যা, নাম কদরজান। ঘোড়াশালের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি গ্রাম- নাম চরবলতৈল, এ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতা পণ্ডিত মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ পার্শ্ববর্তী গ্রামে বেলতৈল এম.ই. স্কুল (বর্তমান বেলতৈল হাইস্কুল) থেকে ১৯০৬ সালে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১০ সনে উক্ত একই স্কুল থেকে এম.ই. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি শাহজাদপুর হাই ইংলিশ স্কুলে (বর্তমানে শাহজাদপুর পাইলট হাইস্কুল) ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯১৪ সনে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১৬ সনে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুনরায় বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন।

www.nagorikpathagar.org

১৯১৮ সনে তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্সসহ দ্বিতীয় বিভাগে বি.এ. পাশ করেন এবং ১৯২০ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে দ্বিতীয় বিভাগে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২২ সনে তিনি এল.এল.বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বি.এ. ক্লাসের ছাত্র থাকাকালে তিনি জোবেদা খাতুনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯২৩ সনে অনুষ্ঠিত প্রথম বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস (বি.সি.এস.) পরীক্ষায় হিন্দু-মুসলিম প্রার্থীদের সম্মিলিত মেধা তালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করে তিনি প্রথমে স্বল্পকালের জন্য ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পদে কাজ করার পর প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন বিভাগে ডেপুটি হিসাবে চাকুরী নেন। ক্রমান্বয়ে তিনি উভয় বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেকটর, মহকুমা অফিসার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও সর্বশেষে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী হিসাবে ১৯৫৩ সনে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৫ সনের ২৬ নভেম্বর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকার বাংলা একাডেমীর আয়োজক (প্রিপারেটারী) কমিটি গঠন করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহকে একাডেমীর স্পেশাল অফিসার (প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা) নিযুক্ত করেন। ১৯৫৬ সনের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে বহাল থেকে মহান ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী বাংলা একাডেমী গঠনের গুরুদায়িত্ব সুষ্ঠুরূপে পালন করেন। পরবর্তীকালে ১৯৬২-৬৩ সনে তিনি বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন। ১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী যে বছর সর্বপ্রথম সাহিত্য পুরস্কার চালু করে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ সে বছরই প্রবন্ধ-গবেষণা ক্ষেত্রে এ মূল্যবান জাতীয় পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তাঁকে 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব প্রদান করেও সম্মানিত করেন।

১৯১৫ সনে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর রাজশাহী কলেজে অধ্যয়ন কালে রাজশাহীতে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলা গদ্যে কথ্যরীতির সার্থক প্রবর্তক প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রমথ চৌধুরীও তৎকালীন বৃহত্তর পাবনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তরুণ বরকতুল্লাহ সে সম্মেলনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় তিনি অনেক কবি-সাহিত্যিকের সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন এবং নিজেও সাহিত্য-চর্চায় অনুপ্রাণিত হন। ঐ সময় কলেজে প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হলে তাতে তাঁর লেখা দুটো প্রবন্ধ যথা- 'পদ্মাবক্ষে'

www.nagorikpathagar.org

এবং 'ভগ্নদেউল' পুরস্কৃত হয়। পরে প্রবন্ধ দুটি রাজশাহী কলেজ ম্যাগাজিনে যথাক্রমে ১৯১৬ ও ১৯১৭ সনে প্রকাশিত হয়। 'ছাত্র সমাজে জাতীয়তা' শীর্ষক তাঁর একটি প্রবন্ধ 'আল্ এসলাম' পত্রিকার মাঘ, ১৩২৪ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত প্রবন্ধের নীচে সম্পাদক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উৎসাহব্যঞ্জক মন্তব্যও সংযোজিত হয়। আল্ এসলাম পত্রিকায় ফাল্গুন, ১৩২৪ সনে এম. আনসারী ছদ্মনামে 'অর্ঘ্যভার-হজরতের প্রতি' শীর্ষক তাঁর একটি কবিতাও ছাপা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিভাগের ছাত্র থাকা কালে 'সওগাত' সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিনের অনুরোধে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ 'ধ্রুব কোথায়' শীর্ষক কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেন এবং তা 'সওগাতে' ১৩২৭ সনে যথাক্রমে অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যায় ছাপা হয়। পরে এটি 'মানুষের ধর্ম' (১৯৪০) গ্রন্থে সংকলিত হয়। এ প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন লেখেন ঃ "এ-প্রবন্ধে লেখক সত্যের বিচার, জীবন ও জগত, জীবন ও মৃত্যু ইহকাল ও পরকাল, জড় ও চৈতন্য, বিরাট প্রাকৃতিক শক্তি, ধর্মীয় বিবর্তন ও সর্বশক্তিমানের স্বীকৃতি প্রভৃতি জটিল বিষয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকগণের মতবাদ দক্ষতার সাথে অতি সহজ ও সুন্দর ভাষায় আলোচনা করেছেন।" **(বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, পৃ. ১৫২৩-২৪)।**

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ কলকাতায় 'ইমপেরিয়াল লাইব্রেরী'তে যাতায়াত করতেন। সেখানে ব্যাপক পড়াশোনার পর তিনি পারস্য সাহিত্য এবং পারস্যের জগৎ-বিখ্যাত কয়েকজন কবি ও মনীষী সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে 'মোসলেম ভারত', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা', 'সওগাত' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধগুলি পরে সংশোধিত আকারে তাঁর সুবিখ্যাত 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'পারস্য-প্রতিভা'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে ৭ জানুয়ারী। প্রথম খন্ডে কয়েকজন সাহিত্য-সাধকের জীবনী আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে । এতে প্রধানত পারস্য সাহিত্যে প্রতিফলিত ধর্ম ও দর্শনের দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৬৪ সনে লেখক 'পারস্য প্রতিভা'র দু'খণ্ড একত্রে প্রকাশ করেন এবং খণ্ডবিভাগ তুলে দেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক জনপ্রিয় সাহিত্য-কীর্তি হলো 'পারস্য-প্রতিভা'। এর প্রথম খণ্ড প্রকাশের সাথে সাথেই তিনি অভাবিত যশ ও খ্যাতির অধিকারী হন। বিদগ্ধ পাঠক সমাজ এর ভূয়সী প্রশংসা করে। বিভাগ-পূর্বকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাট্রিক ক্লাসে 'পারস্য-প্রতিভা'র প্রথম খণ্ড

www.nagorikpathagar.org

থেকে 'কবি ফেরদৌসীর প্রতিভা' পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সে যুগের প্রায় সবগুলো পত্রিকায় এ গ্রন্থের উপর আলোচনা ছাপা হয়। তাতে তাঁর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবশ্রেণীর বিশিষ্ট সমালোচক 'পারস্য-প্রতিভা'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। এখানে সেসব পত্রিকা থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো ঃ

১. "এই পুস্তকে ফেরদৌসী, হাফেজ, ওমর খইয়াম, সা'দী ও জালাল উদ্দীন রুমী– এই কয়েকজন পারস্য কবির জীবন কথা আলোচিত ও বিশ্লেষিত হইয়াছে।... আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভাষা সর্বত্রই গম্ভীর অথচ মধুর, সারগর্ভ অথচ সরস, –কোথাও কষ্ট কল্পনার আভাসমাত্র নাই– ভাষা সর্ব্বত্রসরল স্বচ্ছন্দ গতিশালিনী এবং সহজ ভঙ্গীময়ী। কার্লাইলের 'হিরো ওয়ার্শিপ' প্রভৃতি গ্রন্থে যেরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং চিন্তাশীলতার পরিচয় ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট,– রাস্কিনের গ্রন্থে কারুশিল্প বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্যানুভূতির যেরূপ মনোমদচিত্র দেদীপ্যমান, এই 'পারস্য-প্রতিভা' গ্রন্থের গ্রন্থাকারেরও সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিশীলতা এবং সৌন্দর্যানুভূতির প্রোজ্জ্বল পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার যে একাধারে কবি, ভাবুক এবং জীবনী-আলেখ্যের সুপটু চিত্রকর, তাহা এই গ্রন্থে উত্তমরূপেই বুঝা যাইবে। এ পুস্তক একবার পড়িয়া তৃপ্তি হয় না, – আবার-আবার পড়িবার ইচ্ছা হয়। আর, কবি ফেরদৌসী প্রভৃতির জীবন-সমালোচনা পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারের কবিত্বময়ী আবেগময়ী ছন্দময়ী মধুময়ী ভাষায় আত্মহারা হইয়া মহা-প্রকৃতির কবিত্বকোলে ঘুমাইয়া পড়িতে ইচ্ছা জন্মে। এইরূপ কবিত্ব-লীলাভঙ্গীময় ভাব-মাধুর্য্য-মনোহর এবং মহাকবি ও মহাপ্রাণের জীবনী আলোচনাপূর্ণ পুস্তকই এদেশের উচ্চ শ্রেণীর অধ্যয়ন এবং আলোচনার জন্য পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত হওয়া একান্ত কর্তব্য।... পারস্যের কাব্য-মালঞ্চের কবি-কোকিলগণের মধুর স্বরে এবং তদধিক সুমধুর সার-তত্ত্বে যাঁহারা নির্মল আনন্দ উপভোগ করিতে চাহেন, তাঁহারা এই 'পারস্য-প্রতিভা' পুস্তকে সে আস্বাদ প্রচুর পরিমাণেই পাইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। মুসলমান গ্রন্থকারগণের ভিতর যে এমন চিন্তাশীল এবং সুমধুর অথচ প্রাঞ্জল বঙ্গভাষার লেখক আবির্ভূত হইতেছেন– ইহাও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে অতীব আনন্দ ও আশার কথা। 'পারস্য-প্রতিভা'র গ্রন্থকার মহাশয়ের লেখনী জয়যুক্ত হউক, তাঁহার সধানিস্যন্দিনী লেখনী পারস্য কাব্য-সাহিত্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া এমনই সুধারস গ্রন্থাকারে প্রদান করতে রহুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।" **(বঙ্গবাসী, ১৮ ফাল্গুন, ১৩৩০)।**

www.nagorikpathagar.org

২. "-গ্রন্থকার এই নূতন সৃষ্টির মধ্য দিয়া যে বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, বাস্তবিকই তাহা প্রশংসনীয়।" পারস্য-সাহিত্যের ধারা গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিনি যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে জানিবার, বুঝিবার ও শিখিবার মত অনেক কিছু আছে। এতদ্ব্যতীত জগৎবিশ্রুত পারস্য কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথার সঙ্গে তাঁহাদের কাব্যাবলীর আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি যে সূক্ষ্মদর্শিতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যে কোনও দেশের, যে কোনও জীবনী-লেখক বা সমালোচকের পক্ষে গৌরবের কথা বলিয়া আমরা মনে কবি।" **(সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, ২রা মাঘ, ১৩৩০)।**

৩. "মৌলবী... সাহেব কাব্যরসিক ব্যক্তি; তাঁহার ভাষাসৌষ্ঠব ও ভাবগাম্ভীর্য্য কাব্যালোচনার রসধারাকে কোথাও ক্ষুণ্ন করে নাই। বস্তুতঃ তিনি যেরূপ সুন্দরভাবে আলোচ্য পুস্তকখানিতে পারস্য-কবিগণের জীবনী ও কাব্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই অসাধারণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কাব্যামোদী পাঠকগণ ইহাতে উপভোগের বহু উপকরণ পাইবেন।" **(মোসলেম জগৎ, ১১ই মাঘ, ১৩৩০)।**

৪. "আমরা নিঃসন্দেহে বলিব,- বাঙ্গালা মোস্‌লেম-সাহিত্যে এমন দান এক প্রকার নূতন। ভাষার অনাবিল ভাব, অব্যবচ্ছেদ গতি ও বর্ণনা কৌশলে ইরানী কুঞ্জ মনে পড়ে।" **(ছোলতান, ১৮ই মাঘ, ১৩৩০)।**

৫. "ফিরদৌসী, হাফেজ, ওমর খইয়াম, সা'দী, জালাল উদ্দীন রুমী প্রভৃতি জগৎ প্রসিদ্ধ পারসী কবিগণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। যদি তাঁহাদের রহস্যময় জীবন ও কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিতে চান, তবে এই গ্রন্থ পাঠ করুন। গ্রন্থকার কবিদের জীবনী ও কাব্য আলোচনা করিতে যাইয়া যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও মধুর কবিত্বময়। তাঁহার লেখনী যশস্বী হউক। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রত্যাশায় রহিলাম।" **(আনন্দ বাজার, ফাল্গুন, ১৩৩০)।**

৬. "গ্রন্থকার বহু পরিশ্রমে বিশ্ব-সাহিত্যে লব্ধ প্রতিষ্ঠ এইসব অমর কবিদের জীবনী লিপিবদ্ধ করে বঙ্গ-সাহিত্যে একটা অমূল্যরত্ন দিয়েছেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বঙ্গ ভাষার প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকার এই বইখানি পড়া উচিত।... গ্রন্থকার বেশ প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকখানি রচনা করেছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে দিয়েছেন কবিদের জীবনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে নানাবিধ জ্ঞানের কথা, প্রেমের কথা, সাধনার কথা ইত্যাদি।..." **(বিজলী, ৩রা ফাল্গুন, ১৩৩০)।**

৭. "গ্রন্থকার কবিদের জীবনচরিত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কবিত্বের আলোচনা বা সমালোচনাও পারস্য অনভিজ্ঞ বাঙ্গালী পাঠকদের পক্ষে

www.nagorikpathagar.org

তাঁহাদের কবিত্বরস আস্বাদনে অনেকটা সাহায্য করিবে।" **(দৈনিক বসুমতী, ২৩ শ্রাবণ, ১৩৩১)**।

৮. "গ্রন্থকার নিজের জ্ঞান ও বিচারের সহিত বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের গবেষণার সংমিশ্রণে এই উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্মে ও সাহিত্যে জাতিভেদ নাই; স্থান ও কালের বিভিন্নতায় ধর্মে ধর্মে সাহিত্যে সাহিত্যে যে পার্থক্য ঘটে তাহাতে অসীম-রস-পিপাসু মানবগণ বিভিন্নতার রসাস্বাদ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবার অবসর পায়। গ্রন্থকার এই অসাধারণ আনন্দ বঙ্গের নর-নারীকে পরিবেশন করিয়া সকলের ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন। কবির জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যের সম্পর্ক প্রদর্শন ও তাঁহার কাব্যের বিশেষত্ব বিশ্লেষণ বিশেষ নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে।" **(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩১)**।

৯. "এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি।... গ্রন্থকার পারস্য কবিগণের কাব্যের দার্শনিক তত্ত্ব ও তাঁহাদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন; পুস্তকখানি ভাষার মাধুর্য্যে, বর্ণনা-চাতুর্য্যে ও ভাবের প্রাচুর্য্যে সকলের আদরণীয় হইবে।...আমাদের বিশ্বাস, পারস্যের কবি-সাহিত্য সম্বন্ধে এই গ্রন্থই বাঙ্গালায় প্রথম।" **(সঞ্জীবনী, ১৫ই ভাদ্র, ১৩৩১)**।

১০. "... গ্রন্থকার এই পুস্তকে পারস্য সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। তাঁহার নিপুণ হস্তে বর্ণনীয় বিষয়টি সুপরিস্ফুট ও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভাষাটিও উত্তম ও বিষয়োপযোগী। বইখানি পড়িলে পারস্য সাহিত্যের সহিত আরও অধিক পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা মনে জাগিয়া উঠে।" **(মানসী ও মর্ম্মবাণী, ভাদ্র, ১৩৩১)**।

১১. "বাস্তবিক ইহা বাঙ্গালী সাহিত্যামোদীগণের একখানা পরম আদরের গ্রন্থ হইয়াছে। গ্রন্থকার যে ভাবুক এবং কবিত্বরস সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান যে অসামান্য তাহার পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। এই গ্রন্থ দ্বারা তিনি বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্যের সহিত পারস্য কাব্য সাহিত্যের যে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন, তজ্জন্য চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে।" **(সওগাত, বৈশাখ, ১৩৩৪, ৪র্থ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা)**।

১২. "The book chronicles the life-work of the more famous poets of Persian would critical review of their poetical works. The author is thoroughly wellversed with Persian Literature and Persian History and the book under review bears ample evidence of a finished writer and a mature critic. The language is highly chaste and elegant and the style is almost classical and bears the impress of

www.nagorikpathagar.org

Bankim Chandra's inimitable productions. The ease and facility with which the autor traverses the whole field of Persian Literature is indeed remarkable and the traces of scholarly industry which are evident in every page easily distinguish the book from the other publications which are generally met with in the market.

"The book begins with a historical review of the gradual evolution of Persian Poetry and the circumstances which have imported to it, its peculiar characteristics. The first chapter of the book is therefore highly fascinating and the beautiful style of the author makes it a most pleasant study... And one can hardly go through the book without being tempted to finish it as quickly as possible. We congratulate the author who seems to be preeminently a Poet, on the remarkable parts he has exhibited in this book and assure him that he has afforded us real satisfaction to go through it. We need hardly say that public will find in it a degree of intellectual hardly to be found in the usual publications of the day." (THE SERVENT 13.2.1924)

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর 'পারস্য-প্রতিভা'র ভাষা, বর্ণনা ও রচনার স্টাইলে মুগ্ধ হয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন এটাকে 'Racy sweet Bengali style' বলে উল্লেখ করেন। বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ঃ "I am also delighted to find that as a literary work this book is not essentially Muslim in character but is based on a broad cosmopolitan idea and a comparative study of the Poetical Literatures of different countries."

বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক ও ভাষা-সৈনিক সানাউল্লাহ নূরী পারস্য প্রতিভা সম্পর্কে বলেন ঃ "মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র অম্বিষ্ট জগত আমার আলোচ্য। বর্ষীয়ান এই লেখক সাহিত্যের বলয়ে আর ব্যক্তি-জীবনের বৃত্তে উঠেছিলেন প্রতিষ্ঠার বিশিষ্ট একটি চূড়ায়। দায়িত্বশীল একজন প্রশাসক হয়েও সারাটা জীবন বিচরণ করেছিলেন তিনি সুকুমার সৌন্দর্যের অন্বেষায়। অবগাহন করেছিলেন প্রাচ্য ভাষা, সাহিত্য এবং চিন্তার গভীর রহস্যলোকে। সেই অতল মন্থন করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি উপহার দিলেন ফেরদৌসীর ক্লাসিক্যাল মহাকাব্যের সুধাভান্ড। হাফিজের এবং সা'দীর গজল আর গীতি কবিতার অপার গৌরব, তাঁর বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য। রুমীর মসনবী আর ওমর খৈয়ামের রবাইর অন্তর্লীন সুষমা। ফার্সী সাহিত্যেরই এই অমর কবিদের মুখ আমরা উজ্জ্বল হয়ে ভাসতে দেখি মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচিত 'পারস্য প্রতিভা'য়। এই একটি গ্রন্থে তিনি ধরে

www.nagorikpathagar.org

রেখেছেন ইরানের কাব্য-কাননের সব ক'টি সুকণ্ঠ বুলবুলির সুর এবং গান। তাঁদের আমরা স্পন্দিত হতে দেখি আপন আবেগে, যন্ত্রণায়, ক্ষোভে, ঈর্ষায় এবং ভালবাসায়।

"কাব্যের সমঝদার আর সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে এখানেই অসামান্য কৃতিত্ব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। ঘনিষ্ঠ আলোকে তিনি চিত্রিত করেছেন ইরানী কবিদের জীবন এবং কবিতার জগতে। তাঁদের নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রাণের কাছে অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে। কেমন যেন এক যাদুর ছোঁয়ায় তিনি ঘুচিয়ে দিলেন বাংলাদেশ আর পারস্যের দূরত্ব। আমরা দেখলাম, এই মেদুর আকাশের নীচে আমাদের মেটে ঘরের সামনে শিশির ভেজা আঙিনা দিয়েই যেন হেঁটে যাচ্ছেন পারস্যের অবিস্মরণীয় সেই কবিরা। তাঁদের কণ্ঠের ললিত স্বর কানে এসে বাজছে আমাদের তমালের ছায়াতলে বসে ছন্দে গাঁথছেন তাঁরা। আবৃত্তি করছেন কবিতা।" **(সানাউল্লাহ নূরী ঃ বকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য প্রতিভা)**।

'পারস্য-প্রতিভা'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে। ইতঃমধ্যে প্রথম খণ্ডের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা এ গ্রন্থের অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের পর এ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকা যেসব মন্তব্য করে তার কিছু কিছু অংশ নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

১. "পারস্য-প্রতিভা', দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্যের উর্বর যুগ, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, নেজামী, জামী, সুফীমত ও বেদান্ত, সুফীমত ও নিওপ্রোটোনিজম– এই সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে যেমন পারস্য কবিদের ও তাঁহাদের কাব্যের পরিচয় মিলিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে তেমনি পারস্য দার্শনিক কবি-মনীষীদের জীবন ও মতামত আলোচিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগে পারস্যে যে অমর কাব্য ও দর্শনতত্ত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিক্ষিতজনের পরিচয় হইবে। পারস্য-প্রতিভা বাস্তবিকই বঙ্গ সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।" **(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৪৪)**।

২. "... পুস্তকখানিতে ৭টি প্রবন্ধ স্থান লাভ করিয়াছে। প্রবন্ধগুলি দার্শনিক তথ্যে অলংকৃত।... গ্রন্থকারের লিপিকৌশল মনোরম।" **(দৈনিক বসুমতী, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৮)**।

৩. "বরকতুল্লাহ্ সাহেব কাব্যরসজ্ঞ ও চিন্তাশীল লেখক, একথা ১ম খণ্ড 'পারস্য প্রতিভা' পড়িয়া সাহিত্য সমাজ স্বীকার করিয়াছিলেন। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডও লেখকের সে যশ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছে।" **(মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র, ১৩৩৯)**।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর প্রকাশিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মানুষের ধর্ম' বাংলা ভাষায় মুসলিম রচিত প্রথম এবং এক অসাধারণ দার্শনিক গ্রন্থ হিসাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করে। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সনে। এতে মোট ছয়টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। প্রবন্ধগুলি হলো ঃ 'মানুষের ধর্ম', 'ধ্রুব কোথায়', 'জড়বাদ', 'চৈতন্য', 'বস্তুরূপ' ও 'জীবন প্রবাহ'। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৭ সনে। এতে আটটি প্রবন্ধ স্থান লাভ করে। প্রথম সংস্করণে 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধটি তিনটি ভিন্ন নামে স্বতন্ত্র তিনটি প্রবন্ধাকারে দ্বিতীয় সংস্করণে স্থান লাভ করে। এর পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হয় ১৯৫৯ সালে। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেন ঃ

"গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলি দর্শনমূলক হইলেও দুরূহ দার্শনিকতার অবতারণা ইহাতে করা হয় নাই। সাধারণতঃ আমাদের মনে জীবন ও জগৎ, ইহলোক ও পরলোক, আত্মা ও পরমাত্মা, জড় প্রকৃতি ও মনোজগৎ ইত্যাদি দুর্জ্ঞেয় বিষয়ে সময় সময় যেসব প্রশ্ন জাগে সেইগুলির উপর দর্শন ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাতের চেষ্টা করা হইয়াছে। দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়ই প্রগতিশীল। তাই তিনটি নূতন প্রবন্ধ (১) পরমাণু জগৎ ও প্রাণশক্তির উন্মেষ (২) পরমাণু যুগে ধর্ম ও সভ্যতা (৩) পারমার্থিক জগৎ ও জীবন-এবারে সংযোজিত হইল। প্রবন্ধ তিনটি কিছুদিন পূর্বে 'মাহে নও' পত্রিকায় উহার সম্পাদক সাহেবের সৌজন্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।"

১৯৬৮ সালে 'মানুষের ধর্ম'-এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ সংস্করণে লেখক তাঁর নিবেদনে বলেন ঃ "কোনও কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি আমার আলোচনার ভিতর জড়বাদের উপর অন্যায় কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন।...আমি অধ্যাত্মবাদের সমর্থক। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি জড়বাদ প্রত্যক্ষ প্রমাণভিত্তিক বলিয়া অকাট্য, কিন্তু উহা মানুষের অন্তর্লোকের সন্ধান দিতে অপারগ; অথচ অন্তর্লোকই ধর্ম ও পরমার্থের ক্ষেত্র।"

মোহাম্মদ বকতুল্লাহ্ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য-যুক্তির মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে শৃংখলা, শান্তি, কল্যাণ ও সাফল্যের জন্য ধর্মের আবশ্যকতা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে মানব জীবনে ধর্মের অপরিহার্যতা প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। এ গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও দার্শনিক বিষয়বস্তুর আলোচনা থাকলেও তিনি দৃঢ়তার সাথে একথা বলার প্রয়াস পেয়েছেন যে, ধর্মের মূলভিত্তি বিশ্বাস। অন্যদিকে, বিজ্ঞান ও দর্শন শুধু যুক্তি-নির্ভর। মানুষের নিরন্তর সাধনা হলো চরম সত্যকে আবিষ্কার করা। বিজ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

বস্তুজগত সম্পর্কে অনেক কিছু আবিষ্কার ও নতুন নতুন তথ্য প্রদান এবং আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সক্ষম হলেও বিজ্ঞান বা দর্শন সবকিছু আবিষ্কার বা চরম সত্যে উপনীত হতে আজো সক্ষম হয়নি। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিকগণ আজ যে আবিষ্কার বা নতুন উদ্ভাবনায় সফলকাম হলেন, আগামীতে হয়ত তা ভ্রান্ত বা ত্রুটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। দর্শনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই মানুষের সীমিত জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে বিচার করা সঙ্গত নয়। ধর্মের মূল ভিত্তি বিশ্বাস– এ বিশ্বাসের পথ বেয়েই ধীরে ধীরে চরম সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। এ সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য ও দার্শনিক প্রজ্ঞার সমার্থক। কারণ ধর্মের যিনি স্রষ্টা, বিজ্ঞান ও দর্শনের স্রষ্টাও তিনিই। তাই ধর্মের মূলভিত্তি বিশ্বাসের মধ্যে বিজ্ঞান, দর্শন ও মানব জীবনের অন্য সকল কিছুর একটি সুসমঞ্জস সম্বন্ধ ও সমীকরণ বিদ্যমান। এভাবে তিনি তাঁর জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা ধর্মের আবশ্যকতা এবং মানব জীবনে তার অনিবার্য শুভ পরিণাম সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। নানা দিক থেকে এ গ্রন্থটি অতি মূল্যবান ও উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ।

এ গ্রন্থটি আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সমাজ-পরিবেশ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৫ সনের ১৯ জানুয়ারী। যদিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু এর মূল উদ্যোক্তা ও পরিচালনায় ছিলেন অধ্যাপক আবুল হোসেন (পরে উকিল), অধ্যাপক কাজী আব্দুল ওদুদ, অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন (পরে ডক্টর), আবুল ফজল, মোতাহার হোসেন চৌধুরী, কবি আব্দুল কাদির প্রমুখ। তাঁরা মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতেন এবং সব কিছু বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তির আলোকে বিচার করার পক্ষপাতি ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় ও কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এঁদের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস। তুরস্কের কামাল পাশা, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (হিন্দু কলেজে অধ্যাপনারত তরুণ ফরাসী বুদ্ধিজীবী) ও কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতিও তাঁদের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। দীর্ঘ প্রায় দুই দশককাল পর্যন্ত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' বিশেষ সক্রিয় ছিল এবং ঐ সময় আমাদের ধর্ম-সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন কিন্তু

www.nagorikpathagar.org

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র নেতৃবৃন্দের অনুসৃত রবীন্দ্রনাথের বাণী ঃ 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র', – এই মত ও চিন্তাধারার সাথে তিনি কখনো একমত ছিলেন না। 'বুদ্ধি মুক্তি' আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ধর্ম, বিশেষত ইসলাম সম্পর্কে অনেক বিভ্রান্তিকর প্রশ্নের অবতারণা করেন। এজন্য জ্ঞানতাপস ডক্ট মুহম্মদ শহীদুল্লাহও পরবর্তীতে 'সাহিত্য সমাজে'র সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মুখ্যত ধর্ম সম্পর্কে এ বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জবাব হিসাবেই সাহিত্যিক বরকতুল্লাহ তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তবে এতে প্রচারণামূলক কিছুই নেই, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও বিশ্বাসের সত্যকেই তিনি নির্লিপ্তচিত্তে যুক্তিসহ উত্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য এখানে তুলে ধরছি ঃ

"আব্দুল ওদুদের মত বরকতুল্লাহও প্রবন্ধ সাহিত্যিক কিন্তু তাঁহার আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। ধর্ম বিষয়ে বরকতুল্লাহও আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে ইসলামের আলোচনা না করিয়া ধর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মতামত উপস্থিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন– বিজ্ঞান সত্যের চরম রূপ আবিষ্কারে অসমর্থ। বিজ্ঞান অনেক পথ আসিয়াছে সত্য কিন্তু সম্মুখে এক অভেদ্য রহস্য-জাল, এই শেষ সীমায় পরীক্ষা আর অগ্রসর হয় না। তাই আধুনিক জগতের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অণু-পরমাণু সংস্থার পশ্চাতে চেতনশক্তির অতুলনীয় নৈপুণ্যে। এই বিশ্বাসেই ধর্মের ভিত্তি স্থাপন। গ্রন্থকার যে প্রবন্ধ সমষ্টিতে দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন তাহার নাম 'মানুষের ধর্ম'। অবশ্য এই 'মানুষের ধর্ম' রবীন্দ্রনাথের মানুষের ধর্ম হইতে পৃথক, বিষয়বস্তু ও চিন্তাধারা উভয় দিক হইতে।" (**নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ানঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, তৃতীয় প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯২, পৃ. ৬১৫**)।

পারস্য-প্রতিভার ন্যায় 'মানুষের ধর্ম' প্রকাশের পরও তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এর আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এতে সকলেই গ্রন্থাকারের অসাধারণ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও যুক্তি-নির্ভর আলোচনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। নীচে সংক্ষেপে কয়েকটি পত্রিকার মন্তব্য উদ্ধৃত হলো ঃ

১. "The Book is a collection of six very thoughtful articles published in monthlies coming from the pen of one who is well known for his masterly publication `Parashya Prativa'. The author is a Mohammedan : but nowhere in this book he preaches Mahammedanism or anyother `ism' than universalism. The great

www.nagorikpathagar.org

reality behind the creation of universe has diverse ways of emancipation and expression and the learned writer is liberal enough to accomodate and appreciate every path leading to the one and same destination. Yet he does not present himself as having the vanity of a seer but as an humble seeker after truth... Throughtout the book there is present proof enough of the rare gift of visualising good in everything... The Religion of Maknkind, according to him, evolves itself through seers and sinners, and nothing exists anywhere but adds somethings to the glory of that Supreme Reality which is immanent in spirit and matter as well, and unifies the both... It heartened me a lot to believe with the author that humanity has been constantly striving, thriving, through apparent strifes and setbacks, towards the relisation of truth and we have not left the Golden Age in the primitive past but rather it is ahead of us. This treatise, though brief, forces the readers into a better religion, and, the highest thoughts being clothed in the happiest and most lucid style have been made all the more accessible to all-even to neophytes like the reviewer." **(East Bengal Times, 23.3.1935).**

২. "বরকতুল্লাহ্ সাহেব একজন সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। এদিক দিয়ে তিনি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে অগ্রগণ্য-বোধহয় অদ্বিতীয়ও। আলোচ্য 'মানুষের ধর্ম' তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও দার্শনিক দৃষ্টির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছি।... তাঁর ভাষার লীলাচাতুর্য্য, চিন্তার গভীরতা, নিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি এ পুস্তকে তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণিত করেছে। এ পুস্তকখানা বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করেছে।" **(বুজর-চে-মেহের, মাসিক মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৪২)।**

৩. "এই পুস্তকখানি কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধের সমষ্টি; প্রবন্ধগুলি পূর্বে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলিই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।... প্রবন্ধগুলি বিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সর্বত্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের আলোচনা ও তাহাদের তুলনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এমন সুবোধ্য ভাষায় ও সরল ভঙ্গীতে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে, পাঠকগণ প্রবন্ধগুলি পাঠে বিশেষ আনন্দ লাভ করিবেন। বিশেষতঃ 'জড়বাদ' ও বস্তুরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধ দুইটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান সর্বপ্রকার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলির সমন্বয়ে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত রচনা বাংলা ভাষায় খুব অল্পই প্রকাশিত হয়। লেখকের ভাষায় ফার্সী শব্দের উৎপাত (?) নাই এবং অযথা উচ্ছ্বাসও নাই। ভাষা সর্বত্র সরল, বিষয়োপযোগী ও সুখপাঠ্য।" **(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪২)।**

www.nagorikpathagar.org

৪. "মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ সাহেব তাঁহার নব-প্রকাশিত 'মানুষের ধর্ম' পুস্ত কখানিতে জড় ও জীবন সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বৈজ্ঞানিক যুগের অতিন্দ্রীয়বাদীদের অনুভাবেই অনেকখানি পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজের বিশিষ্ট মানস-কেন্দ্রটির পরিচয় এমন সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন যে, তাহাতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার স্বকীয়তা। এক চৈতন্যশক্তিকে তিনি বিশ্ববস্তুর মূলে কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্মাণ্ডের সেই মূল-বস্তু একক। তাঁহার অদ্বৈতবাদ হইতেছে মওলানা রুমীর Mystical monism; Hacckel-এর Scientific monism নয়।" (**'সবুজ বাংলা', অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ এবং 'মোয়াজ্জিন', ভাদ্র, ১৩৪২**)।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র তৃতীয় গ্রন্থ 'কারবালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সনে। 'কারবালা'র ঘটনা মুসলিম ইতিহাসের এক অতি মর্মন্তুদ ও শোকাবহ ঘটনা। সে শোকাবহ ঘটনার সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে এ গ্রন্থটিতে। গ্রন্থের শিরোনামের সঙ্গে বন্ধনীতে লেখা আছে ঃ 'কারবালার যুদ্ধ ও নবীবংশের ইতিবৃত্ত'। 'কারবালা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সনে। এ সংস্করণে গ্রন্থের শিরোনামঃ 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত'। এ সংস্করণের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেনঃ

"কারবালা গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। তারপর ১৯৬৩ সালে উহা পুনর্মুদ্রিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ফর্মাগুলি প্রেস হইতে ডেলিভারী লওয়ার পূর্বেই, ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে, আকস্মিকভাবে আগুনে পুড়িয়া যায়। তাই সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি আবার নূতন করিয়া মুদ্রিত করিতে হইল। ইহাতে সময় লাগিল অনেক।"

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের আমূল সংশোধন, সংযোজন ও বিষয় বিন্যাসের পরিবর্তন সাধিত হয়। 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' শিরোনামে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তৃতীয় সংস্করণ মূলত দ্বিতীয় সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ। এটি একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ। কিচ্ছা থেকে ইতিহাসকে পৃথক করার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থটি রচিত। কারবালার বিষাদময় ইতিহাসের ভিত্তিতে আমাদের দেশে সেই মধ্যযুগ থেকেই অসংখ্য কিচ্ছা-কাহিনী রচিত হয়েছে। এসব রচনায় যতটা ভাবাবেগ ও মানবিক সংবেদনার প্রকাশ ঘটেছে, ইতিহাসের দিকে ততটা খেয়াল রাখা হয়নি। এমনকি, ঊনবিংশ শতকে মীর মশাররফ হোসেন রচিত সুবিখ্যাত ও অতি জনপ্রিয় 'বিষাদ সিন্ধু' গ্রন্থও এ গতানুগতিক ধারার অনুসরণে রচিত। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র উপরোক্ত গ্রন্থটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। লেখক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

"কারবালার কাহিনী সম্পর্কে একটি কথা উল্লেখ না করিয়া পারা যায় না। কারবালার যুদ্ধ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু ভক্তদের লেখনিতে উহার অনেক অতিরঞ্জন ঘটিয়াছে। দীর্ঘ তেরো শত বৎসর ধরিয়া কবি সাহিত্যিকেরা উহার উপর তুলিকা চালাইতে চালাইতে উহাকে উপকথার পর্যায়ে দাঁড় করাইয়াছেন। নানা কাল্পনিক গল্পের অবতারণা দ্বারা মূল কাহিনীকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করার চেষ্টা চলিয়াছে। নারীঘটিত প্রণয় কাহিনীও উহাতে সংযোজিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, আবদুল জব্বার ও তৎপত্নী যয়নাব সংক্রান্ত কাহিনী নিতান্তই কাল্পনিক। মুহম্মদ হানাফিয়ার যুদ্ধে গমনও ইয়াযিদের পশ্চাদ্ধাবন ইত্যাদি কিচ্ছারও কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।... ইমাম হুসায়েনের কুফা গমনের পূর্বে মুসলিম বিন আকিল কুফায় প্রেরিত হইয়াছিলেন গোপনীয় দৌত্য কার্যে। সেক্ষেত্রে মুসলিমের দুইটি নাবালক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া অস্বাভাবিক। অথচ তাঁহার দুই সুকুমার পুত্রের নিষ্ঠুর হত্যার এক করুণ চিত্র সযত্নে অঙ্কিত করা হইয়াছে পাঠকদের চক্ষুতে অশ্রু আনয়নের জন্য। এই ধরনের বহু অমূলক কিচ্ছা মূল ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ফলে এখন আসল ও নকল পৃথক করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য মূল ইতিহাস হইতে মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে আমাকে বহু পরিশ্রম করিতে হইয়াছে।"

গ্রন্থের প্রথম দিকে লেখকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা, অতঃপর 'কারবালা যুদ্ধের পটভূমিকা', 'পূর্ব ইতিহাস' ও 'খলাফায়ে রাশেদীনের আমল' এসব শিরোনামে লেখক ইমাম বংশ ও কারবালার যুদ্ধের পটভূমি তথ্য ও ইতিহাস-নির্ভর আলোচনার পর মোট ১৭টি অধ্যায়ে কারবালা যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা ও তার পরবর্তী ঘটনাবলী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থটি ইসলামের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা। লেখক সর্বদা নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করেছেন। তবে ভক্তের আবেগ-উচ্ছলতা মাঝে-মধ্যে তাঁর বর্ণনাকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমগদ্ধকর করে তুলেছে। কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

"পৃথিবীর যুদ্ধ-ইতিহাসে কারবালার যুদ্ধ একটি সামান্য ঘটনা। কিন্তু ফলাফলের দিক দিয়া উহার গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। উহা শুধু মদীনা, মক্কা ও কুফায় বিপ্লব আনে নাই, দামেস্কের উমাইয়া রাজবংশের পতনেও উহার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হইয়াছে।...

www.nagorikpathagar.org

"আব্বাসীয় বংশের শাসন আমলেও ইমাম বংশের উপর কম অত্যাচার সাধিত হয় নাই। ইমাম হাসানের প্রপৌত্র ইমাম মুহম্মদ (নাফ্‌সে জাকিয়া) ও ইব্রাহীমের নিধন, হুসায়েন বংশীয় ইমাম মু'সা আল্ কাযিম এবং তাঁহার বংশধরদের মদীনা হইতে নির্বাসন ও বন্দী শিবিরে তাঁহাদের প্রাণত্যাগ ইত্যাদি বহু শোকাবহ ঘটনা কারবালার বিষাদময় কাহিনীর সহিত এক সূত্রে গাঁথা। এইসব কাহিনী যেমন বিচিত্র তেমনি করুণ। এ জন্য কারবালা কাহিনীর সহিত এইসব ঘটনার বিবৃতি সংযোজিত হইয়াছে। মহানবীর ওফারেত পরবর্তী 'দ্বাদশ ইমামের' কথাও প্রসঙ্গক্রমে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

"দুই শতাব্দীরও অধিককাল দুঃখ-কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করার পর ইমাম বংশ কিভাবে আব্বাসীয় খলিফাদের সতর্ক দৃষ্টি সত্ত্বেও ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে এবং পরিশেষে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমীয় সাম্রাজ্য ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়, সেই বিস্ময়কর কাহিনীর বিবৃতির দ্বারা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি টানা হইয়াছে। উপসংহারে আব্বাসীয় শাসনের কিভাবে অবসান হয় এবং বিভিন্ন যুগে খিলাফত কিভাবে এক বংশ হইতে অন্য বংশে হস্তান্তরিত হয় তাহার একটি ধারাবাহিক বিবরণী, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, জিজ্ঞাসু পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য বিবৃত হইয়াছে।"

'কারবালা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক তাঁর ভূমিকায় মোটামুটি ইঙ্গিত দিয়াছেন। লেখক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম সহকারে ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে গ্রন্থের কাহিনী পরম্পরা সাজিয়েছেন। শুধু কারবালার বিষাদময় ঘটনার বিবরণ প্রদানই লেখকের উদ্দেশ্য নয়। কারবালার পটভূমি, এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চরিত্র, ঘটনার প্রতিক্রিয়া, পরবর্তী বিভিন্ন ঘটনাবলী, এমনকি, এর পরবর্তী দু'শো বছর পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বিধৃত করেছেন। তাঁর ভাষা ও বর্ণনার মাধুর্য সবকিছু মিলিয়ে গ্রন্থটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানত দুটি নির্ভরযোগ্য সূত্র অবলম্বন করেছেন। তার একটি হলো খ্যাতনামা লেখক সৈয়দ আমীর আলীর A Short History of the Saracens এবং অন্যটি বিখ্যাত বৃটিশ ঐতিহাসিক অধ্যাপক হিট্টির History of the Arabs. এছাড়া আরো বহু ইংরেজী, উর্দু, বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন তিনি।

এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এর উপর যে আলোচনা-সমালোচনা প্রকাশিত হয় তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে দু'একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

www.nagorikpathagar.org

১. "যে বয়সে অন্য মানুষ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের কথা ভাবে, অর্জিত সিদ্ধি ও যশের মূলধনেই জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চায়, সেই বয়সে জনাব বরকতুল্লাহ্‌র এই অভিযান দুঃসাহসিক, এতে কোন সন্দেহ নাই। উল্লেখিত 'কারবালা' গ্রন্থে মননশীল লেখক কল্পনার প্রলেপে রহস্যময় কারবালা যুদ্ধ ও নবীবংশের ইতিবৃত্তের সঠিক সত্য ও তথ্য নিরূপণে প্রচেষ্ট হয়েছেন এবং এতে সাফল্য লাভ করেছেন বলেই আমার বিশ্বাস।... এ ব্যাপারে তিনি সৈয়দ আমীর আলী, অধ্যাপক হিট্টি, অধ্যাপক এম. খোদাবক্স, স্যার উইলিয়ম মুর, নিকলসন, খাজা হাসান নেজমী, অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন, অধ্যাপক মুহম্মদ ইসহাক প্রমুখের ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা 'ইসলামের ইতিহাস' পর্যালোচনায় এর মধ্য থেকে কল্পনা বিবর্জিতভাবে সঠিক ঘটনাকে তুলে ধরেছেন।

"জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ সুবিখ্যাত দার্শনিক লেখক। তাঁর সারা জীবনের সাহিত্য সাধনার মূল বৈশিষ্ট্য হইল সত্যনিষ্ঠা, ভাবের গভীরতা আর ভাষার ওজস্বিতা। উল্লেখিত গ্রন্থেও তাঁর নিপুণ বিশ্লেষণী শক্তি তাঁর স্বকীয়ত্বকেই প্রমাণ করেছে।" **(তোফাজ্জল হোসেন/ দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা আগস্ট, ১৯৫৮)**।

২. "মোছলেম ইতিহাসের করুণতম কাহিনী কারবালায় এমাম হোছায়েনের শাহাদৎ বরণের সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ আলোচ্য 'কারবালা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে কারবালার করুণ কাহিনী অবলম্বনে এ যাবৎ যত বই প্রকাশিত হইয়াছে, সে-সবের একখানাতে সম্ভবত আলোচ্য বইয়ের মতো সত্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই। 'কারবালা' এদিক দিয়া ব্যতিক্রম এবং একক।... শুধু কারবালা কাহিনী নয়, এ কাহিনীর সাথে সম্পর্কিত সময়কার আরবের ইতিহাসও ইহাতে বর্ণনা করা হইয়াছে। হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিহিংসা এর প্রাথমিক ইতিহাস, কারবালায় এই শোচনীয়তম পরিণতি– এসব সুন্দর সাবলীল ভাষায় এ গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।... বিষয়বস্তু যেমন শোকাবহ, লেখকের ভাষাও তেমনি বলিষ্ঠ ও সাবলীল– ফলে 'কারবালা' পড়িতে উপখ্যানের মতোই পাঠককে টানিয়া লইয়া যায়। লেখক বইয়ের পরিশিষ্টে কারবালার ঘটনার ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে মিঃ খোদাবক্স ও মিঃ মু'য়ের দুইটি দীর্ঘ মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতে বইয়ের মূল্য বাড়িয়াছে।" **(নূরী/ দৈনিক আজাদ, ২৭ জুলাই, ১৯৫৮)**।

৩. "কারবালা প্রান্তরের শোচনীয় ঘটনা ইসলামের ইতিহাসের এক 'বিষাদময়' অধ্যায়।... কারবালার সেই বিষাদময় কাহিনী নিয়ে বাংলাদেশেও অসংখ্য গান গল্পের অভাব নেই। একদিকে যেমন মুক্তাল হোসেন, জঙ্গনামা

www.nagorikpathagar.org

প্রভৃতি মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য পর্যায়ের বহু পুঁথি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো বৃহৎ কাব্যোপন্যাসেরও জন্ম নিয়েছে। ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিক তথ্যের সংমিশ্রণেই কারবালা কাহিনীকে ভিত্তি করে বাংলাদেশে এক বৃহৎ সাহিত্য গড়ে উঠেছে।... আলোচ্য 'কারবালা' গ্রন্থে লেখক ঐতিহাসিক ও গবেষকের দৃষ্টিতে ইসলামের ইতিহাসের সেই বিষাদময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন। বরকতুল্লাহ সাহেবের সমগ্র সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রতি তাকালে দেখা যায়, তার পিছনে একটি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নীরব সাধনা রয়েছে। তাঁর বিদগ্ধতা, দার্শনিকতা গভীর জ্ঞান সাধনা, ভাষার শাণিত দীপ্তি এবং সর্বোপরি তাঁর মনীষাদীপ্ত প্রতিভার স্পর্শ পাঠক শ্রেণীকে মুগ্ধ করে। আর তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনার দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাধনার তুলনায় তা কত অকিঞ্চিৎকর, তবে এ অল্প ক'টি গ্রন্থ থেকেই তাঁর সাহিত্যিক পরিমাপ এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন নির্ধারণ করতে অসুবিধা হয় না।" **(আল ইসলাহ্, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪)**।

৪. "জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহেব চাকুরী জীবনে ন্যায়নিষ্ঠ ও সুবিচারকের খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁর এই নূতন 'কারবালা' পুস্তকে ইসলামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সংবলিত খেলাফত লাভের দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের এবং ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের যে সত্যকার ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে এই রূপ ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নেই।..." **(আব্দুস সালাম/ দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান, ১৬ জুলাই, ১৯৫৮)**।

লেখকের চতুর্থ গ্রন্থ 'নবীগৃহ সংবাদ' প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। মাসিক 'সওগাত' পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩৩২, বৈশাখ, ১৩৩৪ এবং জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪ সংখ্যায় মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ বিবি খাদিজা (রা) সম্পর্কে ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধগুলির ভিত্তিতেই এ গ্রন্থ রচিত। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক উল্লেখ করেন ঃ "বাংলা ১৩৩৩-৩৪ সনে বিবি খাদিজা সম্বন্ধে আমার কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ মাসিক সওগাতে প্রকাশিত হয়।... খাদিজা চরিত্র অঙ্কিত করিলে নবী চরিত্র সে আলেখ্যে আপনা আপনি আসিয়া পড়ে কেননা দুইটি চরিত্র ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার নবী চরিতের অর্থই ইসলামের ক্রমবিকাশের কাহিনী। তাই নবী চরিত্রের সঙ্গে ইসলামের ক্রমবিকাশও এই প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

"নবী চরিত্র বাদ দিয়া প্রথমে খদিজা চরিত্র কেন লিখিয়াছিলাম, তার কারণ, নবী চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তথা বাংলা ভাষাতেও, অসংখ্য

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু খাদিজা চরিত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা এ যাবৎ খুব অল্পই হইয়াছে। অথচ নবী চরিত্রের বিকাশ এবং ইসলামের উন্মেষ ব্যাপারে খাদিজার অবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন জাতির যত নারী চরিত্র পাঠ করিয়াছি তার মধ্যে খাদিজার চরিত্র, প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ যেকোনও যুগে নারী সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"

'নবীগৃহ সংবাদ' গ্রন্থে লেখক আরবজাতির ইতিহাস, এর ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক-বাণিজ্যিক অবস্থা, বিভিন্ন যুগে এর সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ, এর ঐতিহাসিক পরিচয়, বিভিন্ন নবী-রাসূলদের আগমন, মহানবীর (স) আবির্ভাব, ইসলামের ক্রমবিকাশ, মহানবী (স) ও ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে বিবি খাদিজার (রা) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, মক্কায় মহানবীর (স) সংগ্রাম-জীবন ও সে সাথে মহানবীর (স) পারিবারিক জীবনের পরিচয় গভীর পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক নির্লিপ্ততা ও সত্যনিষ্ঠার সাথে লেখক এতে ফুটিয়ে তুলেছেন। বইটি সম্পর্কে একটি পত্রিকার অভিমত ঃ "আলোচ্য বইটিতে লেখক নবীর জীবনের শৈশব থেকে শুরু করে নবীর মদীনা প্রস্থান পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ নবী জীবন ও নবী পরিবারকে কেন্দ্র করে বইটি লিখিত হলেও প্রাসঙ্গিকভাবেই তৎকালীন মক্কার সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি দিক এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ইসলামের ত্বরিৎ ক্রমবিকাশে বিবি খাদিজার মহৎ অবদান এবং তাঁর চারিত্রিক মাধুর্য সম্পর্কে লেখকের সাবলীল ও অনাড়ম্বর বর্ণনা বইটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

"ইসলামের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশে মহৎ অবদানের জন্যই শুধু নয়, স্বীয় চারিত্রিক মাধুর্য, পতিভক্তি এবং আদর্শনিষ্ঠার জন্য বিবি খাদিজা মানুষের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। গৃহিনী হিসাবেও তিনি বিশ্বের ইতিহাসে আদর্শ স্থাপন করে গেলেন। জনাব বরকতুল্লাহ্ সাহিত্যিক। তাই তিনি ঐতিহাসিক সত্যকে অক্ষুণ্ন রেখেও সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর ভাষার একটি সাবলীল গতিছন্দ ও মাধুর্য লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের প্রবন্ধধর্মী জীবনী গ্রন্থের জন্য বলিষ্ঠ শব্দ একান্ত প্রয়োজন। জনাব বরকতুল্লাহ্ শব্দচয়নের এই দিকটি সম্পর্কে সচেতন।" **(দৈনিক ইত্তেফাক, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৬০)।**

'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র পঞ্চম গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক এ গ্রন্থ লেখার পটভূমি এবং এতে বিধৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলেন ঃ "ত্রিশ বৎসর আগের কথা। কতিপয়

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্যামোদী ব্যক্তি আমার পারস্য প্রতিভা পাঠ করার পর আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় একখানি নবী-চরিত্র লিখিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি আত্মজিজ্ঞাসা হইতে উপলব্ধি করিলাম, নবী-চরিত্রের আসল স্বরূপ আমার বোঝা হয় নাই। তারপর পড়িয়াছি যথাসাধ্য এবং শুনিয়াছি বিস্তর। কিন্তু এখনও সেই বিরাট ব্যক্তিত্বের সকল দিক সম্যক বুঝিয়াছি এ দাবী করিতে পারি না। বিষয়টি বাস্ত বিকই দুরূহ। তবে যতটুকু বুঝিয়াছি সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম। হয়ত, আমার দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল অকিঞ্চিৎকর হইলেও কাহারও কিছু কাজে লাগিতে পারে।"

"নবীকে বুঝিতে হইলে শুধু তাঁহার পারিবারিক জীবন এবং তাঁহার পত্নীগণের সহিত তাঁহার দৈনন্দিন আচরণ, ইত্যাদি সম্বন্ধেও অবগত হওয়া দরকার। নবী-চরিত্রের স্ফুরণে তাঁহার পত্নীগণের বিশিষ্ট অবদান রহিয়াছে। ইহারা সকলেই ইতিহাস-কীর্তিতা রমণী। তাই নবী-চরিত্রের বিবৃতির সহিত এই সকল মহিলার, বিশেষ করিয়া অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী বিবি আ'য়িশার, ব্যক্তিত্ব, চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং নবীর কর্তব্যকার্য সম্পাদনের তাঁহাদের সহযোগিতার বিবরণও যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

"চরিত্র চিত্রণে কল্পনার আশ্রয় লওয়া চলে না। শুধু লিখিত-দস্তাবেজ এবং পূর্বসূরীদের গবেষণা-প্রসূত প্রামাণ্য গ্রন্থাবলীর উপর নির্ভর করিতে হয়। আমিও তাহাই করিয়াছি এবং যথাস্থানে তাহা সাধ্যমত উল্লেখ করিয়াছি। বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ আল্ কুরআনের সূরাসমূহেরও যথাসম্ভব সাহায্য লইয়াছি।

"নবী-জীবন সংক্রান্ত আমার অপর গ্রন্থ 'নবীগৃহ সংবাাদ' বর্তমান গ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র। উহা মূলতঃ বিবি খাদিজার আত্মত্যাগ ও সেই সঙ্গে নবীর সাধনা-জীবনের ইতিহাস। বর্তমান গ্রন্থ নবীর সৃষ্টি ও বহুমুখী কর্মজীবনের ইতিবৃত্ত। দুইটি গ্রন্থের প্রত্যেকটি পৃথকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।"

মোহাম্মদ বকতুল্লাহ তাঁর এ গ্রন্থের ভূমিকায় এর বিষয়বস্তু ও মূল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। এটা তাঁর এক অসাধারণ নৈপুণ্য। এখানে তার কিছুটা নমুনা পেশ করছি ঃ "হযরত মুহম্মদের (স) জীবন-কাহিনী আরবের নবধর্ম ও নয়াজাতির উত্থানের বিচিত্র ইতিহাস।... দুর্নীতি, দলীয় বিদ্বেষ, অত্যাচার, অবিচার ও প্রবল কর্তৃক দুর্বলের শোষণ দ্বারা জাতি যখন উৎসন্ন যাইতেছিল, মদ, জুয়া, সূদ ও অবাধ নারী সম্ভোগ যখন সমগ্র জাতির অন্তঃসার নিঃশেষিত করিতেছিল, ভাই হইয়া ভাই-এর বুকে ছুরিকা বিদ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করিতেছিল, মানুষ পণ্যদ্রব্যের ন্যায় বাজারে বিক্রীত হইতেছিল এবং তাহার মনিব-গৃহে পশুর ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছিল এবং পৃথিবীর পুরাতন ধর্মসমূহ বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সময় আরব জাতির, তথা সমগ্র মনুষ্য জাতির, পাপভার হরণের জন্য মক্কায় আবির্ভূত হইলেন মহামনব হযরত মুহম্মদ (সঃ)।

"তিনি এই অধঃপতিত জাতিকে দিলেন ধর্ম, নীতি এবং পরলৌকিক জীবনে বিশ্বাস।...নবী মুসলিমদিগকে শুধু ধর্ম, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না; তাহার যাহাতে সম্মানের সহিত দুনিয়ায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তারও ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে দিলেন সামরিক শিক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা এবং আত্মপ্রত্যয়।...মহান নবীর অবদানের এখানেই শেষ নয়। তিনি সমাজ হইতে দুর্নীতি দূরীভূত করার জন্য সুষ্ঠু সমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিলেন, বিচার ও ইনসাফকে দিলেন ধর্মের মর্যাদা এবং ন্যায়নীতি ও সাম্যের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্রনীতি গড়িয়া দিলেন। নবীর সৃষ্ট নয়াসমাজে অভিজাত বা পুরোহিত বলিয়া কোনও বিশিষ্ট সমাজ থাকিল না। যোগ্যতা থাকিলে আযাদ ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারিবে, ইহাই ছিল নবী-প্রদত্ত বিধান। নবী নারী জাতিকে দিলেন আইনের দৃষ্টিতে ব্যক্তিত্ব। ক্রীতদাস-দাসীদিগকে মুক্তিদানের পথ তিনি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।... তিনি এই নয়াজাতিকে শুধু শক্তিমন্ত্রে নয়, কর্মযোগেও দীক্ষা দিয়া তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিলেন অদম্য জ্ঞান ও কর্মস্পৃহা, যার ফলে তাহারা গ্রীক দর্শন, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানগুরুর আসন অলংকৃত করিয়াছিল এবং ভৌগোলিক বিজয়ের বহু পূর্বেই মনোরাজ্যের দিক দিয়া পৃথিবী জয়ে সক্ষম হইয়াছিল।...এই জাতি শুধু পৃথিবীর ভিতর বৃহত্তর সাম্রাজ্য গড়িতেই সমর্থ হয় নাই, তাহারা পৃথিবীকে উন্নত সভ্যতা, মার্জিত রুচি এবং বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা দিতেও সমর্থ হইয়াছিল। কেননা তাহাদের ধর্মে রহিয়াছে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক জীবনের এক অপূর্ব সমন্বয়।"

'নবীগৃহ সংবাদে' লেখক যেখানে মহানবীর (স) মক্কী জীবনের পরিচয় তুলে ধরেছেন, 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ'-এ সেখানে মহানবীর (স) মদনী জীবন, বিভিন্ন জেহাদ, ইসলামের প্রচার-প্রসার ও আল্ কুরআনের ভিত্তিতে এক আদর্শ ও অতুলনীয় রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থের সর্বশেষ অধ্যায়ে লেখক ইসলামের সাথে অন্যান্য সকল বৃহৎ ধর্মের ও মহানবীর (স) সাথে অন্য সকল বিশিষ্ট ধর্ম-প্রচারকদের তুলনামূলক আলোচনা করে অন্য সকল ধর্ম ও তার প্রচারকদের মুকাবিলায় ইসলাম ও মহানবীর (স)

www.nagorikpathagar.org

অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে সপ্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সম্পূরক। একটিতে মহানবীর (স) মক্কী জীবন অন্যটিতে মদ্‌নী জীবনের বিবরণ রয়েছে। দুটি মিলে মহানবীর (স) সম্পূর্ণ জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এ দুটি গ্রন্থেই গভীর অধ্যবসায় সহকারে ইতিহাসকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট মানুষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী কীভাবে আরবের জাহিলিয়াতের যুগে জন্মগ্রহণ করে নবুওত প্রাপ্তির পর শত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, জুলুম-নির্যাতন সহ্য করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ সমাজ ও নতুন মহান রাষ্ট্র গঠন করলেন এতে তার অতুলনীয় বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা রয়েছে। আজকের অন্ধকারাচ্ছন্ন, পাপময়, দুরাচারগ্রস্ত অশান্ত পৃথিবীতে এ গ্রন্থটি এক আদর্শ, শান্তিপূর্ণ, কল্যাণময় সমাজ ও পৃথিবী গড়ার অনুপ্রেরণা প্রদানে সক্ষম। মহানবীর (স) সর্বোত্তম আদর্শ জীবন কোন একটি বিশেষ সমাজ, ধর্ম বা যুগের জন্য নয়, তিনি সর্বকালের সকল মানুষ ও জাতির চির অনুসরণীয় সর্বোত্তম আদর্শ। 'নয়া জাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ (স)' গ্রন্থে লেখক সে কথাই ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ গ্রন্থের জন্য তিনি 'দাউদ পুরস্কার' লাভ করেন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ষষ্ঠ গ্রন্থ 'হযরত ওসমান' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সনের জুন মাসে। এ গ্রন্থের শুরুতে 'লেখকের নিবেদন' শিরোনামে গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ

"... হযরত ওসমানের জীবনী সঙ্কলনের জন্য আমি যখন কেন্দ্রীয় বাঙলা-উন্নয়ন বোর্ড (পরে বাংলা একাডেমীর সাথে একীভূত) কর্তৃক আদিষ্ট হই তখন ভাবি নাই এ কাজ আমার দ্বারা সম্ভবপর হইবে।...খলাফায়ে রাশেদীনের ভিতর হযরত ওসমানের জীবনী যে সর্বাপেক্ষা দুরূহ কার্য, তাহা অভিজ্ঞ পাঠককে বলা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার সম্বন্ধে সমসাময়িক লেখকগণের ঔদাসীন্য খুবই সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালেও তাঁহার সম্বন্ধে গবেষণা অল্পই হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্বগোত্র উমাইয়াগণ তাঁহার শাহাদৎকে মূলধন করিয়া নিজেদের রাজনৈতিক উত্থানের পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করেন নাই।...পরবর্তী আব্বাসীয় যুগ অবশ্য গবেষণা ও জ্ঞান-চর্চার যুগ ছিল; কিন্তু সে যুগেও হযরত ওসমান সম্বন্ধে পণ্ডিত সমাজ সম্যক আলোকপাত করেন নাই। গ্রন্থপঞ্জীর এই প্রকার দুর্ভিক্ষবশতঃ আমাকে ইতিহাসের নানা অন্ধিসন্ধি হাতড়াইয়া বেড়াইতে হইয়াছে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য...মোটামুটি যে কয়খানি প্রামাণ্য গ্রন্থের উপর আমি নির্ভর করিয়াছি, সেগুলি হইল ঃ সৈয়দ

www.nagorikpathagar.org

আমীর আলী প্রণীত A Short History of the Saracens, অধ্যাপক পি.কে. হিট্টীর রচিত The Arabs, মু'য়র প্রণীত Annals of the Early Caliphate, আর.এ. নিকলসনের Literary History of the Arabs, ডক্টর তোহা হোসেন (মিসরী) প্রণীত 'হযরত ওসমান'-এর মৌলানা নূরুদ্দীন আহমদ কৃত বঙ্গানুবাদ এবং মৌলানা হাজী মঈনউদ্দীন প্রণীত (উর্দু) খলাফায়ে রাশেদীন। এই সব ছাড়া, রোমক-শক্তির সহিত মুসলিমদের সংঘর্ষের বেলায় গীবনেরও সাহায্য লইয়াছি। মু'য়র নির্ভর করিয়াছেন সাধারণতঃ তাবারী ও বালাজুরীর ইতিহাসের উপর। কাজেই আমার গ্রন্থে এ দুই প্রসিদ্ধ আরব-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব পড়িয়াছে।"

লেখকের উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে এ গ্রন্থ রচনার পটভূমি ও বিভিন্ন তথ্য-সূত্রের উল্লেখ রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি এর রচনায় কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন। ইংরেজি, আরবি, উর্দু, বাংলা বিভিন্ন ভাষার নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তিনি এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। সেদিক থেকেই ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান বিন আফ্ফানের (রা) উপর রচিত বাংলা ভাষায় এটিই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। লেখকের রচিত এটিই সর্বশেষ গ্রন্থ। এরপর তিনি আরো কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কিন্তু গ্রন্থ হিসাবে এটাই তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থ। হযরত ওসমান সম্পর্কে লেখক গ্রন্থের শুরুতেই এভাবে বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"মক্কার লোকেরা বলিত, কেহ যদি দুনিয়ায় হযরত ইউসুফের রূপরাশি দেখিতে চায়, তাহাকে আফ্ফানের পুত্র ওসমানের দিকে তাকাইতে বল। ওসমান শুধু রূপেই অনিন্দ্যসুন্দর ছিলেন না, গুণেও কুরাইশ-যুবকদের ভিতর তাঁহার তুলনা ছিল বিরল। ফুলের মত সুকুমার দেহ এবং শিশিরের মত শুচিশুভ্র মন লইয়া তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ সওদাগর আফ্ফানের গৃহ আলোকিত করিয়াছিলেন। পিতা-মাতা স্বগৃহে তাঁহার বাল্য শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেকালে মক্কায় স্কুল-মাদ্রাসার অভাব ছিল। ধনীর সন্তানেরা নিজ নিজ গৃহেই লেখাপড়া শিখিত। ব্যবসায়ের জন্য বেশী লেখাপড়ার প্রয়োজন হইত না। হযরত ওসমান ঘরে বসিয়া মোটামুটি ভালো লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন।"

লেখক তাঁর স্বভাবসুলভ কবিত্বময় বর্ণনায় হযরত ওসমানের দৈহিক সৌন্দর্য ও চরিত্র-মাধুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে ঃ

"হযরত ওসমান বাল্য বয়সেই পিতৃহারা হন। তৎপর তিনি পিতৃব্য হাকামের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর ওসমান

www.nagorikpathagar.org

পিতৃব্যের সহযোগিতায় বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। এবং বিদেশ গমন আরম্ভ করেন। এই প্রিয়দর্শন ব্যবসায়ীর কমনীয় কান্তি, অমায়িক ব্যবহার, দেশে ও বিদেশে পণ্যের বাজারে তাঁহার পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করিত। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে রাবীগণ এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ দেহ নাতিদীর্ঘ, নাতিস্থূল ও সুঠাম মুখমণ্ডল লাবণ্যময় ও কমনীয়; বর্ণ সুপক্ক গমের মত হরিদ্রাভ, আবার কাহারও কাহারও মতে শ্বেত-রক্তাভ। উচ্চতা মধ্যমাকৃতি, নাসিকা উন্নত, দেহ মাংসল, তদুপরি গুটিকার দাগ। শ্মশ্রু ঘন-বিন্যস্ত ও দীর্ঘ। মস্তকের কেশ গ্রীবাদেশ পর্যন্ত লম্বিত। রক্তিম ওষ্ঠাধরের পশ্চাতে শুভ্র দন্তপাঁতি, সর্বোপরি তাঁহার নীলাভ আয়ত চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি- সমস্ত মিলিয়া দর্শকমাত্রকেই মোহিত করিত। চরিত্রের দিক দিয়া হযরত ওসমান বাল্যকাল হইতেই সংযমী, সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কখনও মদ্যপান করিতেন না। এবং কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইতেন না।

"তিনি লাজুক স্বভাব ও বিনয়ী ছিলেন। কাহাকেও কষ্ট দেওয়া তিনি সহিতে পারিতেন না। এই সকল গুণরাশি তাঁহাকে যুব-সমাজে আদর্শ-স্থানীয় করিয়াছিল। বয়স্কদের নিকটও তিনি অতি আদরের পাত্র ছিলেন।... ইসলামের আহ্বানে মক্কায় প্রথম যে চল্লিশ ব্যক্তি তৌহিদে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহাদেরই ভিতর ছিলেন এই হযরত ওসমান (রা)।"

ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) নানা গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, দানশীল, ধর্মভীরু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। তিনি যেমন ধনী ছিলেন, তেমনি ছিলেন দাতা। এজন্য তাঁকে 'গনী' বলা হতো। মহানবীর (স) দুই কন্যা- রোকাইয়া (রা)-কে প্রথমে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর উম্মে কুলসুমকে (রা) বিয়ে করার জন্য তাঁকে 'জুন্নুরাইন' অর্থাৎ যুগল নূরের অধিকারী বলা হতো। তিনি ছিলেন অতি সরল প্রকৃতির মহৎ ব্যক্তি। তাঁর সরলতার সুযোগে তাঁর খিলাফতকালে তাঁর নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই নানারূপ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। এ কারণে অন্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। পরিণামে তাঁকে শাহাদাত বরণ করতে হয়। মোহাম্মদ বকতুল্লাহ্ এসব বিষয় অত্যন্ত নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণার অপনোদন ঘটিয়েছেন। মোট পঁচিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত ২৩৫ পৃষ্ঠা সংবলিত এ গ্রন্থটি অতিশয় সুখপাঠ্য।

'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা' নামে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর ১৮ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা 'সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ' ১৯৬৯ সনের অক্টোবরে

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ করে। এটি মূলত একটি অভিভাষণ। ১৯৪৩ সনের ৮ ও ৯ মে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র সাহিত্য সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে তিনি এ অভিভাষণটি পাঠ করেন। কলকাতা ইসলামিক হলে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন কবি সৈয়দ এমদাদ আলী। এটি 'ছায়াবীথি' নামক পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে লেখক এতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন।

এছাড়া, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর আরো কয়েকটি মূল্যবান অভিভাষণ, প্রবন্ধ ও কতিপয় কবিতা রয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধ হলো ঃ 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন', 'ডাঃ লুৎফর রহমান' ও 'নবযুগের আহ্বান'। 'জীবন স্মৃতি' নামে তিনি একটি স্মৃতিকথা লেখা শুরু করেছিলেন কিন্তু শেষ করতে পারেননি। মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে গভীর পাণ্ডিত্য, দার্শনিক চিন্তা, নিরপেক্ষ তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনার পরিচয় মেলে। তাঁর ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সাবলীল, অলংকারময় ও প্রসাদগুণসম্পন্ন।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ একজন মননশীল সাহিত্যিক। দার্শনিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস, সচেতনতা, গভীর ধর্মবোধ, সত্য-সন্ধিৎসা ও বুদ্ধিদীপ্ততা তাঁর গদ্য রচনাকে দিয়েছে অপরিসীম মহিমা, সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য। দর্শনের ছাত্র হিসাবে দর্শনের চর্চা ও দার্শনিক প্রজ্ঞা ছিল তাঁর সহজাত। পারিবারিক পরিবেশ থেকে এবং আশৈশব সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে ধর্ম-কর্ম পালনের ফলে তাঁর ধর্মবোধও ছিল একান্ত সহজাত। তাঁর ইতিহাস-চেতনার পটভূমি সম্পর্কে বলা যায়, শৈশব-কৈশোর এমনকি, যৌবনেও তিনি পুঁথি পাঠ শুনতেন গভীর আগ্রহের সাথে। সেকালে বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই মুসলিম সমাজে রাত্রি বেলা পুঁথি পাঠের আসর বসতো। তিনি সে আসরে শরীক হয়ে গভীর মনোযোগের সাথে পাঠ শুনতেন। পুঁথির কাহিনী মূলত মুসলিম ইতিহাস ও ঐতিহ্য ভিত্তিক। এর রচয়িতারাও সকলেই ছিলেন মুসলিম। পুঁথি সাহিত্যে বর্ণিত মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন খ্যাতনামা চরিত্র, পীর-পয়গম্বর, শহীদ-গাজী, বীর যোদ্ধাদের পূত জীবন-কাহিনী ও বীরত্বব্যঞ্জক বর্ণনা শুনে তাঁর মধ্যে ইতিহাস-প্রীতির সঞ্চার ঘটে।

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর গদ্যের ভাষা একদিকে যেমন সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, ভাব-গম্ভীর ও প্রসাদ গুণসম্পন্ন অন্যদিকে তেমনি উচ্ছ্বাসময়, অলংকারবহুল, শব্দ-ঝংকার ও ব্যঞ্জনায় অতিশয় হৃদয়গ্রাহী। উচ্চ দার্শনিক ভাব তাঁর বর্ণনাকে কখনো দুজ্ঞেয় ও রহস্যময় করে তোলেনি। সালংকার উচ্ছ্বাসপূর্ণ বর্ণনায়

www.nagorikpathagar.org

কাব্যিক ছন্দময়তা থাকলেও তা কখনো তাঁর মননশীলতা ও ইতিহাস-চেতনাকে ক্ষুণ্ন করেনি। তাঁর গভীর ধর্মবোধ তাঁর লেখাকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন করেনি। ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন, মহৎ ও উদার হতে শিক্ষা দেয়। তাঁর ধর্মবোধ তাঁকে মহৎ, উদার ও প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনে প্রেরণা যুগিয়েছে। ফলে এক উদার, মহত্তম মানবিক চেতনা সর্বদা তাঁকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে, মিথ্যা থেকে সমুজ্জ্বল দীপ্তির পথে, সংকীর্ণ গোঁড়ামী ও কুসংস্কার থেকে চিরন্তন মানবতার পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মূলত তিনি যে ধর্মের অনুসারী ছিলেন, সে ধর্ম কোন গতানুগতিক ধর্ম নয়। সেটা হলো বিশ্বস্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত এক সর্বজনীন, চিরন্তন, সম্পূর্ণাঙ্গ কল্যাণময় ও সর্বোত্তম জীবন-বিধান। সে কারণেই তাঁর ধর্মবোধ, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও ইতিহাস-চেতনার মধ্যে কোন বিরোধ নেই, বরং তা হয়েছে পরস্পর সম্পূরক ও সমন্বয়যুক্ত। আর এ কারণেই তাঁর ধর্মবোধ, দর্শন-চিন্তা ও ইতিহাস চেতনা ইত্যাদির সবই এক গভীর মানবিক সংবেদনা, সত্যসন্ধিৎসা ও মানবিক মহত্তম কল্যাণ-চেতনায় সর্বদা দীপ্যমান। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তাঁর লেখার মধ্যেও তেমনি তা সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তাঁর লেখা হয়েছে সাবলীল, স্বচ্ছ স্রোতধারার ন্যায় মানবিকবোধসম্পন্ন ও সকল শ্রেণীর পাঠকের নিকট গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয়। জনৈক সমালোচকের ভাষায় ঃ

"মানুষের মনন-জগতেই বেশী বিচরণ করেছেন বরকতুল্লাহ। কিন্তু পাণ্ডিত্য কিংবা চিন্তার গাম্ভীর্য কখনো আড়ষ্টতা সৃষ্টি করতে পারেনি তাঁর বক্তব্যে। তাঁর গদ্য আশ্চর্যজনকভাবে ঋজু, সাবলীল এবং শক্তিমান। ভাষার সৌকর্য আর শিল্প-গুণে বাংলা গদ্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। শ্রেষ্ঠ গদ্য সাহিত্যিকদের প্রথম কাতারে তাঁর স্থান। গোটা বাংলা সাহিত্যেই এদিক থেকে তিনি কৃতি পুরুষ।" **(সানাউল্লাহ নূরী ঃ বরকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য প্রতিভা)**।

আরেকজন সমালোচকের ভাষায় ঃ "অপরূপ কলাসৌন্দর্যমণ্ডিত ক্লাসিকধর্মী পদ্য ভাষায় পারস্যের বিশ্রুতনামা কবি-দার্শনিকদের জীবন কৃতির প্রকাশ ও দর্শনের গহনলোকে জীবন-জগতের স্বরূপ সন্ধান আমাদের সাহিত্যে তাঁকে অমরতা দিয়েছে।... তাই লেখক হিসাবে তাঁকে চিহ্নিত করা যেতে পারে একজন চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক পরিচয়ে।" **(ড. হাবিব রহমান ঃ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ)**।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর সাহিত্য প্রতিভার পূর্ণ পরিণত রূপ পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে বাংলা গদ্য সাহিত্য নানা দিক দিয়ে সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, রম্য রচনা, নাটক ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন শাখায় বাংলা গদ্য যথেষ্ট উৎকর্ষতা লাভ করে। ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই বাংলা গদ্য ধীরে ধীরে নানা পর্যায় অতিক্রম করে ক্রমান্বয়ে একটি পরিণত, সমৃদ্ধ পর্যায়ে উপনীত হয়। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত এক্ষেত্রে যাঁদের অবদানে বাংলা গদ্য সাহিত্য বর্তমান উন্নত ও সমৃদ্ধতর পর্যায়ে উপনিত হয়েছে, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। গদ্য-লেখক হিসাবে ভাষা, রচনা-রীতি ও মননশীলতার কারণে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ড. হাবিব রহমান তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বলেন ঃ "(মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর) প্রবন্ধগুলোতে সমাজ, সভ্যতা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ক চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটলেও সেগুলোর কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে মুসলিম সমাজ। এদিক থেকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বরকতুল্লাহকে ঊনিশ শতকের 'সুধাকর দল' এর একজন মননশীল উত্তরসূরী হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।"

তাঁর বিশেষ মানস-প্রবণতা সম্পর্কে ডক্টর সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "এ যুগের আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী বাঙালী মুসলমানের কাছে বরকতুল্লাহ একটা বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের বাণী নিয়ে উপস্থিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা মুসলমানের জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হতে যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি তাদের চিন্তার দিগন্ত প্রসারণের পথেরও ইঙ্গিত দিয়েছে।"

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ প্রধানত জীবনীমূলক ও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে এ ধারা। বাংলা সাহিত্যে এটা একটি অতি সমৃদ্ধশালী ধারা। মধ্যযুগে এটা ছিল কাব্যে, ঊনবিংশ শতক থেকে বাংলা গদ্যেও এ ধারার বিশেষ উৎকর্ষ ঘটে। ঊনবিংশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস জাতীয় রচনা। বাংলা সাহিত্যে এটা এক অনন্য সৃষ্টি এবং সম্ভবত সর্বাধিক পঠিত অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত হলেও ঐতিহাসিক সত্যতা এতে পুরাপুরি রক্ষিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমচন্দ্রসহ যাঁরাই ঐতিহাসিক উপন্যাস বা কাহিনীমূলক রচনা লিখেছেন তাঁরা সকলেই কম-বেশী ইতিহাসের বিকৃতি ঘটিয়েছেন। কেউ এ বিকৃতি ঘটিয়েছেন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে আর কেউ কল্পনার রঙ মিশিয়ে কাহিনীকে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন প্রথমোক্তদের শীর্ষে আর মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন শেষোক্তদের অগ্র

www.nagorikpathagar.org

সারিতে। এক্ষেত্রে মহাকবি কায়কোবাদ ছিলেন বিরল ব্যতিক্রম। তিনি তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত তাঁর মহাকাব্য 'মহাশ্মশানে' যথার্থ ইতিহাস-সচেতনতার উৎকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেছেন। এক্ষেত্রে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ মহাকবি কায়কোবাদকেই অনুসরণ করেছেন। তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ও উদার দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিক সত্যকে উদ্ধার করার প্রয়াস পেয়েছেন। ইতিহাসের নামে কল্পকাহিনী নয়; প্রকৃত ঘটনা ও সত্যকে তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সাহিত্যিক মান ও উৎকর্ষতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন, যে কাজটি নিঃসন্দেহে অতি দুরূহ। তিনি সেই দুরূহ কর্মটিই তাঁর সহজাত প্রতিভা ও নৈপুণ্যে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর রচনা ইতিহাস পদবাচ্য না হয়ে যথার্থ সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। তিনি গদ্য-রচয়িতা ছিলেন কিন্তু তাঁর ভাষা ও বর্ণনা কাব্যময়, অনুপম সৌন্দর্য সুষমায় ভরপুর। সুনির্বাচিত শব্দের সুললিত ধ্বনি ও সুমধুর ব্যঞ্জনা অসাধারণ প্রসাদ গুণে সমৃদ্ধ হয়ে তাঁর গদ্যের ভাষা হয়ে উঠেছে কাব্য-সৌন্দর্যে অপরূপ।

১৯৬০ সনে বাংলা একাডেমী প্রথম যে বছর সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করে, সে বছরই মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ 'বাংলা একাডমী সাহিত্য পুরস্কার' (প্রবন্ধ শাখা) লাভ করেন। ১৯৬২ সনে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'সিতারাই-ইমতিয়াজ' খেতাব ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৬৩ সনে তিনি তাঁর 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' গ্রন্থের জন্য 'দাউদ পুরস্কার' পান। ১৯৭০ সনে তিনি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক 'প্রেসিডেন্ট মেডাল ফর প্রাইড অব পারফরম্যান্স' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮৪ সনে তাঁকে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

<u>তথ্য সূত্র</u> ঃ

১. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্ রচনাবলী, সম্পাদনা- মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, প্রকাশক-বাংলা একাডেমী, ঢাকা
২. বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান
৩. সিরাজগঞ্জের কৃতিসন্তান, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৩
৪. বরকতুল্লাহ ও তাঁর পারস্য-প্রতিভা, সানাউল্লাহ নূরী
৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, ড. হাবিব রহমান

www.nagorikpathagar.org

মাহবুব-উল আলম

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন জীবনধর্মী অসাধারণ শিল্পী হিসাবে মাহবুব-উল আলম বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, জীবনস্মৃতি ও প্রবন্ধ রচনায় তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব জীবন-চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য তিনি একদিকে যেমন প্রশংসিত হয়েছেন, অন্যদিকে বিশেষ জীবনদৃষ্টির কারণে সমালোচিতও হয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি যে একজন অসাধারণ জীবন-শিল্পী এ ব্যাপারে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই।

মাহবুব-উল আলম (জন্ম ১ মে ১৮৯৮-মৃত্যু ৭ আগস্ট ১৯৮১) চট্টগ্রাম জেলার ফতেয়াবাদ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত জেলার ফতেপুর গ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস। তিনি ১৯১৬ সনে এন্ট্রান্স পাশ করার পর ১৯১৭ সনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙালি পল্টনে যোগদান করে মেসোপটেমিয়া গমন করেন। ফলে তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধশেষে তিনি ১৯১৯ সনে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ১৯২০ সনে তিনি সাব-রেজিস্ট্রার পদে যোগদান করেন। কর্মদক্ষতার ফলে তিনি ১৯৪৮ সনে জেলা সাব-রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। পরে ১৯৫২ সনে তিনি জেলা রেজিস্ট্রার পদে এবং উক্ত একই সনে ইন্সপেক্টর অব রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন।

১৯৫৪ সনে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে মাহবুব-উল আলম চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক 'জামানা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। সাংবাদিকতা করার পাশাপাশি তিনি লেখালেখির কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি একাধারে কথাসাহিত্য, স্মৃতিকথা, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস-রচয়িতা ও মননশীল প্রবন্ধকার হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ:

১. পল্টন জীবনের স্মৃতি (১৯৪০)

২. মোমেনের জবানবন্দী (১৯৪৬)

৩. তাজিয়া (১৯৪৬)
৪. আলাপ
৫. পঞ্চ অন্ন (১৯৫৩)
৬. মফিজন (১৯৪৬)
৭. গোঁফ সন্দেশ (১৯৫৩)
৮. বার্মা (১৯৫৯)
৯. সীলোন বা লঙ্কা (১৯৫৯)
১০. ইন্দোনেশিয়া (১৯৫৯)
১১. তুর্কী (১৯৬০)
১২. সৌদী আরব (১৯৬০)
১৩. পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষী (১৯৬০)
১৪. পূর্ব পাকিস্তানের বনক্ষেত্র (১৯৬০)
১৫. পূর্ব পাকিস্তানের মৎস সম্পদ (১৯৬০)
১৬. চট্টগ্রামের ইতিহাস (তিন খণ্ড, ১৯৪৭–১৯৫০)
১৭. বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত (চার খণ্ড)
১৮. সঙ্কট-কেটে গেছে (১৯৫৪)

মাহবুব-উল আলমের প্রথম ও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য রচনা 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' (১৯৪০) একটি আত্মচরিতমূলক গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেন– "তখন 'মাসিক মোহাম্মদী'তে তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। মাসের শুরুতে এই অনবদ্য রচনাটি পাঠের আকর্ষণে আমি পত্রিকাটির অপেক্ষায় থাকতাম। সে এক আশ্চর্য লেখা-বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তীব্র গতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত, এবং অসাধারণ মমতা এই রচনার সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক হিসাবে লেখক যখন মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর দৃষ্টিতে যে জীবন ও কর্মধারার চিহ্নিত হয়েছিল তারই একটি মূল্যবান পরিচয় এই রচনায় তিনি রেখেছেন।" **(সৈয়দ আলী আহসানঃ সতত স্বাগত, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৮)।**

লেখক সক্রিয়ভাবে প্রথম মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ঐ সময়কার জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি এ গ্রন্থে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এটা একাধারে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও জীবন অভিজ্ঞতার অন্তরঙ্গ বর্ণনা হিসাবে এক জীবনধর্মী সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে গ্রন্থকার তাঁর নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন এভাবে ঃ "আমার কৌতূহল

www.nagorikpathagar.org

অদম্য। আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানকার চলমান জীবনকে জানবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া, আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। পুরনো ঘটনা আমার যেভাবে মনে থাকে, নতুন ঘটনা সে রকম থাকে না। অর্থাৎ এখনকার ঘটনা ঠিক এখনই আমার মনে আসবে না। পুরনো হলেই নতুন করে স্মৃতিতে জেগে উঠবে। আমার স্বভাবের এই পরিস্থিতি আমার এই লেখার প্রেরণা। নজরুল ইসলাম লেখাটির অসম্ভব প্রশংসা করেছিলেন। আমি তাঁর উৎফুল্ল অভিনন্দন কখনই ভুলব না।" **(দ্রষ্টব্য–সৈয়দ আলী আহসানঃ সতত স্বাগত, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট ১৯৮৩, পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯)।**

১৯৩০ সনে 'মাসিক মোহাম্মাদী'তে যখন 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে থাকে তখন থেকেই সচেতন পাঠকগণ উপলব্ধি করেন যে, এবার একজন নতুন প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে। মাহবুব-উল আলমের 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' সম্পর্কে সাহিত্য-সমালোচক আবুল মোমেন বলেন ঃ "প্রথম মহাযুদ্ধে পল্টনে যোগ দিয়ে গিয়েছিলেন, মেসোপটেমিয়া। সে কাহিনী লিখেছেন সেকালের বিচারে এমন নতুন আধুনিক গদ্যে যা একই সঙ্গে স্বকীয় এবং সরস। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ, সরস বর্ণনা, আর সর্বোপরি গভীর মানবিক বোধে লেখনি প্রাণবন্ত। তাঁর ভাষা অনাড়ম্বর, কিন্তু ভাব গভীর এবং ব্যঞ্জনাময়। তাঁর পর্যবেক্ষণ শুধু নয়, অন্তর্ভেদী প্রকাশে তিনি সংস্কারমুক্ত। মননে যতোটা তার চেয়ে বেশি মরমে তিনি মানুষকে টানতে চেয়েছেন।"

যখন ১৯৩৩ নাগাদ 'বুলবুল'-এ তাঁর আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'মোমেনের জবানবন্দী' প্রকাশিত হতে থাকে তখন সাহিত্যরসিকদের মুগ্ধতার রেশ বহুকাল সজীব ছিল। 'পল্টনের স্মৃতি'তে মিলেছে আধুনিক ভাষাশৈলী, এবার মিলল অভিনব বিষয়। মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানের অকপট ভাষ্য। ভাষা আরো ঋজু, দ্যুতিময়। বিষয় বা ভাষা কোথাও বিন্দুমাত্র বাহুল্য নেই। সামান্য বাক্যের আঁচড়ে অসামান্য চরিত্র দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তিনিই সন্ধানী-জীবনসত্যের। এ কোনো তত্ত্বকথার বাঁধা পথ নয়– জীবনরসিকের।" **(আবুল মোমেনঃ 'মাহবুব-উল আলম ঃ শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি', একুশের স্মারকগ্রন্থ-১৯৯৯, বাংলা একাডেমী)।**

১৯৩৩ সনে যখন 'বুলবুল' পত্রিকায় মাহবুব-উল আলমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'মোমেনের জবানবন্দী' প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই সেটা পড়ে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন এভাবেঃ "ভাষা, শৈলী, বিষয়, জীবনদর্শন সমস্তই অভিনব। কয়েক কিস্তি পড়ার পরেই আমি বুঝতে পারি যে এই লেখক সাধারণ লেখক নন, ইনি গভীর প্রত্যয় থেকে লেখেন, ইনি প্রকৃতই একজন মোমিন। অর্থাৎ বিশ্বাসী মুসলমান। অথচ এঁর দৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

উদার ও মানবিক। আর এঁর লেখা জীবনরসে পূর্ণ। সাহিত্যরসে উত্তীর্ণ। এঁকে মুসলিম সাহিত্যিক বলে এক কোণে সরিয়ে রাখা যায় না। ইনিও একজন বাঙালি সাহিত্যিক।"

পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর রায় মাহবুব-উল আলম সম্পর্কে লেখেন– "মাহবুব-উল আলম যে একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক এর স্বীকৃতি পশ্চিমবঙ্গে তো নয়ই, বাংলাদেশেও হয়েছে কিনা সন্দেহ। এর কারণ মাহবুব যেমন old fashioned তেমনি গ্রাম্য। অথচ আর সকলের চেয়ে original ও elemental অতি দুর্লভ গুণ। সেই জন্য অনন্য।"

মাহবুব-উল আলমের 'মোমেনের জবানবন্দী' সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান বলেন ঃ "এটা বিশেষ ঢঙে লেখা একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জীবনের কর্মপ্রবাহ নয় কিন্তু জীবন-জিজ্ঞাসার বিচিত্র কল্লোল গ্রন্থটিকে মহার্ঘ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বভাবের জাগরণ এবং চৈতন্যোদয়ের রোজনামচা এ-বইটি। একজন মানুষের বিশ্বাসের স্বরূপ কি? কোন তাৎপর্যে বিমণ্ডিত মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা? জীবনকথার স্মৃতি-মন্থনে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভেসে উঠেছে।" **(সৈয়দ আলী আহসানঃ ঐ, পৃ-৪১)।**

'মোমেনের জবানবন্দী' গ্রন্থে সমাজ ও বাস্তব জীবনের নিখুঁত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। তাঁর গদ্য রচনা অত্যন্ত সাবলীল ও বলিষ্ঠ, এ গ্রন্থে তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। 'তাজিয়া' ও 'পঞ্চ অন্ন' মাহবুব-উল আলমের বিখ্যাত দুটি গল্প সংকলন। মনে হয়, ছেটগল্পে তাঁর প্রতিভা ও শিল্পী-সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাক্যবিন্যাসে নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা কিন্তু বাস্তব জীবন থেকে উপমা নিয়ে তা উপভোগ্য ও রসময় করে তোলার সক্ষমতা রয়েছে তাঁর। তিনি একজন জীবনরসিক প্রাণময় গল্প-রচয়িতা। তাঁর গল্প সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। তাই এখানে তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলো ঃ "মাহবুব-উল-আলম গল্প বলেছেন অসাধারণ তৃপ্তিতে এবং সহজ নিরাভরণ তীক্ষ্মতায়। গল্পে তিনি একটি নির্মল বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন-তিনি জানেন কতটা বলতে হবে এবং কখন থামতে হবে। অর্থাৎ কৌশলগত অতিস্বর বা তাঁর কোন রচনায় নেই-কিন্তু তাঁর রচনা পরিচ্ছন্ন, জীবনময় এবং উপভোগ্য।

"মাহবুব-উল-আলম প্রায়ই আমাকে বলতেন, ছোটগল্প তো কবিতা। ছোটগল্পের মধ্যে গল্প লেখক চরিত্রের গতিবিধি অনুসরণ করে একটি অভিজ্ঞতাকে নির্মাণ করেন, আর কবি শুধু সেই অভিজ্ঞতার অন্তঃসারটুকু নিজের উপলব্ধি হিসাবে উপস্থিত করেন। তাই আমি বলি, কবি ও গল্প লেখকের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

তফাৎ নেই। দুজনের বেসাতি একই। শুধু ক্রেতার সামনে উপস্থাপনার তারতম্যটুকুই আছে।" **(সৈয়দ আলী আহসানঃ ঐ, পৃ-৩৭)**।

মাহবুব-উল-আলম রচিত 'মফিজন' বাস্তব জীবনভিত্তিক ছোট আকারের একটি উপন্যাস। অনেকে এটাকে বড়গল্প জাতীয় রচনাও মনে করেন। তবে শিল্প-রীতি অনুযায়ী এর মধ্যে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অধিক। এটা একটি বিতর্কিত উপন্যাস। অনেকে এটাকে অশ্লীল সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। এতে মুসলিম সামাজিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি আঘাত হানা হয়েছে, বলে অনেকের ধারণা। সবকিছু মিলিয়ে এটা তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থটি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান তাঁর নিজের ধারণা ও লেখকের কথিত মন্তব্য সম্পর্কে যা বলেন, তা এখানে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলো ঃ "তাঁর 'মফিজন' গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন গল্পটিকে অশ্লীল ও যৌনতাবহ বলে অনেকে চিহ্নিত করেছিলেন। মাহবুব-উল-আলমকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, যারা এ গল্পকে অশ্লীল বলে তাঁরাই এ গল্পটি পড়ার সময়, নিশ্চয়ই জানবেন, বারবার ঢোক গিলেছেন। এখানেই আমার গল্পটির সার্থকতা।' একটু থেমে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার কেমন লেগেছে?' আমি বলেছিলাম, 'অল্প পরিসরের মধ্যে আপনি একজন গ্রাম্য রমণীর দেহগত পরিপুষ্টি এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা আমাদের সাহিত্যে নতুন। রমণীর শরীর এবং মনের সার্থকতা এবং সফলতাকে আপনি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন। তবে আমার মনে হয় গল্পটিকে আরও একটু বড় করলে ভালো হত।" **(সৈয়দ আলী আহসানঃ ঐ, পৃষ্ঠা ৪০-৪১)**।

'মফিজন' উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হলেও এটা মুলত গল্প। এতে উপন্যাসের উপাদান থাকলেও লেখক এটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ দিতে পারেন নি। তাঁর গদ্যের মতো এর কাহিনী একান্ত নির্মেদ। মাহবুব-উল আলমের ভাষায়– "ছোটগল্প তো কবিতা। ছোটগল্পের মধ্যে গল্পলেখক চরিত্রের গতিবিধি অনুসরণ করে একটি অভিজ্ঞতাকে নির্মাণ করেন, আর কবি শুধু সেই অভিজ্ঞতার অন্তঃসারটুকু নিজের উপলব্ধি হিসেবে উপস্থিত করেন। তাই আমি বলি, কবি ও গল্পলেখকের মধ্যে তফাৎ নেই।" তারাশঙ্কর রায় লেখেছেন– "মফিজন-এ 'সত্য তার অনাবৃত রূপ নিয়ে নিজের সৌন্দর্য্যের উপর ভর করে দাঁড়িয়েছে।" সাহিত্য-শিল্পী আবুল ফজলের ভাষায়– "পুষ্পকলির মতো জীবনকুসুমের বিকাশ ও তার পাপড়ি কি করে একটির পর একটি দল মেলে তারই রহস্যোদ্‌ঘাটন ঘটেছে অপূর্ব কৌশল ও নৈপুণ্যের সঙ্গে এই গল্পে।...

www.nagorikpathagar.org

সতেজ ও সজাগ চিত্তের জীবন-জিজ্ঞাসা ও পরিণত রস-চিত্তের সমন্বয়।" অন্যদিকে, অন্নদাশঙ্কর রসের দিকটির চেয়ে মফিজনের 'কারিগরি বা Craftsmanship'-এর দিক থেকে রচনাটিকে মহামূল্যবান বিবেচনা করেছেন। বেগম সুফিয়া কামাল 'মফিজন' সম্পর্কে বলেন– "সকলে সমালোচনাই করিল, কিন্তু মফিজনের বেদনাটা কেহ বুঝিল না।... নারীর মনের অকথিত ব্যথার পরিচয় এতো নিবিড় সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে, দরদী মন দিয়ে, আর কেউ লিখেছেন বলে আমার জানা নেই।" গল্পটি সম্পর্কে সমালোচক আবুল মোমেন বলেন ঃ "তাঁর গল্প জীবনের সত্যের নির্যাস অন্বেষণ করেও কাব্যময় হয়ে ওঠে। বাস্তবতাকে এড়িয়ে চলেন না তিনি, বরং এঁকে তোলেন সরাসরি, কিন্তু তাঁর রয়েছে অন্তর্ভেদী এক জীবনজিজ্ঞাসু সত্তা যে সত্যের সুদূরকে খুঁজে পায়। যেন কিটসের সেই 'বিউটি' ও 'ট্রুথ'-এর অনন্যনির্ভরতার কথাই এসে পড়ে। মাহবুব-উল আলমের গল্পে সত্য বলেই সুন্দর এবং সুন্দর রূপেই সত্য। এমনটা হতে পেরেছে প্রথমত তিনি জীবন সত্যের সন্ধানী আর দ্বিতীয়ত তিনি জীবনরসিক বলে।" **(আবুল মোমেনঃ ঐ)।**

মাহবুব-উল আলমের রচিত 'গোঁফ সন্দেশ' একটি ব্যঙ্গ রচনা। ব্যঙ্গ রচনার ক্ষেত্রে এবং বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস সৃষ্টিতে তাঁর নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে এ গ্রন্থটিতে।

মাহবুব-উল আলম সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর জাতিসংঘের ইউনেস্কোর কমিশন পেয়ে বার্মা, শ্রীলংকা, তুরস্ক, সৌদি আরব, ইত্যাদি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তাঁর এসব দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি রচনা করেন 'বার্মা', 'সিলোন বা লঙ্কা', 'ইন্দোনেশিয়া', 'তুর্কী' এবং 'সৌদী আরব'। তাঁর রচিত এসব গ্রন্থে ঐ সকল দেশের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও জনজীবনের বিচিত্র জীবনচিত্র ফুটে উঠেছে। এছাড়া, উক্ত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষী', 'পূর্ব পাকিস্তানের বনক্ষেত্র' ও 'পূর্ব পাকিস্তানের মৎস সম্পদ'–এ তিনটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তাঁর এসব গ্রন্থে বাংলাদেশের পশু-পাখি ও মূল্যবান বন সম্পদ সম্পর্কে চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়।

ইতিহাস-বিষয়ক রচনার মধ্যে মাহবুব-উল আলমের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ হলো– 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' (তিন খণ্ড, ১৯৪৭–১৯৫০) ও 'বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' (চার খণ্ড)। 'চট্টগ্রামের ইতিহাস' ১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড নবাবী আমল প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সনে, কোম্পানী আমল ১৯৫০ এবং পুরানা আমল ১৯৫০ সনে প্রকাশিত হয়। ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে এটা একটি তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ মূল্যবান

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থ। ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি হিসাবে এতে তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইতিহাস গ্রন্থ হিসাবে এর বৈশিষ্ট্যও কম নয়।

মাহবুব-উল আলম বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক ও গদ্য রচয়িতা। তাঁর রচনার মধ্যে বাস্তব জীবন ও সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি গতানুগতিকতার উর্ধ্বে একজন প্রকৃত জীবনশিল্পী। তাঁর সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক কাজী আবদুল ওদুদ বলেন– "মাহবুব-উল আলম স্বভাব-শিল্পী। তাঁর কথা সহজেই ব্যক্ত হয় রেখা ও রঙ্গের বৈচিত্র্য নিয়ে।" তিনি আরো বলেন, "প্রথম ধারায় তাঁর অনন্যসাধারণ সাফল্য লাভ হয়েছে ' মোমেনের জবানবন্দী'তে, আর দ্বিতীয় ধারায় তাঁর বিশিষ্ট রচনা গল্পগ্রন্থ 'তাজিয়া'। কিন্তু যে শিল্পী মোমেন অর্থাৎ বিশ্বাসী তাঁর কেবল শিল্পসৃষ্টির সাফল্যে তৃপ্তি মেলেনি। তাঁর বিশ্বাস মানুষে, বিশ্বাস মাটিতে এবং তিনি বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি। একাত্তর সালে, যখন তাঁর তিহাত্তর বছর বয়স, ২৯ মার্চ থেকে শহর ছেড়ে পালোনোর হিড়িক দেখে বারবার তিনি বলেছেন, 'সবাই শহর ছাড়লে চলবে না।' ভয়ে ভীত পরিজনরা স্বভাবতই সে কথায় কর্ণপাত না করে পালাচ্ছে দেখে গোঁ ধরলেন তিনি, 'সবাই গেলেও আমি এ সময় শহর ছেড়ে যাবো না।' সবাই চলে গেলে প্রতিরোধ যুদ্ধ হবে কীভাবে–এই ছিল তাঁর বক্তব্য। তিনি অনেকটা 'গাঁয়ের মায়া'র হামিদের মতো, 'সোজা মাটির বুক ফুঁড়ে উঠেছে আর সমস্ত পৃথিবীর মাটিই ধরা দিয়েছে মুঠোর ভিতর এবং সে যা জেনেছে সত্য বলে অমনি লেপে গিয়েছে হাত দিয়ে পা দিয়ে- সর্ব অবয়ব দিয়ে কাজে লাগাতে।"

সবশেষে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য দিয়েই আলোচনা শেষ করছি। তিনি বলেনঃ "অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে যখনই আমার দেখা হয়েছে তখনই তিনি মাহবুব-উল আলমের অপূর্ব রসবোধের কথা বলেছেন, 'ইংরেজীতে যাকে বলে introspection অর্থাৎ মর্মমূলে প্রবেশ করার ক্ষমতা, মাহবুব-উল আলমের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। তিনি বাইরের অবয়বকে স্পর্শ করেন না, হৃদয়কে নাড়া দেন।' অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে একমত। আমি মনে করি, মাহবুব-উল আলমের যথার্থ মূল্যায়ন আমাদের দেশে হয়নি। তিনি অনেকের মধ্যে একজন নন, তিনি একাই সম্পূর্ণ। তিনি কাউকেই ঈর্ষা করেন নি, কিন্তু তাঁর সমসাময়িক অনেকেই তাকে ঈর্ষা করেছে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'একজন মানুষের জীবনে যখন সংকট আসে, সেই সংকট মুহূর্তের জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা একজন গল্প লেখকের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র।" **(সৈয়দ আলী আহসানঃ ঐ, পৃ–৪০)।**

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত মন্তব্য থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, মাহবুব-উল আলম এক ব্যতিক্রমী ধারার সার্থক লেখক। তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে অসাধারণ কুশলতার সাথে তাঁর গল্পের কাহিনী নির্মাণ ও বিভিন্ন ঘটনার বিন্যাস করেছেন। গল্প বলায় তাঁর যেমন নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে, তেমনি রয়েছে তাঁর চমৎকার রসবোধ। তাঁর নিজস্ব জীবনবোধ বাস্তব অনুষঙ্গে গল্পের মধ্যে ফুটে উঠেছে, যার ফলে তা পাঠকের মনকে যেমন আবিষ্ট করে তেমনি ভাবনা-তরঙ্গে করে দোলায়িত। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অসাধারণ শিল্পী হিসাবে চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন।

সাহিত্য-কর্মের জন্য মাহবুব-উল আলম ১৯৬৫ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৬৭ সনে প্রেসিডেন্টের পুরস্কার 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স', এবং ১৯৭৮ সনে 'একুশে পদক' লাভ করেন।

www.nagorikpathagar.org

কাজী নজরুল ইসলাম

কবি কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় জাগরণের এক অবিস্মরণীয় প্রাণ- পুরুষ। তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বর্ণিলতা সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁর মত অসাধারণ প্রতিভাবান কবি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও নিতান্ত দুর্লভ। তিনি একাধারে স্বাধীনতা, নবজাগরণ, মানবতা ও বঞ্চিত-বুভুক্ষ-নিপীড়িত-দুখি মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বাণী বলিষ্ঠ কণ্ঠে সোচ্চারিত হয়েছে। অধঃপতিত মুসলমানদের নবজাগরণের তূর্যবাদক হিসাবেও তাঁর বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। তিনি যেমন মুসলিম জাতিকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ-ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের নতুন জীবন-পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন, তেমনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মুক্তির উদ্দীপ্ত আহ্বান রয়েছে তাঁর কাব্যে। সর্বোপরি সকল শ্রেণীর অবহেলিত-দরিদ্র-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের লাঞ্ছনা-দূর্গতি ও দুঃখ-গ্লানির সকরুণ আর্তি তাঁর কাব্যে বাণীরূপ পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সনের ১১ জৈষ্ঠ্য কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম। তিনি ১৯৭৬ সনে মৃত্যুবরণ করেন। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তিনি দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর থেকে তাঁর সাহিত্য-চর্চা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর মাত্র বাইশ বছরের সক্রিয় সাহিত্য জীবনে তিনি ২২ খানা কাব্যগ্রন্থ, ২ খানা কিশোর গ্রন্থ, ৩ খানা উপন্যাস, ৩টি গল্প গ্রন্থ, ৩ খানা কিশোর নাটক, ৭ খানা রেকর্ড নাট্যসহ প্রায় একশটি নাটক, প্রবন্ধ পুস্তক ৩ খানা এবং প্রায় পাঁচ হাজার গান রচনা করেন। তিনি তাঁর লেখা সংরক্ষণে কখনো সতর্ক বা যত্নবান ছিলেন না। তাঁর রচিত অনেক গান ও লেখা অধুনা অন্যের নামে চালু রয়েছে। তাই অনেকে তাঁর রচিত

www.nagorikpathagar.org

গানের সংখ্যা পাঁচ হাজার এবং নাটকের সংখ্যা প্রায় একশো বলে উল্লেখ করলেও সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষিত নেই অথবা কালের গর্ভে, বিস্মৃতির অন্তরালে তা ঢাকা পড়ে গেছে। তাই এ ব্যাপারে শুধু অনুমান করা ছাড়া সঠিক তথ্য উদ্ধার ও সংখ্যা নিরূপণ প্রায় অসম্ভব। তাঁর রচিত গান ও নাটকের সঠিক সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও উপরে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এত অল্প সময়ে এত বিপুল অবদান পৃথিবীতে বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাছাড়া, শুধু সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বৈচিত্র্য ও গুণগত বিচারেও নজরুলের অবদান তুলনাহীন।

নজরুল স্বাধীনতার কবি। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিঝরা বিদ্রোহের বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁর কবিতা ও গানে তা নানাভাবে সোচ্চারিত। এজন্য তিনি পরাধীন আমলে দু'বার জেল খেটেছেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে পারস্পরিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাব্য-কবিতা-সাহিত্যে সে বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেন-

কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল্, কর্‌রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রবল-বিষাণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি'!

(ভাঙার গান : ভাঙার গান)

এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল প'রেই শিকল তোদের কর্‌ব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌ব মোরা জয়
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল-ভাঙা কল ॥

www.nagorikpathagar.org

(শিকল পরার গান ঃ ভাঙার গান)

সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের!
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের!

(সেবক ঃ বিষের বাঁশী)

দু'পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে,
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝংকারে
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে

(বন্দী বন্দনা ঃ বিষের বাঁশী)

মোরা অসি বুকে বরি' হাসিমুখে মরি' 'জয় স্বাধীনতা' গাই!

(রণভেরী ঃ অগ্নিবীণা)

ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন-সংগ্রামের মাধ্যমেই কেবল স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তাঁর কাব্য-কবিতায় সে বিশ্বাসেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বলেন-

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজ দেখিবে তোমার মাতৃমুক্তি পণ।
'হিন্দু না ওরা মুসলিম ?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র !

(কাণ্ডারী হুশিয়ার)

কাজী নজরুল ইসলমাকে বিশেষভাবে মুসলিম নবজাগরণের কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর কবিতার ভাব-ভাষা-বিষয় বিশেষভাবে ইসলামের ইতিহাস, অতীত গৌরবগাঁথা ও স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্যের আলোকে নির্মিত। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যে এক নতুন আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছেন। তাই তাঁকে যুগ-প্রর্বতক, স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মুসলিম নবজাগরণের কবি বললে কিছুমাত্র অত্যূক্তি করা হয় না। নজরুল পরাধীন ও অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ-ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভবিষ্যতের নতুন জীবন-পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন-

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে।
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে অতীত-রাতের মিনার চূড়ে ॥
সরাই-খানার যাত্রীরা কি 'বন্ধু জাগো' উঠ্‌ল হাঁকি' ?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখী গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে' ॥

www.nagorikpathagar.org

আজ কি আবার কা'বার পথে ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে।
নাম্‌ল কি ফের হাজার স্রোতে 'হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে'॥
(ভোরের সানাই ঃ সন্ধ্যা)

অথবা

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে দ্বীন ইসলামী লাল মশাল
ওরে বেখবর তুইও ওঠ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।

নজরুল মানবতার কবি। ইসলামের একত্ববাদ, বিশ্বজনীন মানবিক উদার আদর্শ, ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও ন্যায়বোধের আদলেই তাঁর মানবিকবোধের উৎসার। এ উদার মানবিক চেতনা থেকেই তিনি জগতের সকল ভাগ্যহত, অধিকার-বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও জাগরণের বাণী উচ্চারণ করেছেন। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী সকল নিয়ম-নীতি ও প্রথা-সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি শুধু বিশেষ অঞ্চল বা জনগোষ্ঠীর নয়, সমগ্র বিশ্বের আর্ত-মানবতার মুক্তির অকুতোভয় দিশারী। তাঁর মত মুক্ত-আত্মা ও উদার মানবিকবোধসম্পন্ন কবি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিশ্ব সাহিত্যেও নিতান্ত দুর্লভ। তিনি বলেন-

গাহি সাম্যের গান–
যেখানে আসিয়া এক হ'য়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।
গাহি সাম্যের গান!
(সাম্যবাদী)

গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান্!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি!
(মানুষ)

সাম্যের গান গাই–
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোন ভেদাভেদ নাই!
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর।
(নারী)

জাগো অনশন-বন্দী ওঠরে যত

www.nagorikpathagar.org

জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
(অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত)

কুলি বলে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?
(কুলি-মজুর)

আজ জাগ্‌রে কৃষাণ সব ত গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়-কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল ॥
(কৃষাণের গান)

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল ॥
(শ্রমিকের গান)

নজরুল যৌবনের কবি, প্রেমের কবি। তারুণ্যদীপ্ত যৌবনের বাঁধভাঙা জোয়ার তাঁর কাব্য-শরীরে সর্বত্র বিরাজিত। তাঁর প্রেমানুভূতির বিচিত্র রূপ সকলকে মুগ্ধ করে। এ প্রেম যেমন নারীর প্রতি, তেমনি সাধারণ মানুষের প্রতি। তাঁর প্রেম একাধারে স্বদেশ-স্বজাতি, মানুষ-প্রকৃতি ও মহান স্রষ্টার প্রতি সমভাবে নিবেদিত। তাঁর কাব্য-কবিতায় মানব-প্রেমের পাশাপাশি অধ্যাত্ম চেতনার প্রবল প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রেমের অন্তহীন গভীরতা ও আবেগ-উত্তাপ পাঠককে একান্তভাবে বিমোহিত করে। তিনি বলেন-

জাগো সৈনিক-আত্মা! জাগো রে দুর্মদ যৌবন!
আকাশ পৃথিবী আলোড়ি' আসিছে ভয়াল প্রভঞ্জন।
(জাগো সৈনিক আত্মা)

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে–
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে–
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দু'য়ার-ভাঙা কলোলে।
(আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে)

www.nagorikpathagar.org

এ যৌবন-জল তরঙ্গ রোধিব কি দিয়া বালির বাঁধ?
কে রোধিবি এই জোয়ারের টান গগনে উঠেছে চাঁদ?
(যৌবন-জল-তরঙ্গ)

নজরুল-প্রতিভা বহুমাত্রিক ও বর্ণাঢ্যতায় সমুজ্জ্বল। একাধারে কবিতা, গান-গজল, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য দেদীপ্যমান। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ওজস্বিতা, দুর্দমণীয় প্রাণাবেগপূর্ণ নতুন ভাব-বিষয় ও কাব্য-ভাষার সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহারে বাংলা ভাষায় এক স্বতন্ত্র 'মুসলমানি ঢং'-এর উজ্জ্বলতা নিয়ে আসেন। দু'একটি উদাহরণ–

"মুখেতে কলেমা, হাতে তলওয়ার
বুকে ইসলামী জোশ দুর্বার
হৃদয়ে লইয়া ইশক আল্লাহর
চল আগে চল বাজে বিষাণ,
ওরে ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ
বাঁধা মোর ঐ পাক কুরআন।
"ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ-দুখ সম ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
নাই অধিকার সঞ্চয়ের।
কারো আঁখি-জলে কারো ঝাড়ে কিরে জ্বলিবে দীপ ?
দু'জনার হবে বুলন্দ-নসীব, লাখে লাখে হবে বদনসীব ?
এ নহে বিধান ইসলামের।"
(ঈদ-মোবারক)

নজরুল আসল ইসলামের শিক্ষাকে তুলে ধরেছেন, যেখানে মানুষে মানুষে নাই কোন ভেদাভেদ, নর ও নারী উভয়ে সমান মানবিক মর্যাদা ও অধিকার লাভ করেছে। নজরুলের সাম্যবাদ ও মানবতাবাদের মূল উৎস এখানেই। অবশ্য আমরা আজ ইসলামের মূল শিক্ষা ভুলে গিয়ে মানুষে মানুষে, নর ও নারীতে কৃত্রিম ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছি, যা কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণীর সাথে অসামঞ্জস্যশীল। কবি তাই বলেন ঃ

"হাদীস্ কোরান ফেকা ল'য়ে যারা করিছে ব্যবসাদারী,
মানে না ক তা'রা কোরানের বাণী– সমান নর ও নারী !"
(মিসেস এম্. রহমান)

www.nagorikpathagar.org

গতানুগতিক ভাব ও বিষয় নয়, বরং স্বাধীনতাকামী মুক্ত-উদার মানবিক ভাব ও বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন। তাই তাঁর সাহিত্যের আবেদন সর্বজনীন। মানবিক সংবেদনায় পূর্ণ তাঁর সাহিত্য চিরকালীন মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে গেছে। সেকারণে তিনি একাধারে যুগ-স্রষ্টা এবং কালজয়ী অমর প্রতিভা। নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা এক্ষেত্রে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বিদ্রোহী কবিতার মতো দীপ্ত মানবিক চেতনাসম্পন্ন, আত্মশক্তিতে ভরপুর তেজদীপ্ত কবিতা বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয়টি নেই। বিশ্ব সাহিত্যেও এধরনের কবিতা সুদূর্লভ। কবি বলেন–

"বল বীর–
বল উন্নত মম শির!
শির নেহারি, আমারি নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!"

সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে নজরুলের অবদান বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। একাধারে কবিতা, গান, উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা সঠিক নিরূপণ করা কঠিন। কেউ বলেছেন চার হাজার, কেউ বলেছেন পাঁচ হাজার। সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন, তেমনি ভাব-বিষয়, সুর-তাল-লয়, রাগ-রাগিণী ইত্যাদির বিচিত্র ব্যবহারে নজরুলের কৃতিত্ব একক ও অনন্য। রবীন্দ্রনাথকে বাংলা গানের রাজা বলা হয়। তবে তাঁর গানে এত বৈচিত্র্য নেই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর গান সম্পর্কে বলেছেন, এগুলোকে সংগীত বলা যাবে না, বড়জোর এগুলোকে 'সুর-বাণী' বলা যেতে পারে। কিন্তু নজরুলের গানকে সংগীত বলতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করার কারণ নেই। নজরুল ছিলেন অসাধারণ সংগীতজ্ঞ। সংগীতের সকল কলা-কৌশল, রাগ-রাগিণী, তাল-লয় ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ও পাণ্ডিত্য ছিল সুগভীর। তিনি গান লিখেছেন, সুর দিয়েছেন ও তা গেয়েছেন। দেশী-বিদেশী অসংখ্য রাগ-রাগিণী ও সুরে তিনি গান রচনা করেছেন। সেসব সুরে তিনি তাঁর গান গেয়েছেন। তাঁর মত এতবড় সঙ্গীত-বিশেষজ্ঞ পৃথিবীতে অতিশয় বিরল।

বাংলাদেশ গানের দেশ, নানা রঙ ও সুরের বৈচিত্র্য বাংলার প্রকৃতিতে সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। আবহমান কাল থেকে বাঙালি গান গেয়েছে, গান রচনা করেছে- চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে বাংলার কবি ও শিল্পীরা অসংখ্য গান রচনা করেছেন ও গেয়েছেন। বাংলা গানের ভুবনে অনেক প্রতিভাবান কবি-শিল্পী আপন বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা গানের এ সমৃদ্ধ ভুবনে নজরুল সর্বশ্রেষ্ঠ ও চির উন্নত শির। ভাবের ঐশ্বর্যে, বিষয়-বৈভবে, রাগ-রাগিণী-সুরের বৈচিত্র্যে ও ঝংকারে এবং রচনার অজস্রতায় নজরুলের গানের সাথে তুলনীয় প্রতিভা শুধু বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব-সাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নজরুল তাঁর গান সম্পর্কে বলেছেন-

"কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি, জানি না। আমার আবেগে যা এসেছিল, আমি তাই সহজভাবে বলেছি, আমি যা অনুভব করেছি, তাই আমি বলেছি। ওতে আমার কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সমন্ধে আজ কোনো আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। সাহিত্যে দান আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই। তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি।" **(১৯৩৮ সনে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেন 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার অফিস-গৃহে, জন-সাহিত্য-সংসদের শুভ-উদ্বোধনে সভাপতি কাজী নজরুল ইসলামের প্রদত্ত অভিভাষণ।)**

নজরুল বাংলা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তিনি রবীন্দ্রযুগে এক স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। তিনি এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাব্য-ভাষার নির্মাতা। এক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য তাঁকে স্বমহিমায় উজ্জ্বল করে রেখেছে। নজরুলের এ স্বাতন্ত্র্যের মূলে প্রেরণা যুগিয়েছে ইসলামী ভাবাদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্য। মুসলিম শাসনামলের সাড়ে পাঁচশো বছরে বিনির্মিত ও বহুল প্রচলিত আরবি-ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষা মধ্যযুগের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। নজরুল সে ঐতিহ্যের অনুসরণে এক আধুনিক স্বতন্ত্র কাব্য-ভাষা নির্মাণ করে বাংলা ভাষার রূপ ও বৈচিত্র্যকে বর্ণাঢ্য করে তুলেছেন এবং এ ভাষায় এক অসাধারণ ওজস্বিতা নিয়ে এসেছেন। নজরুল-পরবর্তী প্রায় সব মুসলিম কবিই এক্ষেত্রে তাঁকে কমবেশি অনুসরণ করেছেন। এজন্য নিঃসন্দেহে তাঁকে যুগ-প্রবর্তক ও পথিকৃত কবি হিসাবে অভিহিত করা হয়।

তবে এ প্রসঙ্গে এটা উলেখ করা প্রয়োজন যে, নজরুলকে সাধারণত মুসলিম নবজাগরণের কবি বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে, তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী সকল মানুষের কবি। মানবতার উজ্জীবনই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে যেমন কবিতা-গান-গজল রচনা করেছেন তেমনি হিন্দুদের বা হিন্দুধর্ম নিয়েও তিনি অসাধারণ গান-কবিতা রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে একমাত্র নজরুলকেই সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, উদার মানবতার কবি হিসাবে চিহ্নিত করা

www.nagorikpathagar.org

যায়। সাধারণ মানবতা ও বিশ্বজনীনতার চিরন্তন আবেদন নজরুল সাহিত্যে অতিশয় উজ্জ্বল।

আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এমনকি, জাতিসত্তা বির্নিমাণে নজরুলের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে, নবজাগরণে, নিরন্ন-বুভুক্ষ-বঞ্চিত মানুষের মুক্তির সংগ্রামে এমনকি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনেও নজরুলের গান-কবিতা আমাদেরকে সর্বদা অনুপ্রাণিত-উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই মাত্র ৩০ বছর বয়সেই ১৯২৯ সনে পরাধীনতার যুগে কলকাতায় এলবার্ট হলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের এক যৌথ অনুষ্ঠানে তাঁকে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জাতীয় কবি হিসাবে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু ভারত স্বাধীন হলেও স্বাধীন ভারতে নজরুলকে বোধগম্য কারণেই জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয় নি। এমনকি, যে পশ্চিমবঙ্গে তাঁর জন্ম, সেখানেও তাঁকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। তবে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁকে যথার্থই বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়। এটা যেমন যৌক্তিক তেমনি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর দ্বারা অধঃপতিত বাঙালি মুসলিম সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি অথবা তাঁর প্রতি বাঙালি মুসলমানের কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাঁর মনের ঐকান্তিক আকুতি পূরণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মসজিদের পাশে তাঁকে কবরস্থ করাও আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

www.nagorikpathagar.org

জসীমউদ্‌দীন

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) প্রবল পরাক্রমের যুগে ধূমকেতুর পুচ্ছ ডানা মেলে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) বর্ণাঢ্য আবির্ভাব। নজরুলের দীপ্তিময় আগমনের পরই এবং অনেকটা তাঁরই প্রভাবে 'কল্লোল যুগের' উদ্ভব। 'কল্লোল যুগের' কলকণ্ঠ উচ্চকিত থাকা অবস্থায়ই 'তিরিশোত্তর' যুগের তরুণ প্রতিভাবান কবিদের আবির্ভাব। এভাবে যুগপৎ রবীন্দ্র-নজরুল-কল্লোল-তিরিশোত্তর যুগের উজ্জ্বল আলোক-সম্পাতে বাংলা সাহিত্য যখন ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ, ঠিক তখনি এক স্বতন্ত্র প্রতিভার স্নিগ্ধ আলোকচ্ছটা নিয়ে বাংলা কাব্যে কবি জসীম উদ্‌দীন (জন্ম- ১ জানুয়ারি ১৯০৩, মৃত্যু- ১৪ মার্চ ১৯৭৬) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যে এক নতুন আবহ সৃষ্টি করেন। তাঁর কাব্যের ভাব, বিষয়, শব্দ, চরিত্র, প্রকরণ, ছন্দ, অলংকার, গঠন-কৌশল, আবেদন ইত্যাদি সবই ভিন্ন স্বাদ ও মেজাজের। সমকালীন কবিরা যখন সকলেই আধুনিক নগর-চেতনায় উদ্বুদ্ধ, যান্ত্রিক সভ্যতার জটিলতায় যন্ত্রণাবিদ্ধ, জসীম উদ্‌দীন তখন চিরায়ত গ্রামীণ জনপদ, আবহমান লোকজ ঐতিহ্যের সুস্মিত ধারায় পরিস্নাত এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কবি হিসাবে ভিন্ন মাত্রিক সৃজনশীলতায় বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত উন্মোচনে ব্যাপৃত হন।

গ্রামীণ জনপদের সহজ, সরল, সাধারণ মানুষ, তাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, আনন্দ-কোলাহল, ছায়া-ঢাকা সবুজ অরণ্য, দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, শষ্য ভরা ক্ষেত, নদী-নালা, ফুল-পাখি ইত্যাদি জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে অসাধারণ বর্ণ-সুষমায় মন-মুগ্ধকররূপে রূপায়িত হয়েছে। লোকজ শব্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও লোকজ জীবন-স্বভাবের অন্তরঙ্গ বর্ণনায় তিনি অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। ফলে বাংলা কাব্যে তিনি নতুন ধারার প্রবর্তক ও স্বতন্ত্র মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি হিসাবে পরিচিহ্নিত ও স্বীকৃত। আধুনিক বাংলা কাব্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের পরেই স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক হিসাবে জসীম উদ্‌দীনের নাম পরিকীর্তিত।

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ঃ "জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব, ভাষা ও রস সম্পূর্ণ নূতন ধরনের। প্রকৃত কবির হৃদয় এই লেখকের আছে।"

সমকালীন কবিরা যেখানে প্রায় সকলেই নগর-চেতনাসম্পন্ন, নাগরিক জীবন-স্বভাব ও আচার-আচরণে অভ্যস্ত এবং সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটাতে সচেষ্ট, জসীম উদ্‌দীন সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর কবিতায় তিনি আবহমান বাংলার প্রকৃতি, সমাজ ও সাধারণ মানুষের জীবন-চিত্রকেই আন্তরিক নিষ্ঠা, অকৃত্রিম ভালবাসা ও দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু সবই চিরায়ত বাংলার লোকজ ঐতিহ্য, গ্রাম-বাংলার পরিবেশ ও জীবন থেকে উৎসারিত। কবির শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের একটা বিরাট অংশ কেটেছে নিজ জন্মভূমি ফরিদপুরের গোবিন্দপুর গ্রামে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অধীনে লোক-গীতি সংগ্রহ করার কাজেও তাঁকে প্রায়ই পল্লী অঞ্চলে সফর করতে হতো। পল্লীর সাধারণ মানুষের সাথে তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হতো। তাঁর সংগৃহীত গানের ভাব ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা-গবেষণা করতে করতে তিনিও পল্লী-জীবন ও পল্লী-কবিদের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তাঁর চিন্তা-চেতনা ও কবি-কল্পনায় সেই ভাব ও বিষয়বস্তু গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তবে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী হয়েছে আধুনিক শিল্প-রীতি ও কলাসম্মত উপায়ে। তাই তা পল্লী-জীবন-কেন্দ্রিক হলেও পল্লী-সাহিত্য হয়নি, হয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন আধুনিক সাহিত্য। এটাকে পল্লীর সাথে নগর-জীবনের এক সুন্দর সেতুবন্ধন বলে আখ্যায়িত করা চলে।

জসীম উদ্‌দীন একান্তভাবে পল্লীগত প্রাণ। পল্লী-বাংলার উদার বিস্তৃত নিসর্গ, উদাস করা প্রকৃতি, ছায়া-রোদ্দুর ঘেরা শ্যামল মনোরম প্রান্তর, পাখ-পাখালির বিচিত্র কূজন, নদীর কলতান, ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যময় অপরূপ সুষমা, সহজ-সরল মানুষ, তাদের বিচিত্র জীবন-যাপন প্রণালী, সরল-সহজ, প্রেম-ভালবাসা, চাওয়া-পাওয়া-বঞ্চনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ইত্যাদি তাঁর কবি-চিত্তকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি তাদের সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। তারা কবির একান্ত আপনজন। নিভৃত পল্লীর বাসিন্দা হিসাবে কবি তাদের জন্ম-মৃত্যু, বেড়ে ওঠা, বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের সাথে নিবিড়ভাবে পরিচিত। তাই তাঁর কাব্যের ভাব ও বিষয়বস্তু হিসাবে এগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে। দূর থেকে দেখে তিনি পল্লীর রূপ আঁকেননি, পল্লীর অন্তরের গভীরতম প্রদেশ থেকে রূপ-রস-আনন্দ আহরণ করে তিল তিল করে তিনি তাঁর কাব্যের অপরূপ ভুবন বিনির্মাণ

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। ফলে তাঁর সমসাময়িক কবিরা যেখানে প্রায় সকলেই নগর-জীবন ও নাগরিক উপাদানে কবিতা রচনা করেছেন, জসীম উদ্‌দীন সেখানে নগর-চেতনা ও নাগরিকতাকে পরিহার করে আবহমান পল্লীকে তাঁর কবিতার উপাদান ও উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। পল্লীর সাধারণ অথচ সম্পন্ন-পরিপুষ্ট, আনন্দ-বেদনাপূর্ণ জীবন, শ্যামল-স্নিগ্ধ প্রকৃতি ও মনোরম পরিবেশকেই তিনি আশ্চর্য শিল্প-কুশলতা, আধুনিক রুচি ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাব্য-ভঙ্গীতে রূপায়িত করেছেন। তাঁর এ পল্লীবোধ সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেন ঃ

"জসীম উদ্‌দীন বাংলা ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ রূপকার, বাংলা সাহিত্যের এক প্রধান কবি। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যে কবি জসীম উদ্‌দীন বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। সমকালীন প্রবল নগর-কেন্দ্রিক কাব্য ভাবনার পরিমণ্ডলে তাঁর কবিতা বয়ে এনেছিল শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম বাংলার গীতল শীতল আবহ, নম্র, অকম্প্র ধীর প্রবাহ। আধুনিক বাংলা কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম এনেছিলেন পৌরুষদীপ্ত জীবনচেতনা এবং আধুনিক মানবতাবোধ আর জসীম উদ্‌দীন এনেছিলেন গ্রাম বাংলার সজীব-জীবন সম্পর্কে চেতনা এবং গ্রামীণ মানুষের সহজ মানবিকতা।" **(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ 'কবি জসীম উদ্‌দীন', 'সাম্প্রতিক', মাসিক সাহিত্য পত্রিকা, 'কবি জসীম উদ্‌দীন সংখ্যা', দ্বাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, চৈত্র, ১৩৮২, পৃ. ৩৫-৩৬)।**

জসীম উদ্‌দীন একান্তভাবে লোকজ ঐতিহ্যের কবি। পল্লীবোধ ও পল্লী-চেতনা তাঁর কবি-স্বভাবের একান্ত অনুষঙ্গ। এ সম্পর্কে অন্য একজন সমালোচকের মন্তব্য ঃ "প্রকৃতি উৎসারিত স্বাভাবিক ও মৌলিক লোকজ ধারাটি আগে আর কেউ তেমন সহজভাবে আধুনিক কাব্যধারার সঙ্গে এক করতে সক্ষম হননি। এটা জসীম উদ্‌দীনের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এই জন্যে যে, তিনি ছিলেন গ্রাম ও গ্রামবাংলার এক স্বাভাবিক অংশ।" **(হাসান হাফিজুর রহমান ঃ বাংলার প্রকৃতি ও জসীম উদ্‌দীন, বেতার বাংলা, মার্চ, প্রথম পক্ষ, ১৯৮০)।**

সাধারণভাবে কবির সব লেখায় এবং বিশেষভাবে তাঁর 'রাখালী', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'ধানক্ষেত' প্রভৃতি কাব্যে পল্লী-জীবনের সাধারণ বাণী-চিত্র, প্রকৃতি ও পরিবেশের অপরূপ বর্ণনা রয়েছে। 'নকসী-কাঁথার মাঠ' সম্পর্কে প্রখ্যাত শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "শহরবাসীদের কাছে এই বইখানির সুন্দর কাঁথার মত করে বোনা লেখার কতটা আদর হবে জানি না। আমি এটিকে আদরের চোখে দেখছি ঃ কেননা এ লেখার মধ্যে দিয়ে বাংলার পল্লী জীবন আমার কাছে চমৎকার একটা মাধুর্যময় ছবির মতো দেখা দিয়েছে।" **(আধুনিক জার্মান সাহিত্য/সম্পাদনা ঃ সৈয়দ আলী আহসান, ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।**

www.nagorikpathagar.org

ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন 'নকসী কাঁথার মাঠ' সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "নকসী কাঁথার মাঠে' এমন অনেক কথা আছে-যা বাংলার আর কোন কবি লিখিতে পারতেন কিনা সন্দেহ। ...নকসী কাঁথার মাঠের কবি দেশের পুরাতন রত্নভাণ্ডারকে নূতনভাবে উদ্ধার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে আগত রাজ্যের বার্তা বহিয়া আনিয়াছেন। 'রাখালী' নামক কাব্যে ইহার প্রতিভার যে পরিচয় পাইয়াছিলাম, 'নকসীকাঁথার মাঠে' তাহার পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাইতেছি।"

জসীম উদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ "সোজন বাদিয়ার ঘাট' অতীব প্রশংসারযোগ্য। এই বই যে বাংলার পাঠক সমাজে আদৃত হবে সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই।"

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন যে মন্তব্য করেছেন, তা যেমন অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি আবেগপূর্ণ। তিনি বলেন ঃ "আমি হিন্দু! আমার কাছে বেদ পবিত্র, ভগবৎ পবিত্র। কিন্তু 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' পুস্তকখানি তাহার চাইতেও পবিত্র। কারণ ইহাতে আমার বাংলাদেশের মাটির মানুষগুলির কাহিনী আছে।"

এভাবে 'রাখালী', 'বালুচর' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে পল্লী-জীবনের কথা, পল্লীর সাধারণ মানুষের কথা, পল্লীর অপরূপ সৌন্দর্যময় প্রকৃতি ও নিসর্গের বর্ণনা রয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোন কবি পল্লীর ভাব ও বিষয় নিয়ে এমন সার্থক কাব্য-কর্ম করতে সক্ষম হননি। জসীম উদ্‌দীনকে অনুসরণ করে তাঁর পরবর্তীতে অনেকেই একইভাবে কাব্য-চর্চায় ব্রতী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর মত সাফল্য অন্য কেউ অর্জন করতে পারেননি। জসীম উদ্‌দীন এক্ষেত্রে একক ও অনন্য। তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও সহজে সনাক্তযোগ্য কাব্যকর্ম বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলার লোকজ ঐতিহ্য ও পল্লী বাংলার ভাব ও বিষয়কে বর্ণাঢ্য শৈল্পিক সুষমায় রূপায়িত করার অনন্য গৌরব ও সাফল্যে মহীয়ান কবিকে তাই অনেকেই 'পল্লীকবি' হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ অভিধার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা না করেও শুধু এটুকু বলা যায় যে, গ্রাম-প্রধান বাংলার সাহিত্যে গ্রামীণ মানুষের জীবন, ভাব ও বৈচিত্রময় জীবন-সংগ্রামের চিত্র জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে যেভাবে ফুটে উঠেছে, অন্য কোন আধুনিক কবির কাব্যে তা পরিলক্ষিত হয় না।

শুধু ভাব ও বিষয়ের ক্ষেত্রেই নয়, কাব্য-ভাষা, শব্দ-চয়ন, উপমা, রূপক, প্রতীক, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রেও তিনি লোকজ ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। তাঁর শিল্পবোধ, রুচি, মনন ও চৈতন্য সম্পূর্ণ আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও

www.nagorikpathagar.org

এসব ক্ষেত্রে তিনি লোকজ ঐতিহ্য অনুসরণ করে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। যেকোন কবির স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকতার পরিচয় হিসাবে তাঁর নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণের নৈপুণ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ নৈপুণ্য ও কৃতিত্বের অধিকারী। জসীম উদ্‌দীনের কবিতা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করলে তাঁর এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবি-ভাষা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যাবে ঃ

১. "কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত
চখা আর চখি নরম ডানায় মুছায়ে দিয়াছে কত।"
(কাল সে আসিবে)

২. "এক কোঁচ ভরা বেথুন তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে
ওরে মুখপোড়া, কোথা গিয়েছিলি এমনি এ-কালি সাঁঝে?"
(পল্লী জননী ঃ রাখালী)

৩. "দশ খান্দা জমি রূপার, তিনটা গরু হালে,
ধানের বেড়ী ঠেকে তাহার বড় ঘরের চালে।"
(নকসী কাঁথার মাঠ)

৪. "শোন মা আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে,
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাতনূর সিকা ভরে।"
(পল্লী জননী / রাখালী)

৫. "কিরে বেটা বকিস নাকি কনের চাচা হাঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।"
(নকসী কাঁথার মাঠ)

৬. "সোজন আসিয়া জাম গাছটির আগ ডালে যেন উঠি
মেঘের মতন কালো জামগুলি তুলিতেছে মুঠি মুঠি।"
(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

উপরে বিভিন্ন উদ্ধৃতি থেকে জসীমউদ্‌দীনের কাব্য-ভাষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। তাঁর সমগ্র কাব্যের ভাষাই প্রায় এক রকম। এ ভাষার কয়েকটি বিশেষ গুণ হলো এই যে, এটা লোকজ ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, সহজ, স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম এবং সাধারণ গ্রামীণ-জীবনের সাথে সম্পর্কিত। সর্বোপরি এ ভাষা ব্যঞ্জনাময়, প্রসাদ-গুণসম্পন্ন, সরস ও কাব্যময়। লোকজ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। শালীন রুচিবোধ, শৈল্পিক শুচিতা ও গভীর জীবন সংশ্লিষ্টতায় তা অপরূপ মাধুর্যময়। এ কারণেই তিনি রসজ্ঞ বোধ্যা পাঠকের নিকট অকৃত্রিম জীবন-স্বভাবের সার্থক রূপকার হিসাবে

www.nagorikpathagar.org

প্রশংসিত। তাছাড়া, শুধু শব্দ নির্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, উপমা-রূপক, প্রতীক ও রুপকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি গ্রামীণ ঐতিহ্যকে ধারণ করে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়েছেন।

জসীম উদ্‌দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' কাব্যের অনুবাদক E.M. Milford -এর ভাষায় ঃ "Jasim uddin Villager's rejoice and suffer, desire and undesired, hate and despair from the very depth of their soul ; There is nothing trival about them, nothing superficial, they are real". [The Field of the Embroidered Quilt / Jasim uddin, translated by E.M. Milford].

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্যিক Dr. Verrir Elwin 'নকসী কাঁথার মাঠ' পড়ে মন্তব্য করেন ঃ "I read the poem with growing excitement and have returned to it again and again to be delighted by its simplicity, its deep humanity". **[The Field of Embroidered Quilt গ্রন্থের Forword দৃষ্টব্য]** ।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি আরবি-ফারসি শব্দের স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তবে এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কষ্ট-প্রয়োগের প্রবণতা তাঁর মধ্যে কখনো লক্ষ্য করা যায় না। যেসব আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ বাংলা ভাষায় আত্মস্থ হয়ে যুগযুগ ধরে আমাদের বইয়ের ভাষায় বা কথ্যভাষায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেসব শব্দই তিনি সহজ-স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেছেন। অনেকে এটাকে পুঁথি সাহিত্যের প্রভাব বলতে পারেন, কেউ কেউ এটাকে নজরুলের প্রভাবও বলতে পারেন। প্রকৃত অর্থে, এটা আমাদের গ্রাম-বাংলার ঐতিহ্য থেকেই তিনি লাভ করেছেন।

মুসলিম শাসনামলে আরবি-ফারসি ভাষার অসংখ্য শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবিষ্ট হয়ে আমাদের ভাষাকে যেমন সমৃদ্ধ করেছিল, তেমনি বাংলা সাহিত্য-চর্চার পথও সুগম করেছিল। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই তখন এ ভাষায় সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। ইংরাজ আমলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের খ্রিস্টান পাদ্রী ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের ষড়যন্ত্রে আরবি-ফারসি বিবর্জিত, দুর্বোধ্য সংস্কৃত শব্দ সংবলিত কৃত্রিম 'সাধু বাংলা' ভাষা তৈরি এবং পাঠ্য-পুস্তকাদির মাধ্যমে তা প্রচলনের চেষ্টা হলেও সাধারণ বাঙালি বিশেষত বাঙালি মুসলমানের কথ্য ভাষায় অসংখ্য আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ যথারীতি চালু থাকে। অদ্যাবধি আমাদের বইয়ের ভাষা যাই হোক না কেন, বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় অসংখ্য আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বাস্তব জীবন শিল্পী হিসাবে সাধারণ মানুষের বাস্তব জীবন-চিত্র ফুটিয়ে তোলার অনিবার্য তাগিদে জসীম উদ্‌দীন এ প্রচলিত ভাষার শব্দমালা গ্রহণ করেছেন অতি সহজ ও

www.nagorikpathagar.org

স্বাভাবিকভাবে। এতে কোন কৃত্রিমতা নেই, অস্বাভাবিকতা নেই। এতে তাঁর কাব্যের দ্যুতিময়তা ও সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হলো ঃ

১. "ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরে রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কিয়ামত ভাবিতেছি কত দূর!
জোর হাতে দাদু মোনাজাত কর, 'আয় খোদা'! রহমান,
ভেস্ত নাজেল করিও সকল মৃত্যু ব্যথিত প্রাণ।"

(কবর ঃ রাখালী)

২. "হে মৃতেরা শোন! তোমাদের তরে শেষ জেয়ারত করিয়া যাই,
শিমুলতলীর গোরস্তানেতে মিলিব না আর সকল ভাই।
শবেবরাতের রজনীতে হেথা জ্বলিবে না আর মোমের বাতি,
ব্যথিত জনের লোবানের বাসে উঠিবে না বাতাস মাতি।
যে খোদা দেখিছে সকল দুনিয়া, সে জন মোদের বাসনা লয়ে,
কবরে কবরে পড়ে জেয়ারত ঈদের বাসরে মোদের হয়ে।"

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

৩. "মুন্সী সাহেবের মফেল ত নয়, রঙ-বেরঙের ফুলের বাজার,
পূর্ণমাসীর চাঁদ ঘিরে আজ তারা ফুলের উড়ছে বাহার।
গন্ধ তাদের ছড়ায় পবন আতর গোলাপ লোবানেতে,
আল্লাহুমা-ছাল্লে আলা দরুদ গানের ছন্দে মেতে।"

(মুন্সী সাহেব ঃ ধানখেত)

৪. "বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,
কাছারী ঘর গুম-গুমা-গুম, লোক হয়েছে ভারি।
গোয়াল ঘরে ঝেড়ে পুছে বিছান দিল পাতি,
বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প গানে মাতি।

... ...

পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোড়ল নাচিয়ে ঘন দাড়ি,
পড়ে কেতাব গাঁয়ের মোল্লা মাঠ-ফাটা ডাক ছাড়ি।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

উদ্ধৃত কবিতাংশে যেসব আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা বিষয় ও পরিবেশের প্রয়োজনে এসেছে একান্ত স্বাভাবিকভাবে। আমাদের গ্রামীণ

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম সমাজে এসব শব্দ হর-হামেশাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব শব্দের ব্যবহার ছাড়া গ্রামীণ পরিবেশের বর্ণনা কখনো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে না। 'পল্লীকবি' জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে তাই এরকম বহু শব্দের ব্যবহার আছে। বিষয় ও পরিবেশের প্রয়োজনে অনেক ক্ষেত্রে আবার হিন্দু শাস্ত্র ও পূজা-পার্বণ সম্পর্কিত অনেক শব্দও এসেছে ঐ একই কারণে। এর দ্বারা জসীম উদ্‌দীনের বাস্তববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়ানুগ উপযোগী ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যে সচেতন ছিলেন, এটা তারই প্রমাণ। যেমন ঃ

১. "চড়ক পূজার গাজন গাহি নাচে নমুর দল,
চৈতী ঢাকের বাদ্য শুনি গাঁও করে টল্‌মল্‌।"

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

২. "লাভের মধ্যে হাজ্‌রা-তলা দুগ্ধেতে যায় ভাসি,
গঙ্গা দেবীর কপাল ভালো পূজায় উঠেন হাসি।"

(জেলে গাঙে মাছ ধরিতে যায় ঃ রাখালী)

রূপক, উপমা, প্রতীক, রূপকল্পের বিচিত্র, নৈপুণ্যপূর্ণ ব্যবহার আধুনিক কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আগের যুগেও এর ব্যবহার ছিল। আধুনিক কবিরা এ ব্যাপারে অধিকতর সচেতন এবং এর বিচিত্র- নৈপুণ্যপূর্ণ ব্যবহারে যত্নবান। জসীম উদ্‌দীনও এর ব্যবহারে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। তবে বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রেও তিনি লোকজ ঐতিহ্যকে আশ্রয় করেছেন। তাঁর কবি-চিত্তে পল্লী-আবহ এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে যে, এসব ক্ষেত্রেও সে অনুসঙ্গ থেকে তিনি বিচ্যুত হতে পারেন নি। ফলে তিনি গতানুগতিক ধারা পরিহার করে গ্রামীণ উপাদান-অনুষঙ্গ নিয়ে কাজ করেছেন। ফলে তা যেমন নতুনত্ব সৃষ্টি করেছে, বাংলা কাব্যের পরিচিত একঘেঁয়েমি থেকেও তিনি বেরিয়ে এসে নতুনত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। এখানে কিছু উদাহরণ পেশ করছি। প্রথমে উপমা ঃ

১. "কেমন যেন গাল দু'খানি মাঝে রাঙা ঠোঁটটি তাহার,
মাঠে ফোটা কলমি ফুলে কতকটা তার খেলে বাহার।"

(রাখালী ঃ নাম কবিতা)

২. "কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দু'খান সরু,
গা-খানি তার শাওন মাসের যেমন তমাল তরু।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

৩. "পড়শীরা কয়, মেয়ে তো নয়, হলদে পাখীর ছা,

www.nagorikpathagar.org

ডানা হলেই পালিয়ে যেত ছেড়ে তাদের গাঁ।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

৪. "লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়ায় যায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

উপরে উপমা , উপমেয় সবই গ্রামের পরিবেশ থেকে সংগৃহীত। জসীম উদ্‌দীনের কৃতিত্ব হলো, আমাদের গ্রাম-জনপদের বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যকে আধুনিক শিল্প-সুষমায় তিনি শিক্ষিত সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। নাগরিক বৈভবপূর্ণ চাকচিক্যময় সাহিত্যের পাশাপাশি তার কদর যাই হোক না কেন, তার অকৃত্রিম মাধুর্যময় সৌন্দর্য আমাদেরকে মুগ্ধ-বিমোহিত করে। এর দ্বারা তিনি বাংলাকাব্যের বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনার দিগন্তকে অবারিত করেছে। এ দিক দিয়ে তিনি আধুনিক নাগরিক সমাজের সাথে অবজ্ঞাত গ্রাম-জনপদের একটা মধুর মিলন-সেতুও রচনা করেছেন। রূপক ব্যবহারের উদাহরণ ঃ

১. "এ রূপ মহিমা সহিতে পারে না ভোরের রূপসী উষা
রজনী ফুলের অঙ্গ হইতে হরিয়া লইছে ভূষা।"

(রজনী গন্ধার বিদায় ঃ মাটির কান্না)

২. "চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াশা কাফন পরি।
দুঃ ছাই। কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।"

(পল্লী জননী ঃ রাখালী)

প্রতীকের ব্যবহার ঃ

১. "মনে মনে রাখাল ভাবে, 'গাঁয়ের মেয়ে। সোনার মেয়ে,
তোমার কালো কেশের মত রাতের আঁধার আসল ছেয়ে।"

(রাখালী ঃ নাম কবিতা)

২. "ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ লাগে,
মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর।"

(বর ঃ রাখালী)

রূপকল্প ঃ

১. "উদয় তারা আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পূবের পথে,
ভোরের সারথী এখনো আসেনি রক্ত-ঘোড়ার রথে।"

(সোজন বাদিয়ার ঘাট)

www.nagorikpathagar.org

২. "পথ দিয়া যেতে গেঁয়ো-পথিকেরা মুছিয়া যাইত চোখ,
চরণে তাদের কাঁদিয়া উঠিত গাছের পাতার শোক।
আথালে দুইটি জোয়ান বলদ সারা মাঠ পানে চাহি,
হাম্বা রবেতে বুক ফাটাইত নয়নের জলে নাহি।
গলাটি তাদের জড়ায়ে ধরিয়া কাঁদিত তোমার মা,
চোখের জলের গহীন সায়রে ডুবায়ে সকল গাঁ।"

(কবর ঃ রাখালী)

৩. "ঘুম হতে আজ জেগেই দেখি শিশির ঝরা ঘাসে,
সারা রাতের স্বপন আমার মিঠেল রোদে হাসে।
আমার সাথে করতে খেলা প্রভাত হাওয়া ভাই,
শরষে ফুলের পাঁপড়ি নাড়ি ডাকছে মোরে তাই।
চলতে পথে মটরশুঁটি জড়িয়ে দুখান পা,
বল্‌ছে ডেকে, গাঁয়ের রাখাল একটু খেলে যা!"

(রাখাল ছেলে ঃ রাখালী)

উৎপ্রেক্ষা ঃ

১. "হেথায় ঘুমায় তোর ছোট ফুফু, সাত বছরের মেয়ে
রামধনু বুঝি নেমে এসেছিল ভেস্তের দ্বার বেয়ে।"

(কবর ঃ রাখালী)

২. "এ-বাড়ি যায়, ও-বাড়ি যায় গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রামশালিকের ছা।
দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

সমাসোক্তি ঃ

১. "হেমন্ত চাঁদ অর্ধেক হেলি জ্যোৎস্নায় জাল পাতি,
টেনে টেনে তবে হয়রান হয়ে, ডুবে যায় সারারাতি।"

(নকসী কাঁথার মাঠ)

অনুপ্রয়াস ঃ

১. "নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
ছেলেরে তাহার ভাল করে দাও, কাঁদে জননীর প্রাণ।"

(পল্লী জননী ঃ রাখালী)

উপরে উদ্ধৃতাংশে উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পের যে ব্যবহার বাংলা কাব্যে তা একান্তভাবে জসীম উদ্‌দীনের স্বাতন্ত্র্যকেই সুস্পষ্ট করে তোলে। পল্লীর জীবন,

www.nagorikpathagar.org

নিসর্গ ও সাধারণ দৃশ্যপট থেকে আহরিত শব্দ-সম্পদ, বিষয়ানুগ চিন্তা-ভাবনা জসীম উদ্‌দীনের কবিতাকে দিয়েছে এক অভিনব সৌন্দর্য ও অপরূপ বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে তিনি একক ও অসাধারণ। আধুনিক বাংলা কাব্যে তিনি এক চন্দ্রালোকিত স্নিগ্ধ ভুবন রচনা করে আপন মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে আছেন। রবীন্দ্র-নজরুল-কল্লোল ও তিরিশোত্তর যুগের উচ্চকণ্ঠ আবহের মধ্যে জসীম উদ্‌দীনের স্মিতকণ্ঠ তলিয়ে যায় নি; বরং তা এক স্বতন্ত্র আলোর প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য কম নয়। এখানে জসীম উদ্‌দীনের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকত্ব আপন স্বভাবে প্রোজ্জ্বল।

এসব উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা-অনুপ্রয়াস ইত্যাদির প্রয়োগ ও ব্যবহার-বিধি দর্শনে জসীম উদ্‌দীনকে সহজেই একজন আধুনিক শিল্প-সজ্ঞান কবি বলে প্রতীয়মান হয়। বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসান তাই বলেন ঃ

"গ্রাম্য-জীবন এবং গ্রাম্য-পরিবেশ তাঁর কাব্যের উপাদান যুগিয়েছে এবং কবিতার কলা-কৌশলের মধ্যেও গ্রাম আবহকে আমরা মূর্ত হতে দেখি। কিন্তু তাই বলে তিনি পরিপূর্ণভাবে গ্রাম্য কবি নন। তার কারণ উপমা রূপক প্রয়োগে তিনি যথেষ্ট অনুশীলনের পরিচয় দিয়েছেন এবং কাব্যকাহিনী নির্মাণে উপন্যাসের গঠন-প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছেন।" **(মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ. ৪৩৪)**।

জসীমম উদ্‌দীনের কাব্যে উপমা-রূপক-প্রতীক ব্যবহারের রীতি ও কলাকৌশলও তাঁর একান্ত নিজস্ব। এজন্য তিনি ইংরাজি সাহিত্য, গ্রীক পুরাণ বা হিন্দু পুরাণ ঘেটে বেড়াননি, গ্রাম-বাংলার জীবন থেকে, বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে নিজস্ব কবি-কল্পনার সৃজনী-কৌশলে তিনি এগুলো অসাধারণ নৈপুণ্যে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়। এ সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য ঃ

"পল্লীর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা এবং প্রকৃতি জসীম উদ্‌দীনের উপমার উৎস ও শ্রেষ্ঠ প্রেরণা, আপনার সমস্ত সত্তা দিয়ে কবি প্রকৃতির দেহে নূতনতর বিকাশের বর্ণ এঁকেছেন। তাঁর কবি সত্তার এই উপাদানটিকে বাদ দিয়ে তাঁর কবি জীবনের আর কোন আশ্রয় নেই। তাঁর কাব্যে সহজেই চোখে পড়ে জলীর বিলের কাজল জল, কৃষাণ বধূর জল আনতে যাওয়া, ধান কাউনের অথৈ রঙের মেলা, এক পারের ঢেউ এর সঙ্গে আর এক পারের ঢেউ এর কানাকানির মধুর পরিচয়। শুধু জলীর বিলই নয়, পদ্মা, মেঘনা, গড়াই, মধুমতির অবিরাম ভাঙ্গা-গড়ার মাঝে ভাঙ্গা ঘর নূতন করে গড়ে উঠতে দেখিনি, বরং গড়া ঘর ভেঙ্গে পড়ার ছবিই সর্বত্র। আবার কোথাও শান্ত নদীর অবিরাম গতির মধ্যে কবি

www.nagorikpathagar.org

আপন মনের গতিধর্মকে খুঁজে পেয়েছেন আর দিগন্ত বিস্তার উদার আকাশে পেয়েছেন মনের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের প্রশান্তিকে। নদী আর আকাশের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তাঁর সহজাত। নদী আর আকাশকে ঘিরে উপমা ও রূপক ব্যবহার করেছেন অজস্রবার।" **(সেলিমা খালেক : জসীম উদ্‌দীনের কবিতা, অলংকার ও চিত্রকল্প, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৯১)।**

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে লোকজ ঐতিহ্য যেভাবে রূপক, উপমা, প্রতীক ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক রুচি ও শিল্পসম্মতভাবে রূপায়িত হয়েছে সমগ্র বাংলা কব্যে তার নজীর খুব কমই আছে। এটা জসীম উদ্‌দীনের এক অনন্য-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক তিতাশ চৌধুরীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

"জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-শরীর নির্মাণের জন্যে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে কোনো শুচিবায়ু ছিল না। চলতি, দেশী-বিদেশী, লোকজ প্রভৃতি শব্দকেও তিনি কাব্যে অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন।... জসীম উদ্‌দীনের সহজ শব্দচয়ন কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর বিচিত্র উপমা ও চিত্রকল্পের নতুনত্ব এবং ভাষা ব্যবহার-কৌশল একদিকে যেমন একঘেঁয়েমি থেকে মুক্তি দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে জাগিয়ে তুলেছে, আমাদের চিরন্তন আগ্রহ ও কৌতূহল।" **(তিতাশ চৌধুরী : 'জসীম উদ্‌দীন কবিতা, গদ্য ও স্মৃতি', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৭৫)।**

প্রসঙ্গত জসীম উদ্‌দীনের ছন্দ-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। মধুসূদন থেকে জসীম উদ্‌দীনের সময়কাল পর্যন্ত বাংলা কবিতায় ছন্দের ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উত্তরণ ঘটেছে। জসীম উদ্‌দীন সে সম্পর্কে অবহিত কিংবা সচেতন ছিলেন না তা নয়। কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে তিনি মধ্যযুগে প্রচলিত পয়ার, ত্রিপদী ও লোক-ছন্দের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এটাকে তিনি তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর জন্য অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচনা করেছেন। তাঁর কাব্যের অধিকাংশ ভাব, বিষয় ও কাহিনী মধ্যযুগের সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। তাই আধুনিক যুগের সাথে মধ্যযুগের এক সুষম সেতু-বন্ধন রচনার উদ্দেশ্যেও হয়ত তিনি এ ধরনের ছন্দ-প্রকরণের আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ যেটাই হোক, এ ধরনের ছন্দ তাঁর কাব্যের বিষয় ও মেজাজের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হয়েছে এবং তাঁর কাব্যে গ্রামের যে সহজ-সরল জীবন-চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন, তা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্যহীনতা সম্পর্কে কেউ কেউ অভিযোগ করে থাকেন। তবে মনে রাখতে হবে, ছন্দের বৈচিত্র্য নির্মাণ নয়,

www.nagorikpathagar.org

প্রচলিত ছন্দে সুন্দর কাব্য-রচনা করার ক্ষেত্রেই তাঁর আগ্রহ ছিল অধিক। প্রচলিত সব ছন্দের ব্যবহারেও তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না, তাঁর কাব্যের ভাব, বিষয়বস্তু ও মেজাজের উপযোগী মধ্যযুগে প্রচলিত ছন্দের ব্যবহারেই তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন।

প্রসঙ্গত জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা চলে। এগুলো হলো ঃ

১. আখ্যানকাব্য রচনায় তিনি উপন্যাসের গঠন-কৌশল অবলম্বন করেছেন। মধ্যযুগের কাহিনীর অনুকৃতি এতে লক্ষণীয়। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'নকসী কাঁথার মাঠ', 'সকিনা', 'মা যে জননী কান্দে' এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর কাব্যে সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহ, রীতি-নীতি, গ্রামের সাধারণ জীবন-বৈচিত্র্য, চরিত্র-চিত্রণ, গ্রামের সাধারণ দৃশ্যপট, প্রকৃতি ইত্যাদি অসাধারণ অকৃত্রিমতায় হৃদয়গ্রাহীভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানে কোন তত্ত্বকথা নেই, আধুনিক যান্ত্রিকতা, নাগরিক জীবন-যন্ত্রণা ও জটিলতা নেই। সারল্যপূর্ণ চিরায়ত জীবনের আবেগ ঘন স্পন্দন উপন্যাসের আদলে বর্ণিত হয়েছে।

২. জসীম উদ্‌দীনের কবিতায় প্রায়শই কথ্য-ভঙ্গির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এতেও মধ্যযুগে রচিত সাহিত্যের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইংরাজিতে একে বলা হয় Monologue বা স্বগোতোক্তি। ইংরাজি সাহিত্যে এ ভঙ্গিতে রচিত অনেক বিখ্যাত কবিতা আছে। বাংলা ভাষায়ও এ জাতীয় কবিতার সংখ্যা কম নয়। কথ্যভঙ্গীতে রচিত জসীম উদ্‌দীনের কবিতা থেকে কতিপয় উদাহরণ পেশ করা হলো ঃ

১. "তুমি যদি যাও আমাদের গাঁয়ে, তোমারে সঙ্গে করি,
নদীর ওপারে চলে যাই তবে লইয়া ঘাটের তরী।"

(নিমন্ত্রণ ঃ ধানক্ষেত)

২. "এইখানে তোর দাদীর কবর ডালিম গাছের তলে
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।"

(কবর ঃ রাখালী)

৩. "তন্বী তোমার দেহখানি যেন পুষ্প কোরক সম,
ধীরে ধীরে দল মেলিছে লীলায় রঙে রঙে অনুপম।"

(তন্বী ঃ জলের লেখন)

৩. ধ্বনিময়তা ও চিত্রলতা জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। জ্যা পল সার্ত্রের মতে, কাব্যের বিভিন্ন পদ ও শব্দের অন্ত র্নিহিত ধ্বনিময়তা ও চিত্রলতাই কবিতাকে সার্থক করে তোলে। এ দিক দিয়ে

www.nagorikpathagar.org

জসীম উদ্‌দীনের কবিতা নিঃসন্দেহে সার্থক। সে সাথে মানবিক আর্তি ও সংবেদনায় পূর্ণ হয়ে জসীম উদ্‌দীনের কবিতা অপরূপ সার্থকতায় মণ্ডিত হয়েছে। চেকোস্লাভাকিয়ার লেখক ডক্টর দুশন জবাভিতেল চেক ভাষায় জসীম উদ্‌দীনের কিছু লেখার অনুবাদ করেন। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের পরিশিষ্টে জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি জসীম উদ্‌দীনের কাব্য-প্রতিভার তিনটি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন ঃ

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনী সংগীতাশ্রয়ী বিচিত্র কাব্য ঐতিহ্য,
২. বাংলাদেশের পল্লী সাহিত্য ও গ্রাম্য গানের ধারা, এবং
৩. সাধারণ মানুষের প্রতি কবির অসাধারণ মমত্ববোধ – কাব্যিক অর্থে যাকে বলা হয় Poetie Humanism বা মানবিক সংবেদনা।

উপরোক্ত তিন উৎস বা বৈশিষ্ট্য জসীম উদ্‌দীনের কাব্যকে দিয়েছে অসামান্য সার্থকতা, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা। ফলে বাংলা কাব্যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেছেন। লোকজ ভাব, বিষয়, ভাষা ও জীবন-চিত্রের আধুনিক শিল্পসম্মত রূপায়ণে তিনি যে অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন, তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যগ্রন্থ মোট ঊনিশটি। এগুলো হলো ঃ ১. রাখালী (১৯২৭), ২. নক্‌সী-কাঁথার মাঠ (১৯২৯), ৩. বালুচর (১৯৩০), ৪. ধানক্ষেত (১৯৩২), ৫. সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩), ৬. রঙিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫), ৭. হাসু (১৯৩৮), ৮. রূপবতী (১৯৪৬), ৯. এক পয়সার বাঁশি (১৯৪৯), ১০. পদ্মাপার (১৯৫০), ১১. মাটির কান্না (১৯৫১), ১২. গাঙের পার (১৯৫৪), ১৩. সকিনা (১৯৫৯), ১৪. সুচয়নী (১৯৬১), ১৫. মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩), ১৬. হলুদ বরণী (১৯৬৬), ১৭. জলের লেখন (১৯৬৯), ১৮. পদ্মা নদীর দেশ (১৯৬৯), ১৯ মাগো জ্বালায়ে রাখিস আলো (১৯৭৬)।

জসীম উদ্‌দীনের লেখা নাটকের সংখ্যা মোট ছয়টি। এগুলো হলো ঃ ১. পদ্মাপার (১৯৫০), ২. পল্লীবধূ (১৯৫৬), ৩. মধুমালা (১৯৫৬), ৪. বেদের মেয়ে (১৯৫৬), ৫. গ্রামের মায়া (১৯৫৬), ৬. ওগো পুষ্পধনু (১৯৬৮)।

তাঁর স্মৃতিচারণমূলক, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, শিশুতোষ ও অন্যান্য বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা মোট চৌদ্দটি। এগুলো হলো ঃ ১. যাদের দেখেছি (১৯৫২), ২. চলে মুসাফির (১৯৫৭), ৩. ডালিম কুমার (১৯৬০), ৪. বাঙালির হাসির গল্প (১৯৬০), ৫. ঠাকুর বাড়ির আঙিনায় (১৯৬১), ৬. জীবন কথা (১৯৬৪), ৭.

www.nagorikpathagar.org

বোবা কাহিনী (১৯৬৪), ৮. বাঙালির হাসির গল্প, ৯. ২য় খণ্ড (১৯৬৪), ১০. হলদে পরীর দেশ (১৯৬৫), ১১. যে দেশে মানুষ বড় (১৯৬৮), ১২. স্মৃতির পট (১৯৬৮), ১৩. জার্মানীর শহরে বন্দরে (১৯৭৫), ১৪. স্মরণের সরণী বাহি (১৯৭৮)।

উপরোক্ত তালিকা অনুযায়ী জসীম উদ্‌দীনের মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৩৯টি। এছাড়া, তাঁর সংগ্রহ ও সম্পাদনা গ্রন্থ দুটির নাম হলো ঃ জারী গান (১৯৬৮) ও মুর্শীদা গান (১৯৭৭)।

১৯৩৯ সনে জসীম উদ্‌দীনের 'নকসী কাঁথার মাঠ' ইংরাজিতে অনূদিত হয়। অনুবাদ করেন E.M. Milford. ইংরাজিতে এর নামকরণ করা হয় The Field of the Embroidered Quitlt. পরে এটি ইতালি ভাষায় অনুবাদ করেন ফাদার মেরিনো রিগ্যান। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ১৯৬৯ সনে The Gypsy Wharp নামে ইংরাজিতে অনূদিত হয়। 'অনুবাদ করেন B. Painter & 1. Love-Lock, Allen and Unwin. ইউনেস্কোর সৌজন্যে এটি প্রকাশিত হয়। ১৯৭৪ সনে জসীম উদ্‌দীনের 'বাঙালীর হাসির গল্প' ইংরেজীতে অনুবাদ করেন Barbara Painter & Hasna Jasim uddin. ইংরেজীতে এর নাম হলো ঃ The Folk Tales of Bangladesh. ১৯৭৫ সনে Selected Poems of Jasim uddin নামে জসীম উদ্‌দীনের কিছু নির্বাচিত কবিতার অনুবাদ করেন Hasna Jasim uddin Moudud. এছাড়া, তাঁর 'মাটির কান্না' কাব্যটি ১৯৫৯ সনে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়। জসীম উদ্‌দীনের কিছু রচনা চেক ভাষায় সাহিত্যিক দুশন জবাভিতেল অনুবাদ করেন।

বাংলাদেশের অন্যকোন কবি-সাহিত্যিকের এতগুলো রচনা বিদেশী ভাষায় রচিত হয়নি। এ থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনের জনপ্রিয়তার বিষয় অবগত হওয়া যায়। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা-ভাষী সাহিত্যামোদীদের নিকট জসীম উদ্‌দীনের কবি-খ্যাতি ব্যাপক। বাংলাদেশের জন্য এটা সবিশেষ গৌরবের।

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে আমরা বাংলাদেশের জনজীবন ও সোঁদা মাটির গন্ধ অনুভব করা যায়। বাংলাদেশের প্রকৃতি, নদী-নালা, খাল-বিল, সবুজ-অরণ্য, দিগন্ত বিস্তৃত বিপুল শষ্য ভরা মাঠ, ফুল-পাখি, বিল-হাওর সর্বোপরি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম জীবন-চিত্রের বর্ণিল প্রকাশ দেখি তাঁর কাব্যে। তাঁর কাব্য-ভাষা, বাক-প্রতিমা নির্মাণ, তাঁর রূপক, প্রতীক, উপমা, চিত্রকল্প নির্মাণ সর্বোপরি ভাব, বিষয় ও চরিত্র নির্মাণ কৌশলে বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের বাঙময় চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্র-নজরুল, কল্লোল-তিরিশোত্তর যুগেও তিনি তাঁর নিজস্ব

www.nagorikpathagar.org

কাব্যধারা নির্মাণে ও নিজস্ব উজ্জ্বল পরিচিতি তুলে ধরতে সম্পূর্ণ সক্ষম ও সফল হয়েছেন। জসীম উদ্‌দীনকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে অনেকেই কাব্য-চর্চায় ব্রতী হয়েছেন। এর দ্বারাও তাঁর বিশিষ্ট কাব্য-রীতি ও সফল কাব্য-কর্মের জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়। জসীম উদ্‌দীনকে অনুসরণ করে যাঁরা কাব্য-চর্চায় সফলতা অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন– কবি বন্দে আলী মিয়া, রওশন ইজদানী, ইজাবউদ্দীন প্রমুখ।

জসীম উদ্‌দীন নানা কাজে এবং আন্তর্জাতিক লোক সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে বিভিন্ন সময় যুক্তরাষ্ট্র, স্কটল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক, বার্মা, রাশিয়া, জার্মানী প্রভৃতি দেশ সফর করেন। এতে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত মূলক বইতে এসব দেশ সফরের নানা আকর্ষণীয় বর্ণনা আছে।

জসীম উদ্‌দীন তাঁর অসামান্য সাহিত্য-কীর্তির স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৮ সনে প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড 'প্রাইড অব পারফরম্যান্স', ১৯৬৯ সনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রী, ১৯৭৬ সনে 'একুশে পদক' এবং মরণোত্তর 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন। ১৯৬৪ সনে তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ করলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলা কাব্যের এ প্রবাদ-পুরুষ ১৯৭৬ সনের ১৪ মার্চ ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। কবির অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁর নিজ জন্মস্থান ফরিদপুরের অম্বিকাপুর গ্রামে তাঁর দাদীর কবরের পাশে ডালিম গাছের শ্যামল ছায়ায় তাঁকে দাফন করা হয়। বাংলা কাব্যের বিশিষ্ট 'পল্লী কবি' হিসাবে খ্যাত জসীম উদ্‌দীন তাঁর শৈশবের ছায়া-ঢাকা, পাখি-ডাকা, স্নিগ্ধ ডালিম গাছের ছায়ার নিচে চির নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈভবপূর্ণ ঐশ্বর্যময় উজ্জ্বল দিগন্তে তাঁর অবদান চির ভাস্বর হয়ে আছে।

www.nagorikpathagar.org

বে-নজীর আহ্মদ

নজরুল সমকালে যে কয়জন কবি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, তাঁদের মধ্যে বে-নজীর আহ্মদ (জন্ম–২৯ অক্টোবর ১৯০৩, মৃত্যু- ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৩) অন্যতম। তিনি কাজী নজরুল ইসলামের মতোই ছিলেন বিদ্রোহী চেতনাসম্পন্ন। অন্যায়-অবিচার এবং পরাধীনতার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন একজন সংগ্রামী কবি। ইসলামী আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত বে-নজীর আহ্মদের জীবন ছিল নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বাঁধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নিরন্তর সংগ্রামশীল। তাঁর লেখার মধ্যেও এর পরিচয় বিধৃত।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি বে-নজীর আহ্মদ ছিলেন অসম সাহসী এক কিংবদন্তীতুল্য অসাধারণ বিপ্লবী মানুষ। গরীব-নিঃস্ব-ভাগ্যহত মানুষের একান্ত দরদী, ধনী-জমিদার-পুঁজিপতি-ইংরেজ রাজশক্তির আতংক, ইসলামের ন্যায়-নীতি, সাম্য ও মানবতাবাদের নিশান-বরদার হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন। গভীর সংবেদনশীল এ মহৎ মানুষটি হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ব্যক্ত করতে একদিকে যেমন কবিতা লিখতেন, অন্যদিকে দুঃখী মানুষের দুর্দশা মোচনে অকাতরে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে, পরাধীনতার শৃংখল মুক্তির উদ্দেশ্যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেয়ার মত চরম পন্থা অবলম্বনেও দ্বিধা করেননি।

কবি বে-নজীর আহ্মদের জন্ম নারায়ণগঞ্জের ধানুয়া গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে। পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার আড়াই হাজার থানার ইলমদী গ্রামে। পিতা সাজেদুর রহমান ওরফে তারা মিয়া, মা মাহমুদা খাতুন। তিনি ৮২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ছোটবেলার নাম বেনু মিয়া। তাঁর কাব্য-প্রতিভা, অসম সাহসিকতা, নিঃস্ব জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড আক্রোশ ইত্যাদি লক্ষ্য করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর নাম দেন বে-নজীর আহ্মদ (বে-নজীর অর্থ নজীর-বিহীন, অনন্য)। সেই থেকে তিনি এ নামেই পরিচিতি লাভ করেন। নজরুলের দেওয়া নামকেই তিনি পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং এ নামেই তাঁর কবি-খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

www.nagorikpathagar.org

শৈশবে মাতুলালয়ে আরবি কায়দায় প্রথম সবক নেবার পর তাঁর প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা শুরু হয় ধানুয়া গ্রামে এক প্রাচীন পাঠশালার জনৈক পলিতকেশ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট। তাঁর মাতামহ ও মাতুলেরাও ছিলেন সে একই পণ্ডিতের ছাত্র। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি নারায়াণগঞ্জ মহুকুমার (বর্তমানে জেলা) আড়াই হাজার হাই স্কুলে একদুয়ারিয়া এফ-ই-স্কুল (অধুনালুপ্ত), শিমুলিয়া এম-ই-স্কুল এবং পরিশেষে ধানুয়ার পার্শ্ববর্তী শিবপুর হাই স্কুলে লেখাপড়া করেন। শিমুলিয়া এম-ই-স্কুল থেকে তিনি মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং শিবপুর হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল জীবনে পড়াশোনা, খেলাধূলা বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাহিত্য সভা ইত্যাদি সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সকলের পুরোভাগে। ঐ সময় বে-নজীরের মাতুলালয়কে কেন্দ্র করে 'ধানুয়া মোসলেম ছাত্র-সমিতি' নামে সাহিত্য-চর্চার একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। সেই সাথে সেখানে একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয়। পাঠাগারটি ছিল খুবই সমৃদ্ধ। এছাড়া মাসিক মোহাম্মদী, মাসিক আল ইসলাম, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকা, সাপ্তাহিক সোলতান, মোসলেম ভারত প্রভৃতি পত্রিকাও পাঠাগারে নিয়মিত রাখা হতো। বে-নজীর ছিলেন এ পাঠাগারের একজন নিয়মিত ও মনোযোগী পাঠক। তাঁর সাহিত্য-চর্চার শুরুতে এ পাঠাগারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এ সময় 'ধানুয়া মোসলেম ছাত্র-সমিতি' ও উক্ত পাঠাগারের উদ্যোগে প্রতিবছর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হতো। একবার উক্ত বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় মুসলিম বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ সুসাহিত্যিক, কবি ও অনলবর্ষী বক্তা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে। তিনি ঐ সময় প্রায় এক সপ্তাহকাল বে-নজীরের মাতুলালয়ে অবস্থান করেন। বেনজীর এ মহান ব্যক্তির নিকট-সান্নিধ্যে এসে ইসলামী ভাবধারা ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় দীক্ষিত হন। স্কুলে পড়া অবস্থায়ই তিনি কাব্যচর্চা শুরু করেন। নবম শ্রেণীতে পড়াকালে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক সোলতান' পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর আরও অনেক কবিতা উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

শিবপুর হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে বে-নজীর আহমদ ঢাকা জগন্নাথ কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। কলেজে পড়া অবস্থায় বিপ্লবী কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে তাঁর নামে হুলিয়া জারি হয়। ফলে তিনি দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। ফলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত হন। এ সময় খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ার উপমহাদেশের পরিস্থিতিকে টালমাটাল করে তোলে। বে-নজীর সে

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন। তাঁর সহপাঠী ও বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তিনি সদল-বলে এতে অংশগ্রহণ করেন। খেলাফত আন্দোলনের মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ করার জন্য তিনি এ সময় কলকাতায় গমন করেন।

কলকাতায় আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পর তিনি দু'বার কারাবরণ করেন। প্রথম বার তাঁকে পাঠানো হয় কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে। সেসময় কারাগারে তাঁর পরিচয় ঘটে উপমহাদেশের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিদের সাথে। দ্বিতীয়বার তিনি বন্দী হয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত খিদিরপুর ডক্ জেলে প্রেরিত হন। দুই দুই বার কারাদণ্ড ভোগ করলেও তিনি মোট মাত্র দু'তিন মাস কারাগারে বসবাস করেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে কারামুক্ত হন। কিন্তু এ স্বল্পকালীন কারাবাস তাঁর জীবনে বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

কারাগারে গিয়ে তিনি দেখলেন, বাংলার রাজনৈতিক ও সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর প্রচারকেন্দ্র ও সদস্য সংগ্রহের উপযুক্ত স্থান ঐ কারাগারগুলি। সেখানেই তিনি সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর ভাবপ্রবণ কবি-চিত্তে বিপ্লবের এক আলোময় ঝিলিমিলি স্বপ্নের দুরন্ত হাতছানি খেলে গেল। তিনি জান বাজি রেখে সন্ত্রাসবাদী কাজে নিজেকে সপে দিলেন। বহুবার গ্রেফতার হয়ে নানারূপ জেল-জুলুম-নির্যাতন ভোগ করেও তিনি এ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ থেকে বিরত হননি। তাঁর রচিত কাব্যের মধ্যে এ বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ তাই একান্ত অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

বে-নজীর আহমদ ছিলেন মানব-দরদী মহৎ হৃদয়ের অধিকারী সংবেদনশীল মানুষ। বঞ্চিত, দরিদ্র, দুখী মানুষের দুর্দশা তিনি বরদাশ্ত করতে পারতেন না। নিজের সবকিছু অকাতরে বিলিয়ে দিয়ে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। এছাড়া, শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে দল গঠন করে তিনি জমিদার, সুদখোর, দাদন-ব্যবসায়ী মহাজনদের নিকট চিঠি-পত্র দিয়ে টাকা-পয়সা সংগ্রহ করে তা নিঃস্বদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। সাধারণভাবে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অন্তর্ভুক্ত। সে কারণে এটা অবশ্যই নিন্দার্হ। কিন্তু তিনি এভাবে সংগৃহীত অর্থ-বিত্ত কখনো নিজের জন্য নয়, বঞ্চিত-নিঃস্ব মানুষের জন্য এবং আর্তমানবতার সেবায় ব্যয় করতেন। তাছাড়া, ঐসব জমিদার-মহাজন ছিল শোষক, সাধারণ মানুষকে শোষণ করেই তারা বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছে আর এ নিষ্ঠুর শোষণের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে সাধারণ মানুষ নিঃস্ব থেকে হয়েছে নিঃস্বতর, অত্যাচার-নির্যাতনে সাধারণ মানুষের জীবন হয়েছে দুর্বিসহ।

www.nagorikpathagar.org

তাই এ দুঃসহ সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধেই পরিচালিত ছিল তাঁর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড। অন্যদিকে এভাবে দুঃস্থ-বঞ্চিত, দরিদ্র-নিগৃহীত মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি এ পথ বেছে নিয়েছিলেন।

ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী শোষক শ্রেণীও ছিল জমিদার-মহাজনদের সপক্ষে। পরাধীন যুগের সামাজিক ব্যবস্থা ও শোষক শ্রেণীর প্রণীত আইন ও বিধি-বিধানও ছিল এ অমানবিক শোষণ-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার পক্ষে। এ অমানবিক শাসন ও শোষণ-নিপীড়নের মূলে চরমাঘাত হানার উদ্দেশ্যেই বে-নজীর আহমদের সংবেদনশীল হৃদয় এ সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে চরম পন্থা অবলম্বনে বাধ্য হয়। এভাবে শোষক জমিদার-জোতদার-মহাজনদের নিকট থেকে সংগৃহীত টাকা-পয়সা দিয়ে তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য সংস্থা পরিচালনা করেন এবং গরীব-দুঃখী মানুষ, দরিদ্র ছাত্রদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেন। জানা যায়, কলকাতার বালিগঞ্জ ও খিদিরপুর এলাকাতেই প্রায় ৫০/৬০ জন গরীব ছাত্রের লেখাপড়ার খরচ তিনি বহন করতেন এভাবে সংগৃহীত টাকা থেকে। এ শ্রেণীর গরীব অসহায় মানুষের নিকট তিনি 'দাতা হাতেম তায়ী' বা 'রবিনহুডের' মত কিংবদন্তীতুল্য এক মহৎ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাই এটাকে সন্ত্রাসবাদ না বলে বিদ্যমান বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রবল বিদ্রোহ বলাই যুক্তিসংগত। গভীর মানবিক বোধসম্পন্ন কবি বে-নজীর আহমদের বর্ণাঢ্য জীবনের এ এক অসাধারণ দিক।

বে-নজীর আহমদ ছিলেন উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী-সংগঠক। প্রথম জীবনে তিনি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও পরবর্তীকালে চরম হিন্দুবাদী সূর্যসেনের মুসলিম-বিদ্বেষ ও কালীর চরণে রক্ত শপথ গ্রহণের শিরকি রীতি-পদ্ধতি দেখে তিনি অচিরেই সূর্যসেনের সন্ত্রাসবাদী দল ত্যাগ করে 'আজাদ পার্টি' নামে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন। এ দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দেশকে স্বাধীন করা ও দেশের মানুষকে স্বদেশী-বিদেশী শাসক-শোষকদের কবল থেকে মুক্ত করা। শেষোক্ত কর্মসূচি হিসাবে তাঁর দল ঢাকা ও নোয়াখালীর বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যাচারী জমিদার, সুদখোর-মুনাফাখোর-দাদনব্যবসায়ী মহাজনদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করে সংগৃহীত অর্থ বিপন্ন মানুষের খেদমতে ব্যয় করেন।

এ ধরনের কার্যক্রমের এক পর্যায়ে ১৯২৭ সনে বে-নজীর আহমদ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ঐ সময় তাঁকে ঢাকা থেকে নোয়াখালীর জেলে স্থানান্তরিত করার সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুরগামী চলন্ত মেইল স্টিমারের দোতলা থেকে সশস্ত্র গুর্খা প্রহরীদের বেষ্টনী ভেদ করে ভাদ্রের ভরা বর্ষায় পদ্মা-মেঘনার সঙ্গম স্থলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু পুনরায় ধরা পড়ে তাঁকে দীর্ঘদিন

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত নির্জন কারাকক্ষে সর্বক্ষণ লৌহ-শৃংখল পরা অবস্থায় দিনাতিপাত করতে হয়। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা ও ডাকাতির মামলা চলে তিন বছর ধরে। অবশেষে তিনি সমস্ত অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পান। ঐ জেলে বসেই তিনি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বন্দীর বাঁশী' রচনা করেন। অবশ্য গ্রন্থটি প্রকাশের পর পরই সরকার তা বাজেয়াপ্ত করে।

বে-নজীর আহমদ তাঁর বিপ্লবী কর্মকাণ্ড জোরদার করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য একবার ইউরোপ যাত্রা করেন। কিন্তু গুরুতর অসুস্থ হওয়ায় আলেকজান্দ্রিয়ায় ব্রিটিশ দূতাবাসে আশ্রয় নেন। তারা তাঁকে দেশে ফেরত পাঠায়। টাকা ছাপানোর মুদ্রণ-কৌশল শেখার জন্য বে-নজীর আহমদ তাঁর বন্ধু সাংবাদিক ফজলুল হক সেলবর্ষীকে জার্মান পাঠান। কিন্তু তিনি সেখানে কিছু শেখার সুযোগ না পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। এভাবে সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে তিনি তাঁর দলের কার্যক্রম বন্ধ করে দেন এবং 'দৈনিক আজাদে' সম্পাদকীয় বিভাগে চাকুরী নেন। ১৯২৬-২৭ সনে তিনি তাঁর দলের মুখপত্র হিসাবে 'নওরোজ' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন আফজালুল হক। আফজালুল হক ইতঃপূর্বে 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'মোসলেম ভারতে'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি 'নওরোজ' পত্রিকায় যোগদান করেন। এ পত্রিকার প্রধান লেখক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর প্রখ্যাত– 'নওরোজ' 'জগলুল পাশা' প্রভৃতি কবিতা, 'ঝিলিমিলি' ও 'সারাব্রীজ' বা 'সেতুবন্ধ' নামক নাটিকা ও 'কুহেলিকা' উপন্যাস এ 'নওরোজে'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।

বে-নজীর আহমদ কলকাতায় জাহানআরা চৌধুরী নাম্নী এক মহিলার সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বর্ষবাণী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশে সাহায্য করেন। ১৯৩২ সনে 'বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। বে-নজীর আহমদ ও কবি আব্দুল কাদিরের (১৯০৬-৮৪) উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা ছিলেন বলে জানা যায়। নজরুল ইসলামও এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এভাবে দৈনিক আজাদে কর্মরত অবস্থায় তিনি বিভিন্ন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগঠন ও উপমহাদেশের মুসলমানদের জাতীয় রাজনৈতিক দল 'মুসলিম লীগে' যোগদান করেন। মুসলিম লীগে যোগদানের পর তিনি ক্রমান্বয়ে নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলর, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিরক্ষা কমিটির (মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ড) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

www.nagorikpathagar.org

নির্বাচিত হন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদেরও সদস্য নির্বাচিত হন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বে-নজীর আহমদ আরাকান যান। সেখানে আরাকানী মুসলমানদের সংগঠিত করে মুসলিম প্রধান অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন মুসলিম আরাকান রাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হন। কক্সবাজারে আপৎকালীন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ছদ্মাবরণে তিনি এ কাজ করতে থাকেন। কিন্তু অচিরেই বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর নিকট তাঁর আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। ফলে সেখানে মাত্র দেড় বছর অবস্থানের পর তিনি তাঁর কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। তারপর তিনি কলকাতায় ফিরে এসে পুনরায় সাংবাদিকতা পেশায় যোগ দেন। তবে এবারে দৈনিক আজাদ পত্রিকার বদলে তিনি শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকায় যোগ দেন। নবযুগের প্রধান সম্পাদক ছিলেন তখন কাজী নজরুল ইসলাম এবং সম্পাদক ছিলেন আবুল মনসুর আহমদ। বে-নজীর আহমদ সেখানে বার্তা-সম্পাদকের দায়িত্ব লাভ করেন।

স্বাধীনতা আন্দোলন, রাজনীতি ও সমাজ-সেবার পাশাপাশি বে-নজীর আহমদ সাহিত্য-কর্মেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি তালিকা নিচে সন্নিবেশিত হলো ঃ

১) **বন্দীর বাঁশী** ঃ প্রকাশক- বে-নজীর আহমদ ১৩/৪ বি কলিন লেন, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান ঃ মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, ৯১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা; এম্পায়ার বুক হাউস, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র- ১৩৩৯। মোহাম্মদী প্রেসের পক্ষ হইতে মোহাম্মদ-খায়রুল আনাম খাঁ কর্তৃক ৯১, আপার সার্কুলার রোড থেকে মুদ্রিত হয়।

২) **বৈশাখ** ঃ প্রথম প্রকাশ- ১৩৫১ (১৯৪৫) পৌষ মাস (জানুয়ারী), ১০৬/এ সার্কুলার রোড কলকাতা; প্রকাশক ঃ বে-নজীর আহমদ; মুদ্রাকর খায়রুল আনাম খাঁ; মুদ্রক ঃ মোহাম্মদী প্রেস, ৮৬/এ সার্কুলার রোড, কলকাতা। ২য় প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৩৬৯ (এপ্রিল ১৯৬২); প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ মালিক মিনার, শাহজাহানপুর, ঢাকা-২; মুদ্রাকরঃ এম. চৌধুরী রিপাবলিক প্রেস, ২ কবিরাজ লেন, ঢাকা-১। দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ আজ ও কাল (নয়া সড়ক ১৩৫৫); বৈশাখ (মোহাম্মদী- ১৩৫৭); বেগ দাও, বেগ দাও আমার ডানায় (মিল্লাত- ১৩৫৩); আজকে শুধু মেঘের স্তর (দিলরুবা ১২৬১); আজকে আমার মন ভোলায় (খেলাঘর- ১৩৬৩); হে যুগান্ত যাত্রা পথ (মাহে নও- ১৩৪৭); আহ্বান (মাহে-নও- ১৩৫৭)-এ সাতটি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রথম কবিতাটি ছাড়া বাকি ছয়টি কবিতা ১৯৪৭-পরবর্তী যুগে রচিত।

www.nagorikpathagar.org

৩) **জিন্দেগী** ঃ জীবিতকালে তিনি এটির পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করেন। কিন্তু এটি প্রকাশের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এতে মোট ৬২টি কবিতা আছে। প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৪১০, শাবান ১৪২৪, অক্টোবর ২০০৩। প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ মালিক মিনার, ১২০ শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭। প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ। পরিবেশনায় ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

৪) **হেমন্তিকা** ঃ জিন্দেগীর মত এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও কবি প্রস্তুত করেন, কিন্তু প্রকাশের পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। কবিপুত্র মালিক মিনারের কাছে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে মোট ৩০টি কবিতা আছে। প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৪১০, শাবান ১৪২৪, অক্টোবর ২০০৩। প্রকাশক ঃ মুহাম্মদ মালিক মিনার, ১২০ শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭। প্রচ্ছদ ঃ মোমিন উদ্দীন খালেদ। পরিবেশনায় ঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

৫) **বাংলা সাহিত্য** ঃ বে-নজীর আহমদের রচনা সমগ্রে ছাপার অক্ষরে আছে। কবি লিখিত এর গবেষণাধর্মী ভূমিকাটিও মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয়। এটি ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য তৈরী বাংলা সাহিত্য সংকলন।

৬) **ইসলাম ও কমিউনিজম** ঃ পাক-ভারত স্বাধীনতা পূর্ব কালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৩৯০ (১৯৮৪) সনে কবির ইন্তেকালের এক বছর পরে এটি পুনরায় প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ঃ হিলফুল ফুযুল ফাউন্ডেশন। প্রকাশকাল ঃ মাঘ ১৩৯০ (ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪);মুদ্রক ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রেস লিমিটেড। প্রচ্ছদ ঃ মুহাম্মদ বশিরুল হাসান।

৭) **প্রবন্ধ** ঃ পুস্তক হিসাবে অপ্রকাশিত। এটিও বে-নজীর আহমদ রচনা সমগ্রে প্রকাশের অপেক্ষায় প্রথম প্রবন্ধ 'ইসলাম ও কমিউনিজম' হিলফুল ফুযুল ফাউন্ডেশন থেকে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে ক্ষুদ্র পুস্তিকা আকারে পুনরায় প্রকাশিত হয়। 'বিপ্লব সাধনায় কামাল' ১৩৪৫-এর পৌষের (জানুয়ারী ১৯৩৯) মাসিক মোহাম্মদী'তে; 'ইকবাল কাব্যে স্বদেশ প্রেম' ১৩৪৫-এর জৈষ্ঠের (মে ১৯৩৮) মাসিক মোহাম্মদী'তে; 'মধ্য এশিয়ায় নারী জাগরণ' ১৩৩৯ (১৯৩২)-এর 'রূপরেখা'তে; 'নজরুলকে যেমন দেখিয়াছি ও জানিয়াছি' ১৩৩৮ (১৯৭৬)-এর 'বেতার বাংলা'তে; 'নজরুল সাহিত্যের পটভূমি' ১৩৭৬ 'বর্ষা' সংখ্যায় (জুন ১৯৬৯) 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'তে; 'সাহিত্যে দুর্নীতি ও জাতীয় চরিত্রে তার প্রভাব' 'বৈশাখ'

www.nagorikpathagar.org

১৩৬৯ (এপ্রিল ১৯৬২) সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকাতে; এবং 'অক্রুর চন্দ্রের কাব্যসাধনা' বৈশাখ ১৩৬৭ (এপ্রিল ১৯৬০)-এ মাসিক 'মোহাম্মদী'তে প্রকাশিত হয়।

বে-নজীর আহমদের লেখার মধ্যে একাধারে ইসলাম, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও বিশ্ব-মানবতার বাণী সোচ্চারিত। ১৯১৮ সন থেকে প্রায় অর্ধ-শতাব্দী পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলন, সাহিত্য-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বেনজীর আহমদ ছিলেন এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। নজরুল ইসলামের তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী। কাব্য-ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠা ও আবেগের সাথে নজরুলকে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করলেও নজরুল ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যে যে স্বতন্ত্র মহিমান্বিত উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করলেন, সমকালীন অনেককেই তা প্রভাবিত করেছে। এমনকি, নজরুলের কিছুটা অগ্রজ কবি শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কবিও নজরুলের দ্বারা প্রভাবিত হন। বে-নজীর আহমদ সজ্ঞানে এবং নিষ্ঠার সাথে নজরুলকে অনুসরণের প্রয়াস পান। নজরুল যেমন বিদ্রোহী ছিলেন, পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, লাঞ্ছিত-অধঃপতিত মানুষের দুঃখ-দুর্গতি মোচনের জন্য সর্বদা মসী চালনা করেছেন, বে-নজীর আহমদও তেমনি নজরুলের ভাব-শিষ্য হিসাবে তাঁর সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য ঃ

"কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরা কয়েকজন মুসলমান কবিকেও পাই বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে। এঁরা হচ্ছেন– গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, আব্দুল কাদের, বে-নজীর আহমদ। এঁদের মধ্যে বে-নজীর আহমদই একমাত্র কবি, যিনি নজরুল ইসলামের ছন্দ ও দ্যোতনাকে পুরাপুরি অনুকরণ করে কবিতা লিখেছেন। বে-নজীর আহমদের জীবনের সঙ্গে নজরুল ইসলামের জীবনের অনেকটা মিল আছে। বরঞ্চ বে-নজীর আহমদ জীবনে যতটা দুঃসাহসী, ভয়ংকর ও অস্বাভাবিকত্বের মুখোমুখি যেভাবে হয়েছেন, সেভাবে নজরুল ইসলাম হতে পারেননি। অবশ্য কবি-প্রতিভার দিক থেকে বে-নজীর আহমদ নজরুল ইসলামের অনুসারী হিসাবে পরিচিত থাকবেন। তাঁকে অতিক্রম করা বে-নজীরের সম্ভব হয়নি।"

কবি বে-নজীর আহমদ ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সংগঠক, মানবতাবাদী, কবি ও প্রাবন্ধিক। এ প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রাজনীতিবিদ হিসাবে তিনি জনগণের কল্যাণ-চিন্তায় সর্বদা কাজ করেছেন, তেমনি স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সংগঠক হিসাবে তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ

www.nagorikpathagar.org

ও মুসলিম নবজাগরণের সপক্ষে ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে প্রাণপণ সচেষ্ট থেকেছেন। তিনি সর্বদাই দেশ, জাতি ও জনগণের খেদমতে ছিলেন উদার-চিত্ত। অত্যাচারী শোষক-শাসক ইংরেজ রাজ-শক্তি ও দেশীয় জমিদার-জোতদার-মহাজন-পুঁজিপতি জালেমদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও সশস্ত্র-সংগ্রাম করেছেন– কখনও মসী চালনা করেছেন। তাঁর মূল প্রেরণা ছিল মানবতার কল্যাণ ও অধঃপতিত মুসলিম জাতির উত্থান। তাঁর সাহিত্যের মূল প্রেরণাও তাই। এ সম্পর্কে সাহিত্য-গবেষক শাহাবুদ্দীন আহমদের মন্তব্য ঃ

"প্রত্যেক লেখকের পরিণত চিন্তাকেই লেখকের প্রকৃত চিন্তা হিসাবেই ধরা উচিত। জীবনের পথ-পরিক্রমার নানা অভিজ্ঞতা সচেতন লেখককে একটি পূর্ণ বিশুদ্ধ চিন্তাদর্শের উপর এনে দাঁড় করায়। বে-নজীরের লেখনীতে আমরা সেই পূর্ণ-পরিণত মানসের কবিকে দেখি। প্রৌঢ় জীবনে বে-নজীরের চেতনায় যা উজ্জ্বল রূপে প্রস্ফুটিত হয়েছে তা ইসলাম। 'লাল পল্টনের রণ সঙ্গীত', 'জিহাদ জিন্দাবাদ', 'মৃত্যুর বুকে রেখে গেল এরা জীবনের নয়া-তখত', 'মোনাজাত', 'পরিক্রমা' প্রভৃতি কবিতায় আমরা সেই বে-নজীরকে দেখি যিনি শক্তি, গতি ও সংগ্রামকে মানব-সমাজের মুক্তির উৎস বলে মনে করেছেন। সাম্য ও স্বাধীনতাকে, শান্তি ও মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার একমাত্র হাতিয়ার ইসলাম। এই মতাদর্শই বে-নজীরের জীবন-দর্শন হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলামের বিজয়কে যে মনীষীরা মানব-বিজয় বলে চিহ্নিত করেছিলেন বে-নজীর সেই বিপ্লবী ইসলামী আন্দোলনে উৎসর্গিত তরুণ বাংলাদেশী কবিদের প্রতিযোগী অশ্বারোহীদের মত উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন।" **(শাহাবুদ্দীন আহমদ ঃ সম্পাদকের কথা, হেমন্তিকা)**।

শাহাবুদ্দীন আহমদ আরো বলেন ঃ "তিনি ধরে নিয়েছিলেন ইসলাম অর্থ যদি শান্তিবাদ, সাম্যবাদ ও মানবতাবাদ হয় তাহলে নবীন পাশ্চাত্য-সৃষ্ট গণতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদকে সমশ্রেণীতে কেন অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই বলিষ্ঠ ভাবনায় উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অটুট পর্বতের মত ইসলামী আদর্শ ও দর্শনকে মুসলিমদের মুক্তির পথ বলে মনে করেছেন এবং তা কবিতায় প্রকাশ করেছেন।" **(শাহাবুদ্দীন আহমদ, সম্পাদকের কথা, জিন্দেগী)**।

কবি-পুত্র মুহাম্মদ মালিক মিনারের ভাষায় ঃ "প্রচার বিমুখ কবি বে-নজীর আহমদ ছিলেন ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ এক তৌহিদবাদী মানুষ। তিনি আজীবন শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। লেখনীর মাধ্যমে তিনি এ দেশের সংগ্রামী মুসলিম জনতাকে ইসলামী সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট ছিলেন।" **(প্রকাশকের কথা, জিন্দেগী)**।

www.nagorikpathagar.org

কবি বে-নজীর আহমদের কবিতা থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

১. "জিন্দা-জোয়ান জঙ্গ-জেহাদী আয় রে আলোর জিন্দেগী,
কৃষ্ণ-কালো রাত্রি-শেষে রাঙা ঊষার সূর্য-তেজ
চক্রবালের শুভ্র ভালে নাচাক্ বহ্নি-লাল শিখী
জ্যোতির পেখম দিক্ ছড়ায়ে– আনুক নয়া রঙ আমেজ।
পথ-ভোলা সব রাতের জীব
দিক্ তাদে রে পথের দিশা– রোশনী-জ্বালা প্রাণ-প্রদীপ।"

(জিন্দেগী ঃ জিন্দেগী)

২. "আলোর জিন্দেগী লাগি ভাঙো দ্বার জিন্দানখানার
হে জিন্দা জোয়ান–
তোমার মঞ্জিল রোধি জাগিয়াছে যে-বাধা বিস্কার
করো তারে চূর্ণ-খান্‌খান্।
তোমারি বাজুর তেজে মুছে গেছে কেস্‌রা-কায়সার
ইরান-তুরান–
নূতন জামানা জাতির রচিয়াছ তুমি বারবার,
মূর্ত আলীশান।"

(আন্দেশা ঃ ঐ)

৩. "ঊষা কি জেগেছে ? জেগেছে জোহ্‌রা সেতারার আঁখি আলো ?
ওরে ঘুমন্ত! তোমারো দেউলে প্রাণ-জ্যোতি জ্বালো জ্বালো!
পূবের তোরণে লালিমা রেখায় আগে কার রূপ-শিখা–
ঊষসী কি পুনঃ জ্যোতি-গড়া তার মেলিয়াছে অনামিকা ?"

(নূতন দিনে ঃ ঐ)

৪. "ব্যথা-রাতি শেষে ফজরের আলো জাগিছে কি চারিভিতে ?
যুগের আজান রণে যেন শুনি বেদনার মসজিদে ?
সুবে সাদেকের সফেদ নূরের ঝিলিমিলি দ্বার খুলি,
গোলাবী গুলের শিরীন অধরে দেয় নাই বুলবুলি
তখনো প্রথম শরম-পরশ– তারি মধু লাজ সুখে
পুবালী আকাশ জালিমের লালী মাখে নাই সারা মুখে।
নিশার নেকাবে রহিয়াছে ঢাকা ঊষসীর চারু আঁখি,
জাগর সহেলা তখনো গাহেনি ডালে-ডালে কল পাখি।"

(যুগের আজান ঃ ঐ)

৫. "নিরাশা-তিমির-রাতি হয়ে এলো সারা

www.nagorikpathagar.org

মোয়াজ্জিন জাগো জাগো–
আকাশে দিয়াছে দেখা জোহরা-সেতারা
মোয়াজ্জিন জাগো জাগো।"
(মোয়াজ্জিন জাগো জাগো ঃ ঐ)

৬. "আমরা ভুলিয়া গেছি সোনালী দিনেরে,
ভুলে গেছি নিজেদের নাম।
হে দিশারী! আমাদের কারাগার ঘিরে
আনো আজ মুক্তির পয়গাম।"
(পয়গাম ঃ ঐ)

৭. "রাত্রি ভোর– শুনেছি আহ্বান
শুনিতেছি দিবসের ডাক–
পাখার ঝাপটে কাঁপে সীমান্ত নিশার তরু-শাখা।
জমাট মুহূর্তগুলি ঘুমন্ত তিমির তলে যথা হলো ক্ষয়,
ঊষার আলোর ফলা উদয় তোরণ ভেদি সেথা জ্যোতির্ময়"
(ঊষায় ঃ হেমন্তিকা)

৮. "আষাঢ়-কালো মেঘের মাদল ঐ দিলো রে ডাক–
আমার-মনের মরাল রে ভাই মেলেছে পাখ্।
দখিন সাগর আজকে উচাটন–
কোন্ বিরহির আঁখির মায়া কাড়লো রে তার মন :"
(মানুষ মরাল ঃ ঐ)

৯. "মরুভূর বুকে নয়া ওয়েসিস জাগিল আজ
দিছে হাত ছানি তারি মঞ্জিল পথের বাঁক;
রাত হলো শেষ– মিনারে মিনারে শোনো আওয়াজ
শোনো রাহাগীর ঘুম-জাগা উট পাখীর ডাক।"
(চির পথ ঃ ঐ)

১০." দীঘল পথের এখনো যে বাকী, কাফেলা চলো–
শেষ মঞ্জেল এখনো দিঠিতে দেয়নি ধরা,
পেছনে যে আছে ভুলে যাও আজ কি তার হলো,
আগামী দিনের গহনে বাড়াও চরণ ত্বরা।"
(হে কাফেলা চলো ঃ ঐ)

১১. "ঊষা কি জেগেছে ? জেগেছে জোহরা সেতারার আঁখি-আলো ?
ওরে ঘুমন্ত! তোমারো দেউলে প্রাণ-জ্যোতি জ্বালো জ্বালো।

www.nagorikpathagar.org

পূবের তোরণে লালিমা রেখায় জাগে কার রূপ-শিখা–
উষসী কি পুনঃ জ্যোতি-গড়া তার মেলিয়াছে অনামিকা ?
আকাশ-সায়রে জেগেছে জোয়ার আলো-ঢেউ এ দুলি দুলি–
নিশি গেছে চলি শিশিরে কাঁদিয়া ফুল-বুকে ফুলি' ফুলি' ।"

(নূতন দিনে ঃ ঐ)

১২. "নূতন দিনের পথে– হে চির কাফেলা
যাত্রা তবে হবে পুন শুরু ?
রাতের তিমির-গাঢ় বজ্র-ঘন ক্রুর মেঘ-মেলা
এখনো যে ডাকে গুরু-গুরু ।"

(কাফেলা ঃ ঐ)

১৩. "নূতন উষার আলোর ইশারা আমারে দিয়াছে ডাক–
মরা অতীতেরা চেয়ে আছে শুধু বিস্ময়ে নির্বাক ।
প্রতি নিমেষের জীবনের সাথে বিজড়িত ক্ষণগুলি
ফেলে-আসা পথে আঁকে পথ-চিন তুলি শত অঙ্গুলি ।"

(আলোর ইশারা ঃ ঐ)

এ রকম বহু উদ্ধৃতি দেয়া যায়। তবে বে-নজীর আহমদের কবিতার ভাব, ভাষা ও বিষয় উপলব্ধির জন্য উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহই যথেষ্ট মনে করি। ভাবের দিক থেকে তিনি কবি নজরুলের মতো বিপ্লবী-চেতনাসম্পন্ন। ভাষার দিক থেকেও তিনি বহুলাংশে নজরুলের অনুসারী। বিষয়ের দিক থেকেও তিনি নজরুলের মতোই মুসলিম নবজাগরণ ও ঐতিহ্য-চেতনাসম্পন্ন এক মহান কবি-ব্যক্তিত্ব। কবি ফররুখ আহমদের মতো ইসলামী আদর্শ ও ভাবচেতনাও তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ফররুখ আহমদ যদিও তাঁর অনুজ কবি, তবু উভয়ের কাব্যিক অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল একই। উভয়ের যুগ-পরিবেশও ছিল অভিন্ন। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, মুসলিম নবজাগরণ ও স্বাধীনতা লাভের প্রদোষকালে উভয়ের কাব্য-চর্চা স্ফূর্তি লাভ করে। তাই উভয় কবির মধ্যে অভিন্ন ভাব-চেতনা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তবে শিল্প-চেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। ইংরাজি সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যের অনুরক্ত ফররুখ আহমদ আধুনিক কাব্য-কলা, বিশেষত উপমা-রূপক, প্রতীক রূপকল্প ব্যবহারেও অত্যধিক সচেতন ছিলেন। অন্যদিকে, বে-নজীর আহমদ ছিলেন অধিকতর বিষয়-সচেতন। সরাসরি ঋজু ভঙ্গিতে বক্তব্য

www.nagorikpathagar.org

বিষয় উপস্থাপনের দিকেই ছিল তাঁর আগ্রহ।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহে বে-নজীর আহমদের কাব্য-ভাষার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর সাথে নজরুলের সাযুজ্যই অধিক। তিনি সজ্ঞানে নজরুলের ভাষা-রীতি অনুসরণ করেছেন বলে ধারণা করা হয়। কারণ নজরুলের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রেও নজরুলের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। অবশ্য নজরুলের মতো অত বড় প্রতিভার অধিকারী তিনি ছিলেন না, তাই মৌলিকতার পরিচয় তাঁর মধ্যে সেভাবে দৃষ্টিগোচর না হলেও নজরুলের সুবিশাল প্রতিভার দীপ্ত আলোয় নিজস্ব চলার পথ তৈরি করে কবি বে-নজীর আহমদ তাঁর কাব্যের মনোরম ভুবন নির্মাণে সযত্ন প্রয়াস পেয়েছেন।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য বে-নজীর আহমদ ১৯৬৩-৬৪ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার (কবিতা) এবং ১৯৬৯ সনে 'একুশে পদক' লাভ করেন। এছাড়া, তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (মরণোত্তর) লাভ করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর জীবন-সদস্য এবং পাকিস্তান লেখক সংঘের (Pakistan Writer's Guild) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

সমকালীন জীবনবোধ প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তায় বে-নজীর আহমদের সাহিত্য-কর্ম নিবেদিত। এ দিক দিয়ে তিনি একজন কালসচেতন দক্ষ শিল্পী। স্বাধীনতা, মুসলিম নবজাগরণ ও মানবিক সংবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি যেমন আন্তরিক তেমনি প্রোজ্জ্বল। তাই বিংশ শতাব্দীর দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বে-নজীর আহমদের সাহিত্য-কর্ম বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

www.nagorikpathagar.org

বন্দে আলী মিয়া

কবি বন্দে আলী মিয়া (জন্ম– ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০৬, মৃত্যু– ১৭ জুন, ১৯৭৯) বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কবি। কবি হিসাবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, শিশু-কিশোর রচনা, প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণমূলক রচনায়ও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। পাবনা শহরের অন্তবর্তী রাধা নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঃ মুন্সী উমেদ আলী, মাতা ঃ নেকজান নেছা।

১৯২৩ সনে তিনি পাবনার মজুমদার একাডেমী থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি কলকাতায় গিয়ে বৌ-বাজারস্থ ইন্ডিয়ান আর্ট একাডেমীতে ভর্তি হন। সেখানে কিছু কাল পড়াশোনা করার পর তিনি করটিয়া সাদৎ কলেজ ও তারপর কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি তাঁর বেশি আকর্ষণ না থাকায় তাঁর পক্ষে কোন ডিগ্রী লাভ করা সম্ভব হয়নি। অতঃপর ১৯২৬ সনে তিনি পিতা-মাতার ইচ্ছায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। পরপর তিনি চারটি বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে রাবেয়া খাতুন, হেনা, শামসুন্নাহার ও পরীবানু। প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি মোট বারজন সন্তানের জনক ছিলেন।

কবির কর্ম-জীবন নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। বিভিন্ন সময় তাঁকে বিভিন্ন ধরনের কাজ ও পেশায় নিয়োজিত থাকতে হয়েছে। কর্ম-জীবনের শুরুতে তিনি তাঁর আর্ট কলেজের পড়াশোনা কাজে লাগিয়ে কিছুদিন ছবি আঁকায় নিয়োজিত থাকেন। বিভিন্ন পত্রিকায়ও তিনি সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত ছিলেন। এসব পত্রিকার মধ্যে মাসিক সওগাত, বিকাশ, পাবনা থেকে প্রকাশিত সৎসঙ্গ পত্রিকা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালিত স্কুলেও তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। দেশ বিভাগের পর তিনি ঢাকায় এসে নিয়মিত সাহিত্য-সাধনা ও ছবি এঁকে জীবিকা নির্বাহ করেন। অতঃপর ১৯৬৫ সনে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে পাণ্ডুলিপিকার (Script Writer) হিসাবে চাকরী নেন। আমরণ তিনি এ চাকরীতে নিয়োজিত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

কবি বন্দে আলী মিয়ার রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'জীবনের দিনগুলি' থেকে জানা যায়, বাংলা ১৩২৮ সনে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর লেখা প্রথম কবিতা 'ছিন্নপত্র' ১৯২২ সনে রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমা থেকে (বর্তমানে জেলা) 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি গেজেট' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর দশ বছর পর ১৯৩২ সনে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতীর চর' কলকাতার ডি.এস. লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়। কবি বন্দে আলী মিয়া একাধারে কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস, শিশুতোষ কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক ও আত্ম-জীবনীমূলক রচনা লিখেছেন, সেকথা আগেই উল্লেখ করেছি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

কাব্য ঃ ময়নামতির চর (প্রথম প্রকাশ ১৯৩২), অনুরাগ (১৯৩২) স্বপ্নসাধ (১৯৩৬), লীলাকমল (১৯৩৭), মধুমতীর চর (১৯৪৬), পদ্মানদীর চর (১৯৫৩), দক্ষিণ দিগন্ত (১৯৬৮), কথিকা ও কাহিনী (১৯৭১), ধরিত্রী (১৯৭৫)।

গীত ও গান ঃ কলগীতি, সুরলীলা (১৯৪২)।

উপন্যাস ঃ বসন্ত জাগ্রত দ্বারে (প্রথম প্রকাশ ১৯৩১), নারী রহস্যময়ী, ঘূর্ণি হাওয়া (পরে শেষলগ্ন), দিবাস্বপ্ন (১৯৫৪), মনের ময়ূর (১৯৫৬), অরণ্য গোধূলি (১৯৬১), ঝড়ের সংকেত (১৯৬১), প্রেমের বহ্নিশিখা, বয়সের দাবী, জাগ্রত যৌবন।

গল্পগ্রন্থ ঃ তাসের ঘর (১৯৫৪), নারী কলঙ্কময়ী, কায়কল্প।

নাটক-নাটিকা ঃ মসনদ (প্রথম সং ১৯৩১), জোয়ারভাঁটা (১৯৫৬), যুগমানব, উদয় প্রভাত, টোটো কোম্পানীর ম্যানেজার (১৯৫৬)। জয়পরাজয়, সোহরাব রুস্তম, ওমর খৈয়ম, আলাদীন, বনের ফুল, নমরুদ, গোলেবকাউলি।

প্রহসন (একাঙ্কিকা) ঃ বৌদিদি রেস্টুরেন্ট, বাঞ্ছারাম ঢ্যাং, গাধা হাকিম, সতী, লক্ষহীরা, নসিবের ফের।

স্মৃতিকথা ঃ জীবনের দিনগুলি– ১ম পর্ব (১৯৬৬)।

প্রবন্ধ ঃ জীবনশিল্পী নজরুল (চরিত কথা ও সাহিত্য পরিচয়)।

শিশু-কিশোর সাহিত্য ঃ অন্তর্গত রূপকথা ও লোককাহিনী, জীবনসমস্যামূলক কাহিনী ও বিদেশী গল্পের ছায়াভিত্তিক, দুঃসাহসী ও রোমাঞ্চকর কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনামিশ্রিত কাহিনী, শিশু মনোতোষিণী গল্প ও জীবনী এবং ধর্মবিষয়ক কাহিনী।

www.nagorikpathagar.org

বন্দে আলী মিয়া মূলত 'পল্লীকবি' নামে খ্যাত জসীম উদ্‌দীনের (১৯০৩-৭৬) মতোই পল্লীর প্রকৃতি, জীবন ও মানুষের চিত্র বিশ্বস্তভাবে অঙ্কন করেছেন তাঁর কাব্যে। তিনি ছিলেন প্রকৃত জীবনশিল্পী। তাঁর জন্মস্থান পাবনা শহরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে। ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে যে পদ্মা নদী প্রবাহিত হয়েছে সেই পদ্মা নদী, পদ্মা তীরবর্তী বাড়ি-ঘর, দিগন্ত-বিস্তৃত ফসলের মাঠ, পদ্মার চরে বসবাসকারী নিরন্তর সংগ্রামশীল মানুষের অনাড়ম্বর জীবনের প্রাণবন্ত ছবি এঁকেছেন তিনি তাঁর কাব্যে। তাঁর ভাষা যেমন সহজ-সরল তেমনি তা আমাদের গ্রামীণ সমাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ও বোধগম্য। তিনি প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য বর্ণনায়ও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিত্বময় বর্ণনায় পল্লীর প্রকৃতি ও জীবন অপরূপ সৌন্দর্য শোভায় মাধুর্য্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর রচিত কবিতা সাধারণ মানুষের নিকট অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর কবিতায় প্রতীক-উপমা-রূপকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রকাশ লক্ষণীয়। পল্লী-জীবনের চিত্র অঙ্কনে জসীম উদ্‌দীনের সাথে তাঁর কিছুটা মিল থাকলেও কবি হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যও সুস্পষ্ট।

কবি বন্দে আলী মিয়ার রচিত নয়টি কাব্যের মধ্যে 'ময়নামতীর চর' প্রথম প্রকাশিত ও সর্বাধিক জনপ্রিয়। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কর্ম হিসাবে সমাদৃত। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩২ সনে। প্রকাশক- ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। প্রথম সংস্করণে মোট ২০টি কবিতা ছিল। পরবর্তীতে কবিতার সংখ্যা বেড়ে ৩৬-এ গিয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কবিতাগুলো মাসিক 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পূর্বে বন্দে আলী মিয়া বইয়ের ছাপানো ফর্মাগুলো কবি রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে ছিলেন এবং এ সম্পর্কে কবির মন্তব্য গ্রন্থটিতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রকাশিত হয়। এ সম্পর্কে বন্দে আলী মিয়া তাঁর আত্ম-জৈবনিক গ্রন্থ 'জীবনের দিনগুলি'তে লিখেছেন ঃ

"সংবাদপত্র পাঠে জানতে পারা গেল, রবীন্দ্রনাথ পারস্য থেকে ফিরেছেন। আমার 'ময়নামতীর চর' নামক কবিতার বইখানি সেই সময়ে ছাপা হচ্ছিল। বইটা সম্পর্কে একটা অভিমত কবির নিকট থেকে গ্রহণ করবার দুরাশা মনে ছিল। সুতরাং শ্রাবণের এক দ্বিপ্রহরে জনৈক শিল্পীবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।...অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটার দিকে সুধাকান্ত বাবু খবর পাঠালেন- আমাদের আগমন সংবাদ শুনে কবি আমাদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জামাকাপড় বদলিয়ে সেই চাকরটার সঙ্গে কবির বাসগৃহ উত্তরায়ণে এসে হাজির হলাম। কবি ইজিচেয়ারে শুয়ে কি একখানা বই পড়ছিলেন। আমরা যেতেই উঠে

www.nagorikpathagar.org

বসলেন। আমরা অভিবাদন জানিয়ে সমুখে বসলাম। কাগজের মোড়ক খুলে 'ময়নামতীর চরে'র ছাপানো ফর্মাগুলি তাঁর হাতে দিলাম। কবিতাগুলো রবীন্দ্রনাথ একের পর এক মনোযোগ দিয়ে পড়লেন।"

বন্দে আলী মিয়ার বর্ণনা মতে 'ময়নামতীর চর' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত সেদিন দুপুরের আহারাদির পরেই পাওয়া গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ স্বহস্তে গ্রন্থটি সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ "তোমার ময়নামতীর চর কাব্যখানিতে পদ্মাচরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি দেখা গেল। তোমার রচনা সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই। সমস্ত মনের অনুরাগ দিয়ে তুমি দেখেছ এবং কলমের অনায়াস ভঙ্গিতে লিখেছ। তোমার সুপরিচিত প্রাদেশিক শব্দগুলি যথাস্থানে ব্যবহার করতে তুমি কুণ্ঠিত হওনি তাতে করে কবিতাগুলি আরো সরস হয়ে উঠেছে। পদ্মাতীরের পাড়াগাঁয়ের এমন নিকটস্পর্শ বাংলাভাষায় আর কোনো কবিতায় পেয়েছি বলে আমার মনে পড়ছে না। বাংলা সাহিত্যে তুমি আপন বিশেষ স্থানটি অধিকার করতে পেরেছ বলে আমি মনে করি। ২৬ জুলাই, ১৯৩২।"

'ময়নামতির চর' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য অতিশয় মূল্যবান এবং এ সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের মাধ্যমে কাব্যটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। 'পদ্মাচরের দৃশ্য এবং তার জীবনযাত্রা'র যথার্থ পরিচয় এতে বিধৃত। গ্রন্থটির ভাষা 'সহজ এবং স্পষ্ট, কোথাও ফাঁকি নেই'– রবীন্দ্রনাথের এ উক্তিটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বন্দে আলী মিয়ার সব রচনার ভাষাই এমনি সহজ এবং স্পষ্ট, আন্তরিকতার স্পর্শে তা স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল। 'প্রাদেশিক শব্দ' বলতে রবীন্দ্রনাথ যা বুঝিয়েছেন, মূলত তা স্থানীয় বা আঞ্চলিক শব্দ। পদ্মাচরের মানুষের জীবন-চিত্র অন্তরঙ্গভাবে চিত্রিত করার উদ্দেশ্যে এসব আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এতে পদ্মাচরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও মানুষের জীবন-চিত্র যেমন বাস্তব হয়ে ফুটে উঠেছে, তেমনি বাংলা ভাষার শব্দ-ভাণ্ডারও সুসমৃদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এসব শব্দ ব্যবহারের তারিফ করেছেন। মূলত বন্দে আলী মিয়ার সমগ্র রচনার এটা এক চমৎকার বৈশিষ্ট্য। তিনি সাধারণ মানুষ বিশেষত গ্রামীণ জনপদের মানুষের ব্যবহৃত সহজ, সরল শব্দমালাকে তাঁর কাব্যে অপরূপভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

'ময়নামতীর চর' কাব্যের পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন, ৭৩/৭৪ পাটুয়াটুলি, ঢাকা- ১১০০। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আব্দুল কাদির 'একান্ত সংলাপে' লিখেছেন ঃ "ময়নামতীর চর' কাব্যখানিতে পল্লী মানুষের জীবন নির্বাহ পদ্ধতি, অতিপ্রাকৃত শক্তিতে

www.nagorikpathagar.org

অন্ধবিশ্বাস, লৌকিক পূর্ব সংস্কার, আচার-আচরণ সাধস্বপ্ন ও ধ্যানধারণার বাস্তব ছবি গভীর অন্তরঙ্গতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।....কাব্যখানির অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত কবিতাগুলোর বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেগুলোতে যুক্তাক্ষরের ব্যবহার খুবই কম। ময়নামতীর চর বন্দে আলী মিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য এবং বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সম্পদ। **(মাহেনও ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ. ৫৫)।**"

উপরোক্ত মন্তব্যে কবি আব্দুল কাদির 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থে জীবন বাস্তবতার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং এর সহজ, সরল ভাষা ব্যবহারের প্রশংসা করে এটিকে বন্দে আলী মিয়ার শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে উল্লেখ করেছেন। বন্দে আলী মিয়ার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ একথা সকলেই অবলীলায় স্বীকার করেছেন। এখানে 'ময়নামতীর চর' থেকে কিছু চরণ উদ্ধৃত করে এর কাব্য-সৌন্দর্য সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াস পাব। এ কাব্যের প্রথম কবিতার নাম 'ময়নামতীর চর'। কবি এভাবে কবিতাটি শুরু করেছেন ঃ

"বরষার জল সরিয়া গিয়াছে জাগিয়া উঠেছে চর
গাঙ-শালিকেরা গর্ত খুঁড়িয়া বাঁধিতেছে সবে ঘর।
গহিন নদীর দুই পাড় দিয়া আঁখি যায় যত দূরে
আকাশের মেঘ অতিথি যেন গো তাহার আঙিনা জুড়ে!
মাছরাঙা পাখী একমনে চেয়ে কঞ্চিতে আছে বসি
ঝাড়িতেছে ডানা বন্য হংস– পালক যেতেছে খসি
তট হতে দূরে হাঁটু জলে নামি এক পায়ে করি ভর
মৎস্যের ধ্যানে বক দু'টি চারি সাজিয়াছে ঋষিবর।
পাখনা মেলিয়া কচি রোদে শুয়ে উদাসী তিতির পাখী
বারে বারে দু'টি ডানা ঝাপটিয়া ধূলাবালি লয় মাখি।"

এভাবে কবি পদ্মাচরের যে বাস্তবদৃশ্য অঙ্কন করেছেন তা অত্যন্ত সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর। আমরা চর বলতে সাধারণত নদী এবং তার তীরবর্তী বিশুষ্ক বালুময় প্রান্তর বুঝে থাকি। কিন্তু সে প্রান্তর যে মোটেই প্রাণহীন, নির্জীব কোন স্থান নয়, কবির বর্ণনায় তা সম্যক প্রতিভাত হয়। এখানে উদ্ধৃত চরণগুলোতে এবং পরবর্তী বিভিন্ন চরণে পদ্মাচরে গাং শালিক, মেঘ, মাছরাঙা পাখি, বন্য হাঁস, বক, তিতির পাখি, চখাচখি, কচ্ছপ, জলসাপ, টিট্টিভ, ঘুঘু, ডাহুক, পানকোড়ি, খঞ্জনা, সুঁইচোর পাখি, ফড়িং, বালি হাঁস ইত্যাদি অসংখ্য পশু-পাখির পরিচয় বিধৃত হয়েছে, যা পদ্মাচরের নিরিবিলি প্রান্তরকে অষ্টপ্রহর মুখর-চঞ্চল করে রাখে।

www.nagorikpathagar.org

এছাড়াও পদ্মানদীতে আছে অসংখ্য মাছ, শামুক, কুমির ইত্যাদি নানা জলজ প্রাণী। বিভিন্ন ধরনের নৌকা, জেলে, মাঝি ও নৌ-পারাপাররত অসংখ্য যাত্রী এদের আনাগোনায় নদী ও তার উপকূলবর্তী এলাকা থাকে সর্বদা ব্যস্ত ও চলচঞ্চল। কবির বর্ণনায় এগুলো একান্তই প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কবির বর্ণনার মধ্যে আছে সহজতা, কিন্তু সেখানে যেমন রয়েছে রূপময়তা তেমনি অপরূপ কাব্যময় অসাধারণ চিত্রকল্প, যা এ কাব্যটির সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ সহজ, সরল শব্দের ছন্দময় ব্যবহারে চিত্রকল্প নির্মাণের এ কৌশল আমরা প্রথম লক্ষ্য করেছি কবি জসীম উদ্‌দীনের কবিতায়। এক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনের মতই তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। যদিও দু'কবির মধ্যে কিছুটা পার্থক্যও রয়েছে জীবনের গভীরতর সংবেদনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত এখানে জসীম উদ্‌দীন থেকে একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

"উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর যোজন জুড়ি,
জলের উপরে ভাসিছে ধবল বালুর পুরী।"

জসীম উদ্‌দীনের বর্ণনার সাথে বন্দে আলীর বর্ণনার কত চমৎকার মিল রয়েছে। দু'জনেই পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীর জীবন নিয়ে কাব্যচর্চা করেছেন। অতএব, পল্লী-প্রকৃতি ও জীবনের বর্ণনায় এ ধরনের মিল থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া উভয়েই প্রায় সমসাময়িক যুগের কবি। একই আলো-হাওয়া ও জীবন-পরিবেশে উভয়ের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তাই এ ধরনের মিলকে অস্বীকার করা যায় না। তবে জসীম উদ্‌দীন ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। তাঁর জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতার সাথে বন্দে আলী মিয়ার সবক্ষেত্রে মিল না থাকাই স্বাভাবিক। তবু পল্লী-প্রকৃতি ও পল্লীর মানুষের জীবন-চিত্র অঙ্কনে উভয়েই ছিলেন দক্ষ ও একান্ত আন্তরিক। বন্দে আলী মিয়ার 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থ থেকে এখানে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

১. "দূরে যতো চলে আঁখির সীমানা বালি আর শুধু বালি,
জলি ধানগুলো হয়ে গেছে কাটা, উঠে গেছে চৈতালী।
পাটের জমিরা করুণ নয়নে চাহিছে নির্নিমেষ
অঙ্গে তাহার বিধবা নারীর শুভ্র কঠিন বেশ।
খড়গুলা সব কাঁদে ফোঁপাইয়া– চাষীরা গিয়েছে ফেলে,
দুপুরের রোদে অন্তরে তার দিয়েছে আগুন ঢেলে।
পদ্মার সাথে পেতেছিলো সই গাজনা খালের জল,
সেই থেকে হোথা পড়িয়াছে চর– আর নামেনি কো ঢল।"

২. "এ-পাড়ের এই বুনো ঝাউ আর ও-পারের বুড়ো বট

www.nagorikpathagar.org

মাঝখানে তার আগাছায় ভরা শুকনো গাঙের তট।
এরি উঁচু পাড়ে নিত্য বিহানে লাঙল দিয়েছে চাষী
কুমীরেরা সেথা পোহাইছে রোদ শুয়ে পাশাপাশি।
কূলে কূলে চলে খরসুলা মাছ– দাঁড়িকাণা পালে পালে
ছোঁ দিয়ে তার একটারে ধরি গাঙচিল বসে ডালে ;
ঠোঁটে চেপে ধরি আছাড়ি আছাড়ি নিস্তেজ করি তায়
মুড়ো পেটি লেজ ছিঁড়ি একে একে গিলিয়া গিলিয়া খায়।"

৩. "জোসনা-চাদর ছড়ায়ে পড়েছে ময়নামতীর চরে
বালুগুলা তার ভাঙা কাঁচ গুঁড়া ঝিকিমিকি ঝিকি করে,
আধো ঘুম আর আধেক স্বপন– নয়নে মউজ মাখা
বটগাছ যেন বুড়ো সন্ন্যাসী আঁধারের কাঁথা ঢাকা।
কৃষাণের ছোটো তেলের প্রদীপ ক্ষণে নেবে ক্ষণে জ্বলে
পথ-হারা গাই ইহারে চাহিয়া ঘর পানে আসে চলে।
সারা দিনমান খাটিয়া খুঁটিয়া সাঁঝের বেলায় আসি
এক বাড়ী সব জড়ো হইয়াছে গেরামের যত চাষী;
কেহ কথা কয়– কেহ হুঁকা টানে– কেহ খায় শুধু পান
কেহ সুর করে একলা বসিয়া ভাঁজে শুধু জারি গান।"

৪. "পদ্মা নদীর ওপার ভাঙিছে ফের–
চর বাঁধিয়াছে তিন গাঁ জুড়িয়া শেষ নাই যেন এর।
এপাশে ওপাশে সুমুখে পিছনে যে দিকে তাকানো যায়
বালুর সাগর থৈ থৈ করি কাঁপিছে পূবালী বায়।"

'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'কলমিলতা'। একটি সামান্য জলজ তৃণলতাকে নিয়ে রচিত এ কবিতাটিতে কবির কল্পনা কত অনবদ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং ছবির মতো কবি একে একে সব চিত্র অঙ্কন করে চলেছেন, নিচে উদ্ধৃতাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ

"বাতাস লাগিয়ে দোলে নিরবধি কলমিলতা
পাতায় তাহার মাটির মনের গোপন কথা–
বিহানের রোদে টলমল করে বিলের পানি
বুকে ভাসে তার রূপে ডগমগ কলমিরাণী।
থোকা থোকা লতা– পাতা গুছি গুছি কাজল কালো
নীহার চুবানো রূপে যেন বিল করেছে আলো।
ফাঁকে ফাঁকে তার টোপা পানা ভাসে ব্যাঙের ছা'–

www.nagorikpathagar.org

এই ঠেলে আর উজাইতে নারে কলার না'।
কলমির দামে পানিকৌড় চলে ডাহুকী হাঁকে
সাবধানে চলে হেথায় হোথায় কোয়াক ডাকে।
কলমির বনে পথ খুঁজে কাঁদে বকের মেয়ে
সাদা রঙ তার মেঘে মেঘে যেন গিয়েছে ছেয়ে।"

'কৃষাণী' কবিতায় কবি বলেন ঃ

"রাত হতে আজ নীল আসমান ঢেকে গেছে মেঘে মেঘে
মাঘের বিহানে পূবালী বাতাস ফুঁসিছে দারুণ বেগে।
ঘুম ভেঙে গেছে কৃষাণী মেয়ের উঠিতে চাহে না মন
কাঁথা মুড়ি দিয়ে করিতেছে ফের নিদ্রার আয়োজন।
বুড়ি দাদি তার বেটার মেয়েরে লইয়া বুকের কাছে
হাত দুই দূরে খেজুর পাতার পাটি পেতে শুয়ে আছে–
আগুনের 'আলে' বেলা থাকিতেই ঘুঁটে আর তুষ দিয়া
জ্বেলেছিলো বুড়ি পোহায়েছে তায় সারা রাত কাছে নিয়া।
পার কাছে শুয়ে খেঁকি বিড়ালীটা অকাতরে ঘুম যায়
মাঝে মাঝে জাগে ঘড় ঘড় করে হাই তোলে আর চায়।
দেয়ালের কাছে শিশু টিকটিকি ঘুমায় আলস ভরে
মেঘেলা দিনের রূপালী আলোকে উঠানে আসিয়া পড়ে।"

'বর্ষার মাঠ' কবিতায় কবি বলেন ঃ

"ভরা ডুবু ডুবু সারা মাঠ আজ ফাঁক নেই কোনো খানে
দেয়ার পানিরে মনে হয় দেখি ভরে গেছে যেন বানে।
উঁচল জমিনে চিকচিকে পানি তলাতল নীচেটায়
সবুজে সবুজে ভরিয়া গিয়াছে যতদূর চোখ যায়;"

এভাবে প্রতিটি কবিতার মধ্যেই পল্লীর সাধারণ দৃশ্যপট, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও গ্রামীণ-জীবনের সাদামাটা অকৃত্রিম জীবন-চিত্র অপরূপ কবিত্বময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে আঞ্চলিক ভাষার স্বাভাবিক-স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার কবিতার সৌন্দর্যকে অসাধারণ করে তুলেছে। কয়েকটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার উল্লেখ করলেই তা স্পষ্ট হবে। যেমন– গহীন নদী, কচি রোদ, জলি ধান, গাঙ, বিহান, নীহার, কাঁথা মুড়ি, দেয়ার পানি, উঁচল জমিন, ভুড় বেঁধে, হালট, আলপথ, তেনা-ছেড়া, পালান, ছিলিম, জালি গেদা, বেবাক, কলিজা, বান, বাঁশের মাচা, ছিপ, তাড়াক, জুতি, পালানে ইত্যাদি অসংখ্য আঞ্চলিক শব্দ কবি তাঁর কবিতায় সফলভাবে ব্যবহার করেছেন। এসব শব্দ হয়ত শিক্ষিত বা অন্য এলাকার লোকদের কাছে অচেনা

www.nagorikpathagar.org

মনে হতে পারে, কিন্তু যে এলাকার মানুষ ও প্রকৃতি নিয়ে কবি তাঁর কাব্য রচনা করেছেন, তাঁদের কাছে এসব শব্দ অতি পরিচিত এবং এসব শব্দ ছাড়া তাঁদের জীবন ও প্রকৃতিকে কখনো জীবন্তভাবে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এখানে 'ময়নামতীর চরে'র সর্বশেষ কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"হাওড়ে পড়েছে ঢল–
রাতের প্রহরে দূর গাঁ হইতে শোনা গেল কোলাহল।
মাঠের বেবাক ধান আর পাট তল বুঝি হলো হায়
তার কথা ভেবে আজিকে ফজুর কলিজা শুকায়ে যায়।
গত বৎসর এমন দিনেতে দেশে এসেছিলো বান
তল করেছিলো বাড়ি ঘর আর মাঠের আউশ ধান।
কেড়ে নিয়েছিলো মুখের অন্ন– ভেসে গিয়েছিলো ঘর
তাদের জীবন কেটেছে দুঃখে বাঁশের মাচার 'পর।
হালের বলদ মরেছে না খেয়ে– রাতে জ্বলে নাই দীপ
পানি থৈ থৈ মাঠ আর ঘাট– উঠানে ফেলেছে ছিপ।
কচি ছেলে মেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদেছে সকল দিন
এক মুঠি দানা মেলেনি কোথাও– দেয় নিকো কেহ ঋণ।
কত যে দুঃখ পেয়েছে তাহারা দীর্ঘ দিবস মাস
গরীব চাষীর নাই কিছু আর– হয়েছে সর্বনাশ।

....

নতুন পানির ঢল–
সাপের মতন নেচে নেচে চলে– হাসে শুধু খল খল।
জুতের দড়িটা হাতে ছিলো বাঁধা– ছাড়াতে পারে না তায়
মাছ তারে টেনে গহিন গাঙের অতলে লইয়া যায়।
এত তেজী মাছ– জোয়ান ফৈজু তারে দমাইতে নারে
বিপাকে পড়িয়া জান বুঝি যায়– জোরে জোরে দম ছাড়ে।
মাছে ও মানুষে চলে ঝটাপটি– পানি হয় তোলপাড়
অবশ হইয়া আসে সারা দেহ– ফৈজু পারে না আর।
ঘুমের ঘোরেতে কোলের মেয়েটি ককাইয়া কেঁদে ওঠে
হয় তো পিতারে দেখেছে স্বপনে– মুখে নাহি কথা ফোটে।
শিকারী ফৈজু ফিরিলো না আর ভাঙা কুঁড়ে ঘরে তার
ছেলে আর বউ রয়েছে আশায়– পথ চায় বার বার।
বাঁধ-ভাঙা পানি এসেছে পালানে– চাপ চাপ ফেনা ভাসে

www.nagorikpathagar.org

রাতের বাতাস ভারী হয়ে আসে বুকফাটা নিঃশ্বাসে।”

বন্দে আলী মিয়ার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অনুরাগ'। এর প্রথম সংস্করণ ভাদ্র, ১৩৩৯ সনে (ইংরাজি ১৯৩২) প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ডি.এম. লাইব্রেরি, ৬১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট কলকাতা। শিরোনাম অংশের একটি পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত স্তবকটি ছাপা আছে ঃ

“তুমি কাঁদো আমি কাঁদি কাঁদে বালুচর
দুই পারে থাকি মোরা গণিচি প্রহর–
জীবনের বালু দিয়ে নয়নের জল দিয়ে
সুখ দিয়ে দুখ দিয়ে বাঁধি যেন ঘর।”

এ কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ১৮টি কবিতা মুদ্রিত হয়েছে। তবে 'মেঘরঙা মেয়ে' নামক কবিতাটি 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত, কী কারণে তা বোঝা যায় না। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বলা হয় ঃ “অনুরাগ' (কাব্যগ্রন্থ), প্রেমের মধুর স্বপ্ন, বিরহের অশ্রুতাজ।... উপহার দিবার এমন বই আর হয় নাই। দাম পনের আনা।”

উক্ত কাব্যগ্রন্থটির আলোচনায় কবির জীবনীকার ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন ঃ “বন্দে আলী মিয়ার 'অনুরাগ' বইখানি মূলত আবেগবহুল উচ্ছ্বাসময় কবিতা সমষ্টি। প্রেমকে উপজীব্য করে আবেগের স্বার্থপরতায় কবিতাকে তিনি উচ্ছল করেছিলেন, তাঁর কবিতায় একটি স্বচ্ছতা ও একটি সুস্পষ্ট গতিভঙ্গি আছে।” **(গোলাম সাকলায়েন, বন্দে আলী মিয়া, জীবনীগ্রন্থমালা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃ. ৭২)।**

নিচে 'অনুরাগ' কাব্য থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলো ঃ

১. “তোমারে পাই জোস্না রাতে
অলস ঘুম মাঝে
আমার বাঁশী তোমার হাতে
গভীর সুরে বাজে।”
(প্রিয়া)

২. “পরাণ বন্ধু মোর
আমার নয়নে ফুটেচে আজিকে তোমার চোখের লোর–
অমা-রজনীর সকল আঁধার দিয়েছি তোমায় ঢেলে
আলোটুকু তার পরাণে আমার রেখেছি প্রদীপ জ্বেলে,
সাগর তলের মাণিক আমার লোনা জল তব লাগি
কিশোর কবির মুখ পানে চাহি দিন রাতে আছে জাগি”

www.nagorikpathagar.org

(পরাণ বন্ধু মোর)

৩. "তোমারে ফিরায়ে পেনু বয়ষার নব মেঘ সাথে
আধো ছায়া আধো আলো কাক-জোসনায়
এলে আজ মোর আঙিনাতে।
পথিকের বেশে তুমি অতিথি গো এলে দ্বারে–
নাহি মোর কোনো আয়োজন,
রিক্ত আঁচল নেড়ে ভিখারিণী সাজে আজ
কাঁদে মোর বিরহী ভবন।"

(কাক-জোসনায়)

৪. "তুমি মোরে ভালোবাসো এ কথাটি গিয়েছিনু ভুলে
তোমারেই পড়িত না মনে;
কোনোদিন যদি কোনো ক্ষণে
সহসা জাগিত মনে মুখখানি হাসিটুকু তব,
ভাবিতাম, নারীর পরাণ বুঝি চির অভিনব–"

(কুড়ানো মানিক)

৫. "রূপ-সায়রে ফুটলে তুমি
ব্যথার নীলোৎপল
তোমায় ঘিরে উছলে ওঠে
কাজল দীঘির জল"

(কলম কাঁটা)

৬. "নিদ্ প্রাসাদের গহন গোপন দ্বারে
এলে পলাতকা প্রিয়তমা মোর রাতের অন্ধকারে,
কোটি ফাগুনের পুষ্পিত তনু কাঁপিয়েছে তব লাগি
মাধবী নিশার বিবশ শয়নে তব তরে ছিনু জাগি,
বরষায় ছিনু লোনা সাগরের অশ্রু পাথার নিয়া
একেলা ঘরের আঁধার বেলায় অন্তর আগুলিয়া
ভাবিনি বন্ধু রাত শেষে আজ আমায় পড়িবে মনে
আসিবে সহসা পথ ভুলি মোরে দেখা দিতে অকারণে।"

(রাতের পথিক)

উপরোক্ত লাইনগুলো পড়লে সহজেই ধারণা করা চলে যে, কবি এখানে তাঁর যৌবনকালের স্বাভাবিক আবেগ-উচ্ছ্বাস, কল্পনা, প্রেম ও বিরহের কথা একান্ত সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি প্রায়সই

www.nagorikpathagar.org

রবীন্দ্রানুসারী। ভাব ও বিষয়ের ক্ষেত্রেও তেমন কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চোঁখে পড়ে না। বন্দে আলী মিয়া তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতীর চরে' নিসর্গের বর্ণনায় ও সাধারণ জীবন-বৈচিত্র্যের যে অপরূপ প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এখানে তা অনুপস্থিত। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে, রূপক-উপমা-প্রতীক ও চিত্রকল্প নির্মাণেও এখানে তেমন কোন মুনশীয়ানার পরিচয় নেই। তাই এটাকে তাঁর একটি সাদামাটা ধরনের কাব্য বললে অত্যুক্তি হয় না। তবে এখানে দু'একটি কবিতাকে ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করা যায়। যেমন ঃ

১. "অচেনা বন্ধু নয়নে তোমার হলুদ ফুলের আলো
বেগুন কুঁড়ির কচি তনু তব লাগিয়াছে মোর ভালো।
....
তোমারি আদল অমনি কাজল অঁমনি গড়ন তার
পেয়েছিনু তায় এক ছড়া যেন কলমি ফুলের হার।"
(অচেনা বন্ধু মোর)

২. "ফাগুনের ম্লান সন্ধ্যাবেলা
রক্ত-রেণু অঙ্গে মাখি গৃহে চলে শালিক একেলা;
উদাসী বলাকা সারি উড়ে চলে দূর নীলাকাশে
দুলালী মাটির মায়া বক্ষ তার ভরিতেছে শ্বাসে-"
(আনন্দময়ী)

৩. "কর হানি চলে তরুণী সন্ধ্যা পূবের তিমির দ্বারে
রঙ লাগে তার বলাকা সারির দোলানো কণ্ঠহারে-
জ্বলিতেছে হাতে বসুধা গেহের শতেক প্রদীপ শিখা
কপালে তাহার কাজল ঊষার অঙ্কিত রাজটিকা
ধূসর মলিন আকাশের গায়
আলতা তাহার সুছে মুছে যায়
আঁচলে জ্বলিছে তারার চুমকি নিবিড় অন্ধকারে।
....
এই গেহে তার চরণ-চিহ্ন রয়েছে সকল ঠাঁই
প্রতি দিবসের শত কাজ মাঝে ছায়ারে তাহার পাই
পলাতকা প্রিয়া ঘুমাতো হেথায় বুকে মোর মাথা রাখি
ভোরের পাখীর উৎসব গীতে মেলিত নলিন আঁখি;"
(পরবাসী প্রিয়া মোর)

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত লাইনগুলো অসাধারণ কাব্যগুণসম্পন্ন। এখানে যেসব উপমা ও চিত্রকল্প নির্মাণ করা হয়েছে তাও যেমন অসাধারণ তেমনি বন্দে আলী মিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে। এসব চরণে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের মধ্যেও তাঁর নিজস্বতার পরিচয় সুস্পষ্ট। তাই সমগ্র কাব্য নয়, এর কিছু কিছু কবিতা অথবা বিশেষভাবে বলতে গেলে, কিছু কিছু কবিতার কতিপয় লাইন অসাধারণ কাব্যগুণে মহিমান্বিত হয়ে বন্দে আলী মিয়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

বন্দে আলী মিয়ার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'স্বপ্নসাধ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সনে। কিন্তু গ্রন্থটি বর্তমানে অপ্রাপ্ত। তাই এ গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'লীলাকমল'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সনে। এ গ্রন্থটিরও কোন হদিস বর্তমানে পাওয়া যায় না। তাঁর পরবর্তী তথা পঞ্চম কাব্যগন্থের নাম 'মধুমতীর চর'। এটি প্রকাশিত হয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (ইংরেজী ১৯৪৬) সনে। প্রকাশক- লক্ষণচন্দ্র দাঁ, পরাগ পাবলিশার্স, ১৬৯ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। মূল্য দেড় টাকা। উৎসর্গ- ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সাংবাদিক ও সদালাপী ডঃ শ্রী অজিতশঙ্কর দে করকমলেবু। এতে মোট চব্বিশটি কবিতা আছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় কবি লিখেছেন ঃ

"মধুমতীর চরে নানাশ্রেণীর কবিতার সহিত অনেকগুলি গাথাও (Ballad) সন্নিবেশিত হইল। ইহার কোনোগুলি করুণরসাত্মক। কোনোগুলি হাসির। কাহিনীগুলি যদিও ছোটদের, কিন্তু ইহা সর্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে।

আমার রচিত 'পদ্মানদীর চর' ও 'ময়নামতীর চরে'র ন্যায় এখানিও পল্লীকাব্যগ্রন্থ পল্লীগ্রামে যাঁহারা বাস করেন পল্লীর সহিত যাঁহাদের নিত্যদিনের পরিচয়- তাঁহাদের রসপিপাসু মনে পল্লীর এই কাহিনী সহজেই রেখাপাত করিতে পারিবে এ দুরাশা বোধ হয় করিতে পারি। বিপ্লবী কবি শ্রীমান নির্মল দাস ও শ্রীমান গোলাম সরওয়ার এই পুস্তক মুদ্রণে নানা বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছে। এই সুযোগে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩, ৩৬/৪ এ কালীনাথ দত্ত রোড, বরানগর, কলিকাতা।"

'মধুমতীর চর' কাব্যগ্রন্থের সাথে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতীর চর'-এর সাদৃশ্য বিদ্যমান। অনেকে 'মধুমতীর চর'কে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থের পুনরাবৃত্তি বলে মনে করেন। এতে বন্দে আলী মিয়ার নিজস্ব কবি-স্বভাবের পরিচয় বিধৃত। প্রকৃতির আনন্দঘন দৃশ্যের বর্ণনা ও গ্রামীণ জীবনের চিত্রাঙ্কনে কবির নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে এতে। এখানে কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হলোঃ

www.nagorikpathagar.org

১. "পদ্মানদীর পাড়ির 'পরে ঘন কাশের বন
ও-পাশে তার সবুজ চর দূর হতে যে টানে আমার মন।
রাখাল ছেলের সঙ্গে আমি যাবো চলে সেথায় নদীর চরে
শালিক চড়াই ঝাঁক বাঁধিয়া বিহান বেলা হোথায় এসে পড়ে;
তাদের পায়ের দাগ রয়েছে শুক্‌নো চরের সকল বালুময়
নদীর পাড়ে হেথায় সেথায় নানান রঙা পালক পড়ে রয়।
তাই কুড়ায়ে গুঁজবো কানে মাথায় লবো- দু'হাত ভরি
কাশের ফুল ছড়িয়ে দেবো পুব-বাতাসে সারা সকাল ধরি।"

(মধুমতীর চর)

২. "রাখালী মেয়েটি থাকে ওই গাঁয়ে কাজল দীঘির পার
উহারে ঘেরিয়া জলের পরীরা গান গায় বার বার,
বাতাস তাহার চুলেরে দোলায় আলো চলে সাথে সাথে
উহার পায়ের চিহ্ন লইয়া বালুতট মালা গাঁথে।
মেঘ-কালো মেয়ে কুচকুচে মুখ নিটোল সকল গাঁও
চকচক করে রোদের আঁচেতে লিকলিকে হাত পাও,
দুই চোখে তার মাটির মমতা- অশেষ করুণা ঝরে
পায়ে পায়ে ওর ফুটে যেন ওঠে চাঁপা ফুল থরে থরে।"

(রাখালী মেয়ে)

৩. "চুপ করে একা সারা দিন ভরি বসে থাকি জানালায়
চারা আম আর বাঁশঝাড় ফাঁকে দূরে মাঠ দেখা যায়।
আগাছা ও ধানে জড়াজড়ি করে সারা ক্ষেত গেছে ভরি
দিনে আর রাতে নাচিছে উহারা বাতাসের হাত ধরি।"

(একফালি মাঠ)

৪. "কাজল ডিঙির হাটে যাবো আমি খোকনেরে সাথে নিয়া
যাবো দূরপথে সবুজ মাঠেতে আলপথ দিয়া দিয়া;
কোথাও বিলেতে ফুটেছে শাপলা- কোথাও কাশের বন
বাতাসের সাথে দুলে দুলে ওরা খেলা করে সারাক্ষণ
খোকা যদি চায় শাপলা তুলিয়া মালা গেঁথে দেবো তায়
কাশ ফুল তুলে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া উড়াবো পূবালী বায়;
করতালি দিয়া নাচিবে খোকন কহিবে সে কত কথা
দুই চোখে তার খুশী উথলিবে- প্রাণের চঞ্চলতা।"

(দূর গাঁয়ের পথে)

www.nagorikpathagar.org

৫. "নয়া বরষার জল
ভোররাত হতে শোনা গেল তার ঘুম- ভাঙা কোলাহল।
পদ্মার চরে জলিধান ক্ষেত ডুবিয়াছে ওরি সাথে।
নিকেড়ীর নাও বাঁধা ছিলো ঘাটে খুলে দিয়ে তার দড়ি
চরেতে চলিল রফিক সইদ্ দুই ভায়ে সরাসরি-"

(পদ্মাপারের ছেলে)

৬. "আমরা কৃষক বাংলাদেশের- লাঙল চষি মাঠ
প্রভাত হতে সারাটি দিন ক্ষেত খামারে কাটে
মাটি মায়ের বুকের ভাই
সোনার ফসল নাইরে নাই
পাকা ধানের গন্ধ নাহি গাঁয়ের বাটে বাটে।"

(কৃষাণের গান)

উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ গ্রন্থটি রচনা করেছেন। তবে এটা প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ময়নামতীর চরে'র উৎকর্ষতাকে ছাড়িয়ে উঠতে পারেননি। বরং এখানে বিভিন্ন কবিতায় সে গ্রন্থেরই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, এ গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতার বর্ণনায় জসীম উদ্‌দীনের প্রভাবও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। কবি জসীম উদ্‌দীনের 'রাখালী' (১৯২৭), 'নকশী কাঁথার মাঠ' (১৯২৯), 'বালু চর' (১৯৩০) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কবিতার বর্ণনার সাথে আলোচ্য গ্রন্থের অনেক কবিতার সাদৃশ্য বিদ্যমান। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বন্দে আলী মিয়ার কাব্যিক উৎকর্ষ ক্রমান্বয়ে যতটা সঙ্গতভাবে আশা করা যায়, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পরে পরবর্তী কাব্যসমূহে সেভাবে ক্রমোন্নতি ঘটেনি।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'পদ্মানদীর চর'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সনে। এ গ্রন্থটিও বর্তমানে অপ্রাপ্ত। এর পরের কাব্যগ্রন্থের নাম 'দক্ষিণ দিগন্ত'। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। প্রকাশক- ফরিদুল ইসলাম, রাধানগর, পাবনা। প্রচ্ছদ অঙ্কন করেছেন কবি নিজেই। পরিবেশক হিসাবে আহমদ পাবলিশিং হাউজ, জিন্দাবাহার, ঢাকা-এর নাম মুদ্রিত আছে। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক অধিকর্তা এজাজ আহমদের দস্ত মুবারকে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন ঃ

"সাম্প্রতিক কালের কবিতাগুলো 'দক্ষিণ দিগন্তে' স্থান লাভ করেছে। প্রুফ দেখার অতি সাবধানতা সত্ত্বেও দুটি কবিতার শিরোনামায় মারাত্মক ভুল রয়ে

www.nagorikpathagar.org

গেল। এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রসগ্রাহী সুধীবৃন্দের স্নেহ লাভ করলে আমার কাব্যসাধনার প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলোর শিরোনাম নিম্নরূপ ঃ তিমির দহন, কুসুমের বিল, জন্মান্তর, হে কন্যা, রিক্সা, পান্থনিবাস, আদিম স্বপ্ন, বিদগ্ধ প্রান্তর, উদয়লগ্ন, জীবনের দু'টি গতি, ভবন কপোতী, মৌসুমী, উপনিবেশন, নাগিনী, বিস্মৃত দিন, ঢেউ বয়ে যায়, পলাতকা, ক্ষুধাতুর, পরিচয়, ছন্দপতন, আমন্ত্রণ, জীবনের দিক, চিরপ্রতীক্ষা, মন-ময়ূরী, চিররাত্রি চিরদিন, বিগত বসন্ত, নীলকণ্ঠ, অভিনয়, কপোতী, কাফেলা, ইতিহাস, নাগকন্যা, প্রিয়া বান্ধবী, মালা, বিদায় প্রহর, যাত্রী, বানগ্রস্থ দিন, আমার কবিতা, পুষ্পধনু, শেষ প্রহর, পুষ্পসাধ, ঝড়ের সংকেত, ময়ূরী, অভিনেত্রী, ধূসর সন্ধ্যা, শীতের রাত, প্রতীক্ষা প্রহর, বন্দিদাহ, জনতা, ঝড়ের বিহঙ্গ, এখন হেমন্ত রাতি, নিশীথ হরিণ, দক্ষিণ দিগন্ত।"

এ কাব্য সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেন ঃ "দক্ষিণ দিগন্ত' কাব্যগ্রন্থের নাম- কবিতায় এ যুগের সার্বিক চেহারার আভাস ফুটে উঠেছে। একটা বিরাট ওলটপালট যেন ঘটে গেছে। মানুষের চিন্তার আবাস তছনছ হয়ে গেছে। সর্বত্র যেন ধ্বংসের আশংকায় বিহ্বল।" (**রশীদুল আলম ঃ বাংলা সাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া- কবি বন্দে আলী মিয়া স্মারকগ্রন্থ**, পৃ. ১১৮)।

এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতা থেকে সামান্য কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

১. "আমার অগ্নিশিখা তুমি কি দেখেছো কভু
বৈশাখী বিদ্যুৎ মেঘে!
আমার পুষ্পধনু দেখেছো কি কোনো দিন
মাধবী রাত্রির ধ্যানে !
আমার কামনা দাহ অনুভব করেছো কি
নির্জন বাসক শয্যায়-
কখনো শুনেছো কিগো আমার বুকেতে বাজে
বিদায়ের করুণ বেহাগ!"

(তিমির দহন)

২. "ঘুমের মতন মিঠে আজিকার সকালের রোদ
ভাসিয়া আসিছে সুর- বাজিতেছে কোথায় স্বরোদ!
দখিন বাতাস বুঝি বাতায়নে পথ খুঁজে যায়-
একটি অচেনা তারা নীলানভে আপনা হারায়।"

কুসুমের দিন)

www.nagorikpathagar.org

৩. "একটি প্রসন্ন রাতি ফিরিবে কি জীবনে আবার!
মানস সাগর হতে ফিরিবে কি কলহংস দল!
দারুচিনি বনে আজ নামিয়াছে তুষারের ঢল–
আমার তাসের ঘর লুটাইছে পথের ধূলায়"

(জন্মান্তর)

৪. "দূরাগত যাত্রীদল আসে পরদেশী আশ্রয়বিহীন
পথশ্রমে ক্লান্ত ক্ষুধাতর– নামহীন পরিচয়হীন–
কেহ আসে– কেহ চলে চায়– রিক্ত হয় প্রাণের সঞ্চয়
নবাগত বন্ধুগণ লাগি পান্থশালা রহে প্রতীক্ষায়।"

(পান্থনিবাস)

৫. দিবা আর রাতি যেন জেগে আছে আয়ুর প্রহরী
তিমির দুয়ার পাশে মহা নিশি তন্দ্রাবিহীন,
উদয় রথের শুনি চক্রধ্বনি দূর নভ পারে
মেঘে মেঘে ওড়ে ধূলি তীক্ষ্ণধারা খুরের আঘাতে।

ফেনপুঞ্জ উড়ে যায়– উড়ে যায় অশ্ব বল্গা হতে
চন্দ্রের কিরণ লাগে সুমেরুর গলিত তুষারে–
মরুর বালুকা জ্বলে বিষবাষ্প বিসর্পিল ধোঁয়া
রৌদ্রদগ্ধ বসুমতী মূর্ছাহত স্বপনের প্রায়।"

(দক্ষিণ দিগন্ত)

বন্দে আলী মিয়ার কাব্যে সাধারণত পল্লী-প্রকৃতি ও গ্রামীণ জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু 'দক্ষিণ দিগন্ত' কাব্যগ্রন্থটির বিষয়বস্তু কিছুটা ভিন্ন। এখানে শহর জীবনের চিত্র এবং ব্যক্তিগত জীবনের বিভিন্ন চাওয়া-পাওয়া, অসংগতি ইত্যাদি কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে। মাঝে মাঝে জীবন-জগৎ সম্পর্কে কবির দার্শনিক অনুভূতির প্রকাশও ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে এ গ্রন্থটি মোটামুটি পাঠ-সুখকর।

এরপরের কাব্যগ্রন্থের নাম 'কাহিনী ও কথিকা'। এটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৭১ সনে। প্রকাশক- সোসাইটি ফর পাকিস্তান স্টাডিজ, ঢাকা। এটি কথা ও কাহিনীমূলক কবিতার সংস্কলন। এতে মোট বাইশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এখানে মুঘল রাজবংশের সম্রাট হুমায়ুন ও ক্রুসেড-বিজয়ী গাজী সালাহউদ্দীন– এ দু'জন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রচলিত দু'টি কাহিনী কবিতার আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। দু'টি কাহিনীতেই দুই মহান ব্যক্তির জীবনে

www.nagorikpathagar.org

সংঘটিত দু'টি মানবিক উদারতার হৃদয়স্পর্শী কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অন্যান্য কবিতাগুলো রচিত হয়েছে বিভিন্ন লৌকিক কাহিনী ও কল্প-কথার ভিত্তিতে। উক্ত গ্রন্থ থেকে কতিপয় উদ্ধৃতি নিচে পেশ করা হলো ঃ

১. "মুঘল বংশ গৌরব রবি হুমায়ুন একদিন
রাজদরবারে সভাসদ সাথে রয়েছেন সমাসীন।
সারা ভারতের বাদশাহ তিনি
প্রতাপান্বিত নানা দেশ জিনি
দিকে দিকে তাঁর বিজয় নিশান গৌরবে উড্ডীন।"

(ঋণ পরিশোধ)

২. "জেরুজালেমের তরে
মুসলিম আর খ্রিস্টান সেনা যুঝিছে পরস্পরে।
ইউরোপ থেকে এসেছে রিচার্ড– সঙ্গে অযুত সেনা
অভিলাষ তার জয় করিবার– ফিরে কভু যাইবে না
কণ্ঠে বজ্র নয়নে বহ্নি সাহস দুর্নিবার
অশ্বের হ্রেষা হস্তীর রোষ অস্ত্র ঝনৎকার।
সিংহ বাহিনী উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে চলে
মরু ময়দান কাঁপে থর্‌থর্‌ তাহাদের পদতলে।
ক্রুসেড যুদ্ধ ধর্ম যুদ্ধ জেরুজালেমের তরে
খ্রিস্টান সেনা দাঁড়াইল আসি আরবের প্রান্তরে
গাজী সালাউদ্দীন
ঝঞ্জার বেগে রুধিলেন পথ– হলেন সম্মুখীন।"

(বিজয়ী)

প্রথম কবিতাটিতে ভিস্তিওয়ালার প্রতি বাদশা হুমায়ুনের বদান্যতার প্রকাশ অর্থাৎ ভিস্তিওয়ালাকে প্রদত্ত সম্রাটের ওয়াদা অনুযায়ী তাকে নিজ সিংহাসনে বসিয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং দ্বিতীয় কবিতাটিতে খ্রিস্টান বীর রিচার্ডের প্রতি গাজী সালাউদ্দীনের মহানুভবতা প্রদর্শন অর্থাৎ খ্রিস্টান বীরের অসুস্থতার কথা শুনে গাজী সালাহউদ্দীন ছদ্মবেশ ধারণ করে শত্রু শিবিরে গিয়ে সেনাপতি রিচার্ডের চিকিৎসা করার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী বিশটি কবিতায় বিভিন্ন লোক-কাহিনী ও কল্প-কথার বর্ণনা আছে। যেমন ঃ

১. "পলাশ ডাঙার কলিমুদ্দিন অতিশয় বদরাগী
কখন কি করে ঠিক কিছু নাই– সংসার বৈরাগী।
ইহাতে তাহার বড়ো অশান্তি– সদাই ঝগড়া ঝাঁটি

www.nagorikpathagar.org

একদা সে তাই অভিমান করি ছেড়ে গেল ভিটামাটি।"

(অবাক কাণ্ড)

২. "কোশল নৃপতি করেছেন পণ
খুঁজে যদি পান সাধু সজ্জন
সত্যাশ্রয়ী নির্লোভ মন
চরিত্রে মহীয়ান,
রাজার দুহিতা মুঞ্জুমালায়
তারে করিবেন দান।"

(ত্যাগ)

৩. "পলাশ ডাঙার ইস্টিসানেতে ভোর রাতে আসে গাড়ী
সেই গাড়ী ধরি তারণের দিদি যাবে এই গ্রাম ছাড়ি।
ধান ভেনে আর চিঁড়ে মুদি বেচে চালাইত সংসার
গ্রামে নাই কেহ- কে কিনিবে আর- দিন কাটে নাকো তার।
জমিদার বাড়ী খালি হয়ে গেছে- আর কেহ হেথা নাই
জনহীন গ্রাম- হেথায় হোথায় চুরি হয় হামেশাই।
পড়শী তাহার বোষ্টম খুড়ো- সেও চলে যাবে আজ
তারণের দিদি যাবে তার সাথে- করে তাই গোছগাছ।"

(বাস্তুহারা)

৪. "কয়দিন থেকে তিনু দেখিতেছে আব্বার মুখ ভার
আগের মতন ডাকে নাকো তারে- আদর করে না আর।
সবাই কেমন মনমরা হয়ে চুপ করে বসে ভাবে-
শুনেছে পিতার চাকুরী গিয়েছে- অফিসে আর না যাবে।
এই দুর্দিনে রোজগার নাই- কেমনে চলিবে দিন,
তাই বুঝি হায় ভেবে তিনি সারা দেহ হলো তার ক্ষীণ।"

(দুর্দিন)

৫. "গাজনতলায় মহেশ মালী সে কিপ্পণ অতিশয়
হাত দিয়ে তার গলে নাকো জল, পাড়ার লোকেরা কয়।
কারবার তার টাকা ধার দেয়া, কিন্তু এমন সুদ
দশ টাকা হয় ছ'মাসে তিরিশ হিসাব সে অদ্ভুত।
সকাল বিকাল খাতা বগলেতে বের হয় তাগদায়
লয় না আসল- মহেশ শুধুই সুদের কড়িটি চায়।
লোকে বলে তারে, দেখিলে উহার আহার নাহিক জোটে-

www.nagorikpathagar.org

নাম নিলে তার হাঁড়ি ফাটে দিন ভালো নাহি যায় মোটে।"

(নগদ বিদায়)

এভাবে এ জাতীয় কবিতাগুলোতে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও তাদের মানবিক দুর্বলতার বিভিন্ন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। মানবিক রসে পূর্ণ হওয়ায় কবিতাগুলো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। তাই 'কাহিনী ও কথিকা' কাব্যগ্রন্থটির সাহিত্য-মূল্য কম নয়। এটিকে বন্দে আলী মিয়ার একটি উৎকৃষ্ট কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচনা করা যায়।

বন্দে আলী মিয়ার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থটির নাম 'ধরিত্রী'। এটি সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশক- ফরিদুল ইসলাম এম.এ. কাজী হাটা, রাজশাহী। কবি নিজেই এর প্রচ্ছদ এঁকেছেন এবং গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক মজুলুক হোসেন সাহেবের দরাজ হস্তে। গ্রন্থটিতে মোট পঁয়তাল্লিশটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় কবি লিখেছেন ঃ "ধরিত্রী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতী, মানসী ও মর্মবাণী, পঞ্চপুষ্প, সচিত্র শিশির, পুষ্পপাত্র, ভোরের আলো, বিকাশ, গল্পলহরী, দীপালী, শারদীয়া যুগান্তর, শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, মোহাম্মদী, উদয়ন প্রভৃতি সাময়িকী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুদের অনুরোধে এবং আগ্রহে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

"গ্রন্থখানি মুদ্রণ এবং প্রকাশ ব্যাপারে আমাকে নানাভাবে প্রেরণা দিয়াছেন এবং সাহায্য করিয়াছেন মডার্ন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব এম. একরামুল হক এম.এ. সাহেব। তাঁহার ঋণ জীবনে অপরিশোধনীয়। তাঁহাকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। অতি সাবধানতার সহিত প্রুফ দেখা সত্ত্বেও নানা স্থানে ছাপার ত্রুটি রহিয়া গেল। এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। রাজশাহী, সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫।"

এ গ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচক বলেন ঃ "কবি বন্দে আলী মিয়ার 'ধরিত্রী' কাব্যগ্রন্থে আধুনিক জীবনযন্ত্রণামূলক কবিতা ছাড়াও মনীষী-জীবন আমাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং ঐতিহাসিক পটভূমির উপর কিছু কবিতা রয়েছে। 'হযরত মুহম্মদ (দঃ)', 'রবীন্দ্রনাথ', 'রবিঅস্ত যায়', 'শরৎচন্দ্র', 'সিরাজউদ্দৌলার প্রতি' কবিতাগুলি মনীষী জীবন সংক্রান্ত; 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', 'দুইটি ডোমিনিয়ন', 'হিন্দু-মুসলমান', 'রক্ত ঝরা দিন', 'আমরা স্বাধীন', 'জয়যাত্রা', 'পঁচিশে মার্চ', 'একটি বছর', 'আজও আছো', 'একটি জাতক', 'আর্তনাদ' কবিতাগুলি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তন সংক্রান্ত।" **(রশীদুল আলম, প্রাগুক্ত,** পৃ. ১২১)।

www.nagorikpathagar.org

সমালোচকের মন্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও এ থেকে গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বিশ্ববিখ্যাত মনীষীদের সম্পর্কে কবির আবেগ-অনুভূতি এ গ্রন্থটিতে যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক পরিবর্তনের নানা ঘটনাও এতে বিবৃত হয়েছে। সর্বোপরি, পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর লেখা তাঁর কবিতাগুলো থেকে ধারণা করা যায় যে, কবি সমকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না। চলমান জীবনের নানা ঘটনা, পরিস্থিতি ও বিপর্যয় সম্পর্কে কবির মনে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছে, তার বিশ্বস্ত প্রকাশ দেখি এসব কবিতায়। নিচে বিভিন্ন কবিতা থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করা হলো ঃ

১. "মরু সাহারার আকাশে বাতাসে আজিকে আলোর দিশা
লক্ষ যুগের কেটেছে তমসা– কেটে গেছে মহানিশা।
কুল মখ্‌লুকে পড়ে গেছে সাড়া– ঊষর মরুর দেশে
এসেছে কে আজ বিশ্ব-দরদী– এসেছে এতিম বেশে!
ত্রাসে শিহরায় কুরায়েশ দল– কেঁপে ওঠে বার বার
মানব শিশুর বেশে এসেছেন নকীব সে আল্লার।
লক্ষ যুগের পথ চেয়ে থেকে পৃথিবী পেয়েছে তাঁরে
এসেছেন তিনি সবাকার তরে ধূলিময় সংসারে।

আরব আকাশে হয়েছে উদয় জাহানের শিশু চাঁদ
এসেছে আলোক পুলক বন্যা– টুটিয়া গিয়াছে বাঁধ।
বুলবুলি গাহে বন্দনা তাঁর খেজুর শাখার পরে
মরুর বাতাস তাঁর আগমনী জানাইছে ঘরে ঘরে।
নূতন দিনের বারতা বহিয়া এসেছে যে শিশু রবি
তাঁর জয়গান তাঁরি বন্দনা গাহে শাশ্বত কবি।
ক্ষমা কারো মোর শত অপরাধ শত ত্রুটি শত ভুল
সেলাম নাও গো দীনের বাদশা মুহম্মদ রসুল।"

(হযরত মুহম্মদ (সঃ)

২. "আকাশে অনন্ত রাত্রি– বাষ্পাতুর গাঢ় অন্ধকার
গৃধিনীর পাখার ঝাপটে– চারিভিতে প্রেতের ক্রন্দন।
দুঃখের তমিস্রা তীরে শেষ হলো উদয় লগন
একটি জীবন-স্বপ্ন মর্মে তার চির হাহাকার।"

(সিরাজউদ্দৌলার প্রতি)

৩. "হে প্রাচীন বনস্পতি

www.nagorikpathagar.org

অশীতি বৎসর আজি পূর্ণ হলো তব।
মোরা ক্ষুদ্র তরুদল
আজি তব জন্ম দিনে
শাখা আর পাতা নোয়াইয়া
তোমারে জানাই প্রণতি।"

(রবীন্দ্রনাথ)

এ পর্যায়ে কংগ্রেস নেতা গান্ধী ও প্রখ্যাত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দু'টি কবিতা রয়েছে। দেশ-বিভাগের উপর রচিত তাঁর কবিতাটির নাম 'দুইটি ডোমিনিয়ন'। এ কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ এরূপ ঃ

"স্বাধীন ভারতে নবীন সূর্যোদয়।
রুধির পিচ্ছিল পথ–
রথ চক্র মন্থর
সপ্ত অশ্ব-গতি রুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে
অশ্বের বল্গা মুখে– কেন পুঞ্জ উড়ে উড়ে যায়।"

স্বাধীনতার উপরে লেখা তার কবিতাটির নাম 'আমরা স্বাধীন'। এ কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"হাঁকিছে নকীব বজ্র কণ্ঠে : আমরা স্বাধীন–
দুর্যোগ আঁধার শেষে উদিয়াছে প্রভাত নবীন।
দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষার পরে
বুকের শোণিত ধারা পার হয়ে আসিয়েছে আমাদের তরে।
আমরা স্বাধীন
জাতির জীবনে আজ আসিয়েছে রঙিন এ দিন।"

'জয়যাত্রা', 'পঁচিশে মার্চ', 'আজও জেগে আছো' প্রভৃতি কবিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখা। পঞ্চাশের মন্বন্তরের উপর দু'টি কবিতা এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা থেকে কয়েকটি চরণ নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"অন্নদাও– অন্নদাও' দ্বারে দ্বারে ফেরে দুর্গতদল
পরণে জীর্ণ বাস– রুদ্ধ বাষ্পে নয়ন সজল।
ধনীর প্রাসাদ তলে ক্ষুধাতুর কেঁদে হলো সারা
এক মুষ্ঠি অন্ন লাগি জনে জনে প্রাণ দিলো তারা।
পালঙ্কে রাজার সুত সুখে নিদ্রা যায়।
কাঁদে মাতা কাঁদে কন্যা– কাঁদিতেছে বন্ধু পরিজন

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দীর অভিশপ্ত মানবাত্মা হতেছে পীড়ন।"

(পঞ্চাশের মন্বন্তর- ১)

"বাংলাদেশের লোকে
অনাহারে মরে হাজারে হাজারে- মরে দারিদ্র্যে শোকে !
অন্নকষ্ট দারুণ কষ্ট সহ্য নাহি যায় আর
সারাদিন রাত কচি শিশুগুলো করিতেছে চীৎকার।
বিঘে কয় ক্ষেত ছিলো কৃষাণের বেঁচেছে পেটের দায়
হালের বলদ দুধের গরুটা আজি কিছু নাহি হায়।
খাদ্য অভাবে কত অজানা গলে দড়ি বেঁধে দিলো প্রাণ
স্বামী তাড়াইলো গৃহিণীরে তার- বিকালো মা সন্তান।
ঘরে যাহা ছিলো সোনা আর রূপো নারীর জীবন ধন-
তামার কাঁসার বাসন যা ছিলো গেল সে বিসর্জন।"

(পঞ্চাশের মন্বন্তর- ২)

মুসলিম ও হিন্দুদের ধর্মীয় উৎসবের উপরে লেখা কয়েকটি কবিতাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, রাজনীতি, দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি আমাদের ঐতিহ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কেও তাঁর গভীর মমত্ববোধ ছিল। তবে তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিল না। তিনি ছিলেন উদার মানবিকতাসম্পন্ন একজন সহজ-সরল অসাম্প্রদায়িক কবি। মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন, স্বদেশ, স্বজাতি ও আপন ঐতিহ্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে এ গন্থের বিভিন্ন কবিতায়।

কবি বন্দে আলী মিয়ার 'কলগীতি' নামে একটি গীতি সংকলন প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ সনে। প্রকাশক – ফরিদুল ইসলাম, কাজীহাটা, রাজশাহী। এটি উৎসর্গিত হয়েছে মুহম্মদ একরামুল হকের দন্ত মুবারকে। এতে আধুনিক, পল্লীগীতি, হামদ ও নাত, দেশপ্রেম, হাসির গান এবং আধ্যাত্মিক- মোট ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত মোট ১১১টি গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবি দীর্ঘকাল (১৯৬৫ থেকে আমৃত্যু) বেতারে চাকরী করেছেন। প্রধানত বেতারের প্রয়োজনেই তাঁকে এ জাতীয় গান রচনা করতে হয়েছে। এসব গান এক সময় বেশ জনপ্রিয় ছিল। ইতঃপূর্বে তিরিশের দশকে তিনি বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধেও বিভিন্ন ধরনের কিছু গান রচনা করেছিলেন। সেসব গানের একটা সংকলনও বের হয়েছিল 'সুরলীলা' নামে। 'কলগীতি' গ্রন্থের শুরুতে 'প্রাক্‌বাক্‌' শীর্ষক ভূমিকায়

www.nagorikpathagar.org

এ সম্পর্কে কবি বন্দে আলী মিয়া লিখেছেন ঃ

"অনেক বছর আগের কথা। কলকাতার আপার চিৎপুর রোডে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-কোম্পানীর রিহার্সাল ক্লাব ছিলো। সেখানে মাঝে মাঝে যেতাম। সময়টা বোধ হয় ১৯৩২ সাল। তখন থেকে গান লিখতে আরম্ভ করি। নানা ধরনের গান লিখেছিলাম– আধুনিক, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, হাম্‌দ নাত্‌, হাসির গান, ভক্তিমূলক এবং দেশপ্রেম সম্পর্কীয়। গানগুলি হিজ মাস্টার ভয়েস, টুইন কলম্বিয়া, রিগ্যাল মেগাফোন, হিন্দুস্থান তাজ, সেনোলা প্রভৃতি রেকর্ড কোম্পানীগুলিতে নানা শিল্পীর কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়েছিলো এবং যথাসময়ে বাজারে প্রকাশিতও হয়েছিলো।...

সেই সময়ে ১৩৪১ সনে পুরুসঙ্গ লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী (২০৩/৪ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট কলকাতা) আমার রচিত নানা ধরনের গান সংগ্রহ করে 'সুরলীলা' নামক আমার প্রথম গানের বহি প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকা বেতার কেন্দ্র এবং রাজশাহী বেতার কেন্দ্রে আমার রচিত নানা ধরনের গান অনেকে গেয়েছেন। তাঁদের এবং আমার বহু হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের অনুরোধে 'কলগীতি' প্রকাশিত হলো। এজন্য তাদের সকলের নিকটে আমি কৃতজ্ঞ।"

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বন্দে আলী মিয়ার অবদান যথেষ্ট না হলেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর লেখা তাঁর একটি জীবন-চরিত ও সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'জীবনশিল্পী নজরুল' উন্নত মানের গ্রন্থ হিসাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছে। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সনে। প্রকাশক– মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম গলি, ঢাকা-১। কবি বইখানি লুৎফর রহমান সরকারের নামে উৎসর্গ করেন।

গ্রন্থটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত ঃ ১. নজরুল সান্নিধ্য, ২. নজরুল ও শনিবারের চিঠি, ৩. আমি শ্রী মোহিত লাল মজুমদার বি.এ. ৪. দ্রোণ গুরু, ৫.সুরলোকে নজরুল, ৬. নজরুল সংবর্ধনা, ৭. নজরুলের গান ও শনিবারের চিঠি, ৮. নজরুলের চিঠিপত্র, ৯. কবির হিতৈষী বর্গ, ১০. নজরুল চরিত্রের বিভিন্ন দিক ও ১১. বিদেশে নজরুলের জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের আয়োজন।

এ গ্রন্থটি সম্পর্কে কবির জীবনীকার ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন ঃ

"জীবনশিল্পী নজরুল' গ্রন্থটি এক হিসাবে নজরুল চরিতকথা ও তাঁর সাহিত্য পরিচয় নিয়ে রচিত। বন্দে আলী মিয়া এটাকে জীবন চরিতের বই হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। অনেকেই নজরুল সম্বন্ধে বই লিখেছেন, কেউ

www.nagorikpathagar.org

কেউ স্মৃতিকথা রচনা করেছেন। কিন্তু বন্দে আলী মিয়ার মতো সুখপাঠ্য বই খুব বেশি রচিত হয়নি। এ-বই রচনা করতে গিয়ে তিনি নজরুল-জীবনের অনেক অজ্ঞাত কথার উল্লেখ করেছেন ; আর সেই সঙ্গে এ-কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' এ মৌলিক তত্ত্ব নজরুল সাহিত্যের প্রাণ। নজরুল কবি, নজরুল সাহিত্য সাধক, নজরুল পত্রিকা-সম্পাদক, সুরকার ও গীতিকার এ তাঁর এক পরিচয়, কিন্তু বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনদের সঙ্গে হৈহুল্লোড় করে আড্ডা দেওয়া আর সঙ্গীত ও সাহিত্য আসর মাত করা নজরুলের আর এক পরিচয়। এই উভয় দিকের পরিচিতি দ্বারা কবি নজরুলকে চেনা যায়, এভাবেই নজরুল সমগ্রকে বুঝতে পারা যায়। বন্দে আলী মিয়ার এ গ্রন্থে নজরুল ইসলামের সেই সত্যপরিচয়ই বাণীরূপ পেয়েছে।" **(গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯)**।

নজরুলকে বন্দে আলী মিয়া অতি নিকট থেকে দেখেছিলেন। কবির ব্যক্তিগত জীবন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, কাব্য-সাধনা, গান-গজল রচনা সম্পর্কে বন্দে আলী মিয়ার পর্যালোচনা অত্যন্ত সহৃদয়পূর্ণ ও তথ্যভিত্তিক। তাই যে কারণেই হোক, বন্দে আলী মিয়া প্রবন্ধ সাহিত্যে আর কোন অবদান না রাখলেও তাঁর রচিত এ একটি মাত্র গ্রন্থের জন্যেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, সন্দেহ নেই। নজরুলকে যথার্থরূপে জানার জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত সহায়ক ও একান্ত নির্ভরযোগ্য।

বন্দে আলী মিয়ার গদ্য রচনার আর একটি উজ্জ্বল নিদর্শন হলো তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- 'জীবনের দিনগুলি'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৭৩ (জুলাই ১৯৬৬) সনে। প্রকাশক- মহিউদ্দীন আহমদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম গলি, ঢাকা-১। মূল্য চার টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১১২। উৎসর্গপত্রে কবি লেখেন ঃ যারা একদিন পাশে ছিল- তারা আজ নাই। কেহ জনতার অরণ্যে গিয়েছে হারিয়ে, কেহ আজ দেহাতীত লোকে। সবাকার স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

কবি ১৩২৮ সনে (ইংরাজি ১৯২১) যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকে শুরু করে কলকাতার রক্তাক্ত হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার দিনগুলো অর্থাৎ ১৯৪৬ সনের ১৯ আগস্ট পর্যন্ত তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর বর্ণনা দিয়েছেন এ স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থটিতে। বইটি সম্পর্কে কবির জীবনীকার ডক্টর গোলাম সাকলায়েন বলেন ঃ "জীবনের দিনগুলি' বন্দে আলী মিয়ার স্মৃতিকথা জাতীয় বই। স্কুল জীবনে তিনি যখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকে কবিতা লিখতে

www.nagorikpathagar.org

শুরু করেন। এই সংবাদ দিয়ে বইখানির সূত্রপাত হয়েছে এবং জীবনের বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গ্রন্থকার ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্টে কলকাতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস (Direct Action Day) ঘোষণার তিন দিন পরে (১৯ আগস্ট) যখন নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের নিরাপত্তা দেখতে পেলেন তখনই এর প্রথম পর্বের সমাপ্তি টেনেছেন।" **(গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১)।**

ডক্টর গোলাম সাকলায়েন যদিও গ্রন্থটিকে 'প্রথম পর্ব' বলে উল্লেখ করেছেন, মূলত বন্দে আলী মিয়ার পরবর্তী কোন পর্ব বা স্মৃতিচারণমূলক লেখা পাওয়া যায় নি। অতএব, এখানেই গ্রন্থটির সমাপ্তি বলে ধরে নেয়া যায়। কবির প্রথম কবিতা লেখার অভিজ্ঞতার বর্ণনা থেকে তাঁর সাহিত্যিক ও শিল্পী-জীবনের নানা বিষয়ের বর্ণনা এতে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। কবিকে জানার জন্য এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট উপলব্ধি করার জন্য এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। তাছাড়া, কবির সমকালে তিনি যেসব বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাহচর্যে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক এবং সে সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার তথ্যভিত্তিক বর্ণনা এ গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। সেদিক থেকে এটাকে তাঁর জীবনের (যদিও খণ্ডিত) ও সমাজের একটি মূল্যবান দলিল হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়।

কবি বন্দে আলী মিয়া মোট পাঁচটি উপন্যাস লিখেছেন (গ্রন্থ-তালিকা দ্রষ্টব্য)। 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' (১৯৩১) তাঁর রচিত প্রথম ও সর্বাধিক সার্থক উপন্যাস হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের মন্তব্য নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ "বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসটি বন্দে আলী মিয়ার উপন্যাসগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে। ফরিদ ও মালবিকা মেডিক্যাল কলেজের সতীর্থ। পুরীতে হাওয়া পরিবর্তন করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে উদ্বেল তরঙ্গসঙ্কুল বারিধির তীরে উদার আকাশের তলে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়। অনুরাগ প্রেমে ও পরিণয়ে রূপান্তরিত হয়। পরে সংশয়ের ঝড়ঝঞ্ঝা তাদেরকে যেই বিচ্ছিন্ন করবার উদ্যোগ করেছে তেমনি সেই চিরন্তন প্রেম যা নারী পুরুষকে চিরদিন কাছে টেনে রেখে সৃষ্টিধারা ও তার সৌন্দর্য অক্ষুণ্ন রেখেছে তাই-ই তাদের আবার পুনরায় মিলিয়ে দেয়। ফরিদ ও মালবিকা চরিত্র জটিল, মধুর ও মনস্তাত্ত্বিক।" **(স্মারক গ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১২৭)।**

কবির জীবনীকার ডক্টর গোলাম সাকলায়েন গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন ঃ "কেউ কেউ বলে থাকেন বসন্ত জাগ্রত দ্বারে উপন্যাসটি বন্দে আলী মিয়ার শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্য। এ দাবির পেছনে যুক্তি কী ? সম্ভবত লেখকের অর্ন্তদৃষ্টি ও নাটকীয় ঘটনার সংস্থান। সেই সঙ্গে গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা ও সংলাপের কথাও

www.nagorikpathagar.org

উল্লেখযোগ্য।" **(গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪)।**

এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ মজির উদ্দীন বলেন ঃ "মানুষের ভালবাসা, ব্যথা বেদনা ও চক্রান্ত রূপায়ণের ক্ষেত্রে লেখক একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী ছিলেন। বসন্ত জাগ্রত দ্বারে উপন্যাসেও সেই অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ হৃদয়বত্তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। চরিত্রচিত্রণের বেলায় বন্দে আলী উদার। মানুষকে তিনি মানুষ হিসাবেই দেখেছেন। জাত ধর্মের ছদ্ম পরিচয়কে তিনি বড় বলে মনে করেন নি। কথাশিল্পী বন্দে আলীর এ গুণ প্রশংসার যোগ্য।" **(ষষ্ঠদশ মৃত্যুবর্ষ সংকলন পৃ. ১৮)।**

'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসের নায়ক মুসলমান এবং নায়িকা খ্রিস্টান। যৌবনের আবেগময় মুহূর্তে তারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবেসেছে। কিন্তু উভয়ের পারিবারিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পটভূমি ও দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন হওয়ার কারণে জীবন চলার পথে তাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে ও চিন্তা-চেতনার অমিল পরিলক্ষিত হয়েছে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ও দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়েছে তার চমৎকার বর্ণনা ফুটে উঠেছে এ উপন্যাসটিতে।

বন্দে আলী মিয়ার দ্বিতীয় উপন্যাস 'ঘূর্ণিহাওয়া'। কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ রচনা ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'বসন্ত জাগ্রত দ্বারে' উপন্যাসের চেয়ে 'ঘূর্ণিহাওয়া' উপন্যাসটিতে অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কিছুটা দেখে দিয়েছিলেন এবং মাঝে মাঝে সংশোধন-পরিমার্জন করেছেন বলে জানা যায়। সেদিক থেকে এটি একটি উন্নতমানের উপন্যাস হওয়াই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে বন্দে আলী মিয়া নিজেই লিখেছেন ঃ "২১ জুলাই ১৯৩১ সাল। শান্তি নিকেতনে একটি অপরাহ্ন। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে উত্তরায়ণের বারান্দায় রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে আমি আর আমার জনৈক শিল্পীবন্ধু বসেছিলেম। কথার পরে কথা প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ চলছিলো। এক ফাঁকে আমার 'ময়নামতীর চর' কাব্যগ্রন্থখানির কবিতাগুলি সম্পর্কে আলোচনা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে তাঁর যৌবন দিনে শিলাইদহ বাসের কথা তাঁর মনে পড়লো।

তিনি বললেন ঃ দেখ, শিলাইদহের কাছারীবাড়ির কিছুটা দূরে একজন খোঁয়াড়ালা ছিলো। তার জীবনকথা আমি জানি। কাহিনীটা লিখবার জন্যে মনের মধ্যে আমার লোভ এখনো আছে। কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে রেখেছি। মুসলমান পরিবারের খুঁটিনাটির খবর আমার জানা নেই। অথচ গল্প লিখতে ওটা নিতান্তই অপরিহার্য। লিখলে কোথায় কি ত্রুটি থেকে যাবে যার জন্যে সমালোচকদের তীক্ষ্ণ আক্রমণ আমার ওপরে হতে থাকবে। এই বুড়ো বয়সে সেটা মোটেই প্রীতিকর নয়। সুতরাং কাহিনীটা তোমাকে বলছি, তুমি এ বিষয়ে

www.nagorikpathagar.org

চেষ্টা করো।

আমি সানন্দে স্বীকৃত হয়েছিলেম। কলিকাতায় ফিরে এসে আখ্যায়িকাটির রূপদান করলেম। অতঃপর গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথের) কলিকাতায় আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগলেম। তিনি কলিকাতায় এলে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না থেকে বরানগরে শশীভিলায় অবস্থান করতেন। তিনি এলেন। আমি সুযোগ করে পর পর দুদিন গিয়ে উপন্যাসখানি পড়ে তাঁকে শোনালেম। তিনি গম্ভীর মুখে শুনলেন এবং স্থানে স্থানে সংযোজন ও পরিবর্জনের নির্দেশ দান করলেন।

তাঁর ইচ্ছা শিরোধার্য করে বহিটি সমাপ্ত করে মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশের জন্য দিলেম। বহিটি উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বের হবার সময়ে অনেকেরই দৃষ্টি সে সময়ে আকৃষ্ট করেছিলো। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বহিখানির নাট্যরূপ লিখে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। আমি যথাসময়ে তাঁদের অনুরোধ রক্ষা করেছিলেম। অতঃপর 'নসিবের ফের' নাম দিয়ে তাঁরা বহিটির পালারেকর্ড বাজারে বের করলেন। ইহার কিছুদিনের মধ্যেই অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর কর্তৃপক্ষ আমাকে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানালেন, উপন্যাসখানি রেডিয়োর উপযোগী করে নাট্য রূপান্তরিত করবার জন্য। তৎপরে উহা অল ইন্ডিয়া রেডিয়োতে বহুবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে। বর্তমানে এই বহির নাট্যরূপ 'গাঁয়ের মেয়ে' নামে রেডিয়ো পাকিস্তানে মাঝে মাঝে, অভিনীত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করেছি মাত্র। যদি কিছুটা সাফল্য লাভ হয়ে থাকে তাহা তাঁরই অনুগ্রহে।"

গ্রন্থকারের উপরোক্ত বর্ণনা থেকে উপন্যাসটি রচনার পটভূমি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক তার সংশোধন-পরিমার্জন এবং বিভিন্ন নামে বিভিন্নভাবে উপন্যাসটির প্রচারের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, গ্রন্থটি এক সময় বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উপন্যাসটি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য লেখকের উপরোক্ত বর্ণনা খুবই উপযোগী ও একান্ত সহায়ক, তাই একটু বিস্তৃত আকারেই তা এখানে তুলে ধরলাম।

বন্দে আলী মিয়ার তৃতীয় উপন্যাস 'মনের ময়ূর' এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। গ্রন্থের ভূমিকায় গ্রন্থকার লিখেছেন ঃ "এই বহির চরিত্র এবং বিষয়বস্তু সমস্ত কাল্পনিক। কেহ ইহাকে সত্য বলিলে উহা ভুল করা হইবে। উপন্যাস– সর্বদাই উপন্যাস– কখনো ইতিহাস নহে। এই বহিতে বহু ভুল ত্রুটি থাকিতে পারে, সেজন্য যে অপরাধ তাহার জন্য আশা করি পাঠকেরা ক্ষমা করিবেন।"

লেখক গ্রন্থটির কাহিনী কাল্পনিক বলে দাবী করলেও 'মনের ময়ূর' উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্র চিত্রণের সাথে তাঁর নিজের জীবনের কাহিনীর মিল

www.nagorikpathagar.org

আছে। কবির স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ 'জীবনের দিনগুলি' পড়লে বিশেষত গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ে বর্ণিত কাহিনীর সাথে এর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

বন্দে আলী মিয়ার চতুর্থ উপন্যাস 'দিবাস্বপ্ন' (১৯৫৭)। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে ১৩৬৩-৬৪ সনে ঢাকার মাসিক মোহাম্মদীতে ধারাবাহিকভাবে (১৩৬৩ কার্তিক, ২৮ বর্ষ : ১ম সংখ্যা থেকে ১৩৬৪ ভাদ্র ২৮ বর্ষ ১১ সংখ্যা পর্যন্ত) ছাপা হয়। উপন্যাসের নায়িকা ময়না, নায়ক সোনা। কৈশোর জীবনে তাদের পরিচয়, পরিচয়ের পর মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা, অতঃপর প্রেমের সম্পর্ক। কিন্তু একদিন ট্রেন দূর্ঘটনায় অকস্মাৎ নায়কের মৃত্যুর খবর শুনে নায়িকা মর্মান্তিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটলেও লেখক সর্বশেষে আকবর নামে আরেক জনের সাথে ময়নার জীবনের সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে উপন্যাসটি শেষ করেছেন।

বন্দে আলী মিয়ার সর্বশেষ উপন্যাসের নাম 'অরণ্য গোধূলি' (১৯৬১)। উপন্যাসের শুরুতে লেখক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'দুই পাখি' নামক কবিতা থেকে নিম্নোক্ত চারটি লাইন উদ্ধৃত করেছেন ঃ

"খাঁচার পাখি ছিলো সোনার খাঁচাটিতে
বনের পাখি ছিলো বনে
একদা কি করিয়া মিলন হলো দোঁহে
কী ছিলো বিধাতার মনে।"

উদ্ধৃত কবিতাংশের সাথে উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রের কিছুটা মিল রয়েছে। মুসলমান জমিদার আলী রেজার দ্বিতীয় স্ত্রীর আফরোজা বেগমের সদ্যোজাত পুত্রসন্তান বিমাতা সাহের বানুর চক্রান্তে আম বাগানে কাপড়ের পুটলিতে মোড়ানো অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়। ঘটনাচক্রে জনৈক হিন্দু ধনী পরিবারের সন্তানহীনা রমণী অনুরাধা শিশুটিকে কুড়িয়ে পায়। সে তার নাম রাখে বিজয় সেন। বিজয় সেন ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে যৌবন প্রাপ্ত হয়। এরপর প্রতিবেশী ব্যারিস্টার মুখার্জী বাবুর কন্যা সুমিত্রার সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রণয় ঘটে। বিজয় সেন মুসলমান পরিবারের সন্তান একথা জানাজানি হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের মিলনে শেষ পর্যন্ত কোন বাধার সৃষ্টি হয়নি। বিজয় সেনের পালক পিতার উক্তি ঃ

"মানুষের বিচারে আমি অপরাধী কিন্তু ভগবানের কাছে আমি নির্দোষি। মানবতাকে আমি সম্মান দিয়েছি। ছেলেটি মুসলমান অথবা অপর কোন ধর্মাবলম্বীর বিচার আমি করিনি। পুত্রের মতো স্নেহে তাকে লালনপালন করেছি।"

উপন্যাসটির কাহিনী ও চরিত্র বিনির্মাণে বন্দে আলী মিয়ার অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, এখানে কিছুটা হিন্দু-মুসলিম মিলনের

www.nagorikpathagar.org

বাণী প্রচারের প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

বন্দে আলী মিয়ার দু'টি গল্পগ্রন্থের নাম– 'নারী কলংকময়ী' ও 'তাসের ঘর'। প্রথমটিতে মোট নয়টি এবং দ্বিতীয়টিতে মোট ছয়টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলো সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেছেন, 'মুহূর্তগুলোর সংলাপ'। মূলত দৈনন্দিন জীবনের কিছু কিছু বাস্তব ঘটনা, দুঃখ-দৈন্য ও আনন্দ-বেদনার খণ্ড চিত্র নিয়ে তাঁর ছোটগল্পগুলো রচিত। গল্প হিসাবে এগুলো মোটামুটি আনন্দদায়ক হলেও ছোটগল্পের আঙ্গিক ও শিল্পবিচারে তা যথেষ্ট সফল হয়েছে বলে মনে হয় না।

বন্দে আলী মিয়ার রচিত উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যা কম নয়। এটা তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতা ও সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের নিদর্শন। তবে কবি হিসাবে তিনি যতটা সফলতা অর্জন করেছেন, কথাশিল্পে তাঁর সাফল্য অতটা নয়।

বন্দে আলী মিয়া মোট ১২টি নাটক-নাটিকা, একটি একাঙ্কিকা এবং পাঁচটি প্রহসন রচনা করেছেন। তাঁর রচিত অধিকাংশ নাটক ও নাটিকা ফরমায়েশী ধরনের। প্রধানত বেতার এবং বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুরোধে তিনি এগুলো রচনা করেন। তাই এগুলোর বাণিজ্যিক মূল্য যতটা, সাহিত্য মূল্য অতটা নয়। তাঁর রচিত 'উদয় প্রভাত' একটি ঐতিহাসিক নাটক। নাটকটি উৎসর্গিত হয়েছে কবি ওবায়েদ উল্লাহর নামে। এটি তুরস্কের জাতীয় নেতা কামাল আতাতুর্কের জীবনভিত্তিক নাটক। তাঁর 'জোয়ার ভাটা' নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৩ সনে। এটি তাঁর একটি উপন্যাসের নাট্যরূপ। লেখক এ সম্পর্কে তাঁর 'প্রাকবাকে' (ভূমিকা) বলেছেন ঃ

"আমার লিখিত 'শেষলগ্ন' নামক উপন্যাসের ইহা নাট্যরূপ। উপন্যাসখানি যখন কয়েক বৎসর পূর্বে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছিল সেই সময়ে উহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ উহার নাট্যরূপ লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। 'নসিবের ফের' নামকরণে আমি কাহিনীটি নাটকে রূপান্তরিত করি। কলম্বিয়া কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে রিগাল রেকর্ডে উহা প্রকাশিত হয়। তৎপর বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে কিছু অংশ পরিবর্তন করিয়া 'হাসিনা বানু' নাম দিয়া উহা মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করি। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রে উহা একাধিকবার অভিনীত হইয়াছে। বর্তমানে ইহা সাধারণ মঞ্চের উপযোগী করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করা হইল।"

'বৌদিদি রেস্টুরেন্ট' প্রহসনটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৫৫ সনে। প্রকাশ করেন কাজী আকাম উদ্দীন, ৩৫/এ, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা। এ বইয়ে মোট ছয়টি প্রহসন ও একাঙ্কিকা একত্রে সংকলিত হয়েছে। শিরোনাম ঃ

www.nagorikpathagar.org

"বৌদিদি রেস্টুরেন্ট, বাঞ্ছারাম ঢ্যাং, গাধা হাকিম, সতী, লক্ষহীরা, নসিবের ফের। ভূমিকায় গ্রন্থাকার লিখেছেন ঃ "বৌদিদি রেস্টুরেন্ট ও বাঞ্ছারাম ঢ্যাং হাসির নকশা দুইটি শ্রী নবদ্বীপ হালদার কর্তৃক সেনোলা কোম্পানীতে রেকর্ড করা হইয়াছে। রেকর্ড দুইখানিতে প্রচুর হাসির উপাদান থাকায় উহা অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।"

বন্দে আলী মিয়ার নাটক-নাটিকার মতো প্রহসন ও একাঙ্কিকাগুলোও প্রধানত ফরমায়েসী লেখা। এগুলোর সাহিত্য-মূল্য যথেষ্ট না হলেও এর মাধ্যমে তাঁর প্রতিভার বহুমুখীতার একটি পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এগুলোর মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যও রয়েছে। তবে সামাজিক বিষয়ই প্রধান। এর মধ্যে কবির এক হাস্যতরল, সহজ-সরল, রসাত্মক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

বন্দে আলী মিয়ার রচিত শিশু-কিশোরদের উপযোগী বইয়ের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। এগুলোর মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্যও রয়েছে। রূপকথা, লোককাহিনী, জীবন-চরিত, ধর্ম, দুঃসাহসিক ও রোমাঞ্চকর কাহিনী, ঐতিহাসিক ঘটনাভিত্তিক কাহিনী, বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে রচিত অনেক শিশুতোষ রচনা লিখেছেন তিনি। একসময় এগুলোর জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ট। তাঁর রচিত কিছু কিছু শিশুতোষ রচনা এককালে স্কুলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। তাই শিশুতোষ ছড়া, কবিতা ও কাহিনীভিত্তিক রচনায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে, বন্দে আলী মিয়া বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি প্রধানত কবি হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ ছিল। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদানও ব্যাপক। তাঁর প্রতিভা ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের জন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি চির অমর হয়ে থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা

মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (জন্ম ১৬ ডিসেম্বর ১৯০৬-মৃত্যু ২ মে ১৯৭৯) পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নেয়ামত বাড়ি গ্রাম, কুষ্টিয়া। ডিভিশনাল স্কুল ইন্সপেক্টর খান বাহাদুর মহম্মদ সোলায়মান তাঁর পিতা। বাল্যকালে তিনি রাজশাহী মিশন স্কুল, বরিশাল ও পাবনায় শিক্ষালাভ করেন। তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করার সুযোগ পান। কিন্তু তিনি প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চতর শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হলেও নিজ চেষ্টায় স্বগৃহে লেখাপড়া করেন। রাজশাহীতে তাঁর গৃহ-শিক্ষক ছিলেন প্রথম বাঙালি সার্থক মুসলিম উপন্যাসিক প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' উপন্যাসের লেখক মোহম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন। ১৯২৮ সালে তিনি 'হাইজিনে' ডিপ্লোমা ডিগ্রি লাভ করেন। রন্ধন প্রণালীতে 'লেডি কারমাইকেল ডিপ্লোমা' হাসিল করেন।

মাহমুদা খাতুন অল্প বয়স থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা লিখে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ: পশারিণী (১৯৩৮), মন ও মৃত্তিকা (১৩৬৭) এবং অরণ্যের সুর (১৯৬৬)। 'পশারিণী' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, এর আগে আর কোনো বাঙালি মুসলিম মহিলা কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। মুসলিম বাঙালি মহিলা কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম সনেট ও গদ্য ছন্দে কবিতা লিখেছেন। তাঁর সমকালে তিনি একজন জনপ্রিয় কবি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সেকালে খুব অল্প সংখ্যক মুসলিম মহিলাই সাহিত্য চর্চা করতেন, তিনি তাদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম এবং অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল। তাঁর কবিতার ভাব, ভাষা ও বিষয় ছিল সহজ, সরল ও সাধারণ জীবনধর্মী। তাঁর কবিতার সহজ সরল ভাব পাঠকের মনকে সহজেই স্পর্শ করে।

সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি মাহমুদা খাতুন ছবি আঁকা ও সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার এবং ১৯৭৭ সালে 'একুশে পদক' লাভ করেন। তিনি আজীবন কুমারী ছিলেন। ১৯৭৯ সালের ২ মে তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

বাংলা সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি ও লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কাজী নজরুল ইসলামসহ অনেক কবি-সাহিত্যিকদের সাথেই তাঁর পরিচয় ছিল। বিশেষত নজরুল ইসলামের অনুপ্রেরণায় তিনি সাহিত্য চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হন। সামাজিকভাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিশুক ও মানবকল্যাণকামী। ১৯৩৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর কলকাতার এলবার্ট হলে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে 'ডক্টর অফ লিটারেচার' উপাধি প্রদান উপলক্ষ্যে যশোর সাহিত্য সংঘ কর্তৃক যে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল সে অনুষ্ঠানে মাহমুদা খাতুন প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ ছাড়া ১৯৩৭ সালে কলকাতা সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেন।

পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী মাহমুদা খাতুন ধার্মিক ও কলকাতার পীর সাহেবের মুরিদ ছিলেন। ইসলামের উদার মানবিক শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার ফলে তিনি তৎকালে প্রচলিত সমাজের বিভিন্ন অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে চিরদিন প্রতিবাদ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের পদাংকানুসারি ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

শামসুন নাহার মাহমুদ

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সমাজসেবী শামসুন নাহার মাহমুদ (১৯০৮-৬৪) বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার (বর্তমানে জেলা) গুথুমা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ছয় মাস বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মাতামহ খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের চট্টগ্রামের বাড়িতে তাঁর শৈশব ও কৈশোর কাল অতিবাহিত হয়। তাঁর মাতৃ ও পিতৃকুল উভয়েই তৎকালীন বাঙালি মুসলিম সমাজে অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শামসুন নাহার মাহমুদের শিক্ষা জীবনের সূচনা হয় চট্টগ্রাম শহরের ডাক্তার খাস্তগীর স্কুলে। ১৯২৬ সালে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। অতঃপর ড. ওয়াহিদ উদ্দীন মাহমুদের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর তিনি কলকাতার ডায়েসিমন কলেজে ভর্তি হন। উক্ত কলেজ থেকে তিনি ১৯২৮ সালে আই এ এবং ১৯৩২ সালে বি. এ. এবং ১৯৪২ সালে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে বাংলায় এম. এ পাস করেন। পরবর্তী বছর ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসে যোগদান করেন। চাকরীরত অবস্থায় তিনি ১৯৪৪ সালে এম. ই ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবনে শামসুন নাহার মাহমুদ কলকাতায় বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত 'সাখাওয়াৎ হোসেন মেমোরিয়াল স্কুল'-এর শিক্ষয়িত্রী, কলকাতা লেডি ব্রাবোন কলেজ ও ঢাকা ইডেন কলেজে বাংলায় অধ্যাপনা করেন। নারীমুক্তি আন্দোলনের অগ্রদূত বেগম রোকেয়ার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁরা নারী জাতির উন্নয়নে ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে একসঙ্গে কাজ করেন। এছাড়া, বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'-এর সম্মেলনে (১৯৩৯) তিনি মহিলা শাখায় সভানেত্রী ও সমিতির পরবর্তী সম্মেলনে (১৯৪১) এর শিশু সাহিত্য শাখায় সভানেত্রী হিসাবে অংশগ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শামসুন নাহার মাহমুদ কলকাতা ছেড়ে ঢাকা চলে আসেন এবং ১৯৪৮ সালে 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা সমিতি'-এর সহ-সভানেত্রী ও ১৯৬২ সালে 'ঢাকা লেডিস ক্লাব'-এর সভানেত্রী নির্বাচিত হন।

শামসুন নাহার মাহমুদ একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজসেবক ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান। বিশেষত তাঁর বড় ভাই হাবিবুল্লাহ বাহার ছিলেন স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তাঁর ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে তিনি এসব কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাঁর সাহিত্য ও সমাজসেবামূলক বিভিন্ন কাজের জন্য কবি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। নজরুলের 'সিন্ধু-হিন্দোল' (১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ 'বাহার-নাহার'-এর নামে উৎসর্গিত হয়।

শামসুন নাহার মাহমুদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলির একটি তালিকা নিম্নরূপঃ পুণ্যময়ী (১৯২৫), রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭), বেগম মহল (১৯৩৮), শিশুর শিক্ষা (১৯৩৯), নজরুলকে যেমন দেখেছি (১৯৫৮), ফুল বাগিচা, আমার দেখা তুরস্ক ইত্যাদি।

উপরোক্ত গ্রন্থ-তালিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, শামসুন নাহার মাহমুদের সাহিত্যচর্চা তাঁর কর্মজীবন ও অভিজ্ঞতারই ফসল। বেগম রোকেয়ার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও একসঙ্গে কাজ করার ফলে রোকেয়ার প্রতি তাঁর যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ এবং এ মহীয়ষী নারীর বিভিন্ন সৎকর্মের প্রতি তাঁর যে আস্থা তারই বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'রোকেয়া জীবনী' গ্রন্থে। এদেশের নারী সমাজের জাগরণে বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে ও তাঁর সান্নিধ্যে জাতির সেবায় তিনি নিয়োজিত হন। নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। 'রোকেয়া জীবনী' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এতে বেগম রোকেয়ার কর্মময় জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তা অনুসরণের জন্য নারী সমাজের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় এবং নজরুলের দ্বারা তিনি যে কতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় 'নজরুলকে যেমন দেখেছি' গ্রন্থে। এছাড়া, 'আমার দেখা তুরস্ক' গ্রন্থে তাঁর তুরস্ক সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। অতএব, একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতারই নির্যাস।

শামসুন নাহার মাহমুদ সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সম্পাদনার কাজেও আত্ম-নিয়োগ করেন। বড় ভাই হবীবুল্লাহ বাহারের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় তিনি

www.nagorikpathagar.org

কলকাতা থেকে 'বুলবুল' (১৯৩৩) নামে চতুর্থ মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি দ্বিতীয় বর্ষে (১৯৩৪) ত্রৈমাসিক ও তৃতীয় বর্ষে (১৯৩৬) মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

শামসুন নাহার মাহমুদের সমকালে বাঙালি মুসলিম সমাজ অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মুসলিম সমাজের তখন চরম দুর্দিন। দেশ তখন পরাধীন। একদিকে ইংরাজ শাসক, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শোষণ-নির্যাতন ও বৈসম্যমূলক আচরণের ফলে মুসলিম সমাজের দুরবস্থা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। উপমহাদেশে তখন স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান হয়। বিশেষত ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'পাকিস্তান প্রস্তাব' গৃহীত হবার পর স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করে। শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিক হিসাবে শামসুন নাহার মাহমুদ তখন তাঁর ভাই হাবিবুল্লাহ বাহারের সাহচর্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রণ করেন এবং সাহিত্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যান। বিশেষত অধঃপতিত নারী জাতির মুক্তি কামনায় তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তৎকালীন মুসলিম সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শামসুন নাহার মাহমুদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়মূলক কাজে তাঁর অবদান নিসন্দেহে প্রসংশাযোগ্য।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে শামসুন নাহার মাহমুদ যথেষ্ঠ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৬৪ সালের ১০ এপ্রিল ঢাকায় শামসুন নাহার মাহমুদের বর্ণাঢ্য জীবনের অবসান ঘটে।

www.nagorikpathagar.org

কাজী কাদের নওয়াজ

কবি কাজী কাদের নওয়াজ (জন্ম- ১৫ জানুয়ারি ১৯০৯, মৃত্যু- ৩ জানুয়ারি ১৯৮৩) পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার তালিবপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোর্ট গ্রামে। মঙ্গলকোর্ট গ্রামের কাজী পরিবার নানা কারণে ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এ গ্রামেই আঠার আউলিয়ার মাজার, পীর পুকুর, বিবির পুকুর, চাঁদ দীঘি ইত্যাদি রয়েছে। কবি ঐতিহ্যমণ্ডিত কাজী পরিবারে জন্মগ্রহণ করে নিজেকে একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী, নিষ্ঠাবান সাহিত্যসেবী হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সম্ভ্রান্ত কাজী পরিবার সম্পর্কে লেখক মন্ওয়ার হোসেন লিখেছেনঃ "মঙ্গলকোর্টের কাজী বাড়ীর নাম ডাক দেশ জুড়ে ছিলো। কাজী দৌলত, কাজী আলাওল (মধ্যযুগের বিশিষ্ট দুই কবি) থেকে কাজী নজরুল ইসলাম এই কাজী বাড়ীর বংশানুক্রম আত্মীয়। কালু কাজী, ভুলু কাজী প্রমুখ অমর পুরুষের সাথে সম্পর্ক ছিলো কাজী বাড়ীর। আবার কাজী বাড়ীর সাথে গাজী বাড়ীর সুসম্পর্ক আবহমানকাল ধরে।" **(আমার স্মৃতিতে সুন্দর ঃ মনওয়ার হোসেন, সাপ্তাহিক ছুটি, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২৯শ সংখ্যা, ১৮ শ্রাবণ ১৩৯৭)।**

কবির পিতৃব্য কাজী নওয়াজ খোদা এক সময় মাসিক 'মোহাম্মদী'র সহ-সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাংলা ১৩২২ সনে মাসিক 'আল এসলাম' পত্রিকায় 'কবিবর খসরু', 'মহাকবি শেখ সাদী' ও 'এমাম মালেক' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখে সুধি-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কবির মা ফাতেমুন্নেসাও একজন শিক্ষিতা বিদূষী রমণী ছিলেন। বাল্যকালে পিতৃহীন কবি মায়ের নিকট আরবি, ফারসি প্রভৃতি ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। বনেদী জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও কবি অত্যন্ত সাদা-সিধা সাধারণ জীবন-যাপন করতেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সনে তাঁর পরিবার সম্পত্তি বিনিময় করে বর্তমান মাগুরা জেলার মুজদিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। নিজ গৃহে মায়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর কবি ১৮১৯ সনে মাথরুন উচ্চ ইংরাজি স্কুলে ভর্তি হন। এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রখ্যাত কবি কুমুদরঞ্জন

www.nagorikpathagar.org

মল্লিক। ১৯২৩ সনে কবি কাদের নওয়াজ কৃতিত্বের সাথে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৫ সনে আই.এস.সি. এবং ১৯২৯ সনে তিনি বহরমপুর কলেজ থেকে ইংরাজিতে অনার্সসহ বি.এ. পাস করেন। এরপর তিনি ইংরাজিতে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেননি। পরবর্তীতে বি.টি. পাস করেন। ছাত্র হিসাবে তিনি বরাবরই খুবই মেধাবী ছিলেন এবং সকল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষাজীবন শেষ করে কবি কাদের নওয়াজ প্রথমে ১৯৩৩ সনে স্কুল ইনসপেক্টর হিসাবে চাকরি নেন। এরপর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ইংরাজির শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। দীর্ঘ তের বছর সেখানে শিক্ষকতা করে তিনি সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসাবে পদোন্নতি লাভ করেন। এরপর ১৯৪৮ সনে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানে এসে তিনি প্রথমে ঢাকা নবকুমার ইন্সিটিটিউটে (পরবর্তীতে নবাবপুর হাই স্কুল) যোগদান করেন। অতঃপর ১৯৫১ সনে হেড মাস্টার হিসাবে দিনাজপুর হাই স্কুলে যোগদান করেন। এখানে চৌদ্দ বছর চাকরি করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। দিনাজপুর হাই স্কুলে যোগদানের পূর্বে তিনি অল্প কিছুকাল ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি নিজ বাড়ি মুজদিয়া গ্রামে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। তবে অবসর জীবনেও তিনি পার্শ্ববর্তী গ্রামে শ্রীপুর মহেষচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন।

বাল্যকাল থেকেই কবি কাজী কাদের নওয়াজ কবিতা লেখা শুরু করেন এবং ঐ সময়ই বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা ছাপা হয়। কবির কবিতা রচনার ক্ষেত্রে একাধারে যে অনুপ্রেরণা এবং পারিবারিক অনুশাসন ছিল সে সম্পর্কে কবির জীবনী লেখক মজনুনুল হক বলেন ঃ "লেখার জগতে প্রথম অনুপ্রেরণা পান স্কুল শিক্ষক দ্বিজ বাবুর নিকট হতে। দ্বিজ বাবু কবিতা লিখতেন। তাঁরই উৎসাহে 'স্বদেশ স্মৃতি' নামক কবিতা 'বিকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবি তখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন তখন বিপরীত মেরুতে। কবিতা লেখার ঘোর বিরোধী। ছেলে উচ্ছন্নে যাবে ভেবে শংকিত। সংসারে শালিশের রায় দেওয়া হল– কবিতা লেখা নিষিদ্ধ। কবির প্রথম কবিতা প্রকাশ সে তো প্রথম প্রেমের আনন্দ। সে সবই ফুৎকারে নিঃশেষিত প্রায়। নিরুপায় হয়ে কবি, চাচা কাজী নওয়াজ খোদার শরণাপন্ন হলেন। চাচা কিছুটা উদার-পন্থী।... স্থিরীকৃত হল 'কবি' ম্যাট্রিক পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত কবিতার চর্চা করতে পারবেন না।... দুঃখের রাত্রিও এক সময় পার হয়। কবির প্রতীক্ষা শেষ হল। কবির মা ঘুমপাড়ানী গান গাইতেন। তার অনুকরণে তিনি 'ঘুম পাড়ানীয়া গান' লিখলেন।" **(বিস্মৃত প্রায় এক প্রবীণ কবি ঃ মজনুনুল হক; সচিত্র স্বদেশ, ঢাকা, ১০ জুন ১৯৮২)**।

www.nagorikpathagar.org

১৯২১ সনে কবি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র তখন তাঁর আর একটি কবিতা কলকাতার 'বিকাশ' পত্রিকায় ছাপা হয়। এরপর প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষে তাঁর লেখা 'ঘুম পাড়ানীয়া গান' নামে একটি কবিতা তৎকালীন মাসিক 'শিশু সাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঐ বয়সেই তাঁর মধ্যে যে প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিচে উপরোক্ত 'ঘুম পাড়ানীয়া গান'টি উদ্ধৃত হলো ঃ

"চাঁদের আলোয় ফুল ফুটেছে
চকোর উড়ে যায়,
ঝিরঝিরিয়ে বইছে হাওয়া
আয়রে ও ঘুম আয়।
নীল আকাশের অসীম শেষে
মেঘগুলো সব হাওয়ায় ভেসে
কোন্ অজানা পরীর দেশে
খবর নিয়ে যায়–
বাইরে কোথাও নাইরে সাড়া
আয়রে ও ঘুম আয়।
বাড়ীর পাশে বাঁশের সারি
দুলছে নিরন্তর,
হাসছে চাঁদের মোহন কিরণ
খোকার মুখের পর !
আঁধার তীরে চখায় ডাকি
কাঁদছে বিধুর চক্রবাকী
রাতের পাখী গায় একাকী
শ্যামল অশত্থ ছায়।
বাইরে কোথাও নাইরে সাড়া
আয়রে ও ঘুম আয়।
ডাইনী বুড়ীর মুখেতে ছাই
পলাক মশা-মাছি
সোনার খোকন ঘুম যাবে মোর
সেই আশাতেই আছি।
নদীর তীরে জ্বলল চিতা,
পুড়লো রে কার সাধ্বী সীতা

www.nagorikpathagar.org

ডাকল শৃগাল বনের মাঝে
বসল গাছে পাখী
দেখতে দেখতে খোকন আমার
মুদলো দু'টি আঁখি।"

কবি কাদের নওয়াজ বাংলা, ইংরাজি, আরবি, ফারসি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতি-শক্তি ছিল প্রখর। মাতৃভক্তি, গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি অপত্য স্নেহ, দেশপ্রেম ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ও সাহিত্যে সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়। ছাত্রজীবনে তাঁর যেসব কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিখ্যাত কবিতার নাম 'মা'। 'শিশু সাথী' পত্রিকায় প্রকাশিত উক্ত কবিতাটির মধ্যে তাঁর গভীর মাতৃভক্তির পরিচয় ফুটে উঠেছে। এছাড়া, মাকে নিয়ে তাঁর আরো অনেক কবিতা আছে। এখানে 'মা' শীর্ষক উক্ত কবিতাটি উদ্ধৃত হলো ঃ

"মা কথাটি ছোট্ট অতি
কিন্তু জেনো ভাই,
ইহার চেয়ে নাম যে মধুর
তিন ভুবনে নাই।
সত্য ন্যায়ের ধর্ম থাকুক
মাথার পরে আজি
অন্তরে 'মা' থাকুক মম
ঝরুক স্নেহ-রাজি।

রোগ বিছানায় শুয়ে শুয়ে
যন্ত্রণাতে মরি।
সান্ত্বনা পাই মায়ের মধুর
নামটি হৃদে স্মরি।
বিদেশ গেলে সেই মধু নাম
জপ করি অন্তরে–
মন যে কেমন করে আমার
প্রাণ যে কেমন করে।

মা যে আমায় ঘুম পাড়াতো
দোলনা ঠেলে ঠেলে

www.nagorikpathagar.org

শীতল হত প্রাণটা, মায়ের
হাতটা বুকে পেলে।
পালিয়ে যেত মশা যে মা'র
ঘুম পাড়ানী গানে
শৈশবের সেই মধুর স্মৃতি
জাগছে আজি প্রাণে।

মাগো আমি বিদেশ থেকে
লিখছি তোমার চিঠি;
কেমন আছে ? জানতে চাহে
দেখতে চাহে দিঠি।
তোমায় স্মরি চোঁখ ফেটে মোর
অশ্রু যে আজ ঝরে–
প্রাণ যে কেমন করে আমার
মন যে কেমন করে।"

কাজী কাদের নওয়াজের কবিতা পড়ে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে নিম্নোক্ত উৎসাহ-বাণী প্রেরণ করেন ঃ "কবিতা লেখার স্বাভাবিক শক্তি তোমার আছে।... তুমি তোমার কাব্য সাধনার ধারাতেই জন্মভূমির মঙ্গল সাধনা করছ।"

কাজী কাদের নওয়াজ প্রধানত কবি হিসাবে পরিচিত হলেও তিনি গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা ও অনুবাদ রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবি জীবনের প্রথম ২৭ বছর কাটিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে। এরপর বাকী ৩৪ বছর তাঁর কেটেছে বাংলাদেশে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকায়ই তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। তিনি লিখেছেন প্রচুর। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ যাবৎ তাঁর মুদ্রিত বইয়ের সংখ্যা মাত্র ছয়টি। তাঁর রচিত অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও পাওয়া যায় না। এগুলো সব হারিয়ে গেছে বলে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানা যায়। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপ ঃ

কবিতা

১. **মরাল**। প্রকাশকাল ঃ ১৩৪১; প্রকাশক ঃ মৌলভী কাজী মৌলা নওয়াজ বি.এ.; সাহিত্যকুঞ্জ, মঙ্গলকোর্ট; প্রিন্টার ঃ মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, মোহাম্মদী প্রেস, ৯১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১০+১১৫। মূল্য ঃ এক টাকা চার আনা।

২. **নীল কুমুদী**। প্রকাশকাল ঃ ১৯৬০; প্রকাশক ঃ নওরোজ পাবলিশিং

হাউস, দিনাজপুর; পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৭০। মূল্য ঃ দুই টাকা।

উপন্যাস

৩. **দুটি পাখি, দুটি তীরে।** প্রকাশকাল ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৭৩; প্রকাশিকা ঃ বেগম আনোয়ারা খাতুন, খামার প্রকাশনী, ঢাকা; প্রচ্ছদশিল্পী ঃ নিতাই কুমার সাহা; পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৮৬। মূল্য ঃ দুই টাকা।

৪. **উতলা সন্ধ্যা।** প্রকাশকাল ঃ উল্লেখ নেই; প্রকাশক ঃ শ্রী যজ্ঞেশ্বর রায় ও তিনকড়ি বারিক; নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ৬৫নং প্যারিদাস রোড়, বাংলা বাজার, ঢাকা-১; প্রচ্ছদপট ঃ শ্রী অনিল চন্দ্র বড়ুয়া; পৃষ্ঠা ঃ ৪+৮০। মূল্যঃ এক টাকা ষাট পয়সা।

৫. **দস্যু লালমোহন** (গোয়েন্দা কাহিনী)। এক সময় এটি সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল।

শিশু-সাহিত্য

৬. **দাদুর বৈঠক।** প্রকাশকাল ঃ ১৯৪৭; কলিকাতা।

অপ্রকাশিত গ্রন্থঃ ১. মরু চন্দ্রিকা (মহানবীর জীবনী কাব্যাকারে রচিত), ২. **মণিদীপ** (কাব্য), ৩. **কালের হাওয়া** (কাব্য), ৪. **চম্পাডাঙ্গার হাট** (কাব্য), ৫. **ইসলামী গাথা ও কাব্য** ইত্যাদি।

কাজী কাদের নওয়াজের অপ্রকাশিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিসমূহ হারিয়ে গেছে বলে আগে উল্লেখ করেছি। হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির মধ্য থেকে উপরোক্ত নামগুলো বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া গেছে। কিন্তু সেসব বইয়ের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম 'মরাল'। এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাও বটে। 'মরাল' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায়ের নামে। উৎসর্গ পত্রটি এরূপ ঃ "স্বনামধন্য রাজা বাহাদুর মণিলাল সিংহ রায় সি.আই.ই. নীতিগুণাকর'কে"। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন ঃ "বিচিত্রা', 'বসুমতী' প্রভৃতি কাগজে কবি কাজী কাদের নওয়াজের অনেকগুলো কবিতা পড়ে অবধি কবির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ খুঁজছিলাম। কবির 'মরাল' নামক কাব্যগ্রন্থখানির ভূমিকা লেখার সূত্র ধরে ভাগ্যক্রমে সেই সুযোগ পেয়ে গেলাম! এই বইখানিতে কবির বাহিরে বাহিরে যে পরিচয় তার চেয়ে অনেক মূল্যবান অন্তরের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ তিনি পাঠকদের দিয়েছেন। এই উভয়দিকের পরিচয়ের সঙ্গে সুদূর আরব্য-পারস্য দেশের জনকয়েক মহাকবির লেখার ও ভাবের সঙ্গে পরিচয় করে নেবার সুযোগ এই বইখানিতে পাওয়া যাবে। আমি সর্বান্তকরণে কবির প্রশংসা করছি। তিনি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা আমার

www.nagorikpathagar.org

মতো অ-কবির পক্ষে সঙ্গত হয় না। আমি উত্তরোত্তর কবির উন্নতি কামনা করছি।

"অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, সি.আই.ই. (ডি.লিট)
কলিকাতা, জোড়াসাঁকো, ১১ বৈশাখ ১৩৪১।"

গ্রন্থটিতে মোট ২২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। বিষয় অনুযায়ী কবিতাগুলোকে মোট তিন পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থভুক্ত 'হারানো টুপী' একটি বিখ্যাত কবিতা। এটি এক সময় স্কুলে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত ছিল। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

১

"টুপী আমার হারিয়ে গেছে
হারিয়ে গেছে ভাইরে
বিহনে তার এই জীবনে
কতই ব্যথা পাইরে;
হাসবে লোকে শুনলে পরে
হারালো সে কেমন করে
কেমন করে বৈশাখ ঝড়
উড়িয়ে দিল মোর সে টুপী
বুঝেছি হায় টুপীর লোভে
দেবতাদেরই এ কার্চ্চুপি।

২

থাক্‌ত টুপী দুপুর রোদে
ছাতার মতই মাথায় মম,
কখনো বা বাতাস পেতাম
ঘুরিয়ে তারে পাখার সম।
বক্ষে তাহার নিতুই প্রাতে
ফুল রেখেছি আপন হাতে
সে ছিল মোর ফুলদানী আর
ফুলের সাজি একসাথে হায়!
জানি নে আজ কোথায় গেছে
কোন দেশে সে কোন অলকায়।

www.nagorikpathagar.org

৩

হয়ত এখন পবন দেবের
মাথায় আছে সেই টুপী মোর,
এদিকে তার বিচ্ছেদে হায়
আমার চোঁখে ঝরতেছে লোর।
ভুলতে নারি টুপীর প্রীতি
জাগছে হৃদে শুধুই স্মৃতি
বিদেশ গেলে বালিশ হ'ত
হায় সে টুপী মোর শিয়রে,
চলতে পথে সেলাম পেতাম
থাক্‌লে টুপী মাথার প'রে।

৪

তিনটী টাকায় কিনেছিলাম
'চাঁদনী হতে সেই টুপীরে
তিনশ টাকা দিবই আজি
পাই যদি ফের তারেই ফিরে।
চার মিনিটে 'চসার' পড়ে
শেষ করেছি টুপীর জোরে
পরীক্ষাতে প্রথম হতাম
থাকলে টুপী মাথার প'রে
দুখের দিনে বন্ধু টুপী
কোথায় গেলি আজকে ওরে।

৫

আজিও হায় নিমন্ত্রণে
গেলে সবার মধ্যিখানে,
সব ভুলি যে প্রথম আমি
তাকাই লোকের মাথার পানে
দেখি কেবল চুপিচুপি
কার শিরে রয় আমার টুপী
মিলে না খোঁজ সভার দিকে
ফিরে আসি শুষ্ক মুখে
নতুন টুপী কিনব না ভাই

www.nagorikpathagar.org

পণ করেছি মনের দুখে।"

পরাধীন ইংরাজ আমলে কবিতাটি রচিত। মূলত কবিতাটিতে আমাদের পরাধীনতার গ্লানিময় জীবনের কথাই রূপকাকারে বর্ণিত হয়েছে। স্বাধীনতা মূলত কবির নিকট স্বীয় মাথার তাজ বা টুপী সদৃশ। স্বাধীনতা হারিয়ে কবি মনোবেদনায় ভুগছেন। স্বাধীনতা মানুষের জীবনে এনে দেয় মর্যাদা। সে মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্য কবির মনে যে উদ্বেগ ও আকাংক্ষা তারই প্রতিফলন ঘটেছে এ কবিতায়। 'হারানো টুপী' ছাপা হওয়ার পর বিভিন্ন লেখক-সম্পাদক এ সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে নিচের উদ্ধৃতি থেকে তা অনুধাবন করা যায় ঃ

"প্রবাসী সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সরাসরি জানালেন– আপনার হাতে মণি-কাঞ্চন আছে, তবু আপনি তা দিতে কার্পণ্য করেছেন কেনো। বঙ্গবাসী সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, চার মিনিটে চসার পড়ে যে কবি 'হারানো টুপি' ফিরে পেতে পারে, আর চার মিনিট যোগ করলেই তো তিনি অমৃত মন্থন করতে পারেন।...বসুমতীর স্বনাম ধন্য সম্পাদক সাহিত্যিক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সগৌরবে বলেন, বাঙলা আর বাঙালীর ইতিহাসে কবি কাদের নওয়াজ অদ্বিতীয় এবং সাহিত্যিকদের সবচেয়ে নিকট বন্ধু।" **(দ্রষ্টব্য ঃ আমার স্মৃতিতে সুন্দর ঃ মনওয়ার হোসেন; সাপ্তাহিক ছুটি, ১৮ শ্রাবণ ১৩৯৭)।**

কাজী কাদের নওয়াজের বিখ্যাত 'মরাল' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর সমকালীন প্রখ্যাত কবি গোলাম মোস্তফা যে মন্তব্য করেছেন তা অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। প্রসঙ্গত নিচে তার অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হলো ঃ "কবি কাদের নওয়াজের কাব্যের কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। তাঁর কাব্যে পারস্য কবিদের সুরের রেশ পাওয়া যায় আর সে সুর সহজেই পাঠক-হৃদয়কে স্পর্শ করে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'মরাল' যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই একথা স্বীকার করবেন। অনুভূতির আন্তরিকতা ও প্রকাশভঙ্গীর ঋজুতা তাঁর কাব্যের আর এক প্রধান গুণ। যা তিনি আপন হৃদয়ে অনুভব করেন তা তিনি অপর হৃদয়ে পৌঁছে দিতেও পারেন। অনুভূতির এই সংক্রমণতাই ত সকল কাব্য-সকল আর্টের সার্থকতার মাপকাঠি। কবি কাদের নওয়াজের কাব্য সে পরীক্ষায় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়ে যায়।"

কাজী কাদের নওয়াজের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'নীল কুমুদী'। এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় কবির বিরহ-যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটেছে। প্রথম যৌবনে কবি তাঁর চাচাত বোনকে বিয়ে করেন। স্ত্রীকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। স্ত্রীও তাঁর প্রতি ছিলেন অতিশয় বিশ্বস্ত। কিন্তু পারিবারিক কলহের কারণে বিয়ের পর দীর্ঘ

www.nagorikpathagar.org

২৭ বছর পর্যন্ত কবি তাঁর স্ত্রীর সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর অবশেষে পিতার অনুমতিক্রমে তিনি পঞ্চান্ন বছর বয়সে স্ত্রীর সান্নিধ্য লাভ করেন। এ কারণে কবির মনে যে বিরহ-যন্ত্রণা জ্বলন্ত অগ্নি-শিখার মতো দাউ দাউ করে জ্বলছিল, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে 'নীল কুমুদী' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এ কাব্য থেকে নিচে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলো ঃ

"অশ্রু-সায়ারে এ মোর নীল-কুমুদী
এতদিন ছিল ব্যথায় বিধুরা বদন মুদি"

(নীল কুমুদী)

"আজি নিরালায় তারি কথা পড়ে মনে
ভুলিতে চেয়েছি যাহারে সংগোপনে।
শরতের চাঁদ পারিতাম যদি হতে
দেখিতাম তারে মুক্ত জানালা-পথে
আকাশ হইলে তারার প্রদীপ জ্বালি
দেখিতাম তারে সারা নিশি চেয়ে চেয়ে।"

(নিরালায়)

"দেখিয়াছ লালা ফুল তাহার হিয়ার মাঝে
দাগ আছে মুছিবার নহে,
তেমনি আমার হৃদে আজো দাগ রহিয়াছে
তিলে তিলে আজো মোরে দহে।"

(স্মৃতি)

"বলে দাও কবে ঝরিয়া পড়িবে
শিউল শেফালী সম।"

(শিউলী ফুল)

"কুলু কুলু আর কল্ কল্ রবে
তুই শুধু কেঁদে চলিস নদী,
আমি ছল ছল চোখে চেয়ে আছি
আমার ব্যথার নাই দরদী।"

(কাঞ্চনের প্রতি)

কাজী কাদের নওয়াজের প্রথম উপন্যাস 'দুটি পাখি, দুটি তীরে'। এটি একটি সামাজিক উপন্যাস। এখানেও কবি-জীবনের বিচ্ছেদের কাহিনী

www.nagorikpathagar.org

প্রচ্ছন্নভাবে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'উতলা সন্ধ্যা' গ্রামীণ পটভূমিতে রচিত আর একটি সামাজিক উপন্যাস।

কবি শিশু-কিশোরদেরকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। সারাজীবন শিক্ষকতা করার কারণে তাদেরকে নিয়েই তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাই শিশু-কিশোরদের উপযোগী অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন তিনি। সহজ-সরল ভাষা, স্বচ্ছন্দ ছন্দ-বিন্যাস ও উপযোগী কাহিনীর সমন্বয়ে রচিত তাঁর শিশু-সাহিত্য এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বিশিষ্ট কবি ও গবেষক ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর এক প্রবন্ধে কাজী কাদের নওয়াজ রচিত 'মণিদ্বীপ', 'কালের হাওয়া' ও 'মরুচন্দ্রিকা' নামক তিনটি কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেগুলোর কোন হদিস পাওয়া যায় না। তাঁর অসংখ্য পাণ্ডুলিপির সঙ্গে এগুলোও হয়ত হারিয়ে গেছে। এছাড়া, মাসিক 'মোহাম্মদী', মাসিক 'শিশু সাথী', মাসিক 'মাহেনও', মাসিক 'খেলাঘর', মাসিক 'নবারুণ', মাসিক 'সবুজ পাতা', 'বিকাশ', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী', 'শুকতারা', 'পাঠশালা', 'রামধনু', 'শীশ মহল', 'মৌচাক', 'প্রবাসী', 'মিনার', 'জলছবি', 'গুলবাগিচা', 'খোকাখুকু', 'মুকুল', 'সমবায়', 'সপ্তডিংগা', 'আলাপনী', 'দৈনিক আজাদ', 'দৈনিক সংবাদ', 'রং মশাল', 'পাকিস্তানী খবর', 'পাক জমহুরিয়াত', 'পাক সমাচার', 'মাসিক দীপক', 'কৃষিকথা', 'ধলেশ্বরী', 'শিশু সওগাত', 'গণদাবী' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

কাজী কাদের নওয়াজের সময়কালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর জন্মের কিছুদিন পরেই বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১) হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (১৯১৪), এর কিছুকাল পরে মুসলিম নবজাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত (১৯২১) হয়। তিনি যখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তখন কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ইত্যাদি আমাদের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশকে উত্তপ্ত করে তোলে। ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর স্বাধীনতা আন্দোলন গতি লাভ করে। তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৩) অশান্ত অবস্থা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী পঞ্চাশের মন্বন্তর, রেনেসাঁ আন্দোলন, ১৯৪৬ সনের গণভোট, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭) ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁর সাহিত্য-চর্চা চলে। এসব রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের সাথে কবি সরাসরি সম্পৃক্ত না হলেও প্রচ্ছন্নভাবে এর কিছু প্রভাব তাঁর লেখার মধ্যে অল্প-বিস্তর পরিলক্ষিত হয়।

অন্যদিকে, রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী সাহিত্যিক প্রভাব-বলয়ে তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে স্বাভাবিকভাবেই পরিলক্ষিত হয়। ঐ সময় হিন্দু-মুসলিম সব কবির মধ্যেই রবীন্দ্র-প্রভাব কম-বেশি লক্ষ্য করা গেছে। রবীন্দ্রনাথের সমকালে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর অসাধারণ প্রতিভার গুণে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধারা সৃষ্টি করেন, তার প্রভাবও কাজী কাদের নওয়াজের উপর পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া, তিরিশোত্তর যুগের বিভিন্ন কবি, পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-৭৯) এবং চল্লিশোত্তর যুগের বিভিন্ন কবির সমকালে তিনি তাঁর কাব্য-চর্চা অব্যাহত রাখেন। ফলে তাঁদের কিছু কিছু প্রভাবও কাজী কাদের নওয়াজের লেখার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে তিনি সমকালীন অবস্থা, সময় ও পরিবেশকে অস্বীকার না করেও সর্বদা একটি স্বতন্ত্র নিজস্ব ধারায় কাব্য-চর্চা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর জীবন-চেতনা ছিল অতি সাধারণ অথচ পরিশীলিত নৈতিক মানে সমুন্নত। তাঁর ভাষা সহজ-সরল। সাধারণ মানুষের জীবন ও প্রকৃতির বর্ণনায় তিনি অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। কাব্যের বিভিন্ন আঙ্গিক ও ছন্দ সম্পর্কে তিনি অতিশয় সচেতন ছিলেন। এজন্য তিনি ছান্দসিক কবি হিসাবেও পরিচিত। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি তাঁর উত্তরসূরীদেরকেও প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও লোক-বিজ্ঞানী ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য ঃ

"সে যুগের প্রায় প্রতিটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা এমনকি প্রথিতযশা হিন্দু সম্পাদকদের পরিচালিত 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শিশু-সাথী', 'পাঠশালা', 'স্বদেশ', বিভিন্ন শিশু বার্ষিকীতেও তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনা প্রকাশিত হত– যে জন্য কবি ছিলেন আমাদের কিশোর বয়সে স্বপ্নের রাজপুত্র।" **(কবি কাদের নওয়াজ ঃ আশরাফ সিদ্দিকী, সাপ্তাহিক অগ্রপথিক, ২৮ পৌষ, ১৩৯৬)।**

কাজী কাদের নওয়াজের জীবনীকার ফারুক নওয়াজ লিখেছেন ঃ "কাজী কাদের নওয়াজ মূলত প্রকৃতিবাদী কবি। দেশ-মাটি-মানুষ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হলেও সেখানে ক্রোধ, বিদ্রোহ কিংবা রাজনৈতিক বিষয়-বক্তব্য স্থান পায় নি। বস্তুজগতের সবকিছুকেই তিনি ভাবগত দৃষ্টি দিয়ে দেখতেন। আর এ কারণেই সম-সাময়িক কবি নজরুল যখন 'বিদ্রোহী', 'দারিদ্র্য', 'মানুষ' ইত্যাদি

www.nagorikpathagar.org

লিখেছেন; প্রেমেন্দ্র মিত্র, বেনজীর আহমেদ যখন জীবনকে খুব কাছে থেকে দেখছেন; কাদের নওয়াজ তখন ছন্দ আর ভাবের সংমিশ্রণে রচনা করেছেন আবেগাশ্রিত কবিতার মেখলা। যুগের হৈ চৈ, হট্টগোলের শব্দ তাঁকে মোটেও বিচলিত করেনি। ফলে তাঁর কবিতা সময়কে স্পর্শ করতে পারেনি ঠিকই তবে, মানুষের হৃদয়ের গভীরে মায়াবি গোলাপ ফোটাতে পেরেছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।...বলা যায়, কাদের নওয়াজ 'আপন মনের মাধুরী' মিশিয়ে নিজের মতো করেই কবিতা লিখতেন। দল-দ্বন্দ্বের ঊর্ধে থেকেছেন সব সময়। এই স্বকীয়তার জন্যই তিনি কখনো বিতর্কিত হননি, চিহ্নিত হননি।" **(কাজী কাদের নওয়াজ ঃ জীবনদর্শন ও সাহিত্য-স্বকীয়তা)।**

কাজী কাদের নওয়াজের স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য-গবেষক আলমগীর জলিল বলেন ঃ "তাঁর কবিতা চিত্র রূপময় বাণী নির্ঝর। সহজ ও স্পষ্ট, কারুকার্যহীন। হয়ত শ্লথ রচনা শৈলীর লেখক হওয়ায় কাজী কাদের নওয়াজ বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ বণিতা ও আপামর জনসাধারণের অভিনন্দিত কবি। কবির ভাব প্রেরণা ও আবেগ খাঁটি বাস্তবাশ্রয়ী নির্ভেজাল উজ্জ্বল ও হৃদয়াবেদ্য। কাহিনী কাব্য দিয়ে শিশুদেরকে নীতি-আদর্শপূর্ণ মহান জীবনে উদ্বুদ্ধ করার পক্ষপাতী তিনি। সে কারণে শিক্ষক কবি তিনি। বিদ্যালয়ের শিশুপাঠ্য গ্রন্থের পরম রঞ্জিত সাহিত্যস্রষ্টা কাদের নওয়াজ শিশুদের সুপরিচিত বস্তু থেকে নিয়ে যান অবাধে অপরিচিত স্বপ্নলোকে; কিন্তু পুনরায় মাটির নরম মমতাময়ী বাস্তব পৃথিবীতে ফিরে আসেন অপূর্ব তৎপরতার সংগে। সেজন্য বস্তু ও স্বপ্ন, লৌকিক ও অলৌকিক জীবনের পরম কথিকা হয়েছে কাজীর শিশু-কবিতা।" **(সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক ঃ আলমগীর জলিল; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা)।**

কাজী কাদের নওয়াজের মৃত্যুর পর 'দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা'র সম্পাদকীয় কলামে কবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয় ঃ "...কাদের নওয়াজ বর্তমান সময়কার এক শ্রেণীর প্রচার ও গ্ল্যামার সচেতন কবিদের মত আত্মপ্রেমী ছিলেন না। তাঁহার কবিতার বিশিষ্ট স্থান জুড়িয়া ছিল এদেশের অনগ্রসর মুসলিম সমাজের কথা। কবি নজরুলের মত তিনিও এই সমাজে জাগানীয়া গান গাহিয়া মানুষের আত্ম ও সমষ্টি চেতনাকে জাগ্রত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। আর এজন্য তিনি সমাজের শুধু একটি অংশের কবি ছিলেন না; ছিলেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কবি; বাঙ্গালী মুসলিম রেনেসাঁর কবি।" **(সম্পাদকীয় কলাম, দৈনিক ইত্তেফাক ঃ ৬ই জানুয়ারি, ১৯৮৩)।**

www.nagorikpathagar.org

ঐ সময় 'বাংলার বাণী পত্রিকা'য় লেখা হয় ঃ "কাদের নওয়াজ মুসলিম রেনেসাঁর যুগে এক খ্যাতিমান কবি ছিলেন।... বাংলা কাব্যে আরবি-ফারসি শব্দ প্রয়োগের প্রতি তাঁর ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। সেকালে যে ক'জন মুসলিম কবি কাব্যচর্চায় নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাদের নওয়াজের বিশিষ্ট আসন ছিল।... তাঁর কাব্য কীর্তি কোনদিন মরে যাবে না। মুসলিম সমাজকে তিনি এক সময় তাঁর কবিতা দিয়ে, শিক্ষার আলো দিয়ে জাগ্রত করে তুলেছিলেন। সময়ের আলোকে হয়তো তিনি বর্তমানকালে তেমনি অগ্রগণ্য হতে পারেন নি, কিন্তু এক সময় তাঁর মতো কবির প্রয়োজন ছিল।... ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।" **(বাংলার বাণী ঃ ৫ জানুয়ারী ১৯৮৩)**।

দীর্ঘ প্রায় ছয় দশক কাল কবি কাজী কাদের নওয়াজ আমাদের সাহিত্যে একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে বিরাজমান ছিলেন। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। জ্ঞান-চর্চা এবং জ্ঞানালোক বিতরণই ছিল তাঁর মহান ব্রত। এ ব্রত পালনে তিনি যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন তেমনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষ। ইংরাজি, বাংলা, আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ার কারণে তিনি ঐসব ভাষার উন্নত সাহিত্যের সাথেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-চর্চায় এর প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্যের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে সুস্পষ্ট।

ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগে তাঁর আগ্রহ প্রবল। তবে অনাবশ্যকভাবে তিনি কখনো এসব শব্দ ব্যবহার করেননি। তাঁর কাব্যের ভাব ও বিষয় যেমন সহজ-সরল, শব্দ-চয়ন ও প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সহজ, স্বাভাবিক ও সাবলীল। অনাবশ্যকভাবে তাঁর ভাব ও বিষয়কে তিনি কখনো জটিল করে তোলেন নি। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তাঁর মধ্যে তেমনি সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই তাঁর বক্তব্য অতি সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে।

কবি যে সময় জন্মগ্রহণ ও সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, সে সময়টি নানাদিক দিয়ে ছিল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংগ্রামমুখর। হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব, মুসলিম পুনর্জাগরণ প্রয়াস, ইংরেজের অধীনতা থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, মুক্তি সংগ্রাম, স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ঐতিহাসিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তিনি সাহিত্য-চর্চায় নিয়োজিত ছিলেন। কাজী কাদের নওয়াজ একজন উচ্চ শিক্ষিত সচেতন মানুষ হিসাবে এসব কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু অনেকটা নির্লিপ্তভাবে সাহিত্য-

www.nagorikpathagar.org

চর্চায় তিনি সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ ছিল প্রবল। তাঁর সাহিত্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। কাদের নওয়াজ মনে-প্রাণে ছিলেন একজন কবি বা সাহিত্যিক। তিনি স্বজাতি ও স্বদেশকে ভালবেসেছেন, স্বজাতির উন্নতি ও কল্যাণে তিনি সর্বদা নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর লেখার মধ্যেও এর প্রতিফলন ঘটেছে। কিন্তু তাঁর স্বাজাত্য-প্রীতি কখনো তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করেনি। তিনি ছিলেন একজন উদার মনের মহৎ মানবিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি। ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন। পেশায় ছিলেন তিনি একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক। শিক্ষক সুলভ পাণ্ডিত্য ও ঔদার্য তাঁর সাহিত্য-কর্মে সর্বত্র বিধৃত। তাঁর রচিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিসমূহ হারিয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন কঠিন হয়ে পড়েছে। এতে আমাদের সাহিত্যেরও এক অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

ফররুখ আহমদ

ফররুখ আহমদ (জন্ম ১০ জুন ১৯১৮-মৃত্যু ১৯ অক্টোবর ১৯৭৪) বাংলা সাহিত্যের একজন মৌলিক প্রতিভাধর শক্তিমান কবি। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁর বর্ণাঢ্য আবির্ভাব। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সনে। কিন্তু এর কয়েক বছর আগে থেকেই তিনি কাব্য-চর্চা শুরু করেন এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয় এবং প্রথম থেকেই একজন প্রতিভাবান নবীন কবি হিসাবে তিনি সকলের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হন। ঐ সময় থেকেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর উপর লেখালেখি শুরু হয়, এমনকি কলকাতা বেতারেও তাঁর উপর আলোচনা সম্প্রচারিত হয়। এভাবে কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাবের স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাবান কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। ফররুখ আহমদকে প্রধানত চল্লিশ দশকের কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হলেও, চল্লিশ পরবর্তী কালেও তিনি বাংলা কাব্যে তাঁর অবদান অব্যাহত রেখেছেন। ১৯৭৪-এ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে তাঁর অবদান সময়ের বিবর্তনে বহুমাত্রিক ও বিচিত্র বর্ণাঢ্য রূপ লাভ করেছে। এটা একজন বড় কবির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-৪৫) পর উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তার ফলে ১৩৫০ সনে (ইংরাজি ১৯৪৩) সৃষ্টি হয় এক ভয়াবহ মন্বন্তর। এ মন্বন্তরে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে করুণ মৃত্যু বরণ করে। এটা ছিল আমাদের ইতিহাসের এক মর্মন্তুদ অধ্যায়। ফররুখ আহমদ সে দুর্ভিক্ষের মর্মন্তুদ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সে বিষয়ে অনেক প্রাণস্পর্শী কবিতা রচনা করেছেন। ঐ দুর্ভিক্ষের জন্য তিনি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা ও একশ্রেণীর স্বার্থপর, অর্থলোলুপ মানুষের হৃদয়হীন শোষণকে দায়ী করেছেন। ঐ সময় লেখা তাঁর প্রায় ১৯টি কবিতায় দুর্ভিক্ষের চিত্র অংকিত ও মানবিক সংবেদনার অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে। দুর্ভিক্ষের আর এক

www.nagorikpathagar.org

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ঐ সময় 'আকাল' নামে যে সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাতে ফররুখ আহমদের লেখা 'লাশ' কবিতাটি স্থান পায়। দুর্ভিক্ষ নিয়ে যাঁরা ঐ সময় কবিতা লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদের কবিতা ছিল অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির, স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও গভীর আবেদন সৃষ্টিকারী। তাঁর উল্লেখিত 'লাশ' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যায়। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। এ কবিতায় শুধু সমকালিন অবস্থার চিত্রই নয়, বরং এক কালোত্তীর্ণ মানবিক আর্তির সকরুণ প্রকাশ ঘটেছে।

চল্লিশের দশকে ইংরাজ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন প্রবলতর হয়। ১৯৪০ সনে লাহোরে 'মুসলিম লীগে'র অধিবেশনে 'লাহোর প্রস্তাব' (যা 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামেও পরিচিত) গৃহীত হবার পর স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ গতি ও মাত্রা যোগ হয়। এ-সময় স্বাধীনতার সপক্ষে গণজাগরণমূলক কবিতা লিখে যাঁরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-৮৩), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-৭৯), মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (১৯০৬-৭৯), কাজী কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-৮৩), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯), আ.ন.ম বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬), ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের সকলের লেখার মধ্যেই ছিল তখন অধঃপতিত মুসলিম জাতির স্বপ্ন-কল্পনা ও নবজাগরণের উদ্দীপনা। কিন্তু এঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদ সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হন। কারণ তাঁর কবিতায় একটি ভিন্ন আমেজ ছিল। অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যের আলোকে সমুদ্ভাসিত তাঁর কবিতা বর্তমানের দুরবস্থার চিত্র ও ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সোনালী দিনের পূর্বাভাস পাঠকের মনকে আপ্লুত করে তোলে। তাই মুসলিম নবজাগরণের কবি হিসাবে নজরুল যে অসাধারণ খ্যাতির অধিকারী, ফররুখ আহমদও তেমনি মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম প্রাণ-পুরুষ হিসাবে বিশেষভাবে পরিচিত।

'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদের প্রথম এবং সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। মূলত এ গ্রন্থে ফররুখ আহমদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও মানবতাবোধের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণে, তাঁদেরকে ঐতিহ্য-সচেতন করে তুলতে এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে এটা এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গ্রন্থে কবির মানবিক সংবেদনার এক উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটেছে। তাই সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে এ গ্রন্থ এক ধ্রুপদ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

ফররুখ আহমদ তাঁর সমকাল ও জীবন বাস্তবতা সম্পর্কে অতিশয় সচেতন ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। দুর্ভিক্ষ, জ্বরা-মৃত্যু,

www.nagorikpathagar.org

নদী-ভাঙন, মানুষের বিচিত্র জীবন-সংগ্রাম, নবজাগরণ, স্বাধীনতার স্পৃহা এমনকি, ১৯৪৭ পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন লেখায় শাসক-শোষক শ্রেণীর বিভিন্ন শোষণ-জুলুম, অন্যায়-অবিচার-বৈষম্য ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহসী উচ্চারণ ফুটে উঠেছে। তাঁর প্রতিবাদের ভাষা সর্বত্র গভীর মানবিক সংবেদনায় উচ্চকিত। তাই তাঁর কাব্য সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবন-স্বপ্ন রূপায়ণে তিনি এক অসাধারণ কবি। ফলে জীবন সংগ্রামে হতোদ্যম, স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনায় ক্লিষ্ট অসহায় মানুষের নিকট তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আশা-আনন্দ ও প্রেরণার চিরন্তন উৎস।

ফররুখ আহমদ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে গীতি কবিতা, গান, মহাকাব্য, সনেট, নাট্যকাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা, শিশুতোষ কবিতা, গল্প, উপন্যাস ও গদ্যরচনায় তিনি পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তবে তিনি মূলত কবি এবং কবি হিসাবেই তাঁর প্রতিভার আত্যন্তিক বিকাশ ঘটেছে। তাঁর কাব্যের ভাষা ও বুননে যে বিস্ময়কর শিল্প-নৈপুণ্য ও স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তা তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিধর মৌলিক প্রতিভাধর কবির মর্যাদা দান করেছে। তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

১. সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪), ২. আজাদ করো পাকিস্তান (১৯৪৬), ৩. সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২) ৪. নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১), ৫. মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৩), ৬. ধোলাই কাব্য। (ফররুখ আহমদের ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন। সংগ্রহ ও সম্পাদনায় ঃ ফারুক মাহমুদ। প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৬৩), ৭. হাতেম তা'য়ী (১৯৬৬), ৮. পাখির বাসা (১৯৬৫), ৯. হৃফরের ছড়া (১৯৬৮), ১০. নতুন লেখা (১৯৬৯), ১১. ছড়ার আসর (১) (১৯৭০), ১২. নয়া জামাত (প্রথম ভাগ) (১৯৫০), ১৩. নয়া জামাত (দ্বিতীয় ভাগ)। (১৯৫০), ১৪. নয়া জামাত (তৃতীয় ভাগ) (১৯৫০), ১৫. নয়া জামাত (চর্তুথ ভাগ) (১৯৫০), ১৬. ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭৫),। সম্পাদক ঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ। ১৭. হে বন্য স্বপ্নেরা (কবি-পরিকল্পিত। সম্পাদক ঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী–১৯৭৬), ১৮. মুহূর্তের কবিতা (সম্পাদকঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী–১৯৭৮), ১৯. ফররুখ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ও আব্দুল মান্নান সৈয়দ–১৯৭৯), ২০. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮০), ২১. চিড়িয়াখানা (১৯৮০), ২১. কাফেলা (১৯৮০), ২২. হাবেদা মরুর কাহিনী (১৯৮১), ২৩. সিন্দাবাদ (সম্পাদক ঃ আখতার-উল-আলম–১৯৮৩), ২৪. ফুলের জলসা (১৯৮৫), ২৫. তসবিরনামা (১৯৮৬), ২৪.

www.nagorikpathagar.org

কিস্‌সা কাহিনী (১৯৮৪), ২৫. ধোলাই কাব্য (ফররুখ আহমদ লিখিত ভূমিকা সংযোজিত। ভূমিকায় কবি এটিকে 'ধোলাই কাব্যের পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত–অতীব পরিষ্কার সংস্করণ', 'সহীহ বড় সংস্করণ' বলে উল্লেখ করেছেন–১৯৮৬), ২৬. মহফিল (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (১৯৮৭), ২৭. ফররুখ আহমদের গল্প (সম্পাদক ঃ আব্দুল মান্নান সৈয়দ–১৯৯০), ২৮. নির্বাচিত কবিতা (সম্পাদকঃ ঐ–১৯৯৫), ২৯. ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য (১৯৯১), ৩০. দিলরুবা (১৯৯৪), ৩১. ফররুখ আহমদ রচনাবলী, প্রথম খণ্ড (১৯৯৫), ৩২. ফররুখ আহমদ রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৯৬)।

এছাড়া, ফররুখ আহমদ রচিত আরো যেসব পাণ্ডুলিপির পরিচয় পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

৩৩. অনুস্বর (ব্যঙ্গ কবিতা) (১৯৪৪-৪৬), ৩৪. বিসর্গ (ব্যঙ্গ কবিতা) (১৯৪৬-৪৮), ৩৫. হাল্কা লেখা, ৩৬. তস্‌বিরনামা, ৩৭. রসরঙ্গ, ৩৮. রক্ত গোলাপ (গানের সংকলন), ৩৯. কাব্যগীতি, ৪০. রাজ-রাজরা (গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা), ৪১. ছড়ার আসর (২), ৪২. ছড়ার আসর (৩), ৪৩. সাঁঝ সকালের কিস্‌সা, ৪৪. আলোকলতা, ৪৫. খুশির ছড়া, ৪৬. মজার ছড়া, ৪৭. পাখির ছড়া, ৪৮. রং মশাল, ৪৯. জোড় হরফের ছড়া, ৫০. পড়ার শুরু, ৫১. পোকামাকড়, ৫২. কুরআন মঞ্জুষা, ৫৩. আমপারা (কুরআন শরিফের ২৯টি সূরার অনুবাদ), ৫৪. সিকান্দার শা'র ঘোড়া (একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস), 'মৃত্তিকা' পত্রিকার আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৫৩ সংখ্যায় 'এ কোন দেশ' ও 'সীমানা' –এ শিরোনামে উক্ত উপন্যাসের আংশিক প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়া, ফররুখ আহমদের কিছু প্রবন্ধ রয়েছে যা আজও পুস্তকাকারে প্রকাশিত বা গ্রন্থিত হয় নি। তাঁর রচিত বইয়ের উপরোক্ত তালিকা যে সম্পূর্ণ তাও নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। ফররুখ আহমদ বিশ্ববিখ্যাত কয়েকজন উর্দু ও ফারসি কবির কবিতাও অনুবাদ করেছেন। এর মধ্যে পাকিস্তানের দার্শনিক কবি ইসলামী পুনর্জাগরণের অন্যতম দিশারি মহাকবি আল্লামা ইকবাল, পাকিস্তানের মরমি কবি শাহ আব্দুল লতিফ ভিটাই, প্রখ্যাত উর্দু কবি আলতাফ হোসেন হালী এবং ইরানের বিশ্ববরেণ্য সুফী কবি হাফিজ ও শেখ সাদী (রহঃ)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবির এ-সকল অনুবাদ কবিতার সবগুলোই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, অন্যান্য কবির অনূদিত বিভিন্ন কবিতার সংকলনেও স্থান পেয়েছে। তবে সবগুলো কবিতা গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে কিনা তা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। অনুবাদ

www.nagorikpathagar.org

কবিতার মধ্যে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। এগুলোর মধ্যেও তাঁর প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছে।

ফররুখ আহমদ শিল্প-সচেতন কবি। রং, বর্ণ, সুর-ছন্দ ও শব্দের অপরূপ ব্যবহারে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। আধুনিক কাব্যরীতি, অলংকার-প্রতীক-উপমা-রূপক-রূপকল্প ইত্যাদি ব্যবহারে তিনি স্বাতন্ত্রিক মহিমায় উজ্জ্বল। কাব্য-ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) ছিলেন তাঁর আর্দশ। মাইকেলের বিখ্যাত 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে তিনি অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন। ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার সুবাদে প্রখ্যাত ইংরাজ কবিদেরও তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁদের অনেক কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। মাইকেল ও আধুনিক ইংরাজ কবিদের অসংখ্য কাব্য-কবিতা পাঠের ফলে আধুনিক কাব্য-কলা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল পর্যাপ্ত। তাঁর সে অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব কাব্যের অপরূপ সৌন্দর্যময় ভুবন নির্মাণে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

ফররুখ আহমদ তাঁর নিজস্ব কাব্য-ভাষা সৃষ্টিতে বিরল কৃতিত্বের অধিকারী। এটা যে-কোনো বড় কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমাদের ঐতিহ্যপূর্ণ পুঁথি সাহিত্যের প্রতি ফররুখ আহমদের প্রবল অনুরাগ ছিল। পুঁথি সাহিত্য বাংলা ভাষার এক বিশাল সম্পদ। পুঁথির ভাষা, পুঁথির কাহিনী ও তার আবহ ফররুখের কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করেছে। পুঁথির ভাষা ও কাহিনীকে আধুনিক রুচি ও উপযোগিতায় এবং জাতীয় নবজাগরণ ও সংগ্রামী প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। পুঁথি সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের একান্ত নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য। ইংরাজ আমলে আমাদের এ গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হলেও কাজী নজরুল ইসলাম সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে পুঁথির ভাষা অর্থাৎ, আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ সংবলিত বাংলা ভাষার ব্যবহারে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বাংলা ভাষার যে একটি স্বতন্ত্র মহিমান্বিত 'মুসলমানী ঢং' আছে, তার বলিষ্ঠ পরিচয় তুলে ধরেন নজরুল। নজরুল-প্রদর্শিত এ পথে কাব্য-চর্চা করে পরবর্তীতে অনেক বাঙালি মুসলিম কবি বিশেষ কৃতিত্ব ও সাফল্য অর্জন করেন। এক্ষেত্রে নজরুলের পরে জসীমউদ্দীন ও ফররুখ আহমদের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব সর্বজন স্বীকৃত। নিজস্ব কাব্য-ভাষা নির্মাণের অসাধারণ দক্ষ কারিগর হিসাবে নজরুল যে সাফল্য অর্জন করেন, পরবর্তীতে জসীমউদ্দীন ও ফররুখ আহমদও তেমনি স্ব স্ব কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হন।

www.nagorikpathagar.org

ফররুখ আহমদ ঐতিহ্য-সচেতন কবি। যে-কোনো বড় কবির মধ্যেই ঐতিহ্য-চেতনা প্রবলভাবে কাজ করে। ঐতিহ্য-চেতনাহীন কোন কবি-শিল্পীর পক্ষে কখনও কোন মহৎ ও অমর সৃষ্টি-কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব নয়। গ্রীসের জাতীয় কবি হোমার, ইংরাজ কবি ভার্জিল, মিল্টন, টি.এস. ইলিয়ট, ফারসি কবি ফেরদৌসী, পাকিস্তানের কবি মোহাম্মদ ইকবাল, বাংলা ভাষার কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিশ্ব-বিখ্যাত সকল কবিই ঐতিহ্য-সচেতন। ঐতিহ্য-চেতনা তাঁদেরকে জাতির মহৎ চিন্তা-কল্পনা, স্বপ্ন-বাসনাকে রূপায়িত করার প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁদের সকলের ঐতিহ্য এক বা অভিন্ন নয়। স্ব-স্ব ঐতিহ্যে লালিত ও সংলগ্ন থেকে তাঁরা তাঁদের স্বীয় সৃষ্টিকর্মে নিয়োজিত হয়ে জনপ্রিয় অমর কবির মর্যাদা লাভ করেছেন। ফররুখ আহমদও তাঁর স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর সাথে একান্ত সংলগ্ন থেকে কাব্য-চর্চায় ব্রতী হন। এ কারণে তাঁর কাব্যে এক সর্বজনীন ও চিরন্তন আবেদন সৃষ্টি হয়েছে।

ফররুখ আহমদ একাধারে ঐতিহ্যাশ্রয়ী, রোমান্টিক ও মানবতাবাদী কবি হিসেবে সুপরিচিত। ঐতিহ্য-প্রীতি, মানুষের প্রতি প্রেম ও গভীর সহানুভূতি তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছে উন্নত মানবিকবোধের। তাঁর কাব্যের সর্বত্র এর প্রকাশ সুস্পষ্ট। বিভিন্ন ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক চরিত্র নির্মাণ ও মানবিক সংবেদনা সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি এ মানবতাবোধের সর্বোত্তম রূপায়ণ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছেন। রোমান্টিক কবি হিসাবে তিনি ছিলেন সৌন্দর্য-পিয়াসী, স্বপ্নচারী ও সত্য-সুন্দর কল্যাণের প্রত্যাশী। তাঁর কবিতায় স্বপ্নচারিতা ও আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। তিনি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে যেমন মুগ্ধ, তেমনি অসীম নীলাকাশ, সীমাহীন সমুদ্র এবং দিগন্ত-বিস্তারী মরুভূমির সৌন্দর্যও তাঁকে বিপুলভাবে আকর্ষণ করেছে। রোমান্টিক কবি-কল্পনার আল্পনা মিশিয়ে এসব সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যে। এদিক দিয়ে তিনি এক বিশ্বজনীন, উদার, মানবিক কবি-মনের অধিকারী। তাঁর কবিতার ক্যানভাস তাই যেমন বিচিত্র ও দিগন্তচারী, তেমনি নানা বর্ণ-সুষমায় বর্ণাঢ্য-সমুজ্জ্বল।

ফররুখ আহমদকে অনেকে ইসলামী রেনেসাঁ ও মুসলিম ঐতিহ্যের কবি বলে অভিহিত করে থাকেন। তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁর কবি বলা হয়, কারণ তাঁর কবিতায় ইসলামী পুনর্জাগরণের স্পৃহা বিদ্যমান। মুসলিম ঐতিহ্যের কবি বলা হয় একারণে যে, তাঁর কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য-চেতনা বিধৃত হয়েছে। কবি তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্বে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ অনেক স্মরণীয় কবিতা রচনা করলেও পরবর্তীতে তিনি তাঁর স্বীয় ধর্ম ও ঐতিহ্য থেকে গভীর

www.nagorikpathagar.org

অনুপ্রেরণায় দীপ্ত হয়ে কাব্য-চর্চায় ব্রতী হন। এটা তাঁর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব আদর্শ রয়েছে। কবি-শিল্পী ও প্রতিভাবান ব্যক্তিরাও এর ব্যতিক্রম নন। বিশ্ব-বরেণ্য বহু কবি নিজ-নিজ ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কাব্য-চর্চা করেছেন। ধর্মবোধ তাঁদের শিল্প-চেতনাকে কোনোভাবেই খর্ব করে নি। ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েও তাঁরা সকলেই বিশ্ব-খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাছাড়া, আমরা কোন কবির বিশেষ ধর্মবোধের কারণে তাঁর কাব্য পাঠ করি না এবং কাব্য পাঠের ফলে আমরা তাঁর ধর্মবোধেও তাড়িত হই না। কবির মহত্তম শিল্প-কর্মই আমাদেরকে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে। ফররুখ আহমদও ধর্মবোধে উদ্বুদ্ধ এক অসাধারণ শিল্পী-কবি। তবে একথা ঠিক যে, তাঁর ধর্মবোধের জন্য নয়, তিনি তাঁর মহত্তম শিল্প-গুণের জন্যই মুলত কবি হিসাবে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী। অবশ্য তাঁর ধর্মবোধ তাঁকে নিঃসন্দেহে মহত্তম মানবিক বোধে উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রত্যেক প্রতিভার মূল্যায়নে ব্যক্তি-পরিচয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি হিসাবে ফররুখ আহমদ ছিলেন অসাধারণ মানুষ। তিনি একজন সহজ-সরল, নিরহংকার-ন্যায়পরায়ণ, দৃঢ়চেতা-নির্লোভ, সৎ ও স্পষ্টভাষী ব্যক্তি হিসাবে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ব্যক্তি-জীবনে তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাঁর আচার-আচরণে এবং লেখায় তারই বিশ্বস্ত প্রতিফলন ঘটেছে। সত্য-সুন্দর-কল্যাণে বিশ্বাসী কবির লেখা তাই মানুষের নিকট চিরন্তন আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। প্রখর নীতিবোধ ও আদর্শবোধে দীপ্ত কবি সারা জীবনই দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করলেও কখনো কারো কাছে কোন কারণে তিনি নতজানু হন নি। তাঁর কবিতার মধ্যেও তাঁর সে বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের বাণী সমুচ্চারিত।

ফররুখ আহমদের কাব্যের ভাব ও বিষয় বহু বিচিত্র। সেখানে ইসলামী আদর্শ, মুসলিম-ঐতিহ্য এবং আরব্যোপন্যাসের কথা যেমন রয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের প্রকৃতি, ফুল-পাখি, পাহাড়-নদী, সাধারণ মানুষের জীবন-বৈচিত্র্য, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও জীবন সংগ্রামের বিচিত্র বিষয়ও অপরূপ কাব্য-ভাষায় আভরণমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। তাই কোন একটি বিশেষ অভিধায় কবিকে অভিহিত করলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া দুষ্কর। তবে এককথায় তাঁকে মানবতাবাদী, ঐতিহ্য-সচেতন, সত্য-সুন্দর-কল্যাণের কবি বলে অভিহিত করাই সংগত।

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি হিসাবে অসাধারণ কাব্য-নৈপুণ্যে, স্বতন্ত্র কাব্য-ভাষা নির্মাণে, বলিষ্ঠ মানবিক সংবেদনা সৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি

www.nagorikpathagar.org

নবজাগরণের প্রেরণা সৃষ্টিতে ফররুখ আহ্‌মদের কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। এ কারণে তিনি বাংলা কাব্যে চির অমর ও কালজয়ী প্রতিভা হিসাবে সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যে-কোনো কবির আদর্শ, বোধ-বিশ্বাস ও মহৎ চিন্তা-চেতনা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু শুধু এগুলোর জন্যই কখনো কোন কবি অমরত্ব লাভে সক্ষম হন না। কাব্য-গুণে ও শিল্প-নৈপুণ্যে তাঁর সৃষ্টিকর্ম কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ সেটাই হয় তাঁর প্রতিভা বিচারের ও অমরত্ব লাভের প্রধান মাপকাঠি। ফররুখ আহ্‌মদ নিঃসন্দেহে এ মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ এক কালজয়ী মহৎ কবি-প্রতিভা।

www.nagorikpathagar.org

তালিম হোসেন

তালিম হোসেন (জন্ম- ২৯ অক্টোবর ১৯১৮, মৃত্যু- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯) একজন স্বল্পপ্রজ দীপ্তিমান কবি। বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। তিনি কবিতা, গান ও গদ্য রচনায় সমভাবে দক্ষ ছিলেন। তাঁর সমকালে তিনি একজন খ্যাতিমান কবি, লেখক ও সম্পাদক হিসাবে সর্বমহলে সমাদৃত ছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। ঢাকায় 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার জন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

কবি তালিম হোসেন নওগাঁ জেলার চাকরাইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তৈয়ব উদ্দীন চৌধুরী, মাতা গোলেজার বানু। পিতা তৈয়ব উদ্দীন ছিলেন লেখক, সংস্কৃতিসেবী, সমাজ-সচেতন, গুণগ্রাহী ব্যক্তি। মা ছিলেন সুফী পরিবারের মেয়ে। বাবা-মা উভয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও প্রভাবে কেটেছে তালিম হোসেনের শৈশব ও কৈশোর জীবন। পিতা ভূপতি ও সমাজপতি হয়েও সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী হওয়ায় সমাজের গ্লানিময় দিকগুলোর কঠোর সমালোচনা করে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এধরনের একটি কবিতার সংকলন হলো 'নক্‌শা'।

গ্রামের স্কুলেই তালিম হোসেনের লেখাপড়ায় হাতে-খড়ি। অতঃপর তিনি কীর্তিপুর হাইস্কুল ও নওগাঁ কে.ডি. হাইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি প্রথমে রাজশাহী কলেজ এবং পরে করটিয়া সা'দৎ কলেজে ভর্তি হন। তখন সা'দৎ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক ইব্রাহিম খাঁ। ইব্রাহিম খাঁর স্নেহ-ছায়ায় তালিম হোসেনের কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে। কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তখন তাঁর কবিতা ছাপা হতে থাকে। কিছুটা ছন্নছাড়া, অনিয়মতান্ত্রিক ও স্বাধীনচেতা তালিম হোসেন করটিয়া সা'দৎ কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করে বাংলাতে অনার্স নিয়ে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরীক্ষা দেন কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে।

www.nagorikpathagar.org

তালিম হোসেনের প্রথম কবিতা ছাপা হয় এস. ওয়াজেদ আলী সম্পাদিত 'গুলিস্তাঁ পত্রিকা'য়। অতঃপর ১৯৩৭ সনের দিকে যখন তিনি মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র, তখন থেকেই 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সওগাত', 'দৈনিক আজাদ'সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, সাহিত্য-সমালোচনা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। ১৯৪০ সনে মুসলিম লীগ কর্তৃক ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তান আন্দোলন জোরদার হওয়ার প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সনে কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান 'রেনেসাঁ সোসাইটি' গঠিত হয়। সোসাইটির উপদেষ্টা ছিলেন 'দৈনিক আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং আহবায়ক ছিলেন দৈনিক আজাদের সিনিয়র সহকারী সম্পাদক খ্যাতনামা সাংবাদিক-সাহিত্যিক মুজীবুর রহমান খাঁ। দৈনিক আজাদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, মোহাম্মদ মোদাব্বের, জহুর হোসেন চৌধুরী, মোহাম্মদ খায়রুল আনাম খাঁ, সৈয়দ সাদেকুর রহমান, আব্দুল হাই, আনোয়ার হোসেন, ডা. ফজলুল করীম খাঁ ও মোশাররফ হোসেন ছিলেন সোসাইটির সদস্য। পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দীপনা ও মুসলিম নবজাগরণের চেতনায় তখন সকলেই ছিলেন বিশেষভাবে উদ্দীপ্ত। এ রাজনৈতিক-সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় তালিম হোসেনের সাহিত্য-চর্চা স্ফূর্তি লাভ করে।

১৯৪২ সনে 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র উদ্যোগে কলকাতায় এক সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসাইন। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। প্রবীণদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল হাশেম, ডক্টর আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, কবি শাহাদৎ হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ, এস. ওয়াজেদ আলী, নরেন দেব, রাধা রাণী দেবী, গোপাল হালদার, মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ প্রমুখ। নবীনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, তালিম হোসেন প্রমুখ। তালিম হোসেন এ সময় থেকেই রেনেসাঁ সোসাইটির বিভিন্ন কাজের সাথে নিজেকে সোৎসাহে সংম্পৃক্ত করে ফেলেন। ছাত্র-জীবন থেকেই ইসলামের উদার মানবিক আদর্শের প্রতি তালিম হোসেন গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন এবং তাঁর কবিতা ও অন্যান্য লেখায় এ ভাবের প্রতিফলন ঘটে।

১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে কায়দে আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ কলকাতা এলে ঐতিহাসিক গড়ের মাঠে তিনি যে বিশাল জনসভায় ভাষণ

www.nagorikpathagar.org

দেন, সেখানে তালিম হোসেন তাঁর নিজের লেখা এবং স্বসুরারোপিত 'পাকিস্তান আজাদ' গানটির কোরাস পরিচালনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল তরুণ সঙ্গীত-শিল্পী এবং কোরাসের সঙ্গে ড্রাম-বিউগলসহ অর্কেস্ট্রা পরিবেশিত হয়। ভরাট গলার উদাত্ত সুরের গানটি উপস্থিত জনচিত্তে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এরপর ঐ গানটি অবিভক্ত বাংলা এবং আসামের বহু অঞ্চলে স্বাধীনতার প্রাক্কালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কলকাতার গ্রামোফোন কোম্পানী গানটির একটি রেকর্ডও বের করে। এভাবে স্বাধীনতার প্রাক্কালে তালিম হোসেনের জাগরণমূলক গান, কবিতা ইত্যাদি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং বাঙালি মুসলিম নবজাগরণে ও পাকিস্তান আন্দোলনে তা গভীর অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

১৯৪০ সনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হবার পর ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কাল পর্যন্ত সময়টাকে বিশেষভাবে 'রেনেসাঁর যুগ' বা বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের স্বর্ণালী যুগ বলে আখ্যায়িত করা চলে। এ রেনেসাঁর প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত; তমদ্দুন, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে। এর মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণ ও উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র, স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। উক্ত রেনেসাঁ আন্দোলনের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ বাহার, আবুল মনসুর আহমদ, মুজীবুর রহমান খাঁ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, মোহাম্মদ নাসির আলী, ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আব্দুল মওদুদ, বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখ। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, খাজা নাজিম উদ্দীন, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, আবুল হাশেম, মৌলবী তমিজ উদ্দীন খাঁ, নূরুল আমীন প্রমুখ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও নানাভাবে এ রেনেসাঁ আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেছেন।

কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে এ সময় রেনেসাঁর নিশানবরদার ছিলেন কবি শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বেনজীর আহমদ, বেগম সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, মোফাখ্খারুল ইসলাম, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল হোসেন প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন ফররুখ আহমদ। এ রেনেসাঁর বা নবজাগরণের উদ্দীপনাপূর্ণ আবহাওয়ায় তালিম হোসেনের কবি-প্রতিভার সম্যক প্রকাশ ঘটে। রেনেসাঁর আদর্শ, লক্ষ্য ও ভাবধারা তালিম হোসেনকে তাঁর কাব্য রচনায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সনে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে তালিম হোসেনের কর্ম-জীবনের শুরু। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও তিনি কিছুকাল কলকাতায় অবস্থান করেন। অতঃপর ১৯৪৯ সনে তিনি কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় এসে তিনি প্রথমে মোহাম্মদ মোদাব্বের সম্পাদিত 'দৈনিক মিল্লাতে'র সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫২ সনে পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'মাহে নও'-এর সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘদিন কর্মরত থেকে ১৯৭৬ সনে অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পূর্বতন মাসিক 'মাহে নও' পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে নতুন নাম হয় 'পূর্বাচল'। তিনি পূর্বাচলেরও সম্পাদক ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও তামদ্দুনিক চিন্তার ক্ষেত্রে এবং সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার সাথে তালিম হোসেন নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। তালিম হোসেনের কবি-কল্পনা ও ভাব-চেতনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল ইসলামের উদার মানবিক আদর্শে, রেনেসাঁর উদ্দীপ্ত আবহের মধ্যে। তাই তাঁর চিত্তলোক ছিল সকল সংকীর্ণতার উর্ধে। কবি-সুলভ উদারতা ও মানবিক মূল্যবোধে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল, মহীয়ান।

তালিম হোসেনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি সম্ভবত তাঁর উদ্যোগে গঠিত 'নজরুল একাডেমী'। বাঙালি মুসলমানের নবজাগরণে কাজী নজরুল ইসলামের ভূমিকা ছিল অনন্য ও অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃত ও ব্যাপক নজরুল চর্চার মাধ্যমে মুসলিম নবজাগরণের উদ্দীপনা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াসে, আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বতন্ত্র ধারাকে অব্যাহত রাখার মানসে এবং সর্বোপরি সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও মানবিক আদর্শকে সমুন্নত রাখার উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই তিনি কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৪ সনের ২৪ মে 'নজরুল একাডেমী'র সংগঠনী কমিটি গঠিত হয় নিম্নোক্তভাবে ঃ

সভাপতি ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন

সাধারণ সম্পাদক ঃ তালিম হোসেন

কোষাধ্যক্ষ ঃ এ.কে. এম. নূরুল ইসলাম (পরে বিচারপতি ও বাংলাদেশের উপ-রাষ্ট্রপতি)

নির্বাহী সদস্যবর্গ ঃ প্রিন্সিপ্যাল ইব্রাহিম খাঁ, কবি সুফিয়া কামাল, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, সিরাজুদ্দীন হোসেন, শিল্পী আবুল কাসেম, মোসলেম

www.nagorikpathagar.org

আহমদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, জাহানারা আরজু ও মাফরুহা চৌধুরী।

একাডেমীর অস্থায়ী অফিস হিসাবে কোষাধ্যক্ষ এ.কে.এম. নূরুল ইসলামের ১১নং র‍্যাংকিন স্ট্রীটের বাড়ি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৬৭ সনে একাডেমীর গঠনতন্ত্র তৈরি হলে, গঠনতন্ত্র মোতাবেক নতুন কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন বিচারপতি আব্দুল মওদুদ। সহ-সভাপতি আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ও সাব্বির আহমদ চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন তালিম হোসেন। কোষাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম এবং সদস্যবর্গ হলেন ঃ আকবর উদ্দীন, বে-নজীর আহমদ, মোহাম্মদ মোদাব্বের, খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন, মুজীবুর রহমান খাঁ, এ.এস.এম. নূর মোহাম্মদ, এ.আর. ভূঁইয়া, মোহাম্মদ নাসির আলী, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কাজী নজমুল হক, শেখ মোসলেম আহমদ, জাহানারা আরজু ও মাফরুহা চৌধুরী।

তালিম হোসেন তাঁর সৃজনী প্রতিভা, সঙ্গীতানুরাগ, সাংগঠনিক যোগ্যতা এসবের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়োজিত করেছিলেন নজরুল একাডেমীর প্রতিষ্ঠা ও এর উত্তরোত্তর উন্নতি সাধন ও বিবিধ কার্যক্রমে। নজরুল সাহিত্যের চর্চা ও গবেষণা, নজরুল সঙ্গীত সংগ্রহ, চর্চা ও সংরক্ষণে তাঁর নিরলস সাধনা, যথার্থ গুণী লোকদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল চর্চার ক্ষেত্রে এবং নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিসিক্ত করতে তালিম হোসেনের নিরলস চেষ্টা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একারণে তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি-কর্ম সম্পর্কে তিনি অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েন। নজরুলের বিশাল কালজয়ী প্রতিভার সার্বিক পরিচয় তুলে ধরার জন্য তিনি স্বকীয় মহৎ শিল্পী-সত্তাকে অনেকটা বিসর্জন দেন। তাঁর এ মহৎ আত্মত্যাগ প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক মাইল ফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অন্যান্য যাঁরা তাঁকে সহযোগিতা দিয়েছিলেন অথবা একইক্ষেত্রে যাঁরা ভিন্নভাবে কাজ করেছেন, তাঁদের অবদানও বিস্মৃত হওয়ার নয়।

যেসব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে তালিম হোসেন বিভিন্ন সময় জড়িত ছিলেন তার একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

- নজরুল একাডেমী, প্রথমে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, পরে সভাপতি
- পাকিস্তান মজলিশ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
- বাংলা একাডেমীর প্রথম নির্বাহী পরিষদের সদস্য
- রওনক সাহিত্য সংস্থা ও পাকিস্তান রাইটার্স গিল্ড-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
- পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি, পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলনসহ

www.nagorikpathagar.org

বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংস্থা ও আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন।

তালিম হোসেনের প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থের তালিকা ঃ

- **কাব্যগ্রন্থ** ঃ ১. দিশারী (১৯৫৬), ২. শাহীন (১৯৬২), ৩. নূহের জাহাজ (১৯৮৪), ৪. কবিতা সমগ্র (১৯৯৮)।
- **অনুবাদ** ঃ ১. স্বর্গচারণ (জন স্টেইনবার্গকৃত Pastures of Heaven উপন্যাসের অনুবাদ), ১৯৫৯, ২. এন্ড্রু কার্নেগী (জীবনী গ্রন্থের অনুবাদ), ১৯৬২, ৩. কুরআন ব্যাখ্যার নয়াপদ্ধতি (ইসমাইল আল ফারুকী রচিত গ্রন্থের অনুবাদ), ১৯৮০।
- **শিশুতোষ রচনা** ঃ ধাইকিড়ি ধাইকি, ১৯৮১।
- **সংকলন** ঃ ইসলামী কবিতা, ১৯৮২।

তালিম হোসেনের অগ্রন্থিত ও গ্রন্থভুক্ত মোট ২৩৬টি কবিতা, ছড়া, ব্যঙ্গ ও অনুবাদ কবিতা কবি-স্ত্রী মাফরুহা চৌধুরী সম্পাদিত 'কবিতা সমগ্রে' প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও তাঁর অনেকগুলো প্রবন্ধ, অনুবাদ, ছোটগল্প, শিশু-কিশোর গল্প এখনো অগ্রন্থিত রয়েছে।

তালিম হোসেনের মৌলিক কবিতাগ্রন্থের সংখ্যা মাত্র তিনটি। তাঁর প্রতিভার তুলনায় সৃষ্টির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। এজন্য পাঠকের মনে গভীর দুঃখবোধ থাকলেও তাঁর সৃষ্টির গুণগত দিক বিবেচনা করে বোদ্ধা পাঠক যথেষ্ট পরিতৃপ্তি লাভ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির এক দশক পূর্ব থেকে তাঁর কাব্য-চর্চা শুরু হয় এবং এ সময়টি তাঁর সর্বাধিক সৃষ্টিমুখর দশক হিসাবে চিহ্নিত। সমকালীন যুগ-পরিবেশ, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা ও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ঘনিষ্ঠ প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর এ সময়কার বিভিন্ন লেখায়। তাঁর পরবর্তী কালের রচনাতেও আমরা এর সম্যক প্রতিফলন লক্ষ্য করে থাকি। এদিক দিয়ে তালিম হোসেন ছিলেন একজন বাস্তববাদী, সমাজ-সচেতন ও মানবতাবাদী কবি। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে এর সুস্পষ্ট পরিচয় লক্ষ্যযোগ্য। এছাড়া, স্বদেশপ্রেম, স্বাজাত্যপ্রীতি ও মানবতাবোধ তাঁর কাব্যের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। এ কারণে তালিম হোসেন শুধু সমকালীন নন, তাঁর কাব্যের আবেদন চিরন্তন।

তালিম হোসেনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দিশারী' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সনে। কবি তাঁর বাবার নামে এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ-পত্রে তিনি লেখেন ঃ

"ধর্মসহ সমস্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও অনুরক্তির প্রতি যাঁর প্রথম সমালোচনামূলক মনোভঙ্গী শৈশব থেকেই আমাকে সংশয় ও যুক্তিবাদের পথে ঠেলে দিয়েছে ; অথচ সেই সাথে বারে বারে আহত হওয়া সত্ত্বেও ভগ্ন না হয়ে আমার প্রতি যাঁর দুর্মর স্নেহ ও আস্থা আমার মানস-সংগঠনে অলক্ষ্যে এক পরম লক্ষ্যের দ্যোতনা জাগিয়েছে;

www.nagorikpathagar.org

স্বয়ং সাহিত্যিক ও আমার সাহিত্য-জীবনের জনক বাবাকে দিলাম।"

'দিশারী' কাব্যগ্রন্থে মোট ২৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলো মূলত রেনেসাঁ-যুগে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির প্রাক্কালে রচিত। তাই এতে জাগরণমূলক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। ইসলামী আদর্শ, মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, নতুন রাষ্ট্র গঠনের আবেগ-উদ্দীপনা এসব কবিতার অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। 'দিশারী'র প্রথম কবিতায় কবি বলেন ঃ

"শতকের নিশি-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে
সন্ধানী দীপ আমার জোহরা তারা
কোথায় কখন নীহারিকা পথে ফিরে
সুপ্তির ক্ষণে অলক্ষ্যে হ'লো হারা।
সেই তারা-দীপ জ্বালব আবার আমি–
এখানে আমার কাফেলা যাবে না থামি'।
জিন্দেগানীর আজাদী-সনদ
এনেছি আল-কোরান,
এনেছি দিশারীর আল-আমীনের
তওহিদী ফরমান।
মানুষের প্রভু কেহ নাই আর
এক আল্লাহ ছাড়া,
এক মন্‌জিল-অভিমুখী এই
চির-মানুষের ধারা।"

(দিশা ঃ দিশারী)

এখানে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য-সচেতনতা ও নবজাগরণের দীপ্ত শপথে উদ্দীপ্ত কবি জাগর-স্বপ্নে বিভোর। কবিতার ভাব ও বিষয়বস্তু, বাক্-বিন্যাস, শব্দ-চয়ন, উপমা, চিত্রকল্প ইত্যাদি সবকিছুতেই কবির আদর্শ ও ঐতিহ্য-চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এখানে 'আলোর কাফেলা' শীর্ষক কবিতায় কবির আদর্শ- চেতনা কতটা বলিষ্ঠ রূপ লাভ করেছে, নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা উপলব্ধি করা যায় ঃ

"আকাশে তোমার হেলালী নিশান উড়িয়ে দাও,
আলোর ঝলকে কালো রাজপাট পুড়িয়ে দাও।
নওযোয়ান
মুসলমান !
ছড়াও দু'হাতে বিশ্বে তোমার
চিরবিপ্লবী প্রাণের দান ॥

www.nagorikpathagar.org

চিরনিশীথের আলোর কাফেলা–
সূর্যের অভিসারী পথিক,
হাতের মশালে দেখাও যুগের
দিকভ্রান্তেরে হারানো দিক।
আল-কোরান – আল-কোরান ঃ
মনে রেখো সেই দীপ্ত মশাল অনির্বাণ!
মনে রেখো বীর, – দিশারী তোমার
চির মানুষের আল-আমীন,
সেই সিরাজাম মুনীরা – সে নবী
রাহ্মাতুল্লিল আ'লামীন!
তোমার পথের অগ্রপথিক সে
খলিফাতুল মুসলিমীন ,
মানবতার সে দরদী বন্ধু–
সেই আমিরুল-মুমিনীন!"

(আলোর কাফেলা ঃ দিশারী)

'নয়া জিন্দেগী' কবিতায়ও কবি নবজাগরণের আহবান জানিয়েছেন। অধঃপতিত ও বঞ্চিত বাঙালি মুসলমানকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন ঃ

"মন্‌হুস দিন মুর্দা রাতের
অভিশাপ জ্বরা-জীর্ণ খাব
টুটে-ফুটে এসো, নতুন দিনের
নয়া জিন্দেগী – ইনকিলাব !

জুল্‌মাত-ভরা গুম্‌রাহা দীল্‌
বনি আদমের এই মিছিল
ভয়দীর্ণ পঞ্জরে আজ
নিশানের তলে হলো শামিল।
মন্‌জিল-দিশা হারায়ে ইহারা
মূর্চ্ছা-ক্লিষ্ট দীর্ঘ দিন
পাড়ি দিয়ে এলো মরু-কান্তার –
আঁধার মৃত্যু, হিম তুহিন।

... ...

এক আল্লাহর আসমান-তলে
আসুক সে একদিন উছল,

www.nagorikpathagar.org

এক আলোকের সম্পাতে হোক
চির মানুষের মুখ উজ্বল।"

(নয়া জিন্দেগী ঃ দিশারী)

'হে অভিযাত্রিক' কবিতায় ইসলামের পতাকা হাতে দৃঢ় প্রত্যয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলার আহবান জানিয়েছেন কবি ঃ

"তোমার সম্মুখে আজ শোণিতাক্ত যুদ্ধের ময়দান
তোমার পশ্চাতে আজো প্রেত-ছায়া-জিঞ্জীর জিন্দান;
তবু আজ – হে অভিযাত্রিক,
তোমাকে চলিতে হবে স্থির লক্ষ্যে, দুর্বার নির্ভীক।"

(হে অভিযাত্রিক ঃ দিশারী)

ইসলামের প্রতি কবির ঈমান দৃঢ়বদ্ধ। কিন্তু ইসলামের অনুসারী হিসাবে আজকের মুসলমানদের অবস্থা দেখে কবির চিত্ত ব্যথা-দীর্ণ। তাই ইসলামে নতুনভাবে ঈমান এনে নিষ্ঠার সাথে তা যথার্থরূপে অনুসরণ করে নিজেদের বিড়ম্বিত অবস্থার পরিবর্তন ঘটানোর আহবান জানিয়েছেন কবি। তাঁর 'আবার ঈমান আনো' কবিতায় এরই অনুরণন পরিলক্ষিত হয় ঃ

"জাগ্রত করো মুগ্ধ হৃদয়, আবার ঈমান আনো;
কোথা ইসলাম–সে পথের পরে সন্ধানী দিঠি হানো।
মুসলমানের সংজ্ঞা করো না নাম-ধাম পরিচয়ে–
দেখো আছে কিনা মানুষ কোথাও ইসলাম বুকে ল'য়ে।
মিছে এ নারা-এ-তকবীর শুধু গগন-বিদারী স্বর,
মনের গহনে পড়ো কানে কানে 'আল্লাহু আকবার'।"

(আবার ঈমান আনো ঃ দিশারী)

এভাবে 'ঈদের পয়গাম', 'ঈদ মুবারক', 'ঈদের ফরিয়াদ', 'কারবালা', 'ছাত্র সঙ্গীত', 'রক্ত প্রভাত', 'কাফেলার গান', 'মুবারক হো জিন্দেগী', 'ভোরের নকীব', 'আবহায়াত', 'নয়া কদম', 'সিপাহ্সালার', 'ফারুকে আজম', 'দিশারী' প্রভৃতি কবিতায় ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও মুসলিম নবজাগরণের উদাত্ত আহবান বাণী-রূপ লাভ করেছে। এছাড়া, 'দিশারী'র অন্যান্য কবিতা – 'সিরাজ স্মরণ', 'হায় সিরাজ', 'পাকিস্তান', 'পাকিস্তান আজাদ', 'দিল্ আজাদীর দেশ', 'মুবারক হো জিন্দেগী', 'এই দেশ মহীয়ান', 'পাক ওয়াতন', 'কায়েদে আজম প্রয়াণে', 'হে আল্লামা' প্রভৃতি কবিতায় কবির দেশপ্রেম, স্বাধীনতা-প্রীতি ও গণ-মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে। 'দিশারী'র মূল বক্তব্য ও আবেদন হলো ঃ ইসলামী আদর্শবাদ, দেশপ্রেম, স্বাধীনতার আকৃতি, নবজাগরণ ও উদার মানবতা। ইসলামের আদর্শবাদেই এ উদার মানবতাবাদের

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশ ঘটেছে বলে কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

কবি তালিম হোসেন মূলত একজন রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবিরা সাধারণত স্বপ্ন-কল্পনার অধিবাসী। কল্পনার অতিন্দ্রীয়লোকে নিজস্ব বর্ণাঢ্য ভুবন রচনায় তারা আনন্দবোধ করেন। তবে তালিম হোসেন রোমান্টিক চেতনার অধিকারী হয়েও তিনি বাস্তবতাকে কখনো বিস্মৃত হন নি। তাই তাঁকে জাগর-স্বপ্নের কবি বলা যায়। তিনি অবাস্তব কল্পনা-বিলাসী নন। তাঁর কল্পনার জগতে বাস্তব জীবনের চিত্র, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, আশা-উদ্দীপনা, জাগরণের অভীপ্সা, স্বাধীনতার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা ও প্রোজ্জ্বল মানবতার বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছে। 'দিশারী'র কবি তালিম হোসেন শুধু একজন কল্পনা-বিলাসী কবি নন। তিনি আমাদের আদর্শ-ঐতিহ্যের স্বাপ্নিক কবি, নবজাগরণের উষরলোকের দিশারী কবি-সত্তা, নিপীড়িত অথচ গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী এক মহান জাতির অন্তরলোকে জাগরণী-মন্দ্রোচ্চারণের প্রয়াসে একান্ত আন্তরিক।

তালিম হোসেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শাহীন' প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সনে। এতে মোট ২৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি এ গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন 'বিশ শতকের মানব-যাত্রীকে'।

'শাহীন' অর্থাৎ ঈগল পাখি সাধারণত নভোচারী। উর্ধ্বলোকে নীল আকাশের নিঃসীম নীলিমায় তার অবাধ বিচরণ। শুধুমাত্র ক্ষুধা লাগলে সে শিকার-সন্ধানে নিম্নগামী হয়। তখন সে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসে, কিন্তু মাটিকে সে সাধারণত স্পর্শ করে না। কোন সুউচ্চ গাছের শাখায় ক্ষণিকের জন্য আশ্রয় নিয়ে নিকটবর্তী কোন স্থান থেকে ছোঁ মেরে শিকার তুলে নিয়ে আবার নিঃসীম নীলিমায় উধাও হয়ে যায়। অথবা ডিম পাড়ার সময় হলে সে কোন উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় বসে ডিম পেরে আবার নীলিমায় যাত্রা করে। মাটির ধরণী তাঁকে কখনো বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না। উর্ধ্বাকাশের দিকেই তার সর্বদা তীব্র আকর্ষণ। নিঃসীম নীলিমায় উড়ে বেড়াতে সে সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মহাকবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল ও ইসলামী রেনেসাঁর কালজয়ী কবি ফররুখ আহমদসহ অনেকেই এ পাখি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তাঁদের কবিতায় ঈগল পাখির এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে। বিশেষত ইকবাল ও ফররুখ এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে ঈগল পাখিকে মু'মিনের কতক বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা করেছেন। তালিম হোসেনের 'শাহীন' কবিতায় ইকবালের চিন্তাধারার ছায়াপাত ঘটেছে। মূলত মহাকবি ডক্টর মুহম্মদ ইকবাল এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেন উভয় কবিকেই অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তালিম হোসেনের 'শাহীন' কবিতার অসাধারণ কয়েকটি লাইন ঃ

www.nagorikpathagar.org

"শাহীনের দুরন্ত পাখায়
সাত আকাশের ঝড় ডাক দিয়ে যায়।

... ...

সুউচ্চ পাহাড়-চূড়ে তার আশিয়ানা
নিরুদ্ধ প্রান্তরে দেয় উর্ধ্বলোকে মুক্তির ঠিকানা–
অবরুদ্ধ প্রত্যহের নিম্নমুখ মনের কিনারে
যেমন আজান ওঠে জনপদে
উচ্চশীর্ষ মসজিদ-মিনারে।
নীড় তার নীড় নয়; অনিত্যের কোলাহল
নিমগ্ন যেখানে,
ধ্যানীর বিবিক্ত আত্মা যেখানে নৈঃশব্দ-শীর্ষে
ব্রতী পরম সন্ধানে–
সেখানে সে অধিষ্ঠিত। তিমির-সমুদ্রতল থেকে
উচ্চশির উর্ধ্ববাহু – যেখানে একাকী রয় জেগে
প্রবাল দ্বীপের বুকে পথের দিশারী বাতিঘর,
নিরুদ্ধ প্রান্তর থেকে সেইখানে শোনা যায়
শাহীনের স্বর।
সে পাখী থাকে না বাঁধা নীড়ের বাঁধনে,
সাত আকাশের ডাক আসে তার উন্মুখ নির্জনে।
মুহূর্তে সে অভিযাত্রী মিরাজের দীপ্ত বাসনায়!
মুহূর্তে বুর্রাক নামে তার দীপ্ত আতশী ডানায়?
তাঁর প্রজ্ঞা-শরীরের ছায়া নাই ক্লিন্নতার
সন্তপ্ত মাটিতে,
তার পক্ষ বিধূননে আলোর সঙ্গীত জাগে
দূরশ্রুত পুষ্প শকটীতে।
সে জানে, মাটির টানে মাটি হয় হৃদয়ের
স্বর্ণ উপত্যকা,
তাই উর্ধ্ব আকাশের জ্যোতির্মুখ অভিযানে
মানে না সে বিদ্যুৎ করকা–
আকাশের দ্বাররক্ষী, – যে আকাশ নিম্নতল থেকে
মাটিতে পাঠায় মেঘ করুণার নির্লিপ্ত আবেগে।

www.nagorikpathagar.org

অসীমের প্রেম তাকে টানে
ক্ষুদ্রের আড়াল ভেঙে বৃহতের পানে–
অশেষ সন্ধানে।"
(শাহীন ঃ শাহীন)

'শাহীন' তালিম হোসেনের এক অসাধারণ কবিতা। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যের সুর-ধ্বনি ও ছন্দের অপূর্ব অনুরণন লক্ষ্য করা যায়। 'বলাকা'র গতিময়তার সাথে এর একটা মিল চোঁখে পড়ে। কিন্তু ভাব ও আবেদনের ক্ষেত্রে দুই কবির মধ্যে দূরতিক্রম্য ব্যবধান সহজেই চোঁখে পড়ে। এক্ষেত্রে বরং ফররুখ আহমদের 'ডাহুক' কবিতার সাথে তালিম হোসেনের 'শাহীন' কবিতার অনেকটা সাজুয্য পরিলক্ষিত হয়।

'দিশারী' কাব্যে আবেগের প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয়। 'শাহীন' কাব্যে তা নেই। এখানে আবেগ-প্রাবল্যের পরিবর্তে এসেছে স্থিতি, মননশীলতা ও আধ্যাত্মিকতা। ইকবালের 'জওয়াবে শিকওয়া'র মতো এসেছে গভীর আত্ম-জিজ্ঞাসা। কবি এখানে নিজের লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন ও জগতকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই এখানে আবেগের বদলে এসেছে সংহতি ও স্থিতি, উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার বদলে এসেছে প্রজ্ঞা ও জিজ্ঞাসা। কবির এ কাব্যিক উত্তরণ তাঁকে স্বীয় পরিণতির দিকে অগ্রসর করে দিয়েছে। এতে তাঁর পরিণত মানসিকতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়েছে।

কবির অন্তরলোকে যে পরিবর্তন, তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গ ক্ষেত্রেও সে পরিবর্তনের ধারা অনেকটা প্রকাশ পেয়েছে। এ পরিবর্তন শব্দ চয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষভাবে পরিদৃশ্যমান। 'দিশারী'র কাব্য-ভাষা বহুলাংশে নজরুল-ফররুখ তথা মুসলিম ঐতিহ্যানুগ ভাষা। কিন্তু 'শাহীনে'র ভাষা বা শব্দ-চয়ন অনেকটাই ভিন্ন। এক্ষেত্রে তালিম হোসেনের স্বাতন্ত্র্য সহজগ্রাহ্য। তবে এখানেও আদর্শ-চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ তাঁর কাব্যের ভাব-বিষয়, উপমা-রূপক, প্রতীক-চিত্রকল্পে যথারীতি বিরাজমান, যেটা তাঁর কবি-স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

'শাহীন' কাব্যে ৭টি সনেট সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ৭টি সনেটেই ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি, আশা-আনন্দ ও স্বপ্ন-কল্পনা-ভালবাসার কথা ব্যক্ত হয়েছে। 'দিশারী' কাব্যে যে উদ্দীপনা, জাতীয় জাগরণ ও ভাব-ব্যঞ্জনার প্রকাশ ঘটেছে এ সনেটগুলোর সাথে তার আদৌ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এখানে কবি যেন অন্য আরেক জগতের মানুষ। তার প্রধান কারণ হলো 'দিশারী' কাব্য রচনার সময় যে স্বাধীনতার স্বপ্ন কবির সমগ্র আবেগ-অনুভূতিকে তাড়িত করেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কবির সে স্বপ্ন-সাধ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়

www.nagorikpathagar.org

এক শ্রেণীর স্বার্থান্ধ রাজনীতিক, আমলা ও সমাজপতিদের ইসলাম ও জনস্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপের কারণে। এ অবস্থায় কবি নিদারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন এবং সমাজের নানা অসংগতি ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে বেনামে নানা ব্যঙ্গাত্মক কবিতা লিখতে শুরু করেন। অবশ্য তাঁর এ জাতীয় কবিতা তিনি গ্রন্থভূক্ত করেননি। এ ধরনের কবিতা অধিকাংশই তিনি লিখেছেন ছদ্মনামে।

বিদ্যমান হতাশাব্যঞ্জক রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁর রচিত 'শাহীন' কাব্যের সর্বশেষ কবিতাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'শান্তির জন্যে' শীর্ষক ১৪৭ লাইনের এ দীর্ঘ কবিতাটিতে কবি নিরাবেগ চিত্তে, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক অনুভবের দৃঢ় প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেন ঃ

"শান্তি কী ঃ শান্তি কোথায় ঃ কার জন্যে শান্তি ?
বুদ্ধের দিকে চেয়ে দ্যাখো ঃ
শান্তিকে পেয়েছিলেন তিনি বিশ্ব-আত্মার মাঝে।
সে বিশ্বকে তুমি করেছো পর;
খৃষ্টের দিকে চেয়ে দ্যাখো ঃ
শান্তিকে পেয়েছিলেন তিনি পরম আত্মার মাঝে–
সে পরমকে রেখেছো তুমি বাহির দ্বারে;
মুহম্মদের দিকে চেয়ে দ্যাখো ঃ
শান্তিকে তিনি পেয়েছেন আত্মার মাঝে–
সে আত্মাকেই আজ তুমি করেছো অস্বীকার!
ধ্যানের অধ্যাত্ম-মানসের সেই শান্তির পয়গাম যুগে যুগে এসেছে
অশান্তি-পীড়িত, সপ্রশ্ন, উচ্চকিত মানুষের দুয়ারে–
"ধর্ম সংস্থাপনায় সম্ভবামি যুগে যুগে!"
সেই ধর্ম–আল্লাহর সেই দীন একদিন পূর্ণ হলো, পরিণত হলো...
"আল্ ইয়াওমা আকমাল্‌তু লাকুম দীনাকুম
ওয়া আত্‌মামতু আলাইকুম নেয়ামাতী ;"
আত্মার ফলকে লব্ধ মুহম্মদের সেই শাশ্বত পয়গাম
সেদিনের বিপর্যস্ত, ধ্বংসমুখী মানবতাকে দিলো
পরম শান্তির-উজ্জ্বলতম পরিণতির আশ্বাস।
ধর্মকেও করেছিলে তুমি খোদাপরস্তিরই অবলম্বন ;
শান্তি পলাতক হয়েছিল ধর্মের চত্বর থেকে।
তাই ধর্ম নয় 'শান্তি'র সনদ এলো – ইসলাম ঃ
যার অর্থ শান্তি, উদ্দেশ্য শান্তি, সমাধ্য শান্তি..."

www.nagorikpathagar.org

(শান্তির জন্যে ঃ শাহীন)

কবি আরো বলেন ঃ

"শান্তির আবাদ করো নিজেরি মধ্যে;
তারি ফুল-ফসলের সওগাত পৌঁছে দাও বিশ্বের কাছে ;
সে আবাদের পদ্ধতি শিখে নাও মুহম্মদের কাছে–
নাম যার আল-আমীন,
চারিত্র্য যাঁর ইসলাম,
অবদান যাঁর 'সালামত'–
শান্তি !"

(ঐ ঃ ঐ)

'গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্যবাদ', 'ডারউইন, ফ্রয়েড, মার্কস', 'এঙ্গেলস', 'বিজ্ঞান, সভ্যতা, প্রগতি' ইত্যাদি কোন কিছুই মানুষের জীবনে ও সমাজে ঈপ্সিত শান্তি আনতে পারে না। এসব বাছা বাছা বুলি ও মনোলোভা বাদ-মতবাদ-শ্লোগান সবই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে সমাজের কল্যাণ সাধনে। ইতিহাসে তার উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান। তাছাড়া, পার্থিব চিন্তা ও চরম বস্তুতান্ত্রিকতা মানুষের জীবনে শান্তির বদলে এনেছে অশান্তি, অকল্যাণ ও বিপর্যয়। তাই কবির সুচিন্তিত প্রাজ্ঞ অভিমত হলো ঃ অন্যকোন মত, চিন্তা ও শ্লোগান নয়, একমাত্র ইসলাম ও রাসূলের (স.) আদর্শের মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি নিহিত। অতএব, ইসলামকে যথার্থরূপে উপলব্ধি করে তা নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করেই শান্তির অন্বেষণ করতে হবে। কিন্তু আজ ইসলামের নামে একদিকে যেমন ভণ্ডামী চলছে, অন্যদিকে, এক শ্রেণীর হতাশাগ্রস্ত লোক ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে পাশ্চাত্যমুখী ভোগবাদী, জড়বাদী অথবা সমাজবাদী, নাস্তিক্যবাদী অন্ধকার বিবরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর কোনটাই ঈপ্সিত শান্তি ও কল্যাণের পথ নয়। এতে মানুষের মুক্তি সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। একমাত্র ইসলাম ও মহানবীর আদর্শই মানব জাতিকে তার ঈপ্সিত শান্তি ও কল্যাণের পথে নিয়ে যেতে পারে। কবির এ দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কথা 'শান্তির জন্যে' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। এটা তাঁর এক অসাধারণ কবিতা। এখানে তালিম হোসেনের দার্শনিক চিন্তা, প্রজ্ঞা ও জীবন-অভিজ্ঞতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

তালিম হোসেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'নূহের জাহাজ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সনে। এতে মোট ৩৪টি কবিতা অর্ন্তভুক্ত হয়। গ্রন্থটি তিনি তাঁর 'আনন্দ-বেদনার নিত্য-সাথী' স্ত্রী মাফরুহা চৌধুরীর নামে উৎসর্গ করেছেন। 'নূহের জাহাজ' তালিম হোসেনের এক ভিন্ন স্বাদের অসাধারণ কাব্য। জীবনের ছোট

www.nagorikpathagar.org

ছোট দুঃখ-ব্যথা, হাসি-আনন্দ, ঘাত-প্রতিঘাত, মান-অভিমান, দৈন্য-দুদর্শা, অনুভূতি-উপলব্ধির সহজ, সুন্দর বর্ণনা রয়েছে এখানে। জটিল কোন আদর্শের কথা নেই, কোন দুর্বোধ্যতা নেই, মায়াবী স্বপ্নের দুর্মর কল্পনা-বিলাস নেই – একান্ত সাদা-মাটাভাবে জীবন ও জগতের সাধারণ বিষয়গুলো অসাধারণ কাব্যময় ভাষা ও ছন্দে অবলীলায় বর্ণনা করা হয়েছে এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। এ কাব্যের প্রথম কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

"সবুজের ছত্র-ছায়া গ্রাম,
আবক্ষ বানের পানি,
নির্বাসনে নিমগ্ন বসতি।
ঘরের চালের সাথে নৌকার গলুই ;
হাট নেই, ঘাট নেই, সংসারের পাট নেই,
অবসিত সারা বেলা কাজের গুঞ্জন–
ঝগড়া-ঝাটি, হাসি-কান্না, হর্ষ-কোলাহল,
শঙ্খ-ঘন্টা, সাঁজালের ধোঁয়া,
প্রহরে প্রহরে শোনা
উচ্চকিত আজানের ধ্বনি।
ধানের পাটের চারা অগাধ পানির নীচে
মৃত্যুর শৈবালে দেহ রাখে।
আশা ভরা যত্নের কোদালে
উঁচু আল-তোলা ভিটে, আর
নাল ও নয়ানজলি, মাঠ খাল বিল
কোথায় লুকায় তার মুখ।
উপরে প্রতাপী বন্যা অকূল পাথার
আদিগন্ত আয়নায় তার
দেখায় অথৈ রিক্ত চূর্ণ কম্প্র ছবি।"

(নূহের জাহাজ ঃ নূহের জাহাজ)

বান-ভাসি ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত বাংলাদেশ ও তার অসহায় সরল-সহজ মানুষের করুণ অবস্থাকে কবি 'নূহের জাহাজ' ও তার আরোহীদের সাথে তুলনা করেছেন। এ উপমাটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ। আল-কুরআন, ওল্ড- টেস্টামেন্ট, নিউটেস্টামেন্ট ইত্যাদি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে হযরত নূহ (আ.) ও তাঁর মহাপ্লাবনের

www.nagorikpathagar.org

বর্ণনা আছে। দীর্ঘ নয়শো বছর পর্যন্ত নিজ জাতিকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও মাত্র স্বল্প সংখ্যক লোক হযরত নূহ (আ.) এর দাওয়াতে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেন। বাকি বিপুল সংখ্যক লোক আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আল্লাহর রাসূলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও নানাভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহর গযব নাযিল হয় সেসব অবিশ্বাসীদের উপর। আল্লাহর হুকুমে নূহ (আ.) এক বিশাল জাহাজ নির্মাণ করে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে জাহাজে ওঠেন। এরপর আল্লাহর ইচ্ছায় একাদিক্রমে কয়েকদিন পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়ে সমস্ত পৃথিবী মহাপ্লাবনে ভেসে যায়। কিস্তিতে আশ্রয়প্রাপ্ত ঈমানদার ব্যক্তিগণ ছাড়া সমগ্র পৃথিবী জন-মানবশূন্য হয়ে পড়ে। মহাপ্লাবনের পর সবকিছু শান্ত-স্বাভাবিক হয়ে এলে কিস্তিটি আবার মাটিতে ফিরে আসে এবং কিস্তিতে আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিগণ পুনরায় ধীরে ধীরে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বানভাসিতে প্লাবিত বাংলাদেশের জনপদকেও কবি 'নূহের জাহাজে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। নূহের জাহাজ তুল্য জনপদের মানুষ যদিও সাময়িকভাবে অসহায় ও বিপন্ন তবু তারা আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। কেননা তাদের মধ্যে রয়েছে ঈমানী শক্তি। এ শক্তির বলে নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ী। ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার কারণে তারা আল্লাহর রহমত লাভ করেছে। কবি তাই বলেন ঃ

"সয়লাব সুমসাম বর্ণহীন রিক্ত চিত্রপটে
মৃত্যুর বিশাল ছায়া ;
তবু পদ্মা, মেঘনার, ধলেশ্বরী, যমুনার
চিরঞ্জীব সংগ্রামী মানুষ
মৃত্যুকে মাশুল দিয়ে
জীবনকে ধরে রাখে দুর্ধর্ষ মুঠিতে।
যে হাতে চালায় হাল কঠিন মাটিতে,
যে হাতে তরঙ্গ শিরে
তুফানে নির্ভীক হাল ধরে,
মারীতে ও মন্বন্তরে
যে হাতে ধ্বংসের রাশ টানে-
সংসার মাথায় নিয়ে,
ঘরকন্না কঠিন পাঁজরে,
তাকে দেখি বার বার

www.nagorikpathagar.org

প্রলয়ের সিন্ধুর ওপারে
ভিড়াতে জীবন-জয়ী নূহের জাহাজ।”
(ঐ ঃ ঐ)

স্বদেশের পলিমাটির সোঁদাগন্ধ, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, দৈব-দুর্বিপাক, মানুষের বিচিত্র জীবন-সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে 'নূহের জাহাজ' কবিতায় । কত অন্তরঙ্গ ও বাস্তব অভিব্যক্তিতে পূর্ণ সে চিত্র! তাই তালিম হোসেনের কবি-স্বভাবের অন্য একটি দিক ফুটে উঠেছে এখানে। 'সহযাত্রীকে' কবিতায় কবি বলেন ঃ

“এ দেশ আমার
আমি এ দেশের সংগ্রামী জনতার
মিছিলে অগ্রগামী,
তার নিয়তির প্রতিশ্রুতির পূর্তি আমার
রক্তের চেয়ে দামী।”
(সহযাত্রীকে ঃ নূহের জাহাজ)

স্বদেশের সংগ্রামী জনতার হাতে হাত রেখে তাদের সাথে একাত্ম হয়ে চলতে চান কবি। তাদের সুখে-দুঃখে সমভাগী হতে চান তিনি। কেননা তিনি তো এ দেশেরই মাটির সন্তান। এই বিশাল জনতার তিনিও একজন। তাই কবির দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত হয়েছে এভাবে ঃ

“পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলীতে
যত ডেকে যাক বান –
দেখবে তুফান তরঙ্গ শিরে
সংগ্রামী সাম্পান
পাড়ি দেবে ঃ আর পুরনো পলিতে
তীরে তীরে তার
জাগবে নূতন ধান –
সুরভিতে তার ভাসবে বাতাসে
আমারই প্রাণের মৃত্যুঞ্জয়ী গান।”
(ঐ ঃ ঐ)

'সুন্দরবনের পথে' কবিতায়ও কবি-মনের একই অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে। 'নূহের জাহাজ' কাব্যে কতকগুলো আত্মকথন বা স্বগোক্তিমূলক (Monologue) কবিতা আছে। যেমন ঃ 'স্মৃতির নেপথ্যে কান্না', 'বাড়ি', 'কনফেশন', 'আকাশ ও সমুদ্র', 'আত্মগত', 'চাঁদের শবযাত্রা', 'নাস্তির প্রহর', 'কাফ্ফারা', 'আল্-আমীন', 'চির জিজ্ঞাসা', 'হে প্রিয় পরম শত্রু', 'কিছু করার নেই', 'নিয়তির পাখায়', 'অর্চনা', 'ব্যক্তিগত' প্রভৃতি কবিতায় কবি নিজের

www.nagorikpathagar.org

সম্পর্কে, জীবন-জগত সম্পর্কে সহজ, সরলভাবে অনেক তত্ত্বকথা, প্রজ্ঞা ও দর্শনের কথা উচ্চারণ করেছেন। এসব কবিতা পড়ে তাঁকে মহাকবি ইকবালের মতই দার্শনিক কবি বলে প্রতীয়মান হয়। জীবন ও জগতকে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞান থেকে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছেন। যেমন ঃ

"অবশেষে
বাড়ি বানালাম একটা।
আমি এখন এই মহানগরে
একটা বাড়ির মালিক।

... ...

মাস্টার বেড-এ সকলের প্রবেশ
যাতে স্বাগত না হয় সেজন্যে
প্ল্যানে দরজাটা ছোট মাপের দেখানো ছিল।
কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি,
দরজাটা শেষ পর্যন্ত বড় রাখতে
রাজী হতেই হলো ;
কারণ ; অশিক্ষিত প্রৌঢ়
রাজমিস্ত্রি সর্দার বললো –
এ্যাত্তো ছোট রাখবেন সাব,
এ দিয়ে তো খাটিয়া বেরোবে না!"

(বাড়ি ঃ নুহের জাহাজ)

আর একটি কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

"আমার কিছু কিছু পাপের কথা
কোন কোন নিকট জন জানে।
কিন্তু আমার সব পাপের কথা
শুধু তুমি জানো, আর কেউ জানে না।

যা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না
সেই সব পাপ আমি অন্যের কাছে
গোপন করে গেলাম।
কী হবে–যারা তা জানে না তাদের জানিয়ে?
নিকট জনেরা পুড়িয়ে ফেলবে
আমার পাপের খাতা,
পুণ্যের খাতা মেলে ধরবে শুধু।

www.nagorikpathagar.org

কাজেই বাড়তি মন্দ যা তুমি জানো
সেটুকু ঢাকাই থাক না,
সেটুকু ভালোই থাকি না
তুমি ছাড়া আর সবার কাছে!"

(কনফেশন ঃ নূহের জাহাজ)

'নূহের জাহাজ'-এ কিছু গান ও কবিতা অন্তর্ভূক্ত হয়েছে যা দেশাত্মবোধক। এগুলো হলো ঃ 'দেশ-গান', 'আমার দেশ', 'একুশের গান', কর্মখালি', 'পঞ্চম বাহিনী' ইত্যাদি। শেষোক্ত দুটি কবিতা ব্যঙ্গাত্মক। এ সব কবিতা ও গানে দেশের মাটি, মানুষ ও মাতৃভাষার প্রতি কবির গভীর মমত্ববোধের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন ঃ

"বাংলাদেশ-বাংলাদেশ
মৃত্যুবিজয়ী বাংলাদেশ।
যুগ-যুগান্ত পথের প্রান্ত
অতিক্রান্ত প্রাণ অশেষ
বাংলাদেশ॥

প্রান্তর নদী গিরি অরণ্য
মেলেছে প্রাণের মেলা অনন্য,
সুধা ভরা মাটি মায়ের স্তন্য
ফুলে ও ফসলে অনিঃশেষ
বাংলাদেশ॥"

(দেশ-গান –১ ঃ নূহের জাহাজ)

অথবা,

"আমার দেশের মাটি যে আমার
বেহেশতী আমানত।
এখানে আমার জীবন জীবন-মরণ
আল্লাহর রহমত॥

আল্লাহর' পরে পূর্ণ ঈমান
আমার প্রাণের জ্যোতি অম্লান,
মুহম্মদের হাতের নিশান
আমাকে দেখায় পথ॥

বহু সঙ্কট পাড়ি দিয়ে আজ

www.nagorikpathagar.org

বিজয়ী বাংলাদেশ
পেয়েছে আপন প্রাণ-চঞ্চল
জীবনের উদ্দেশ
চির-সংগ্রামী কাবার কাফেলা
গড়েছে নূতন জীবনের মেলা,
হবে না এখানে আর হেলা-ফেলা
মানুষের ইজ্জত॥"

(দেশ-গান –২ ঃ নূহের জাহাজ)

কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির স্মরণে লেখা কবিতাও 'নূহের জাহাজ' কাব্যে স্থান পেয়েছে। এ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ হলেন যথাক্রমে মহাশূন্যচারী ইয়ুরী গ্যাগারিন, কবি বে-নজীর আহমদ, কবি হাসান হাফিজুর রহমান, কবির অনুজ তওফিক হোসেন, মহাকবি আল্লামা ইকবাল, কবি ফররুখ আহমদ ও বিশিষ্ট মনীষী ডক্টর হাসান জামান।

তালিম হোসেনের জীবনকালে তাঁর মাত্র উপরোক্ত তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যা আগেও উল্লেখ করেছি। তবে এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে, এ তিনটি কাব্যই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন। এর একটির সাথে অন্যটির মিল বড় একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এ তিনটি কাব্যই ভাব, ভাষা, বিষয় ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, তিনটি কাব্য তিনটি ভিন্ন কাল ও ভিন্ন যুগ-পরিবেশে রচিত। প্রথম কাব্যটির অধিকাংশ কবিতাই রচিত হয় পাকিস্তান-পূর্ব কালে, দ্বিতীয়টি রচিত হয় পাকিস্তানী যুগে ও সর্বশেষ কাব্যটি প্রকাশিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে। এ কাল ভিন্নতা, পরিবেশ ও সামাজিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রচিত তাঁর বিভিন্ন কাব্যে ভাব ও বিষয়-বৈচিত্র্য তাই একান্তই স্বাভাবিক। তবে শুধু ভাব-বিষয় ও উপলব্ধির ক্ষেত্রেই নয়, ভাষা-রূপরীতি ও কাব্য কৌশলের ক্ষেত্রেও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে বুঝা যায়, তালিম হোসেন অত্যন্ত বোদ্ধা, কুশলী ও শিল্প- সচেতন কবি ছিলেন। অতি নিপুণ ও সচেতনভাবে তিনি তাঁর কাব্যের সুরম্য উদ্যান সাজিয়েছেন, একই বাগিচার ফুল হয়েও রং, রূপ ও সৌরভে তা বিচিত্র, বর্ণ-সুষমায় অপরূপ মনোহারিণী।

উপরোক্ত তিনটি কাব্য ব্যতীত তালিম হোসেন-পত্নী বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক মাফরুহা চৌধুরীর সযত্ন সম্পাদনায় তালিম হোসেনের যে 'কবিতা সমগ্র' প্রকাশিত হয় (জুলাই ১৯৯৮) তাতে পূর্বোক্ত তিনটি কাব্যসহ কবির

www.nagorikpathagar.org

অগ্রন্থিত ১৬৬টি কবিতা, ১১টি অনুবাদ কবিতা, ১১টি অগ্রন্থিত গান ও ৪৮টি শিশুতোষ কবিতা স্থান লাভ করেছে। অগ্রন্থিত কবিতার মধ্যে অনেকগুলো ব্যঙ্গ কবিতা, যার মধ্যে তালিম হোসেনের তীক্ষ্ণ ধী-শক্তি, রসবোধ ও গভীর সমাজ-সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুবাদ কবিতার মধ্যে ৮টি ইকবাল থেকে এবং বাকি তিনটি প্রখ্যাত ফারসি কবি রুমী থেকে। তাঁর অগ্রন্থিত ১১টি গানও বিচিত্র ভাব ও বিষয়-সংবলিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তালিম হোসেন নিজে সুরকার, গায়ক ও অত্যন্ত সংগীতবোদ্ধা ব্যক্তি ছিলেন। এ থেকে বুঝা যায়, তালিম হোসেনের কাব্যে ভাব-বিষয় ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্য বিদ্যমান।

তালিম হোসেনের 'কবিতা সমগ্রে'র অন্তর্ভূক্ত ৪৮টি অগ্রন্থিত শিশুতোষ কবিতাকে সম্পাদিকা মাফরুহা চৌধুরী চারটি শিরোনামে বিভক্ত করেছেন ঃ 'ধাইকিড়ি ধাইকি', 'জমজম', 'ছড়াছড়ি', ও 'বীর বাচ্চার গান'। এ শিশুতোষ কবিতাগুলি শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাব, বিষয়, ভাষা ও ছন্দে অসাধারণ হয়ে উঠেছে। বাংলা শিশু-সাহিত্যে এগুলো অমূল্য সংযোজন হিসাবে বিবেচিত হবে। উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে চারটি স্বতন্ত্র শিশুতোষ কাব্য হতে পারে। তাঁর শিশুতোষ কবিতা থেকে দু'একটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

এক. "একুশে জ্যৈষ্ঠ কামস্‌কাটকা–
খবর এসেছে টাট্‌কা টাট্‌কা
খবর এসেছে নতুন খবর
অবাক কাণ্ড–আজব জবর।

ছেলেরা সেখানে ইস্কুলে যায়
ছোট্ট খোকন দোলে দোলনায়
ছুটি হলে তারা করে ছুটোছুটি
দোলনায় খুকু হেসে লুটিপুটি।

হাসি-খুশী সব মেয়েরা সেখানে
লেখায় পড়ায় নাচে আর গানে
খিদে পেলে তারা খায় দুধ-রুটি
দোলনায় খুকু হেসে লুটোপুটি।

ভাবছো বুঝিবা এই সে খবর?
আরে, সে খবর আজব জবর!
সে খবরটা তো এখনো বলিনি,

www.nagorikpathagar.org

আমি নয় সেটা জানে শুধু মিনি!"
(আজব খবর ঃ ধাইকিড়ি ধাইকি)

দুই. "ও শেয়ালের গিন্নি,
বাদলা রাতে বাঁধলি নাকি
গাঙ শালিকের সিন্নি।

শেয়াল্‌নী তোর শেয়াল কোথা
বন-বাদাড়ে রাত্রে
বন-মোরগের আস্তানাটা
খুঁজে বেড়ায় হাত্‌ড়ে।
ভালোয় ভালোয় ফেরে যেন
নিশুত রাতে বর্ষায় –
সিন্নিটা তোর দে পাঠিয়ে
ভুড়ো বাবার দর্গায়।

জানি এখন পড়বি শুয়ে
সব একদম সাবড়ে,
শিয়াল এলে চিল্লাবি জোর –
ওরে মারে বাপরে!

বলবি তারে-দর্গা ফেরৎ
নামলো জোরে পেটটা,
ওলা ওঠায় মরি এখন
পাচ্ছে খালি তেষ্টা।

এই না বলেই এক নিশ্বাসে
'কুল' শোনাবি চারটি,
ভুড়ো বাবার তাবিজ দিবি
গাঙ্‌-শালিকের হাড্ডি।
(সিন্নি ঃ ঐ)

তিন. "বেহেশ্‌ত থেকে এলি শিশু
সোনা মানিক রে –
তোর মুখে যে তারই আভাস
দেখি খানিক রে।

এই দুনিয়ার গুল-বাগিচায়
ফুটলি নূতন ফুল,

www.nagorikpathagar.org

শুক্‌নো কাঁটার শাখায় এলি
আনন্দ-বুলবুল্‌।"

(জমজম ঃ জমজম)

চার. "দ্রিম দ্রিম দ্রিমিরে
বাজ পড়ে ঝিমিয়ে
কড় কড় কড়াৎ
বড় জোর বরাৎ
বেঁচে গেলে জানটা
দুনিয়াটা ঠাণ্ডা।"

(ছড়াছড়ি-১ ঃ ছড়াছড়ি)

পাঁচ. "নূতন দিনের রাহে পুণ্য রাহী
বীর বাচ্চার দল মোরা সিপাহী ॥
শিরে জাগে ইসলাম, হৃদয়ে ঈমান
বেগুনা এ জিন্দেগী, তরোতাজা প্রাণ।
সত্যের পন্থায় চলে অভিযান,
ঝুটা দৈত্যের তরে পরোয়া নাহি ॥
আল্লাহর রাহে মোরা জান-কোরবান
খাল্‌কের খেদ্‌মতে নিবেদিত প্রাণ!

লঙ্গিয়া যাই পথে বাধার পাহাড়,
দুর্যোগ পাড়ি দিই রাতের পাথার।
সম্মুখে ডাক শুনি নতুন উষার
চলি নব জীবনের গান গাহি ॥"

(বীর বাচ্চার গান ঃ বীর বাচ্চার গান)

ছয়. "ফিরদৌসের মুজ্‌দা বহিয়া
দুনিয়ার গুলবাগে –
লক্ষ মুকুল জাগে॥
গুল চেহারায় উজালা ভুবন,
শিরীন জবানে উতলা পবন,
হাস্যে লাস্যে জীর্ণ নিখিলে
জীবনের রঙ লাগে॥"

(লক্ষ মুকুল জাগে ঃ ঐ)

www.nagorikpathagar.org

সাত. "জট্‌লা করে
ওই যে দূরে
গাছের সারি
দাঁড়িয়ে আছে –
মিলিয়ে গেছে
পথের রেখা
নিবিড় হয়ে
ওরই মাঝে।"

(জোছনায় ঃ ঐ)

আট. "রাজন মহারাজ
তাঁর ঈদের দিনের সাজ
পায়জামা আর পাঞ্জাবী আর
মাথায় জরীর তাজ।"

(রাজনের ঈদ ঃ ঐ)

নয়. "শত শত চাঁদ মিলে এক রাকা চাঁদ
বসন্ত উজাড় করা ফুলের প্রসাদ।
নভোনীল প্রশান্তিতে সুশান্ত অন্তর,
মরমী কণ্ঠের মাঝে সুরের নির্ঝর।
মুক্তা ঝরে হাসি আর কথার ঝর্ণায়,
শশিকলা আনন্দের ছন্দ এঁকে যায়।
তাবৎ আশীষ ধারা তার শিরে থাক্‌,
রীতি হোক গীতি তার প্রীতির পরাগ।"

(জন্মদিনে বড় মেয়ে রাকা-কে ঃ ঐ)

তালিম হোসেনের গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কাব্য-কবিতা, গান, শিশুতোষ কবিতা ও ব্যঙ্গ কবিতা থেকে তাঁর বহুমুখী ও বৈশিষ্টপূর্ণ কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অবদান হয়ত সুবিশাল নয়, তবে তা নানা বর্ণ-সুষমায় সুস্মিত সমুজ্জ্বল। বিংশ শতকের বাংলা কাব্য-সাহিত্যে তিনি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল কবি-প্রতিভা। তালিম হোসেনের প্রবন্ধ-সাহিত্য, ছোটগল্প, কিশোর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এখনো পর্যন্ত অপ্রকাশিত। সেগুলো গ্রন্থভুক্ত হলে তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে আরো বেশি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

তালিম হোসেন তাঁর জীবনকালে যেসব সম্মাননা ও পুরস্কার পেয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ

www.nagorikpathagar.org

এক. বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ফেলো ও জীবন সদস্য – ১৯৬৫
দুই. 'সিতারা-ই-ইমতিয়াজ' খেতাব ও স্বর্ণপদক – ১৯৬৯
তিন. একুশে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় পদক – ১৯৮২
চার. পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া নজরুল একাডেমীর নজরুল পুরস্কার ও সংবর্ধনা – ১৯৯৩
পাঁচ. স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত সংবর্ধনা ও স্বর্ণপদক – ১৯৯৮

স্বল্প-প্রজ কবি হিসাবে পরিচিত হলেও প্রতিভা ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যে তালিম হোসেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে চির বরণীয় হয়ে থাকবেন। কবিতা ছাড়াও গান ও গদ্য রচনায় তিনি তাঁর দক্ষতা সপ্রমাণ করেছেন। তবে এর পরিমাণ অধিক নয়। কিন্তু সংখ্যার দিক দিয়ে স্বল্প হলেও গুণগত বিচারে তাঁর মূল্য নেহায়েত কম নয়। একজন প্রতিভাবান কবি, গীতিকার, বুদ্ধিদীপ্ত লেখক, সম্পাদক এবং সফল সংগঠক হিসাবে তালিম হোসেন সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আলী আহসান

বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য-সমালোচক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বক্তা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান (জন্ম- ২৬ মার্চ ১৯২০, মৃত্যু- ২৫ জুলাই ২০০২) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন পুরোধা ব্যক্তি। তিনি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও মনন-চর্চার ক্ষেত্রে এক বিশাল মহীরূহ হিসাবে বিবেচিত হতেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জাতির অভিভাবকতুল্য এক মহান ব্যক্তিত্ব- যার ছায়াতলে সমকালীন কবি-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী-বুদ্ধিজীবী অনেকেই নিবিড় শান্তি-স্বস্তি ও নির্ভরতা অনুভব করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসানের মতো বিশ্বমানের মনীষীর জন্ম পৃথিবীতে খুব কমই হয়। তাঁর মতো ব্যক্তিরা যে কোন দেশ ও জাতির জন্য মহাগৌরবের। তাঁর বহুমুখী অবদান ও কৃতিত্বে আমাদের দেশ ও জাতি নানাভাবে সমৃদ্ধ ও উপকৃত হয়েছে। কবি হিসাবে সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবদানে আমাদের সাহিত্য যেমন সমৃদ্ধ, সমাজ-সংস্কৃতি-শিক্ষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নানা দিক ও বিভাগও তেমনি ঋদ্ধ ও সমুন্নত হয়েছে। এ সকল ক্ষেত্রে স্বদেশে তিনি যেমন একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হিসাবে সম্মানিত ছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি ছিলেন বিশেষভাবে সমাদৃত। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও অবদানে তিনি আন্ত র্জাতিকভাবে দেশের সম্মান, মর্যাদা ও পরিচিতিকেও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছেন।

অসাধারণ মেধার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান মাগুরা জেলার অন্তর্গত আলোকদিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আল হামেদ। ১৯৩৭ সনে আরমানিটোলা সরকারি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৩৯ সনে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৪৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজিতে কৃতিত্বের সাথে এম.এ. পাশ করে ঢাকাস্থ ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন ও ১৯৪৫ সনের শেষের দিকে কলকাতা রেডিওতে প্রোগ্রাম এসিস্ট্যান্ট হিসাবে চাকরি নেন।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৭ সনে দেশ-বিভাগের পর তিনি ঢাকা রেডিওতে যোগদান করেন। এরপর ১৯৪৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সিনিয়র লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। এরপর ১৯৫৩ সনে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রীডার ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন, ১৯৬০ সনে তিনি বাংলা একাডেমীর পরিচালক (তখনও মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি হয়নি) পদে যোগদান করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ এবং প্রফেসর হিসাবে যোগ দেন এবং সেখান থেকেই ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে কলকাতা চলে যান এবং 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে' নিয়মিত অনুষ্ঠান করা ছাড়াও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধকালে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে স্বাধীনতা অর্জনকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে তিনি মূল্যবান অবদান রাখেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে তিনি প্রথমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পূর্ব পদে যোগদান করলেও অচিরেই তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর, অতঃপর ১৯৭৫ সনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা (মন্ত্রীর পদমর্যাদাসম্পন্ন) এবং ১৯৭৮ সনে পুনরায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৯ সনে তিনি জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি কিছুকাল দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ও কবি ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ প্রতিষ্ঠিত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন।

এছাড়া, তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, ইউনেস্কোর উপদেষ্টা, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসাবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ ও দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে আয়োজিত বহু আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে যোগদান উপলক্ষ্যে বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি মোট প্রায় ৭/৮টি ভাষা জানতেন। বাংলা ছাড়া ইংরাজি ভাষায়ও তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেন। বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী সৈয়দ আলী আহসান মোট ১০৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর প্রকাশিত

www.nagorikpathagar.org

গ্রন্থের একটি তালিকা ঃ

গবেষণামূলক গ্রন্থ ঃ

১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সাথে যুগ্মভাবে ১৯৫৪)
২. নজরুল ইসলাম (১৯৫৪)
৩. Essays in Bengali Literature (১৯৫৬)
৪. কবি মধুসূদন (১৯৫৭)
৫. কবিতার কথা (১৯৫৭)
১. সাহিত্যের কথা (১৯৬৪)
২. কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা (১৯৬৮)
৩. পদ্মাবতী (১৯৬৮)
৪. মধুমালতী (১৯৭২)
৫. আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ শব্দের অনুষঙ্গে (১৯৭০)
৬. রবীন্দ্রনাথ ঃ কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৭৪)
৭. মধুসূদন ঃ কবিকৃতি ও কাব্যাদর্শ (১৯৭৫)
৮. আধুনিক জার্মান সাহিত্য (১৯৭৬)
৯. সতত স্বগত (১৯৮৩)
১০. শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য (১৯৮৩)
১১. সরহপার দোহাকোষ গীতি (১৯৯৩)
১২. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ (১৯৯৪)
১৩. আমাদের আত্মপরিচয় এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ (১৯৯৬)
১৪. মৃগাবতী (১৯৯৮)।

গল্প ঃ

১. গল্পসংগ্রহ (১৯৫২)
২. গল্প সংকলন (১৯৬৯)।

আত্ম-জৈবনিক উপন্যাস ঃ

১. জিন্দাবাহারের গলি (১৯৮৫)
২. স্রোতোবাহী নদী (১৯৮৯)।

কবিতা ঃ

১. অনেক আকাশ (১৯৫৯)
২. একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪)
৩. সহসা সচকিত (১৯৬৫)

www.nagorikpathagar.org

৪. উচ্চারণ (১৯৬৮)
৫. আমার প্রতিদিনের শব্দ (১৯৭৪)
৬. কাব্য সমগ্র (১৯৭৪)
৭. চাহার দরবেশ ও অন্যান্য কবিতা (১৯৮৫)
৮. সমুদ্রেই যাব (১৯৮৭)
৯. রজনীগন্ধা (১৯৮৮)
১০. নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৬)।

শিশুতোষ ঃ কখনো আকাশ (১৯৮৪)।

ভ্রমণকাহিনী ঃ

১. প্রেম যেখানে সর্বস্ব (১৯৮৭)
২. হে প্রভু আমি উপস্থিত।

আত্মজীবনী ঃ আমার সাক্ষ্য (১৯৯৪)।

অনুবাদ ঃ

১. ইকবালের কবিতা (১৯৫২)
২. প্রেমের কবিতা (যুগ্মভাবে ১৯৫৮)
৩. হুইটম্যানের কবিতা (১৯৬৫)
৪. ইডিপাস (১৯৬৮)
৫. সাম্প্রতিক জার্মান গল্প (১৯৭০)
৬. জার্মান সাহিত্য একটি নিদর্শনী (১৯৭৪)
৭. উইলিয়াম মেরিডিথের নির্বাচিত কবিতা (১৯৮২)
৮. সন্দেশ রাসক (১৯৮৭)
৯. নাহ্‌জুল বালাঘা (১৯৮৮)।

সম্পাদনা ঃ

১. রূপচ্ছন্দা (যৌথ ১৯৫০)
২. আধুনিক গদ্য সংগ্রহ (গল্প সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ১৯৫৩)
৩. গল্প সঞ্চয়ন (যৌথভাবে, ১৯৫৪)
৪. লোক সাহিত্য (১ম খণ্ড, ১৯৬৬)
৫. বীরাঙ্গনা কাব্য ঃ মধুসূদন (১৯৬৮)
৬. মেঘনাদবধ কাব্য ঃ মধুসূদন (১৯৬৮)
৭. একেই বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৯৬৮)
৮. বাংলাদেশ (১৯৭২)
৯. চর্যাগীতি (১৯৮৪)

www.nagorikpathagar.org

ধর্মবিষয়ক ঃ

১. মহানবী (১৯৯৫)
২. শাহ আলী বোগদাদী (১৯৯৫)
৩. আল্লাহর অস্তিত্ব (১৯৯৫)

এছাড়াও রয়েছে তাঁর অপ্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ে মূল্যবান রচনাবলী। সৈয়দ আলী আহসান প্রধানত কবি। সমকালীন বাংলা কাব্যে একজন বিশিষ্ট কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। তাঁর সমসাময়িক বিশিষ্ট কবিদের মধ্যে– জসীমউদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-৮৩), আব্দুল কাদের (১৯০৬-৮৪), মহীউদ্দীন (১৯০৬-৭৫), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-৭৯), সুফী মোতাহার হোসেন (১৯০৭-৭৫), কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০৯-৮৩), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯), আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬), মতিউল ইসলাম (১৯১৪-৮৪), আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫), আবুল হোসেন (১৯২১), মুফাখ্‌খারুল ইসলাম (১৯২১-২০০৭), হাবীবুর রহমান (১৯২২), সাশাউল হক (১৯২৪-৮৩) প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, তিরিশোত্তর যুগের বিশিষ্ট কবি-জীবনানন্দ দাস (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-৮৪), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-৮৮), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-৭৮), বিষ্ণু দে (১৯০৯-৮২), সমর সেন (১৯১৬-), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-), গোলাম কুদ্দুস (১৯২০-), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-৪৭) প্রমুখ যখন বাংলা কাব্য চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন উজ্জ্বল দিগন্তের সূচনা করেছেন, সে আলোকিত ভুবনেই সৈয়দ আলী আহসানের কাব্য চর্চার সুত্রপাত। উল্লেখিত অনেক কবিই বয়সে ও রচনাকালের দিক থেকে সৈয়দ আলী আহসানের কিছুটা পূর্ববর্তী হলেও তাঁদের উল্লেখযোগ্য কাব্য-কৃতি মোটামুটি একই সময়কার। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে সৈয়দ আলী আহসান বাংলা কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন।

রবীন্দ্র-নজরুল প্রভাব-বলয়ে, উত্তর-তিরিশের কাব্যিক আবহাওয়ায় সৈয়দ আলী আহসানের কবি-মানস লালিত হলেও তার সাথে যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত সামাজিক অবক্ষয়, পাকিস্তান আন্দোলনের উদ্দীপিত চেতনা, ১৯৪৩ সনে কলকাতায় গঠিত 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'র প্রণোদনা ইত্যাদি এবং সমসাময়িক অবস্থার প্রক্ষেপ তাঁর মানস-চেতনাকে

www.nagorikpathagar.org

প্রভাবিত করেছে। এছাড়া, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও অভিজাত মানস-প্রবণতাও তাঁর কাব্যকে দিয়েছে এক ধরনের বিশিষ্টতা। তাই তাঁর কাব্যে স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্য-প্রীতি, নিসর্গ-প্রীতি, প্রেম ও মানুষের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সৈয়দ আলী আহসানের কাব্যে রোমান্টিসিজম ও আবেগের নিবিড় সংশ্লেষ লক্ষণীয়। রোমান্টিক কবিদের এটা এক সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সৈয়দ আলী আহসান মুলত একজন আধুনিক রোমান্টিক কবি। তাঁর 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সুবিখ্যাত 'আমার পূর্ব বাংলা' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত হলোঃ

"এখানে নদীর মত এক দেশ
শান্ত, স্ফীত কল্লোলময়ী
বিচিত্ররূপিণী অনেক বর্ণের রেখাঙ্কন
এ-আমার পূর্ব বাংলা
যার উপমা একটি শান্ত শীতল নদী ॥"

(আমার পূর্ব বাংলা – এক)

"আমার পূর্ব-বাংলা একগুচ্ছ স্নিগ্ধ
অন্ধকারের তমাল
অনেক পাতার ঘনিষ্ঠতায়
একটি প্রগাঢ় নিকুঞ্জ
সন্ধ্যার উন্মেষের মতো
সরোবরের অতলের মতো
কালো কেশ মেঘের সঞ্চয়ের মতো
বিমুগ্ধ বেদনার শান্তি
আমার পূর্ব-বাংলা বর্ষার অন্ধকারের অনুরাগ
হৃদয় ছুঁয়ে-যাওয়া
সিক্ত নীলাম্বরী
নিকুঞ্জের তমাল কনক-লতায় ঘেরা
কবরী এলো ক'রে আকাশ দেখার মুহূর্ত"

(আমার পূর্ব-বাংলা– দুই)

"আমার পূর্ব-বাংলা অনেক রাতে গাছের
পাতার বৃষ্টির শব্দের মতো
কখনও মৃদঙ্গ, হঠাৎ কখনও বেহালা–
একসময় বাঁশীর সুর

www.nagorikpathagar.org

যখন রাত্রে একাকী ঘুম ভাঙে
অনবরত কোমল কোলাহলে
স্বপ্নের মত পাতায় পাতায়
শব্দকে দেখি
তার আকুল বিকাশ
অন্ধকার আকাশের চেতনার মতো
যে-চেতনা এক সময় অতল অবলুপ্তি
এক সময় কালো চোখের তন্দ্রা
এক সময় বিদ্যুৎ-বিকাশ
এক সময় হঠাৎ জাগরিত বজ্র এবং
চোখ-চেয়ে-দেখার কথায়
ভরপুর
আমার পূর্ব বাংলা অনেক রাত্রে
গাছের পাতায় বৃষ্টির শব্দের মতো"

(আমার পূর্ব বাংলা- তিন)

'আমার পূর্ব বাংলা' সৈয়দ আলী আহসানের একটি বিখ্যাত কবিতা। এটা বাংলা সাহিত্যেরও একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। অনেকের মতে, এটা তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। আমার ধারণা, এটি সৈয়দ আলী আহসানের শ্রেষ্ঠ কবিতাই শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যেরও একটি উল্লেখযোগ্য, অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ', নজরুল ইসলামের যেমন 'বিদ্রোহী', ফররুখ আহমদের যেমন 'সাত সাগরের মাঝি' তেমনি সৈয়দ আলী আহসানেরও প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা বলতে এটাকে বুঝায়। এ কবিতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান বলেন ঃ

"(এ কবিতায়) সৈয়দ আলী আহসান অবলীলায় সঞ্চরণের উপযোগী ভিত্তি পেয়ে গেছেন– বিষয়, বক্তব্য এবং বহির্প্রকাশের সঙ্গত যোগাযোগ ঘটে গেছে। একটি করে বাক্যে গঠিত এই কবিতা তিনটি। খণ্ড খণ্ড চিত্রে ও চিত্রকল্পে একটি অখণ্ড রূপকল্পের সৃজন প্রয়াসের মধ্যেই এ কবিতাত্রয়ের আঙ্গিক-স্বাতন্ত্র্য। খণ্ডের সমাহারে অখণ্ড পূর্ব বাংলার প্রাকৃতিক ও ঐতিহ্যিক দ্যোতনায় একটি সম্পূর্ণতা আনয়নের প্রয়াসে কবিতা তিনটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা শিহরিত আলোড়ন বয়ে গেছে। কবির মনের গভীরে দেশ সম্পর্কে তাঁর আজীবনের ধারণা, দেশের প্রকৃতি ও মানুষকে দেখার অভিজ্ঞতা, দেশবাসী যেভাবে প্রকৃতি ও জন্মভূমিকে ভোগ করে ও ভালোবাসে, সে সম্পর্কে উপলব্ধি এবং প্রকৃতি ও মানুষের মিশ্রিত জীবনসংগ্রাম ও ঐতিহ্যলালিত চিরাচরিত মনোভঙ্গি, রসগ্রাহিতা ও আত্ম-উন্মোচনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি

www.nagorikpathagar.org

যেমন করে ছবিতে ও চিন্তায় ধীরে ধীরে সঞ্জাত হয়েছিল, সে সবই যেন এই কবিতায় এক সচ্ছল প্রবাহে একসঙ্গে উৎসারিত। এইসঙ্গে মিলিত হয়েছে কবির আধুনিক দেখার ভঙ্গি, রসচেতনার বৈশিষ্ট্য, মানস-প্রকৃতির নিজস্ব উদ্‌বেজনা ও শিল্পধারণা।" **(হাসান হাফিজুর রহমান ঃ আধুনিক কবি ও কবিতা, পৃষ্ঠা-১৬০)**।

রোমান্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী সৈয়দ আলী আহসানের রোমান্টিক কবি-কল্পনা তাঁর কবিতার ছন্দে, ভাবে ও অলংকারে সমন্বিত হয়ে এক অপরূপ কাব্য-সুষমা বিনির্মাণ করেছে। যেমন ঃ

"মানুষের কামনায় ধানের শীষে
হলুদ হয়েছে
কত অনুপাত প্রলাপ কত বিষ
অনেক আনন্দে রমণী পদ্মিনী
সময় তো উল্লাসের মতো
হাসাহাসি অথবা সচকিত বাতাস
এবং মুহূর্তের সচেতনতায় আমি
পৃথিবী।"

(অনবরত, সমকাল ঃ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৬৯)

অনেকের মতে, সৈয়দ আলী আহসান ছিলেন অভিজাত শিল্প-চেতনার অধিকারী। তাঁর চিন্তা, কল্পনা ও অনুরণনে এক নৈর্ব্যক্তিক অনুভব সর্বদা তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। একটি উদাহরণ ঃ

"অনন্তে বিকশিত আনন্দ
শতদল পদ্মের মতো
কিন্তু মানুষ কি তখন চায় শুধু–
অর্থাৎ এ মুহূর্তে সর্বমুহূর্তে–
যদিও অনবরত নিশ্বাস এবং অস্থি
এবং বিশ্বাস
জীর্ণ হয়–
অনন্তের আকাঙ্ক্ষা এবং সমর্থিত বাঁচা ?"

(সম্পন্ন মানুষ এবং গান। সমকাল, বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৬৯)

সৈয়দ আলী আহসান একজন শিল্প-সচেতন কবি। আধুনিক কবিতার আঙ্গিক ও প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। গদ্য ছন্দেই তিনি অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। শব্দ, অলংঙ্কার, উপমা-রূপক, চিত্রকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব রুচি, দৃষ্টিভঙ্গী ও বিবেচনা কাজ করেছে। তিনি এক্ষেত্রে ইংরাজি সাহিত্যের প্রচ্ছায়ায় আধুনিক শিল্পসম্মত প্রয়োগ-কৌশল অবলম্বন

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তাঁর শব্দ ব্যবহারে একটা নিজস্বতা লক্ষণীয়। শব্দের মধ্যে সজীবতা ও দ্যোতনা সৃষ্টির পারঙ্গমতা তাঁকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে এমন একটা ঝংকার বা ব্যঞ্জনা রয়েছে, যা হৃদয়ের অনুভূতিকে তরঙ্গিতভাবে উচ্চকিত করে। তাঁর কবিতার উপকরণ স্বদেশ, স্বকাল ও স্বজাতির মধ্য থেকে আহরিত বলে সকলের নিকট তা সহজগ্রাহ্য। তাঁর কবিতায় আহরিত উপকরণসমূহ বিন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি যে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন তা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতায় এক ধরণের মনন-ধর্মিতা, নৈর্ব্যক্তিকতা ও পরিশীলিত-পরিশ্রুত চিন্তা-চেতনার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। তাই তিনি শুধু কবি নন, অনেকের দৃষ্টিতে তিনি কবিদের কবি।

সৈয়দ আলী আহসান প্রথম জীবনে চল্লিশের দশকের প্রধান কবি ফররুখ আহ্মদের দ্বারা অনেকটা প্রভাবিত হয়ে কবিতা-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। ফররুখ আহমদ পুঁথি-সাহিত্যের কাহিনী, ভাষা ও উপাদান নিয়ে যে আধুনিক কাব্য সৃষ্টির মাধ্যমে নিজস্ব স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টিতে সক্ষম হন, তা সমকালীন অনেক কবিকেই আকর্ষিত করে। সৈয়দ আলী আহসানও সে ধারা অনুসরণের চেষ্টা করেছিলেন। ফররুখের কাব্যে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের প্রতিও তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। তিনি প্রথম দিকে তাঁর কবিতায় কিছু কিছু আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করার প্রয়াস পান। কিন্তু অচিরেই তিনি অনুভব করেন যে, ফররুখ আহমদ যে ধারায় কাব্য-রচনা করে সাফল্য অর্জন করেছেন, তাতে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না। ফলে তিনি তাঁর নিজস্ব ধারায় কাব্য-চর্চায় ব্রতী হন এবং তাতে তিনি সাফল্য অর্জন করেন। ফলে একজন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আধুনিক কবি হিসাবে তিনি সহজেই বাংলা কাব্যে তাঁর নিজস্ব স্থান অধিকার করেন।

বিশেষভাবে কবি হিসাবে পরিচিত হলেও সৈয়দ আলী আহসান গদ্য-রচনায় অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর গদ্যের স্টাইল, বর্ণনা ও শব্দ-বিন্যাস বিশেষ বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। তাঁর গদ্যভঙ্গী কবিতার মতোই ছন্দময়, ধ্বনি-মাধুর্যে ও সুর-তরঙ্গে অপরূপ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাই অন্যদের নিকট তা হয়েছে অনুকরণীয়। তাঁর গদ্যের বিষয়বস্তুও বহু বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। এতে তাঁর অসাধারণ মেধা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু বিষয়ে তাঁর রচনা ও গবেষণা আমাদের মননশীল, সৃষ্টিশীল জগতকে করেছে বিস্তৃত ও নানা বর্ণ-সুষমায় সুসমৃদ্ধ। তাঁর গদ্য রচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ ১. মননশীল রচনা, ২. গবেষণামূলক রচনা, ৩. কথা-সাহিত্য, ৪. আত্ম-জৈবনিক

www.nagorikpathagar.org

রচনা, ৫. ভ্রমণ কাহিনী, ৬. শিশুতোষ রচনা, ৭. শিল্প-সমালোচনা, ৮. বিবিধ।

সৈয়দ আলী আহসান শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অসংখ্য মননশীল নিবন্ধ-প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এগুলো তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। এ জাতীয় লেখার মাধ্যমে তিনি সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টিতে সাহায্য করেছেন। জীবন ও সমাজের নানা বিষয়ে তাঁর যে কত গভীর জ্ঞান ছিল এবং এ সব বিষয়ে তাঁর যে একটি নিজস্ব সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল, তাঁর রচনা পড়লে সেটা উপলব্ধি করা যায়। তাই তাঁর এ জাতীয় রচনা কেবল বক্তব্য-প্রধান নয়, তা সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনামূলক এবং সমাজ ও জীবনের জন্য তা নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো সাহিত্য-রসেও সমৃদ্ধ।

সৈয়দ আলী আহসানের গবেষণামূলক রচনা আমাদের ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতকে বিচিত্র সম্ভারে ও জ্ঞানালোকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথার্থ পরিচয় সন্ধানে এবং সমালোচনামূলক সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি আমাদের দেশীয় সাহিত্যের সাথে বিশ্ব-সাহিত্যের একটা সংযোগ সাধনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ফলে তাঁকে নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষা, সাহিত্য ও গবেষণা-জগতের একজন পথিকৃৎ হিসাবে বিবেচনা করা চলে।

মননশীল রচনা ও গবেষণাকর্ম ছাড়াও সৈয়দ আলী আহসান উপন্যাস, আত্মজৈবনিক রচনা, ভ্রমণ কাহিনী এমনকি, শিশুদের জন্যও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। শিল্পকলা ও ভাস্কর্য বিষয়েও তাঁর অসাধারণ জ্ঞানগর্ভ রচনাবলী পাঠক তো বটেই এমনকি, এসব ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ, তাঁদেরকেও বিস্মিত করে। এছাড়া, রন্ধন-শিল্প ও অন্যান্য নানা বিষয়ে তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রয়েছে। এত বিচিত্র বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি লেখক হিসাবে যেমন ব্যক্তি হিসাবেও ছিলেন তেমনি একজন অসাধারণ মানুষ।

বিভিন্ন বিষয়ে লেখা তাঁর গদ্যের ভাষা ও বর্ণনার স্টাইল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর গদ্যের ভাষা প্রসাদ গুণসম্পন্ন, সাবলীল, ছন্দ-ঝংকারময়, স্নিগ্ধ স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহমান। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এ বৈশিষ্ট্যময় চমৎকার ভাষাভঙ্গী সকলের নিকট যেমন আকর্ষণীয় তেমনি তা অনুসরণযোগ্য। বাংলা গদ্যরীতির উদ্ভব বেশি দিনের না হলেও বিভিন্ন সময় প্রতিভাবান লেখকদের পরিচর্যায় ক্রমান্বয়ে তা একটি মার্জিত, রুচিসম্মত,

www.nagorikpathagar.org

প্রসাদগুণ সম্পন্ন ও বৈভবপূর্ণ নান্দনিক রূপ লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ গদ্যের ভাষাকে এক অনুসরণীয় ও অতুলনীয় রূপ দান করার পর পরবর্তী অনেক লেখক তা আরো বৈচিত্র্য, বৈভব ও স্বাতন্ত্র্যে সারসিত করে তুলেছেন। এক্ষেত্রে সৈয়দ আলী আহসানের কৃতিত্ব অসামান্য। তাঁর গদ্যের ভাষা অনেকটাই তাঁর স্বকীয় প্রতিভা ও নৈপুণ্যে উৎকর্ষিত।

সৈয়দ আলী আহসান বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অসাধারণ অবদান ও কৃতিত্বের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বীকৃতি ও পুরস্কার লাভ করেন। এসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৭), দাউদ পুরস্কার (১৯৬৮, প্রত্যাখ্যান), সুফী মোতাহার হোসেন স্বর্ণপদক (১৯৬৭), একুশে পদক (১৯৮৩), নাসিরউদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), মধুসূদন পুরস্কার (১৯৮৫), স্বাধীনতা পুরস্কার (১৯৮৮), Officer Del Orore Des Arts Et Des Letters, Paris (১৯৯২), হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৭৪ সনে নাগপুর বিশ্ব হিন্দি সম্মেলন থেকে প্রাপ্ত সম্মাননা পত্র। 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ পদক - ১৯৯১', 'স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ স্বর্ণপদক' (১৯৯৮) প্রভৃতি লাভ করেন।

www.nagorikpathagar.org

মুফাখ্‌খারুল ইসলাম

বিগত শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম (জন্ম-৩০ এপ্রিল ১৯২১-২০০৭) । তাঁর জন্ম টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার অন্তর্গত 'মুসল্লী বাড়ি' নামে খ্যাত মামা বাড়িতে। পিতৃগ্রাম মামা বাড়ির সন্নিকটস্থ নূরপাড়া গ্রামে। কবির পিতা মৌলভী ময়েজ উদ্দীন উয়ায়সী ও মাতা নাজিরুন্নিসা উয়ায়সী। শৈশবে তিনি পিতার নিকট বিসমিল্লাখানি ও শিশু শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত করেন। টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী স্কুল থেকে ম্যাট্রিক ও করটিয়া সা'দৎ কলেজ থেকে আই.এ. ও বি.এ.পাশ করেন। এরপর ১৯৪৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. (বাংলা) পাশ করেন।

শিক্ষা-জীবন সমাপ্ত করে তিনি অধ্যাপনাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। সরকারি কলেজে চাকুরী কালে তিনি প্রথমে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ (১৯৫০-৫৩), এরপর যথাক্রমে রংপুর কারমাইকেল কলেজ (১৯৫৩-৬৩), ঢাকা কলেজ (১৯৬৩-৬৯), খুলনা দৌলতপুর কলেজ (১৯৬৯-৭১), ঢাকাস্থ তিতুমীর কলেজ (১৯৭১-৭৫) এবং সর্বশেষ খুলনা সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যাপনা করেন।

বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে স্কুলে পড়াকালেই তাঁর কাব্য-চর্চা শুরু হয়। মুফাখ্‌খারুল ইসলামের লেখা প্রথম কবিতা 'পাশের বাড়ির পুকুর' প্রকাশিত হয় স্কুল ম্যাগাজিনে, যখন তিনি মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। এরপর ১৯৪১ সন থেকে নিয়মিত 'দৈনিক আজাদে'র 'মুকুলের মাহফিল', 'মাসিক মোহাম্মদী', 'মাসিক সওগাত' ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। করটিয়া কলেজে অধ্যয়নকালে তাঁর কাব্য-প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে। সে সময় সা'দৎ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রখ্যাত লেখক ও শিক্ষাবিদ ইবরাহীম খাঁ। তিনি নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের জন্য 'মহুয়া সাহিত্য মজলিশ'

www.nagorikpathagar.org

নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ঐ সময় উক্ত কলেজে অধ্যয়নরত কবি তালিম হোসেন, কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম, কবি আব্দুল করিম ছাসী, কবি মোকসেদ আলীসহ কলেজের অনেক তরুণ কবি-সাহিত্যিকই তখন এই 'মহুয়া সাহিত্য মজলিশে'র ছত্র-ছায়ায় স্ব স্ব প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লাভ করেন।

প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং 'মহুয়া সাহিত্য মজলিশে'র সংস্পর্শে এসে মুফাখ্‌খারুল ইসলাম সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে গভীর অনুপ্রেরণা লাভ করেন। কলেজের অনুকূল পরিবেশ তাঁর প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁর অনুপ্রেরণায় ও সহপাঠী কবি-সাহিত্যিকদের সাহচর্যে তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সম্যক বিকাশ ঘটে। ঐ সময় আর একটি ঘটনা মুফাখ্‌খারুল ইসলামের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রেও এর অনুকূল প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এটা হলো ১৯৪২ সনে কলকাতায় গঠিত 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি'। পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম নবজাগরণে এ সোসাইটির যথেষ্ট অবদান ছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট। কিন্তু ১৯৪০ সনে 'লাহোর প্রস্তাব' গৃহীত হওয়ার পরই বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা, রাজনৈতিক কর্মসূচি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে তখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুর্নিবার আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে ওঠে। এরই প্রেক্ষাপটে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের উদ্যোগে ১৯৪৩ সনে কলকাতায় 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' এবং ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' নামে দু'টি সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান পরিগঠিত হয়। এ সম্পর্কে রেনেসাঁ সোসাইটির আহবায়ক বিশিষ্ট সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ লিখেছেন ঃ "ভারতের দুই জাতির স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলন একটা কৃত্রিম ব্যাপার নয়। এই আন্দোলনের ভিত্তি কেবল দুই জাতির শিক্ষা ও তমদ্দুনের নয়, ইহার ভিত্তিমূল দুই জাতির দুই বিশাল সাহিত্যিক আদর্শের ধারার সাথে সংযুক্ত।" **(মুজীবুর রহমান খাঁ ঃ 'পাকিস্তান', প্রকাশকাল ১৯৪৩, পৃ. ৭)**।

সোসাইটির অন্যতম পুরোধা বিশিষ্ট সাহিত্যিক-রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদের ভাষায় ঃ "সব জাতীয় চেতনাই তার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে। যতদিন সে ঐতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচনা না হবে ততদিন সে সাহিত্য থেকে জাতি প্রেরণা পাবে না।... বাংলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনেসাঁ আনতে হবে, তার সাহিত্য সাধনাকে অনুকরণ ও অনুসরণের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য দিতে হবে।... আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের প্রাণ হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানের মুখের ভাষা।" **(মাসিক মোহাম্মদী. শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১)**।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ "সেকালে (সাবেক) পাকিস্তান আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম মানসিকতার একটি লক্ষ্যাভিসারী চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে সাহিত্য ধর্মীয় পুনর্জাগরণ-কেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষা শুধু আবেগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা অধিকতর স্থিরনিবদ্ধ লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হয়েছিল। মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়তাবোধের পুরুজ্জীবন কামনায় নজরুল যে দৃঢ় ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, বিভাগ-পূর্বকালে তখনকার পাকিস্তান-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সে ভিত্তি-ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুসলিম সাহিত্যিকদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সরব ঘোষণায় উন্মুখর হওয়ার কাজটি অপেক্ষাকৃত সহজ ও দ্বিধামুক্ত হয়ে উঠেছিল। নজরুলের আবেগের সঙ্গে ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারার প্রভাবের সমন্বয়ে মুসলিম সাহিত্য-মানসে তখন নূতন সাংস্কৃতিক জিজ্ঞাসা ও চেতনা দানা বেঁধে উঠেছিল। সেই সঙ্গে বিভাগ-পূর্বকালেই রাজনীতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান পরিকল্পনা গৃহীত হবার ফলে একটি সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক পরিবেশ রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে কেন্দ্র করে স্বদেশপ্রীতি উৎসারণের পথও উন্মুক্ত হয়েছিল।

"স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সাধনা ও শিল্পকলার চর্চা যাতে অবারিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রেনেসাঁ আন্দোলনের নায়কগণ আইরিশ ও মার্কিন সাহিত্য আন্দোলনের আদর্শ অনুসরণের তাগিদ বোধ করেছিলেন ; এই তাগিদ থেকেই স্বতন্ত্র ঐতিহ্যের কথা বিশেষভাবে ঘোষিত হয়েছিল। বাঙালী মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ভিত্তিমূল প্রোথিত ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের ভিতর।" **(মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ ঃ 'বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন', প্রকাশকাল ১৯৮০, পৃ. ১৩০-৩১)**।

এ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও ভাব-বিপ্লবের উদ্দীপনা মুফাখ্‌খারুল ইসলামের কবি-মানসকে প্রভাবিত করে। ফলে তিনি তাঁর নিজস্ব আদর্শ, গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে কাব্য-চর্চার প্রয়াস পান। এ জন্য তিনি তাঁর উপযোগী কাব্য-ভাষারও অনুসন্ধান করেন। মধ্যযুগে মুসলমানদের দ্বারা রচিত সুবিশাল পুঁথি-সাহিত্যের মধ্যে তিনি এ ভাষার সন্ধান পান। নিজস্ব রুচি ও কাব্য-কৌশলে তিনি এ ভাষার ব্যবহারে যথেষ্ট পারদর্শিতা অর্জন করেন। জনপ্রিয় কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮৬০-১৯২৩)

www.nagorikpathagar.org

সর্বপ্রথম তাঁর বইতে, বিশেষত তাঁর প্রখ্যাত 'আনোয়ারা' (১৯১৪) উপন্যাসে মুসলমানী বাংলা শব্দ চালু করার প্রয়াস পান। অতঃপর কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক সাফল্যের সাথে আমাদের ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র মহিমান্বিত পথ রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

এক্ষেত্রে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮-১৯৯৯) প্রমুখ এ ধারায় কাব্য-চর্চা করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। মুফাখ্‌খারুল ইসলামও তাঁদেরই অনুবর্তী ছিলেন। মুফাখ্‌খারুল ইসলাম উপরোক্ত কবিদের প্রায় সমসাময়িক এবং প্রায় একই সময় তাঁরা কাব্য-চর্চা করেন। বিগত শতকের চল্লিশের দশকে মুসলিম নবজাগরণ, স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা ও অধিকার-সচেতনতায় দীপ্ত, আলোকিত যুগ-পরিবেশে তাঁদের কাব্য-চর্চার শুরু। ফলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ভাব, আবেগ ও পরিবেশগত অনেক মিল লক্ষ্য করা যায়। চল্লিশের দশকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবি হলেন আহসান হাবীব (১৯১৭-৮৫), সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-৭৫), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২০-২০০২), আবুল হোসেন (১৯২২), হাবীবুর রহমান (১৯২২-৭৬), সানাউল হক (১৯২৪-৮৩), সৈয়দ আলী আশরাফ (১৯২৪-৯৮), আতাউর রহমান (১৯২৫-২০০১), আবদুল গণি হাজারী (১৯২৬-৭৬), আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী (১৯২৬), আতোয়ার রহমান (১৯২৭-২০০৪), আবদুর রশীদ খান (১৯২৭), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭), আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০) প্রমুখ। এছাড়া, এঁদের পূর্ববর্তী কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), গোলাম মোস্ত ফা (১৮৯৫-১৯৬৪), কাজী কাদের নওয়াজ (১৯০১-৮৩), খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন (১৯০১-৮১), আবদুল কাদির (১৯০৬-৯৪), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-৭৯), বেগম সুফিয়া কামাল (১৯১১-৯৯), আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯১১-৮৬) প্রমুখও এ সময় কাব্য-ক্ষেত্রে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এঁদের মধ্যে ফররুখ আহমদের সাথেই মুফাখ্‌খারুল ইসলামের অধিকতর মিল পরিলক্ষিত হয়।

ফররুখ আহমদের কাব্যে যেমন ইতিহাস, ঐতিহ্য, আদর্শ ও মানবতা বাঙ্ময় রূপলাভ করেছে, মুফাখ্‌খারুল ইসলামও তেমনি ইতিহাস-সচেতন, আদর্শনিষ্ঠ কবি। শব্দ-চয়নের ক্ষেত্রে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম এবং কিছুটা বে-নজীর আহমদ, ফররুখ আহমদ ও তালিম হোসেনের অনুবর্তী। তবে শব্দকে

www.nagorikpathagar.org

কবিতার অনুষঙ্গে পরিণত করতে ও উপমা-রূপক ব্যবহার-কৌশলে নজরুল, বে-নজীর, ফররুখ ও তালিম হোসেন যতটা সাফল্য প্রদর্শন করেছেন, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম তাঁদের তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ। মুফাখ্‌খারুল ইসলামের শব্দ ব্যবহারে যথেষ্ট কষ্ট-কল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়, যা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক ও অকাব্যসুলভ বলেও মনে হয়। মুফাখ্‌খারুল ইসলামের ক্ষেত্রে এধরনের বির্তক থাকলেও কবি-প্রতিভার দিক থেকে ও অন্যান্য কাব্যিক বিচারে মুফাখ্‌খারুল ইসলাম সমকালীন বিশিষ্ট কবিদের কাতারে নিঃসন্দেহে স্থান লাভের উপযুক্ত।

মুফাখ্‌খারুল ইসলামের রচনাবলীর একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

১. হে পাক ফউজ! (কাব্যগ্রন্থ), প্রকাশকাল, ১৯৪৭
২. মুরশিদ (নাটক) প্রকাশকাল ১৯৫১
৩. আউলাদ (কিশোর নাটক) প্রকাশকাল ১৯৫৮
৪. ভাষা ও রচনা-রীতি (কলেজ-পাঠ্য) প্রকাশকাল ১৯৬৩
৫. আল্লাহকে দেখা যায় (দার্শনিক প্রবন্ধ) প্রকাশকাল ১৯৭৪
৬. জালালী কবুতর (কাব্যগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ আগস্ট, ১৯৭৮। রচনাকাল ঃ ১৯৪৫-১৯৭৮
৭. কালো কয়লার সোনার আগুন (কিশোর গল্প), প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৮২
৮. ইতিহাসগত বিভ্রান্তি রহস্য (ইতিহাসগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪। রচনাকাল ঃ জুলাই, ১৯৭১
৯. শেরে খোদা সানী হযরত আব্বাস আলমদার (জীবনীগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫। রচনাকাল ঃ ২৭ এপ্রিল থেকে ৯ মে, ১৯৮৩
১০. ভাটির নওয়ারা (কাব্যগ্রন্থ), প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ১৯৮৭
১১. আদি তরীকাহ (ধর্ম-বিষয়ক), প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮। রচনাকাল ঃ জুলাই-আগস্ট, ১৯৭৬
১২. তৌবাতুন নসূয়া (একাংকিকা) প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯২। রচনাকাল ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩।

এছাড়া, কবির আরো কয়েকটি গ্রন্থের নাম জানা যায়, তবে এগুলো প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা জানা যায় না। এসব গ্রন্থেও কোন তালিকা মুদ্রিত আকারে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর পূর্বে কবি বাকরুদ্ধ ও স্মৃতি-বিভ্রমজনিত রোগে আক্রান্ত ছিলেন। তাই চেষ্টা করেও এ সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে কিছু জানা বর্তমান লেখকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে একটা সাদা

www.nagorikpathagar.org

লেফাফা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। লেফাফার এক পৃষ্ঠে কবির হাতে লেখা একটি তালিকায় কয়েকটি বইয়ের নাম পাওয়া গেছে। সেখানে গ্রন্থ রচনার বা প্রকাশনার কোন সন-তারিখ নেই। তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ ১. জামালপুরে ইসলাম, ২. টাঙ্গাইলে ইসলাম, ৩. ময়মনসিংহে ইসলাম, ৪. ব্যাকরণ বই ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর পাঠ্য বই, ৫. নওয়াব বাঁকের জঙ্গ ('পাণ্ডুলিপি লা-পাত্তা'-কবির নিজের হাতেই পাশে মন্তব্যটি লেখা)।

এছাড়া, 'জালালী কবুতর' গ্রন্থের পেছনের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবি-পরিচিতিতে অপ্রকাশিত কাব্যের সংখ্যা পঁচিশখানি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থের নামোল্লেখ করা হয়নি, কারণ হিসাবে প্রকাশিকার জবানীতে উল্লেখ করা হয়েছেঃ

"এক পাখীর নামেই কবি সাহেবের এক কাব্য করিতে চাহিয়াছিলাম। অন্য এক কবি শুনতে পাইয়া সেই নামে তাহার কাব্য প্রকাশ করেন।"

তাই দেখা যায়, উক্ত 'জালালী কবুতর' কাব্যের শেষ পৃষ্ঠায় কেবলমাত্র প্রকাশিত নিম্নোক্ত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির নামোল্লেখ আছে ঃ ১. সনেট পেত্রার্কান ও শেকসপীরিয়ান, ২. সনেট মুফাখ্‌খারীয়ান, ৩. তৌবাতুন নসূহা (উপরের তালিকায়ও নামটি আছে)- একাংকিকা, ৪. মারাঠা-মদিনী- একাংকিকা, ৫. ইন্টারভিউ- একাংকিকা, ৬. এলাচিপুরের মুন্সেফ- একাংকিকা, ৭. হাকীম বু আলী সীনা সালমান আবসাল- নাটক, ৮. হেনা- নাটক, ৯. আদহাম আশিক- নাটক, ১০. আল্লাহর মর্জি- নাটক, ১১. ঈমান পরখ- কিশোর নাটক, ১২. বড় ঈদ- কিশোর নাটক, ১৩. প্রহরী-পুত্র ও কিশোর নাট্যাবরী- কিশোর নাটক, ১৪. তমদ্দুন রূপায়ণ- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৫. নওয়াব বাকের জঙ্গ ও মজনু ফকীর (পূর্বের তালিকায় এটিরও উল্লেখ আছে)- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৬. টাঙ্গাইল বিবরণ- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৭. ইতিহাসের ফাঁক ও ফাঁকি- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৮. রংপুর-কাহিনী- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ১৯. ঐতিহাসিক প্রবন্ধ- প্রবন্ধ গ্রন্থ, ২০. ইসলাম পথের বাধা- প্রবন্ধ গ্রন্থ।

উপরোক্ত তালিকা থেকে জানা যায়, মুফাখ্‌খারুল ইসলাম মোট ৩৫ খানা গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যার চেয়ে অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে গ্রন্থের সঠিক সংখ্যা ও গ্রন্থভুক্ত বিষয়ের বিবরণ জানা দুষ্কর। তবে যতটুকু জানা যায়, তিনি একাধারে কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, একাংকিকা ও শিশু-সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় প্রধানত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্ম। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাঁর প্রবন্ধে মৌলিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তা বিতর্কেরও জন্ম দিয়েছে। খলাফায়ে রাশিদা এবং ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা

www.nagorikpathagar.org

ও ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে সুন্নী মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিন্নতার কারণেই এ বির্তকের উৎপত্তি ঘটেছে। তিনি শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই সুন্নী-অধ্যুসিত জনপদে এ বিতর্ক স্বাভাবিকভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। উপরোক্ত বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন লেখা হয়তো ইতিহাস অথবা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হলেও তা সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে না বলেই অনেকের ধারণা। তাছাড়া, উপরোক্ত গ্রন্থগুলো মানের দিক থেকেও সাহিত্য পদবাচ্য হওয়ার উপযুক্ত নয় । অতএব, এসব রচনাকে সাহিত্য হিসাবে বিবেচনা না করে তা ইতিহাস বা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবেই বিবেচনা করা সংগত।

'জালালী কবুতর' মুফাখ্‌খারুল ইসলামের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৯৪৫-৭৮ পর্যন্ত তিন দশকেরও অধিককাল ধরে লেখা বিভিন্ন কবিতার সংকলন। উৎসর্গ-পত্রে কবি লিখেছেন ঃ "জাতীয় আদর্শের প্রাণপণ উদ্ধারকারী প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের দরায হস্তে অতীব প্রীতিশ্রদ্ধার সঙ্গে অর্পিত হইল। বিনীত মুগ্ধ মুফাখ্‌খারুল ইসলাম।"

অন্যত্র 'দিবাচা'য় (ভূমিকা) লিখেছেন ঃ "ইহাকে আমার প্রায় প্রথম কাব্যগ্রন্থই বলা চলে। ইহা দেখিলে যাঁহাদের দোআ আমার মাথায় আনন্দাশ্রুরূপে বর্ষিত হইত, তাঁহারা নাই। জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ ২০ বছর যাবৎ এ জাতীয় কবিতা প্রকাশ করিতে তাকীদ দিয়া আসিতেছেন। জাতির আদর্শ সন্ধানের পথে সামান্য আলো জ্বালাইবার জন্যই এই গ্রন্থের অবতারণা।"

শেষোক্ত একটি মাত্র বাক্যে গ্রন্থের মূল বিষয় পরিব্যক্ত হয়েছে। এ গ্রন্থভুক্ত বিভিন্ন কবিতায় এ ভাব-চেতনা সর্বত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে মোট ১২টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত। এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রচিত বিভিন্ন কবিতার ভাব-সাজুর্য লক্ষ্য করেই কবি তা একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। নিচে কবিতাগুলোর পাশে রচনার কাল বা তারিখ উল্লেখ করা হলো ঃ

১. 'হে জালালী কবুতর', রচনাকাল ঃ ঢাকা ২৫ জানুয়ারী, ১৯৭০
২. 'হযরত শাহজালাল', রচনাকাল ঃ করটিয়া, মার্চ ১৯৪৫
৩. 'বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী', রচনাকাল ঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬
৪. 'হে নযীর! শহীদ নযীর', রচনাকাল ঃ ঢাকা ২৮ জানুয়ারী, ১৯৪৮
৫. হাফিয, রচনাকাল ঃ ঢাকা ১২ নভেম্বর, ১৯৪৮
৬. শাহ ইসমাঈল গাযী, রচনাকাল ঃ ২৮ জানুয়ারী, ১৯৬৪

www.nagorikpathagar.org

৭. সালাম তস্‌লীমাত, রচনাকাল ঃ ঢাকা ২৮ মে, ১৯৭৫
৮. কাওয়ালী, গান, রচনাকাল ঃ খুলনা ৭ আগস্ট, ১৯৭৫
৯. দিনান্ত-সূর্য, সনেট, রচনাকাল ঃ খুলনা ১১ আগস্ট, ১৯৭৫
১০. যিয়ারত, রচনাকাল ঃ খুলনা ১৫ নভেম্বর, ১৯৭৫
১১. শেরে বাঙ্গালা জিন্দাবাদ, রচনাকাল ঃ খুলনা, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৬
১২. হে পীর খান জাহান! রচনাকাল ঃ খুলনা ৭ মে, ১৯৭৮

'হে জালালী কবুতর' কবিতায় রূপকের মাধ্যমে কবি তাঁর আধ্যাত্মিক অনুভবের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর এ বিখ্যাত কবিতার কয়েকটি লাইন ঃ

"তোমার পাখার শানে এ পাক ভাটির আসমান
নূরানী চমকে দোলে মাশুকের নেশায় বিভোর
কুয়াশা ভাঙ্গার রাহে তোমার উড়াল অফুরান ঃ
মুর্‌তাযা আলীর হাতে তোমার লীলার সরঞ্জাম ঃ
সে আদর্শে আপোষ না জানে
দুর্দম জীবনে আনে মর্তেই সে কাংক্ষিত কৌসর,
দুনিয়া ও আখিরাত দুই পাখে স্বনে এক নাম,
হে মুক্ত জালালী কবুতর।"

মহানবী (স.) ছিলেন সর্ববিধ মানবীয় গুণের আধার। তিনি মানবজাতির সর্বোত্তম আদর্শ। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবাগণও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবতার উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ইসলামের চতুর্থ খলীফা শেরে খোদা হযরত আলীকে (রা) আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর মনে করা হয়। তাঁর অনুসারী বহু পীর-বুজুর্গ ও অলি-আল্লাহ ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

ইসলামের আলো এবং বিশেষ করে আধ্যাত্মিকতার রোশনি নিয়ে যে সব অলি-আল্লাহ বাংলার যমীনে আগমন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভাটি এলাকার অর্থাৎ সিলেটের হযরত শাহজালাল (র) ছিলেন অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তাঁর দরগাহ শরীফে অসংখ্য কবুতরের বসবাস। এসব কবুতর 'জালালী কবুতর' নামে পরিচিত। এ কবুতরকে কবি এখানে আধ্যাত্মিকতার রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে অশান্ত 'দুর্দম জীবনে আনে মর্তেই সে কাংক্ষিত কৌসর' (আবে কওসর)। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক সাধনার বলে মানুষ এ পৃথিবীতেই 'আবে-কওসর' বা বেহেশতের পরিমল শান্তি লাভ করতে পারে। কবি তাই বলেন ঃ

www.nagorikpathagar.org

"সব ক্লেদ নীচে ফেলে অতি ঊর্ধ্বে তোমার উড়াল,
অমর নবীর লিপি রক্তাক্ত ডানায় ঢেকে দিয়েছ সামাল
জমলে-সিফ্‌ফীনে-কারবালায় ;
আরো তীব্র জ্বালোয়ায়
এনেছ অব্যর্থ পাখে সে-ছহীফা-মুক্তির সনদ
তন্ত্রমন্ত্র-মুক্ত রুদ্ধ মানুষের দ্বারে,
হে জালালী কবুতর! – সেই মুবারক নিআমত"

এখানে কবি মাত্র অল্প কয়েকটি কথায় আরবে এবং বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইসলাম বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য এসেছে, বাংলাদেশেও যখন নানা তন্ত্রমন্ত্র ও ভেদ-প্রথার কবলে মানবতা রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তখন ইসলাম-প্রচারক অলি-আল্লাহগণ এসে সাম্য ও মানবতার ধর্ম প্রচার করেন। ফলে শতধাবিভক্ত সংস্কারগ্রস্ত মানুষ মুক্তির মহানন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বাংলার জ্বরাগ্রস্ত, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ধ্বংসস্তূপে গড়ে ওঠে এক নতুন প্রাণবন্ত, মানবতাবাদী, সাম্য-ভ্রাতৃত্বপূর্ণ আলোকিত সমাজ। সিলেটের হযরত শাহজালাল (র) ছিলেন এ ইসলাম-প্রচারক অলি-আল্লাহদের মধ্যে অন্যতম। বাংলার ভাটি এলাকায় তিনি ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিক জমিদার ও সামন্ত-অধিপতিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে দ্বীন প্রচার করেছিলেন ও মানবতা-বিরোধী নানা কুসংস্কার ও অনাচার নির্মূলে সক্ষম হয়েছিলেন। এ কাজে তাঁকে বিপুল বাঁধা-প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী পৌত্তলিক শক্তি অন্যদিকে হিন্দু জমিদার-সামন্ত বাদী বর্বর পশু-শক্তির বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করে ইসলামের প্রচার-প্রসারে নিরন্তর সংগ্রাম চালাতে হয়েছে। এভাবেই অপরিসীম কষ্ট সহ্য করে প্রাণ-পণ সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলার ভাটি এলাকায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। তাই হযরত শাহজালাল (র) শুধু ইসলামী শাশ্বত মানবতারই প্রতীক নন, তিনি চরম আত্মত্যাগ ও সংগ্রামেরও মূর্ত প্রতীক।

এভাবে 'জালালী কবুতর' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত সবগুলো কবিতায় কবি ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাগরণের কথা বলেছেন। এ কাব্যের অন্ত র্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই দীর্ঘ। বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনেক হৃদয়স্পর্শী প্রাণবন্ত কাহিনী কবির আবেগময় ভাষায় অভিব্যক্তি লাভ করার ফলে কবিতাগুলো স্বভাবতই দীর্ঘ কলেবর বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থভুক্ত 'কাওয়ালী' শীর্ষক কবিতাটি মূলত একটি গান। উর্দু কাওয়ালী গানের আদলে এটা লেখা। খুলনার মহান অলি-আল্লাহ পীর খান জাহান আলীর (র) স্মরণে এটা রচিত। তিনিও ছিলেন একজন মহান ইসলাম-প্রচারক আওলিয়া। বাংলার দক্ষিণ

www.nagorikpathagar.org

এলাকায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তিনি মানবতার ধর্ম ইসলামের প্রচার করে অধঃপতিত মানুষকে মুক্তির সন্ধান দিয়েছিলেন। 'দিনান্ত সূর্য' কবিতাটি 'জাতীয় মঙ্গলে'র কবি মোজাম্মেল হকের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৫ সনে লেখা একটি সনেট। কবি সনেট রচনায় কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়াস পান। এটাকে তাঁর সেই নিরীক্ষামূলক একটি সার্থক সনেট বলা যায়।

একটি বিস্ময়কর বিষয় হলো এই যে, 'জালালী কবুতরে'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলো দীর্ঘ পরিসরে লেখা হলেও কবিতার ভাব, বিষয় ও আঙ্গিক সর্বদা অপরিবর্তনীয় থেকেছে। কালের বিবর্তন, আধুনিক বাস্তবতা কিংবা মনোভঙ্গীগত উত্তরণ এতে তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। এতে বুঝা যায়, কবির বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে তাঁর মানস-বিবর্তন তেমন একটা ঘটেনি।

মুফাখ্খারুল ইসলামের 'ভাটির নওয়ারা' কাব্যটি বাংলার বার ভূঁইয়াদের গৌরবময় কীর্তি-গাঁথায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থটি উৎসর্গিত হয়েছে তৎকালীন বাংলাদেশের নৌ-বাহিনীর প্রধান রিয়ার এডমিরাল সুলতান আহমদের নামে। উৎসর্গ পত্রে কবি লিখেছেন ঃ "মধ্যযুগের বঙ্গবীর ঈসা খাঁ, সৈয়দ মাসুম কাবুলী, খওয়াযা উস্‌মান প্রমুখের প্রতি শ্রদ্ধা ও বর্তমান বাংলাদেশী নওয়ারার অর্থাৎ নৌবাহিনীর অতন্দ্র জওয়ানদের প্রতি দোয়া খায়র আর বাংলাদেশী নওয়ারার তৎকালীন সর্বাধিনায়ক রিয়ার এডমিরাল সুলতান আহমদের প্রতি সম্প্রীতি" জানিয়ে উৎসর্গিত হয়েছে। বাংলার ইতিহাসে এক সময় যে নৌ-সেনাদল গড়ে ওঠে তাকেই 'নওয়ারা' বলা হয়।

কবি 'ভাটির নওয়ারা' গ্রন্থের 'পেশ কালামে' (উপক্রমণিকা) লিখেছেন ঃ "বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইউয়াজ খিলজীই (১২১৩-১২২৭ সন) যে বাংলার নওয়ারার পত্তন করেন, তাই মাত্র ইতিহাসে পাওয়া যায়। বাংলার এ নওয়ারা যুগে যুগে উন্নয়ন লাভ করতে করতে বাংলা বিহারে মুগল আক্রমণের সময় পর্যন্ত এমন দুর্দম হয়ে ওঠে যে, এদেশে মুগলেরা নিজস্ব নওয়ারা বাহিনী পত্তন করবার আগে পর্যন্ত ভাটি বাংলার নওয়ারার সঙ্গে নৌযুদ্ধে কিছুতেই পেরে ওঠেনি (১৫৭৬-১৬২২)। মুগলেরা যখন ঈসায়ী ১৬২২ সনের দিকে বাংলায় দখল কায়েম করে, তখন আবার অন্য এক উৎপাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সে উৎপাতও ভাটির নওয়ারার হাতে জেরবার হয়।... স্বদেশী ও বিদেশী বিকারগ্রস্ত অনাচারীরা জোট পাকিয়ে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী ও মগ জলদস্যু একত্রে যখন ভাটি বাংলা ছারখার করতে থাকে, তখন যদিও উৎপীড়িতেরা পেটের চিন্তায় জোট পাকাবার ভাবনা ভাবতে সময় পায়নি, তথাপি যখন তাদের বৌ-ঝি ছেলেমেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশে বিভূঁইয়ে চড়াদামে দাস-দাসী, গোলাম-বাঁদীরূপে এরা বিক্রি করতে ছিনিয়ে নিতে

www.nagorikpathagar.org

থাকে, তখন ভাটি বাংলার জনসাধারণের নৌশক্তি আবার চাড়া দিয়ে ওঠে। তারা আঞ্চলিক বীরদের অধিনায়কতায় রুখে দাঁড়াতে শুরু করে।"

কবি এ গ্রন্থে 'দীবাচা'য় (ভূমিকা) লিখেছেন ঃ "ভাটির নওয়ারা শুধু দিল্লীর মুগলশাহী আগ্রাসন প্রতিহত করতেই বীরত্ব দেখায় নাই। দেখিয়েছে মগ, হারমাদ, মারহাট্টা দস্যু দমনেও অপূর্ব নৈপুণ্য। তার কিছু পরিচয় প্রথম দিককার কবিতায় পরিস্ফুট হয়েছে। পরের কবিতাগুলিতেও সৈনিক জীবনেরই ব্যথা-বেদনা-মিলন বিরহ বিধৃত হয়েছে।"

'পেশ কালাম' এবং 'দীবাচা'য় কবি তাঁর কাব্যের নামকরণ এবং গ্রন্থভুক্ত কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট আলোকপাত করেছেন। গ্রন্থটি ১৯৮৭ সনে প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। গ্রন্থটিতে মোট ১৪টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবিতাগুলি ১৯৪৮-৭০ এর মধ্যে লেখা। নিচে গ্রন্থভুক্ত কবিতার শিরোনাম, রচনার স্থান ও তারিখ সন্নিবেশিত হলো ঃ

১. ভাটির নওয়ারা (রচনাকাল ঃ ঢাকা- ১.৭.৪৮)
২. ঈসা খান মস্‌নদ-ই-আলী (রচনাকাল ঃ ঢাকা- ৬.৯.৪৮)
৩. ভাটির জোয়ার খেলা (রচনাকাল ঃ ঢাকা- আগস্ট, ১৯৪৮)
৪. আমি জানি (রচনাকাল ঃ মুসলিম হল, ঢাকা- ১.২.৪৯)
৫. ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ (রচনাকাল ঃ মুসলিম হল, ঢাকা- ১৩.৭.৪৯)
৬. অগ্রসর হও (রচনাকাল ঃ মুসলিম হল ঢাকা- ২৮.৯.৪৯)
৭. ফউজী জিন্দিগী (রচনাকাল ঃ সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা- অক্টোবর ১৯৪৯)
৮. আসন্ন (রচনাকাল ঃ ঢাকা- নভেম্বর, ১৯৪৯)
৯. বিদায় সরাই সাকী (রচনাকাল ঃ মুসলিম হল, ঢাকা- ২৪.১১.৪৯)
১০. জিহাদ প্রভাতে (রচনাকাল ঃ মুসলিম হল, ঢাকা- ২৫.২.১৯৫০)
১১. নয়া লড়াই (রচনাকাল ঃ সলিমুল্লাহ হল, ঢাকা- ২৭.২.৫০)
১২. মৃত্যুজিৎ (রচনাকাল ঃ পাবনা- জুলাই, ১৯৫২)
১৩. মা'সূম কাবুলী (রচনাকাল ঃ রংপুর- সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)
১৪. ভাটি বাংলার আমীর বহর (রচনাকাল ঃ খুলনা- আগস্ট, ১৯৭০)

ভাটির নওয়ারা অর্থাৎ নৌবহর বাংলার এক গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকা এক সময় চলাচলের প্রধানতম ও অপরিহার্য বাহন ছিল। চলাচলের জন্য যেমন, পণ্য পরিবহনের জন্যও তেমনি সেসময় নৌকার কোন বিকল্প ছিল না। ক্ষেত থেকে ধান কেটে বাড়ি আনার জন্য নৌকা, পাট বিক্রি করার জন্য বন্দরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা, নাইয়রে যাওয়ার জন্য

www.nagorikpathagar.org

নৌকা, পারাপারের জন্য নৌকা, ফিরিওয়ালার সওদা ফিরি করে বেচার জন্য নৌকা– এভাবে বর্ষাকালে যে কোন কাজে বাড়ির বাইরে পা রাখতেই নৌকার প্রয়োজন হতো। এছাড়া, মাছ ধরার জন্য জেলে ডিঙি, বাইচের জন্য পানশি নৌকা, দূরবর্তী এলাকায় যাতায়াতের জন্য গহনার নৌকা, প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ছৈতোলা বজরা নৌকা, তেজারতী কাজের জন্য বড় মালবাহী নৌকা ইত্যাদি নানা কাজে হরেক রকম নৌকার প্রচলন ছিল তখন নদী-মাতৃক বাংলাদেশে।

বহিঃশত্রুর বর্বরোচিত হামলা প্রতিহত করে জন-জীবনে নিরাপত্তা বিধানের জন্যও সেকালে নৌ-বাহিনী বা নওয়ারার প্রচলন ঘটে। এভাবে এই নওয়ারার ভূমিকা বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। বিশেষত বাংলার স্বাধীন যুগে বার ভূঁইয়াদের আমলে দিল্লীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐ সময় নৌ-বাহিনী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে বহিঃশত্রু ও ঠগ-দস্যুদের আক্রমণ থেকে বাংলার স্বাধীনতা নিরাপত্তা অক্ষুণ্ন রাখার প্রয়াস পান।

তাই দেখা যায়, জাতীয় প্রয়োজনেই এক সময় গড়ে ওঠে 'নওয়ারা' বা নৌ-বহর। বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা, বর্গীদের লুণ্ঠন, মগ হার্মাদ, মারাঠা তস্কর, ঠগ-দস্যু, ছিনতাইকারী-অপহরণকারীদের হাত থেকে বাংলার জনগণকে রক্ষার জন্য মুসলিম শাসনামলে এই শক্তিশালী নওয়ারার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। দিল্লীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাংলার নওয়ারা বা নৌ-বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। এভাবে দেখা যায়, নওয়ারার নানা বীরত্ব-কাহিনী বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

এ নওয়ারার প্রথম পত্তন করেন বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইউয়াজ খিলজী (১২১৩-১২২৭)। বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খাঁ মসনদ-ই-আলী, তৎপুত্র মূসা খাঁ, মা'সূম কাবুলী প্রমুখ ইতিহাস-খ্যাত নওয়ারার বীরগণ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁদের বিস্মৃত-প্রায় এ গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যই 'ভাটির নওয়ারা' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তু। গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'ভাটির নওয়ারা'য় এ বিষয়গুলো কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেন ঃ

"পদ্মার বুক থম্ থম্ আজ, দুর্যোগ কালো রাত,
উত্তাল স্রোত রোষে কেঁপে ওঠে লভি কোন্ সংঘাত!
সারা আসমান চিড় চিড় করে বিদ্যুৎ ছুটে যায়,
কীর্তিনাশার বক্ষ কাঁপছে তুফানের শংকায়!

www.nagorikpathagar.org

ঘন তিমিরের দীওয়ারা লংঘি 'বিদ্যুৎ পিছে ফেলি'
কামানের তীর ছুটে যায় কোথা তীক্ষ্ণ ফলক মেলি;
ছিন্ন সরীসৃপের মতন ঢেউ ছিঁড়ে দুই পাশে,
দীর্ণ স্রোতের উচ্ছৃত ফেনা বুদ বুদ হয়ে ভাসে।
ভাটি মুলুকের নওয়ারা চলেছে বোররাক-বেগে ছুটে,
কোন দূর দ্বীপে দুশ্‌মন-ঘাঁটি দেখেছে অক্ষিপুটে'।"

এভাবে ভাটির নওয়ারাদের শৌর্য-বীর্য-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করেছেন কবি অতি চমৎকারভাবে। কবিতার শব্দ, উপমা-রূপক ব্যবহার, ছন্দ ও ভাব-কল্পনা নির্মিতির ক্ষেত্রে নজরুলের প্রখ্যাত 'খেয়াপারের তরুণী' ও ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার একটা আমেজ পরিলক্ষিত হয়। এ কবিতাটি মুফাখ্‌খারুল ইসলামের একটি সুন্দর ও সার্থক কবিতা। এ গ্রন্থের দ্বিতীয় কবিতা 'ঈসা খান মস্‌নদ-ই-আলী' একটি অনবদ্য কবিতা। এ দীর্ঘ কবিতাটি এভাবে শুরু হয়েছে ঃ

"আলীফশাহীর গড় ভেদ করি জোহরার দ্যূতি জাগে,
টলোমলো আঁসু রাতের কপোলে আসন্ন ঊষা-রাগে!
তরুণীর বাহু জড়ায়েছে তারে আবেগ-বিভোল প্রাণে,
পল্লী-জওয়ান চমকি উঠিছে তবু কার আহ্বানে—
স্বপ্নের ঘোরে ঃ সারা রাত জেগে করছে ইন্তিজার—
নিরুদ্ধ শ্বাসে কান পেতে আছে কার ডাক শুনিবার।

মাঝে মাঝে যেন নজরে আসিছে সমুখে ঝুলান অসি,
দূরবন-শিরে চেয়ে দেখে কোথা জাগে নাকি বাঁকা শশী,
আরো জাগে নাকি তার সাথে সাথে করে নাকি আহ্বান
ডাকে নাকি ঈসা খান।

... ...
তোমার জিহাদে শরীক হওযার তরে
চাঁদা দিবে, তাই কাপড় পরে না বহুদিন হতে এরা,
তোমারেই খুঁজে কমজোর দেহ টানে লাঠি ভর করে,
এই খানে এস পেতে নাও তব ডেরা ঃ
দেখবে ও-লাঠি উঠেছে সজাগ হয়ে
মোগল-বিজয়ী তুমিও উঠবে চমকি সবিস্ময়ে!

মুমিনশাহীর মুমিন-জাদীরা গায়ের জেওর খুলি,
তোমার জিহাদে সাহায্য দিতে রেখেছে হস্তে তুলি।..."

বাংলার বার ভূঁইয়াদের নেতা স্বাধীন সুলতান ঈসা খাঁকে কবি এখানে স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণা স্বাধীনতাকামী বীর

www.nagorikpathagar.org

বাঙালিও ঘরে ঘরে প্রতিরোধের দূর্গ গড়ে তুলেছিল। বীর ঈসা খাঁ ছিলেন তাদের মহান নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস। বিদেশী হানাদারদের মুকাবিলায় তাদের যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে তারা ঈসা খাঁর নেতৃত্বে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। বাংলার সাধারণ মানুষ– যুবা, বৃদ্ধ, এমনকি অসহায় রমণীকুল পর্যন্ত পিছ পা হয়নি। 'ভাটির জোয়ার খেলা' কবিতায় তারই বর্ণনা ফুটে উঠেছে সহজ, সরল, সাবলীল ভাষায় ঃ

"এখন গভীর রাত–
ঘরে ঘরে কেন মাটির চেরাগ জ্বলছে অকস্মাৎ!
মাটির কূপিতে ভেরেণ্ডা তেল হলো ঘোর তেজিয়ান,
গাঁয়ে গাঁয়ে আজ কাঁচা ঘুম ভেঙে জেগেছে কিষাণ প্রাণঃ
কোমর বেঁধেছে, সড়কি নিয়েছে টানি
স্কন্ধে ফেলেছে ধারাল কোদালখানি;
মালকোঁচা এঁটে বল্লম-হাতে পল্লী-জওয়ান চাষী
খাড়া হলো এসে কুটিরের দ্বারদেশে,
সোহাগ-পরশে এতটুকু ভালবাসি,
হাতটি বুলিয়ে প্রেয়সীর এলোকেশে
একবার শুধু কহিল নীরব স্বরে
ঘরে বসে আমি থাকবো কেমন করে?
ঈসা খাঁর ডাক এসেছে আজকে লড়াইয়ের মাঠ হতে।"

'ভাটির নওয়ারা' মুফাখ্‌খারুল ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ। এতে বাংলার এক বিস্মৃত-প্রায় গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের বর্ণনা রয়েছে। এ ঐতিহ্য যেমন বীরত্বপূর্ণ, তেমনি মর্মন্তুদ বেদনার করুণ আলেখ্যে মর্মরিত। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, কবি একজন ঐতিহ্য-সচেতন জন-মানুষের কবি। ঐতিহ্যের দীপ্ত আলোতে তিনি জীবন্মৃত জাতিকে নব বলে বলীয়ান হয়ে উজ্জীবিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। 'ভাটির নওয়ারা' কাব্যের প্রতিটি কবিতার প্রতিটি ছত্রে নবজাগরণের এ উদাত্ত আহ্বান উচ্চারিত হয়েছে। তাই এ কাব্য আমাদের জাতীয় জাগরণের এক মহত্তম উচ্চারণ ও দীপ্ত আলোর রোশনিতে সমুজ্জ্বল। রেনেসাঁ-যুগের বাঙ্ময় আবহের মধ্যে কবির মানস-পরিগঠিত হয়েছিল, এতে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। কবির পূর্বসূরী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), গোলাম মোস্তফা, কাজী নজরুল ইসলাম, বে-নজীর আহমদ, তালিম হোসেন প্রমুখ কবিদের পদাংক্ক অনুসরণে মুফাখ্‌খারুল ইসলাম নিজ ক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

www.nagorikpathagar.org

মুফাখ্‌খারুল ইসলাম সনেট রচনায় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। সনেট নিয়ে তিনি ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মাইকেল মদুসূদন দত্তই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন। সনেট রচনায় মাইকেলের নৈপুণ্যও ছিল তুলনাহীন। সনেটের আটসাঁট বাঁধুনি, কড়া নিয়ম-কানুন মেনে সার্থক সৃষ্টি খুব কঠিন কাজ। তাই এক্ষেত্রে অনেকেই সচেষ্ট হলেও সফলতা অর্জন করেছেন খুব কম কবিই। মোফাখ্‌খারুল ইসলাম সম্ভবত এক্ষেত্রে একজন ব্যতিক্রমী প্রতিভা হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য। সনেট রচনায় তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

অন্তঃমিল বিন্যাসের ক্ষেত্রে সনেটকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়– পেত্রার্কান ও শেক্‌সপীরিয়ান। পেত্রার্কানের মিল-বিন্যাস এ রকম অষ্টক ঃ কখ খক কখ খক। ষট্‌কে ঃ তাপত পতপ, অথবা, তপঙ তপঙ অথবা, তপপ পতত। শেক্‌সপীরিয়ান মিল বিন্যাস, অষ্টকে ঃ কখ খক গখ খগ। ষট্‌কে ঃ তপ তপ ঙঙ।

এ প্রচলিত মিল-বিন্যাসের বাইরে মুফাখ্‌খারুল ইসলাম অন্য একটি মিল-বিন্যাস নিয়ে অনুশীলন করেছেন এবং তিনি এর নামকরণ করেছেন মুফাখ্‌খারীয়ান। এর মিল-বিন্যাস এ রকম অষ্টকঃ কখগকখগকখ। ষট্‌কে– ঘঙচঘঙচ। এটা কবির আত্ম-প্রত্যয়ী মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সনেটের রূপরীতিতে পরিবর্তন আনার প্রয়াস পেয়েছেন। এটা শুধুমাত্র আত্ম-প্রত্যয়ী প্রতিভাবান কবির পক্ষেই সম্ভব। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি কোন অনুসারী সৃষ্টি করতে সক্ষম হননি। অর্থাৎ তাঁর প্রবর্তিত সনেটের নতুন আঙ্গিক-রীতি পরবর্তীতে অন্য কেউ অনুসরণ করতে এগিয়ে আসেনি।

উপরোক্ত নিয়মে তিনি বেশ কিছু সনেট রচনা করেছেন। তাঁর একটি অপ্রকাশিত সনেটগ্রন্থে মোট ২৭টি সনেটের সন্ধান পাওয়া যায়। সনেটগুলো ০৭-০৬-১৯৪৭ থেকে ১২-০৮-১৯৮২ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা। সে অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম সনেটটি এখানে উদ্ধৃত হলো ঃ

"অনেক খুঁজেছি! ... শবে কদরে তামাম রাত জেগে
মুসল্লী হঠাৎ এক মুহূর্তে একাগ্র ঘুম ভাঙি
চমকায়ে ভেবে ওঠে, সেই ক্ষণে মাবুদ নিকটে
নেমেছিল প্রার্থনার তটে, হায়রে অল্পের লেগে
নফল বিফল তার।... তেমনি আসে কি কামরাঙী
চরে সে পাগলী মোর এক মূক বধির! কি ঘটে,
কোথায় কলিজা কার ধ্বসে, নাই কোনো দিগে
খেয়াল! অথচ আত্মমুগ্ধ কভু হেসে ওঠে রাঙি

www.nagorikpathagar.org

শেষরাতে আসমান যমীন লাশ হয়ে পড়ে ঢলে
পাটাটনে রেলপথে! কে জানে কি ঘুরে ঘুরে দেখে
তখন সে নিস্তব্ধ নিজের সঙ্গী! তার সাড়া শুঁকে
যেইমাত্র একযোগে যায় পাখী মিলে কোলাহলে,
তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান (নেওয়া মাত্র গন্ধ তার মেখে)
তখন দেখিনে কিছু যার ছাপ তোলা যায় বুকে!!"

(খুলনা ১৩/১/৭৯)

উপরোক্ত সনেট গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে মুফাখ্‌খারুল ইসলামের কবি-প্রতিভার আর একটি উজ্জ্বল দিক সকলের নিকট সুস্পষ্ট হতো। সনেট রচনা একটি উচ্চ মানের কাব্য-কর্ম। অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তিনি এ কাজটি করেছেন বলে উপরোক্ত সনেট গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আমার ধারণা হয়েছে।

মুফাখ্‌খারুল ইসলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি। বিগত শতকে চল্লিশের দশকে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়ে তাঁর বিনম্র অথচ দৃঢ় পদচারণা বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করলেও রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব তাঁর মধ্যে তেমন একটা লক্ষ্যযোগ্য নয়। তিরিশোত্তর যুগের যেসব আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ না করে বাংলা কাব্যে ব্যতিক্রমী ধারা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, তিনি তাঁদেরও পদাংক অনুসরণ করেননি। বরং ঐতিহ্য-সূত্রে তিনি নজরুল-ফররুখেরই সম-গোত্রীয়। ভাব-সূত্রে তাঁর মধ্যে পূর্বসূরী কায়কোবাদের অনুবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও শব্দ-চয়ন, ছন্দ ও উপমা-রূপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনে হয়েছে নজরুল-ফররুখই তাঁর আদর্শ। তা সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কিছুটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। তাঁর কাব্যের ভাব, বিষয় ও শব্দ-চয়নে তিনি ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও ঐতিহ্যের অনুসারী। একাধারে কবিতা, একাংকিকা, কিশোর নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখায় তাঁর বহুমুখী অবদান রয়েছে। বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে দীর্ঘ ছয় দশক কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের উল্লিখিত বিভিন্ন শাখায় তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁকে একজন বিশিষ্ট কবির মর্যাদা দান করেছে।

একজন ঐতিহ্য-সচেতন কবি হিসাবে বাংলার মাটি, মানুষ, বাঙালি মুসলমানের সুখ-দুঃখ ও সংগ্রামের কাহিনী অন্তরঙ্গ কাব্য-ভাষায় প্রাণবন্তভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্য-কবিতায়। ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট কাহিনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরবি-ফারসি শব্দ ও গ্রামীণ জনপদের সাধারণ আটপৌঢ়ে

www.nagorikpathagar.org

শব্দের মিশেলে তাঁর কাব্য-ভাষাও নিজস্বতার গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কাব্য ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় মুফখ্খারুল ইসলামের উল্লেখযোগ্য পদাচারণা পরিলক্ষিত হয়। এটা তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতার পরিচয় বহন করলেও তিনি মূলত কবি এবং কবি হিসাবেই তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। তবে তাঁর সব কাব্যই সমানভাবে সার্থক তা বলা যাবে না, কোন কবির ক্ষেত্রেই তা বলা সম্ভব নয়। মোফাখ্খারুল ইসলামেরও 'জালালী কবুতর' ও ভাটির নওয়ারা' কাব্যগ্রন্থ দু'টি তাঁর সফলতম কাব্য-কীর্তি। এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কবি-খ্যাতিকে যেমন স্মরণীয় করে রেখেছে, তেমনি বাংলা কাব্য সাহিত্যের ভাণ্ডারকেও করেছে সমৃদ্ধ।

www.nagorikpathagar.org

কথাশিল্পী শাহেদ আলী

বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক শাহেদ আলী। কথাশিল্পী হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও শাহেদ আলী একজন উঁচু পর্যায়ের মননশীল লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, অধ্যাপক, বক্তা, সংগঠক, সমাজসেবক, রাজনীতিক ও সংস্কৃতিসেবী হিসাবে বিংশ শতকে আমাদের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর জ্ঞান, চিন্তা ও বিশ্বাসের সাথে কর্মের সমন্বয় সাধনে তিনি সর্বদা তৎপর ছিলেন।

শাহেদ আলীর পিতার নাম মৌলভী ইসমাইল, মায়ের নাম আয়েশা খাতুন। শাহেদ আলী (জন্ম ঃ ২২ মে ১৯২২–মৃত্যু ৬ নভেম্বর ২০০১) তৎকালীন সিলেট জেলার অন্তর্গত সুনামগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) তাহিরপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৯৪২ সনে সুনামগঞ্জ সরকারী জুবিলী হাইস্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৪৫ সনে সিলেট এম.সি কলেজ থেকে আই.এ ও ১৯৪৭ সনে ডিস্টিংশনসহ বি.এ পাশ করেন। ১৯৫০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলায় এম.এ পাশ করেন।

ছাত্রাবস্থায়ই শাহেদ আলী ১৯৪৪-৪৬ পর্যন্ত মাসিক 'প্রগতি' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অতঃপর ১৯৪৮-৫০ পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র সাপ্তাহিক 'সৈনিক'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫১-৫৩ পর্যন্ত তিনি বগুড়া আজিজুল হক কলেজ ও রংপুর করমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৪ সনে তিনি 'খিলাফতে রব্বানী পার্টি'র প্রার্থী হিসাবে পাকিস্তান আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে ১৯৫৮ সন পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৫ সনে 'দৈনিক বুনিয়াদে'র সম্পাদক, ১৯৫৬ সনে 'দৈনিক মিল্লাতে'র সহকারী

www.nagorikpathagar.org

সম্পাদক, ১৯৬২ সন থেকে 'ইসলামিক একাডেমী পত্রিকা' (বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা)–এর সম্পাদক ১৯৬৩ সন থেকে 'মাসিক সবুজপাতা'র সম্পাদক হিসাবে দীর্ঘকাল দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩-১৯৮৩ পর্যন্ত তিনি 'আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা' এর সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ ও সংকলন বিভাগের পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। এছাড়া, বিভিন্ন সময়ে তিনি চট্টগ্রাম সিটি কলেজ, মীরপুর বাংলা কলেজ, ঢাকার আবুজর গিফারী কলেজে অধ্যাপনা করেন। তিনি বাংলা একাডেমীর প্রতিষ্ঠা-লগ্ন থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর কাউন্সিলর ছিলেন। তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্য তিনি একাডেমীর 'ফেলো' নির্বাচিত হন। তিনি রাইটার্স গিল্ডের নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। দীর্ঘকাল ভাষা আন্দোলনের উদগাতা 'তমদ্দুন মজলিসে'র সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং ১৯৯৯ সনে মজলিশের আজীবন সভাপতি দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের ইন্তিকালের পর তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়ে আজীবন উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে তিনি বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলেন।

সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রতিনিধি হিসাবে অধ্যাপক শাহেদ আলী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এসব দেশের মধ্যে রয়েছে ঃ থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরায়ইন, সৌদি আরব, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্কসহ দুনিয়ার বহু দেশ সফর করেন।

শাহেদ আলী একাধারে কথাশিল্পী, মননশীল লেখক, শিশুতোষ রচয়িতা ও অনুবাদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নিম্নরূপঃ

গবেষণা ও মননশীল গদ্য রচনা ঃ ১. পাকিস্তান রূপায়ণে তরুণ মুসলিমের ভূমিকা (১৯৪৬), ২.ফিলিস্তিনে রুশ ভূমিকা (১৯৪৮), ৩. একমাত্র পথ (১৯৪৮), ৪. সাম্রাজ্যবাদ ও রাশিয়া (১৯৫২), ৫. তরুণের সমস্যা (১৯৬২), ৬. তৌহীদ (১৯৬৪), ৭. বাঙলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান (১৯৬৪), ৮. জীবন নিরবচ্ছিন্ন (১৯৬৮), ৯. মুক্তির পথ (১৯৬৯), ১০. সাম্প্রদায়িকতা (১৯৭০), ১১. বুদ্ধির ফসল, আত্মার আশীষ (১৯৭০), ১২. The Economic Oder of Islam (১৯৮১), ১৩. Islam in Bangladesh Today.

গল্পঃ ১. জিবরাইলের ডানা (১৯৫৩), ২. একই সমতলে (১৯৬৩), ৩. শা'নযর (১৯৮৬), ৪. অতীত রাতের কাহিনী (১৯৮৬), ৫. নতুন জমিনদার ৬. শাহেদ আলীর শ্রেষ্ঠ গল্প।

উপন্যাস ঃ হৃদয় নদী (১৯৮৫)

www.nagorikpathagar.org

নাটিকাঃ বিচার (১৯৮৫)

অনুবাদঃ ১. হেরোডোটাস, ২. এ যুগের বিজ্ঞান ও মানুষ (১৯৬০), ২. ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি (১৯৬৬), ৩. মক্কার পথ (১৯৮৪), ৪. দি হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল সায়েন্স, ইসলাম ইন বাংলাদেশ, ইকনমিক অর্ডার অব ইসলাম।

শিশুতোষ ঃ ১. সোনারগাঁয়ের সোনার মানুষ (১৯৭১), ২. ছোটদের ইমাম আবু হানিফা (১৯৮০), ৩. রুহীর প্রথম পাঠ (১৯৮১) ইত্যাদি।

অপ্রকাশিত রচনাবলীঃ একটি কবিতা সংকলণ (কিশোর বয়সে রচিত)

অগ্রন্থিত লেখাঃ মাসিক সওগাতে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত তাঁর প্রথম লেখা 'অশ্রু', 'রিসার্চ স্কলার' প্রভৃতি গল্প মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত 'এই আকাশের হাওয়া', 'ছিন্নপত্র'। নয়া জামানায় প্রকাশিত 'পরিচয়'। সৈনিকে প্রকাশিত 'হাসিকান্না'। দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত 'সোনার চেয়েও দামী'। দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত 'পিটিশন'। এলানে প্রকাশিত 'তুচ্ছ' প্রভৃতি গল্প এখনো পর্যন্ত কোন গ্রন্থভুক্ত হয়নি। এছাড়াও সৈনিক পত্রিকাসহ তিনি যেসব পত্রিকায় কাজ করেছেন, সেখানে প্রকাশিত তাঁর বহু লেখাই অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। শাহেদ আলীর কিছু কিছু রচনা নিয়ে চলচ্চিত্র রচিত হয়েছে। তাঁর রচিত কিছু গল্প বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর কণ্যা দিলরুবা জেড আরা ইংরাজিতে অনুদিত 'Selected Short Stories of Shahed Ali'-২০০৬ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শাহেদ আলী ইতিহাস-সচেতন, ঐতিহ্যপুষ্ট, বাস্তবধর্মী, সমাজমনস্ক লেখক। তাঁর লেখায় মাটি ও মানুষের কথা আছে। মাটি ও মানুষের ইতিহাস, মানুষের জীবন-সংগ্রামের বিচিত্র কাহিনী, ঐতিহ্যের সুদীপ্ত আশ্বাস, সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশার নিরন্তর দোলাচলে প্রত্যয়ের দৃঢ়তায় অবিমিশ্র জীবনের দ্বন্দ্বমুখর চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। বিশ্বাসে ও আচরণে তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তাঁর সাহিত্যেও এর প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য। বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে জীবনধর্মী সাহিত্যের সৃষ্টি হতে পারে, তার এক অনন্য উদাহরণ শাহেদ আলীর সাহিত্য। মননশীল রচনা তো বটেই, তাঁর কথাসাহিত্যেও তাঁর বিশ্বাসের সাথে বাস্তবতার ও জীবনধর্মিতার এক আশ্চর্য শিল্পসুন্দর সুসমন্বয় সুসংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁকে সম্ভবত বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মুসলিম কথাশিল্পী মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে। শাহেদ আলীর কথাসাহিত্যে বাংলাদেশের

www.nagorikpathagar.org

নৈসর্গিক মনোরম দৃশ্যপট, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম-প্রণয়, স্বপ্ন-প্রত্যাশাপূর্ণ জীবনের চিত্র, বর্ণাঢ্য ঐতিহ্য, সামিজিক মূল্যবোধ সাথে আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ বৈচিত্র্যময় জীবনচিত্র মনোরম বৈভবে অভিনব হয়ে উঠেছে।

চল্লিশের দশকে পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে শাহেদ আলীর সাহিত্য-চর্চার সূত্রপাত। তরুণ শাহেদ আলী নিজেও তখন স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পরাধীনতার বন্ধন-মুক্তি, স্বাধীনতার স্বপ্ন-কল্পনা, স্বকীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক মুহূর্তে শাহেদ আলীর মানস-বিকাশ কীভাবে ঘটেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এ বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এবং পাকিস্তান সৃষ্টির পর নতুন দেশ গড়ার আবেগচঞ্চল উদ্দীপনাপূর্ণ মুহূর্তে শাহেদ আলী জাতীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নবগঠিত স্বাধীন দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা কীরূপ নিতে পারে বা নেয়া উচিত সে ব্যাপারেও শাহেদ আলীর আগ্রহ ও ঔৎসূক্য ছিল প্রবল। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর এ ঔৎসুক্যের কারণে তিনি একদিকে ভাষা-আন্দোলনের পথিকৃৎ আদর্শবাধী সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশে' সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন অন্যদিকে, মুসলিম জীবন-চিত্র নিয়ে সাহিত্য বিশেষত কথা সাহিত্য কী রূপ পরিগ্রহ করতে পারে বা করা উচিত শাহেদ আলী তার উৎকৃষ্ট নমুনা হিসাবে ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে তিনি যথার্থই পথিকৃত হিসাবে গণ্য হবার যোগ্য।

শাহেদ আলীর প্রথম লেখা প্রথম ছোটগল্প 'অশ্রু' ছাপা হয় ১৯৪০ সনে 'সওগাত' পত্রিকায়। তখন তিনি মাত্র অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। আধুনিক সমাজ-পরিবেশ ও যুগ-জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে লেখা তাঁর এ গল্পটি তখন যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। কিশোর বয়সে লেখা এ গল্পটির মধ্যে তাঁর প্রতিভা ও সম্ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর সুবিখ্যাত গল্প 'জিবরাইলের ডানা' শাহেদ আলীকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায় এবং ছোটগল্প লেখক হিসাবে তিনি বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। ক্লাসিক মর্যাদাসম্পন্ন এ গল্পটি ১৯৫০ সনে আই.এ ও বি. এ. ক্লাসে পাঠ্য ছিল। ১৯৮৫ সনে এটি এস. এস. সি ক্লাসের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি প্রকাশের পরই দেশে-বিদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। Afro-Asian Book Club সংকলিত Under the Green Canopy গ্রন্থে 'জিবরাইলের ডানা' ইংরেজী অনুবাদ ছাপা হয়। মস্কো থেকে প্রকাশিত 'জানোতোয়ে ওবোলো' (সোনালী মেঘ) নামক সংকলনে

www.nagorikpathagar.org

রুশ ভাষায় অনূদিত হয়ে 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি ছাপা হয়। এছাড়া, গল্পটি বিদেশী আরো কয়েকটি ভাষায় অনূদিত হয়। এরদ্বারা এর সার্থকতা ও জনপ্রিয়তা আন্দাজ করা চলে। গল্পটির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের জন্য ভারতের বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃনাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, জ্যোতির্ময় রায়, নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়সহ অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা এর চলচ্চিত্র রূপ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের এ আগ্রহের কথা জানিয়ে শাহেদ আলীকে তাঁরা যে চিঠি লেখেন নীচে তার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র-নির্মাতা সত্যজিৎ রায় লেখেন ঃ

" অধ্যাপক শাহেদ আলী সমীপেষু

প্রীতিভাজনেষু,

... আমার 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি ভাল লাগার খবর একেবারে সত্যি। এর চিত্ররূপ দেয়ার খবরটি ষোলো আনা সত্যি না হলেও একেবারে ভিত্তিহীন নয়। কিছুকাল আগে গল্পটির চিত্র সম্ভাবনা নিয়ে আমাদেরই মধ্যে আলোচনা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে, গল্প সংগ্রহটির স্থানীয় প্রকাশকের সঙ্গেও এ বিষয়ে প্রাথমিক আলাপ হয়েছিল....'তিন কন্যা'র মত আরেকটি ছোটগল্পের চিত্র সংকলন যদি ভবিষ্যতে করি তাহলে জিবরাইলের ডানার কথা প্রথমেই চিন্তা করব এ প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে পারি।

গল্পটির জন্য আরেকবার আপনাকে অভিনন্দন জানাই। এটি আমি বহু চেনা পরিচিতকে পড়িয়েছি এবং ভবিষ্যতেও অনুমোদন করব।

প্রীতি নমস্কারান্তে ইতি

সত্যজিৎ রায়।"

জ্যোতির্ময় রায় 'জিবরাইলের ডানা' নিয়ে স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবি করার আগ্রহ প্রকাশ করে ১৯৭৯ সনের ৩১ জানুয়ারী শাহেদ আলীকে যে চিঠি লেখেন তা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নরূপঃ

"শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার 'জিবরাইলের ডানা' গল্পটি যখন প্রথম পড়েছিলাম তখনই মুগ্ধ হয়েছিলাম। একটি সূক্ষ্ম মর্মস্পর্শী কাহিনীকে আপনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে আমার মনে হয় এই অনুপম নিটোল গল্পটিকে চলচ্চিত্রে রূপায়িত করা যেতে পারে। আপনার ভাষা সাহিত্যের ভাষা, এই চলচ্চিত্রের ভাষা হবে দৃশ্যগত ও শ্রুতিগত। তবে আমি ডকুমেন্টারী ফিল্ম করি এবং পুঁজির সামর্থ্যও খুবই সীমিত। আমি যে রকম ছবির কথা ভাবছি সে ছবি হবে খুবই

www.nagorikpathagar.org

স্বল্পদৈর্ঘ্যের এবং আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে একটি তীব্র হৃদয়াবেগপূর্ণ ছবি। আপনি দেখিয়েছেন যে, কত অল্পে কত উঁচুতে উঠা যায়, আর আমিও সেই একই লক্ষকে বিদ্ধ করতে চাই।...

শুভেচ্ছান্তে ইতি

জ্যোতির্ময় রায়"

তৃতীয় চিঠিটি লেখেন ভারতের 'স্বর্ণকমল' বিজয়ী শিশু চলচ্চিত্রকার নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লেখেনঃ

"জনাব শাহেদ আলী,

আমার পরিচয় দিয়েই শুরু করি। এ বছর খগেন মিত্রর 'ভোম্বল মন্দির' শ্রেষ্ঠ শিশু চিত্রের নির্মাণের জন্য আমাকে জাতীয় পুরস্কার 'স্বর্ণ কমল' দেয়া হয়। বর্তমানে আর একটি শিশু চিত্র নির্মাণে আগ্রহী। গল্পটি আপনার লেখা। নাম 'জিবরাইলের ডানা'।

–নৃপেন গঙ্গোপাধ্যায়

৩৯ নং প্রতাপাদিত্য প্রেস।"

দুর্ভাগ্যবশত উপরোক্ত তিনটি উদ্যোগই অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত সফলকাম হয়নি। ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিদের কূটকৌশলকে এ জন্য অনেকে দায়ী করে থাকেন। এভাবে ঋত্বিক ঘটক, মৃনাল সেন প্রমুখও 'জিবরাইলের ডানা'র চলচ্চিত্র রূপদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ একই অজ্ঞাত কারণে তাঁদের উদ্যোগও ফলবতী হতে পারেনি। তবে এর দ্বারা 'জিবরাইলের ডানা'র অসাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি। মোটকথা, দেশে-বিদেশে উচ্চ প্রশংসিত 'জিবরাইলের ডানা' শাহেদ আলীর রচিত একটি ছোটগল্প। এটাকে তাঁর মাস্টার পীচ বললে অত্যুক্তি হবে না। সমগ্র বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যেও এটাকে একটি অনবদ্য রচনা বলে আখ্যায়িত করা চলে। শাহেদ আলীর অনন্য ছোটগল্প ও উপন্যাসও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর শক্তিমত্তা ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে।

অবশ্য একথা সত্য যে, 'জিবরাইলের ডানা' বাংলাদেশী মুসলিম সমাজে এক সময় যথেষ্ট বিতর্ক সৃষ্টি করে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণ, আল্লাহ জিবরাঈল ফিরিস্তা প্রসঙ্গ নিয়ে এক সময় বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত হয়। অনেকে এজন্য তাঁকে 'কাফির', 'মুর্তাদ' ইত্যাদি বলে গালাগাল পর্যন্ত করেন। এসম্পর্কে আমার লিখিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ "গল্পটি ১৯৪৮ সালে আমি লিখি। তারপর গল্পটি ইউনিভারসিটিতে বি. এত পাঠ্য ছিল। তখন এ গল্প

www.nagorikpathagar.org

নিয়ে কোন বিতর্কের সৃষ্টি হয়নি। ১৯৮০-৮৫ এর আগ পর্যন্ত এ গল্প নিয়ে কোন বির্তক হয়নি। অনেকে মনে করতেন এ গল্পটি এপারের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্প। কবি ফররুখ আহমদের কাছে এ গল্পটি অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যে কারণে তিনি জিরাইলের ডানা বই খানা সাথে সাথে রাখতেন। পাকিস্তান হওয়ার পর বলা যায় এ বইখানাই এ পারের প্রথম গল্পগ্রন্থ। কবি ফররুখ আহমদ বলতেন, আমাদের গল্প শুরু হয়েছে জিবরাঈলের ডানা থেকে। আসলে পরে যারা বির্তক সৃষ্টি করেছেন, আমি মনে করি তারা সাহিত্য-বিচারক নন, শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটি বিচার করেছেন। কিন্তু এটি কোন ধর্মীয় গল্প নয়, এটা একটি Symbolic story মাত্র।" **(শাহেদ আলী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ঃ বাংলা সাহিত্য সম্মেলন-সংকলন, ১৯৯২ দুবাই, পৃঃ ৬৫)**

কথাশিল্পী হিসাবে শাহেদ আলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তিনি আমাদের গ্রামীণ জীবন, পরিবেশ ও সমাজের সাধারণ মানুষের চরিত্র চিত্রায়ণ করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনে বিচিত্র অনুষঙ্গ, ভাব, চেতনা ও ঐতিহ্যের বর্ণালী ছন্দ তাঁর লেখায় উঠে এসেছে। সমাজ সচেতনতা ছাড়া কেউ সত্যিকার জীবনধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন না। শাহেদ আলী যথার্থ জীবনধর্মী লেখক, তাঁর লেখায় জীবন ও সমাজের বাস্তব চিত্র বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর নিজের উক্তি থেকেই সমাজ-সচেতনতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এ প্রসঙ্গে লেখকের দেয়া সাক্ষাৎকার থেকে তাঁর স্বীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ সঙ্গত মনে করছি। আমি ১৯৭৭-৯৬ পর্যন্ত দুবাইতে প্রবাস-জীবন যাপন করি। সরকারী চাকরীর পাশাপাশি আমি তখন প্রবাসী বাংলাদেশী ছেলেমেয়েদের বাংলা শেখার উদ্দেশ্যে দুবাইতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করি। স্কুলকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বাংলা সাহিত্য সম্মেলন ও পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। সম্মেলনে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে একজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিককে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতাম প্রধান অতিথি হিসাবে। ১৯৯২ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অধ্যাপক শাহেদ আলীকে প্রধান অতিথি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছিলাম। ঐ সময় স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকায় আমি তাঁর কয়েকটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করি। ঐসব সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর সাহিত্য-চিন্তা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বক্তব্য রাখেন। এখানে তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হলো। Gulf Weekly পত্রিকায় দেয়া সাক্ষাৎকারে শাহেদ আলী বলেন ঃ "My message is social. It is an attempt to awaken the social conscience of my people. Yes. there is a great deal of symbolism but it is rooted in my experience and environment.'' **(Quoted from the Gulf Weekly", Dubai, 19-25, March, 1992.)**

www.nagorikpathagar.org

অর্থঃ "সামাজিক বিষয়ই আমার লেখায় স্থান লাভ করেছে। আমার সমাজের মানুষের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা জাগ্রত করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। হাঁ সমাজ-সচেতনতা জাগ্রত করার লক্ষ্যেই এই প্রয়াস। হাঁ সমাজ-সচেতনতা জাগ্রত করার জন্য অনেক প্রতীকী বিষয় অবলম্বন করা যায়, তবে এক্ষেত্রে আমি আমার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।"

একজন যথার্থ শিল্পীর নিকট তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর উর্ধ্বে উঠে বা এর প্রভাবকে অস্বীকার করে কেউ প্রকৃত জীবন-শিল্পী হতে পারে না। জীবনের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ সম্পর্কে উক্ত একই পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে শাহেদ আলী বলেনঃ "My Writings are about my experience, about my environment. There is a great deal about my rural life but my themes are also urban. Often, I respond to my own feelings about the anomalies in urban life, about the erosion in social values in moral standards. The sum total of my message is to illustrate and convey the sufferings, the pain and the tragedies which people are forced to bear and struggle against. I dont believe that a writer can or should try to creat anything outside the context of his own experinece. To be authentic, you must be a product of your own enviroment. I contradict the theory that are poets and writers are bonded to humanity at large, not to a particular place or time. A Writer is born in a particular country, at a particaular time and in a particular place."

অর্থঃ "আমার লেখা মূলত আমার অভিজ্ঞতা ও পরিবেশ নিয়ে। আমার লেখার একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কথা, তবে নাগরিক জীবনের কথাও সেখানে আছে। নাগরিক জীবনের জটিলতা, সামাজিক জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন সম্পর্কে আমার অনুভূতির কথা আমার লেখায় ফুটে উঠেছে। সাধারণ মানুষের জীবন-যন্ত্রণা, তাদের দুঃসহ জীবনের মর্মন্তুদ পরিণতি যা আমরা প্রত্যক্ষ করি এবং যার বিরুদ্ধে মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম সেসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে আমার লেখায়। স্বীয় জীবন-অভিজ্ঞতার বাইরে কোন লেখকের কিছু সৃষ্টি করা বা সৃষ্টির প্রয়াস থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না। নিজের পরিবেশ থেকেই কেবল সাড়া জাগানো জীবনধর্মী সৃষ্টি সম্ভব। যারা বলেন, যথার্থ কবি বা লেখক স্থান-কালে উর্ধ্বে কেবল মানবতার সপক্ষে উচ্চকণ্ঠ, আমি তাদের মত সমর্থন করি না। একজন লেখক একটি নির্দিষ্ট দেশ, কাল ও স্থানের অধিবাসী (তিনি তারই প্রতিনিধিত্ব করেন)।"
(প্রাগুক্ত)

www.nagorikpathagar.org

এখানে শাহেদ আলী সুস্পষ্টভাবে তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের ছাপ যে তাঁর লেখায় ফুটে উঠেছে, সে কথা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। অন্য আর একটি পত্রিকায় প্রদত্ত সাক্ষাৎকারেও তিনি প্রায় অনুরূপ কথাই বলেছেন। সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত হলোঃ

"I have devoted to the study of life in the lower rangs of society. I give utterance to their sufferings...A Writer has to have commitment for his place, his community and his time. The greatest of writers have written about their own life." **('Khaleej Times', Dubai, 29 February, 1992).**

অর্থঃ "আমি সমাজের অধঃপতিত শ্রেণীর লোকদের বিষয়ে জানার জন্য আত্মনিয়োগ করেছি। আমি আমার লেখায় তাদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছি। একজন লেখক অবশ্যই তার স্থান, সমাজ ও কালের নিকট দায়বদ্ধ। একজন বড় লেখকের লেখায় তার নিজের জীবনের কথাই প্রতিবিম্বিত হয়।" **('খালিজ টাইমস', দুবাই, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২)।**

শাহেদ আলী তাঁর নিজ সমাজ ও পরিবেশের নিকট দায়বদ্ধ। এ সমাজের দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা দেখে তিনি ব্যথিত হন এবং তার সকরুণ চিত্র তাঁর লেখায় তুলে ধরেন। সমাজের নিকট দায়বদ্ধতার কারণেই সমাজের আদর্শ ও মানবিক মূল্যবোধকে অকৃত্রিম আবেগে লালন করেন ও তার স্খলনে বেদনাবোধ করেন, এটা তাঁর জীবন-বাস্তবতার এক সংবেদনশীল দিক। এ সামাজিক স্খলনে-পতন-অবক্ষয় তাঁর মননশীল গদ্য রচনায় তো বটেই, তাঁর জীবনধর্মী কথাসাহিত্যেও এর পরিচয় সুস্পষ্ট।

শাহেদ আলী একজন প্রতিবাদী লেখক। তরুণ বয়সেই তাঁর মধ্যে এ প্রতিবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। স্কুলে অধ্যায়নকালেই তিনি 'প্রভাতী' নামে এক বিপ্লবী প্রতিবাদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শাহেদ আলীর নিজের ভাষায়ঃ "I was editor of a revolutionary paper called Probhat, way back in the early 40s. I was still a student and we were all involved passionately with the Pakistan movement. No, this was more than a political stance. I like to think to myself as a writer who expresses the aspirations of his people." **(Gulf Wekkly, Dubai, 19-25 March, 1992).**

অর্থঃ "আমি সেই চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকেই 'প্রভাতী' নামে এক বিপ্লবী পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। আমি তখনো ছাত্র এবং আমরা সকলেই

www.nagorikpathagar.org

তখন গভীর আবেগেরর সাথে পাকিস্তান আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এটা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক বিষয় ছিল না। আমি একজন লেখক হিসাবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের বাণীরূপ দান করাই আমার ব্রত বলে মনে করি।

এ ব্রত শাহেদ আলী যথাযথভাবেই পালন করেছেন। তবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন শাহেদ আলীর জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তিনি নিজেও জনগণের সাথে একাত্ম ছিলেন, এ স্বপ্ন তাঁর নিজের জীবনের লালিত স্বপ্ন। তাই এর রূপায়ণে ও বাণী-রূপ দানে স্বতস্ফূর্তভাবে তাঁর মন-প্রাণ-আবেগ ঢেলে দিয়েছিলেন। তাই তাঁর সাহিত্য হয়েছে বাস্তবধর্মী ও আবেদনশীল। এরূপ সত্যিকার মানবিক আবেদনই কোন সাহিত্যকে স্থান-কালের উর্ধ্বে চিরকালীন মহৎ সাহিত্যের মানবিক আবেদনই কোন সাহিত্যকে স্থান-কালের উর্ধ্বে চিরকলীন মহৎ সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করে। স্থান-কাল-অঞ্চলকে অস্বীকার করে নয়, বরং তা ধারণ করেই সাহিত্য এ অমরত্ব অর্জন করে। শাহেদ আলী এ কথাই বলতে চেয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সাহিত্য চিরকালীন মহৎ সাহিত্য হিসাবে গণ্য হতে পারে। এ প্রতিবাদী চেতনার কারণেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই যে বাংলা ভাষা আন্দোলন গড়ে ওঠে, তিনি তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সনের সেপ্টেম্বরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে যে ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে ওঠে শাহেদ আলী তার সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। ভাষা আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র 'সৈনিক' পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। পাকিস্তান-পূর্ব ও পাকিস্তান-পরবর্তী যুগের বিভিন্ন আন্দোলন, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত, ভাঙা-গড়া, উত্থান-পতনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলেন শাহেদ আলী। পাকিস্তানের তেইশ বছরের বৈষম্য-বঞ্চনাপূর্ণ ইতিহাস, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, একাত্তরের প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলেন শাহেদ আলী। তাঁর সৃজনশীল সংবেদনশীল মন তা যেমন প্রত্যক্ষ করেছে, আপন সংরাগে পূর্ণ করে তেমনি তার রূপায়ণ ঘটিয়েছে তাঁর সাহিত্যে। শাহেদ আলীর সাহিত্যে তাই গণ-মানুষের জীবন, চিন্তা-চেতনা, দুঃখ-বেদনা, হাসি-আনন্দ, স্বপ্ন-কামনার প্রকাশ ঘটেছে। বিশেষত এ দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধ্যান-ধারনা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিশ্বাস ও সামাজিক মূল্যবোধ তাঁর সাহিত্যে বাঙ্ময় রূপ লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে তাঁর সাহিত্য আমাদের জাতীয় সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত এবং তিনি এক্ষেত্রে এক আধুনিক আলোকিত ধারার উজ্জ্বল পথিকৃত।

www.nagorikpathagar.org

শাহেদ আলীর প্রতিভার তুলনায় তাঁর লেখা যথেষ্ট নয়। তিনি কেন আরো লেখেন নি এ সম্পর্কে আমার এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ঃ "এটি সত্য যে, আমার লেখার সংখ্যা খুব বেশি নয়, কমই বলা যায়। এ প্রসঙ্গে সমালোচক কবি আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি উক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি প্রায়ই আমার সম্পর্কে বলেন যে, আমি একজন স্বল্পপ্রসূ লেখক। আমি তাঁর জবাবে বলি, এমন মানুষ আছে যার অনেক সন্তান, কিন্তু তার কোন সন্তানই মানুষ হল না। আর কেউ কেউ আছে, যার দু'একটি সন্তান, সন্তানগুলো মানুষ হলো। পিতা হিসাবে কে বেশী সার্থক, আমি মনে করি দ্বিতীয় জনই পিতা হিসাবে সার্থক। আমার আরো বেশী লেখা সম্ভব হতো। অনেক কারণ ঘটেছে জীবনে। যার জন্য সব সময় সে সুযোগ ঘটে উঠেনি।" **(শাহেদ আলী প্রদত্ত সাক্ষাৎকার ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৫)**

এখানে গূঢ়ার্থে সামজের প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ ফুটে উঠেছে। তাঁর সংগ্রামশীল জীবনে তিনি হয়ত সব সময় লেখার উপযুক্ত সময়-সুযোগ পাননি। কিন্তু একথাও সত্য যে, লেখার জন্য লেখা এটাতে তিনি বিশ্বাস করতেন না। গভীর মনোযোগের সাথে শিল্প-সুন্দর, কালোত্তীর্ণ লেখার চেষ্টাই তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। তাই দেখা যায়, তাঁর প্রায় সব লেখাই শিল্পোত্তীর্ণ, প্রসাদগুণসম্পন্ন। বাংলা কথা সমাজচিত্র যেখানে প্রায় উপেক্ষিত বা অনুপস্থিত ছিল, তিনি সেখানে বলিষ্ঠভাবে মুসলিম চরিত্র, জীবনচিত্র, বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসার প্রাণবন্ত রূপ অংকন করেছেন। এ ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর পুণর্জাগরণের প্রদোষকালে হিন্দু সমাজে বঙ্গিমচন্দ্র যা ছিলেন, বাঙালী মুসলমানের স্বাধীনতা আন্দোলন ও নতুন দেশগড়ার আবেগাপ্লুত মুহূর্তে শাহেদ আলীও হয়তো অনেকটা তাই ছিলেন। তবে পার্থক্য এই যে, হিন্দুর নবজাগরণের প্রণনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলিম-বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবাপন্ন, সেক্ষেত্রে শাহেদ আলী পুরাপুরি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার মানবিক চেতনায় ঋদ্ধ একজন আধুনিক মানুষ। তাই তাঁর লেখা মুসলমানদেরকে যেমন অনুপ্রেরণা যোগায়, অমুসলমানদেরকেও তেমনি আকৃষ্ট করে।

দীর্ঘ ষাট বছরের সাহিত্য-জীবনে শাহেদ আলী দেখেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুই দুটি স্বাধীনতার সূর্যোদয়, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ভাষা-আন্দোলন, অসংখ্য রাজনৈতিক উত্থান-পতন আন্দোলন, সমাজতন্ত্রের প্রতাপ ও পতন, জড়বাদী সভ্যতার নানা বিকৃত রূপ, বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উত্থান প্রতিরোধে ইসলাম-

www.nagorikpathagar.org

বিরোধী নানা দেশি-বিদেশি চক্রের ঘৃণ্য কার্যক্রম, দমন-নিস্পেষণ, নতুন জীবন ও নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি সমাগত একবিংশ শতাব্দীর আগমন। তিনি একজন স্পর্শকাতর সচেতন মানুষ হিসাবে এসবই অবলোকন করেছেন এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মে তিনি এর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন শিল্পসম্মতভাবে। আবেগের দ্বারা তাড়িত হয়ে শাহেদ আলী কখনো শিল্পবোধ থেকে বিচ্যুত হননি। তবে শাহেদ আলী একটি বিশ্বাসে স্থিতধী ছিলেন, যে বিশ্বাস একজন মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করে, এমনকি হতাশা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ বিশ্বকে প্রকৃত মানবতাবাদী শান্তিপূর্ণ-সংস্থায় পরিণত করার নিশ্চয়তা দেয়। সে বিশ্বাস বিশ্ব-স্রষ্টা আল্লাহর দেয়া ইসলাম ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই শান্তির জন্য পরিশুদ্ধ জীবনের জন্য কল্যাণের জন্য ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্যই ছিল তাঁর জীবনের সকল কর্মায়োজন।

শাহেদ আলী তাঁর সাহিত্য-কর্ম, ভাষা আন্দোলন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য যেসব পুরস্কার ও স্বীকৃতি লাভ করেন তা নিম্নরূপঃ

বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৪), তমঘায়-ই-মতিয়াজ (১৯৭০), রাষ্ট্রপতির ভাষা-আন্দোলন পদক (১৯৮১), নাসির উদ্দীন স্বর্ণপদক (১৯৮৫), সিলেট লায়ন ক্লাব পদক (১৯৮৫), ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৮৬), জালালাবাদ লায়ন্স ক্লাব পদক (১৯৮৮), একুশে পদক (১৯৮৯), সিলেট যুব ফোরাম পদক (১৯৯০), বাংলাদেশ ন্যাশনাল স্টুডেন্ট এ্যাওয়ার্ড, ইংল্যান্ড (১৯৯১), বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯২, চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রদত্ত ‘কবি ফররুখ পুরস্কার (১৯৯৭) ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পদক-২০০০, কিশোরকণ্ঠ পুরস্কার ২০০৩, প্রভৃতি।

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা

বাংলা সাহিত্যে শুদ্ধতম কবিদের অন্যতম সৈয়দ আলী আশরাফ (জন্ম– ৩০ জানুয়ারী ১৯২৪, মৃত্যু– ৭ আগস্ট ১৯৯৮) একাধারে কবি, সাহিত্য-সমালোচক, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও মহান আধ্যাত্মিক পুরুষ। তাঁর এসব পরিচিতির মধ্যে একটি সাধারণ পরিচিতি হলো তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম এবং এ পরিচিতিই তাঁকে তাঁর সকল কাজে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানের প্রতিফলন ঘটেছে। জ্ঞান-বুদ্ধি-শিক্ষা-অভিজ্ঞতায় তিনি একজন অতি আধুনিক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব হয়েও বিশ্বাসের প্রগাঢ়তায় ছিলেন অতিশয় দার্ঢ্য। সাহিত্যসহ তাঁর সকল কর্ম-কৃতীতে এর পরিচয় প্রতিবিম্বিত। তিনি তাঁর বিশ্বাস বা জীবনাদর্শকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তি-প্রমাণের আলোকে উপস্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। অন্ধ বিশ্বাস অথবা গোড়ামীর বশবর্তী না হয়ে তিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞার আলোকে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে শানিত করেছেন। যুক্তি ও প্রজ্ঞার সাথে ব্যক্তি-জীবনের গভীর অনুভূতির সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তিনি সাহিত্য চর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে বিশ্বাস ও জীবনাদর্শের গভীর উপলব্ধি-সঞ্জাত অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সাহিত্যে। সকল মহৎ কবি-সাহিত্যিকই এ কাজ করেছেন। টি.এস.এলিয়ট, বার্নাড শ, ইবসেন, হাফিজ, রুমি, ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলেই সাহিত্যে কোন না কোন তত্ত্ব বা জীবনাদর্শ ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তবে তা তাঁদের ব্যক্তিগত অনুভূতির মোড়কে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁদের সাহিত্য কখনো মতাদর্শ প্রচারের বাহন বলে মনে হয়নি। ফলে তা হয়েছে নিরেট সাহিত্য। সৈয়দ আলী আশরাফও উপরোক্ত বিশ্ব-বিখ্যাত কবিদের মতোই একজন সচেতন বোদ্ধা কবি-ব্যক্তিত্ব। তাঁর কবিতা ও জীবনের সকল কর্মকাণ্ডেও এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্যযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আলী আশরাফের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্র যখন' ১৯৫৭ সনে প্রকাশিত হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব চল্লিশের দশকে। চল্লিশের দশকে আমাদের সাহিত্যে তিরিশোত্তর যুগের কবিদেরই প্রতাপ চলছিল। এ দশকের অনেক কবিও তিরিশোত্তর যুগের কবিদের পরাক্রমের কাছে নিজেদের স্বকীয়তা বহুলাংশে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

তবে চল্লিশের দশকে ব্যতিক্রমী প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে। চল্লিশ দশকের যুগ-চেতনা, উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী জ্বরা-মৃত্যু-মহামারী আক্রান্ত বাংলাদেশ, সমকালীন সামাজিক অবস্থার চিত্র ধারণ করে এ সময় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ জীবনধর্মী সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন, যার ফলে এ ব্যতিক্রমী ধারার সূত্রপাত ঘটে। কবি শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, বে-নজীর আহমদ, সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন প্রমুখ এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবি। এঁদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন ফররুখ আহমদ। তিনি তাঁর আপন প্রতিভা, স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে তিরিশের কবিদের প্রভাবকে অনেকটা নিষ্প্রভ করে দেন। ফররুখ তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও প্রতিভার বলে তাঁর স্বাতন্ত্রধর্মী কাব্যে স্বকীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক নতুন বর্ণাঢ্য ভূবন তৈরিতে সক্ষম হন। উপরোক্ত মুসলিম কবিদের মানস-চেতনায় উদ্বুদ্ধ সৈয়দ আলী আশরাফও এ চল্লিশের দশকেই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন।

তিরিশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে, বিশেষত কবিতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ধ্বস্ নামে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন তেমন প্রবল ছিল না। মূলত রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করেই তিরিশের কবিরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তিরিশোত্তর যুগে আমাদের সাহিত্যে দুটি সুস্পষ্ট ধারা প্রবাহমান। একটি হলো বিশ্বাসহীন, ধর্মহীন, আপন ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন ইউরোপীয় মানবিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত নতুন ধারা। এতে পাশ্চাত্য দর্শন ও চিন্তাধারার যেমন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমনি কমিউনিজমের নাস্তিক্যবাদ, সামাজিক দ্বান্দ্বিকতা ও প্রগতিবাদের প্রভাবও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। অন্যটি, ধর্মের মূলগত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও সে উপলব্ধিজাত মানবতার মানদণ্ডকে নতুনভাবে বিকশিত করা এবং ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের আলোকে নতুন পৃথিবী গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে পূর্ণ একটি আস্তিক্যবাদী ধারা।

প্রথমোক্ত ধারার কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত

www.nagorikpathagar.org

প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা একদিকে যেমন পাশ্চাত্য চিন্তা-দর্শনের অনুসারী ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি প্রাচ্যের কমিউনিজম ও নাস্তিক্যবাদের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন। তাঁদের কাব্যে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। দ্বিতীয় ধারার কবিদের মধ্যে যাঁরা সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করেছি। তবে এঁদের পূর্বসূরী হিসাবে কাজী নজরুল ইসলামের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সনের দিকে কাব্য-ক্ষেত্রে বর্ণাঢ্য আবির্ভাবের সময় থেকেই নজরুল এক আস্তিক্যবাদী প্রবল শক্তিশালী ধারার উদ্গাতা হিসাবে পরিচিহ্নিত। তবে চল্লিশের দশকের শুরুতেই নজরুলের সাহিত্য-জীবনের অবসান ঘটে। প্রথম যৌবনের আবেগ-উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে তখন তিনি অনেকটা স্থিতধী হয়ে উঠেছেন। ১৯৪২ সনে বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কয়েক বছর তিনি একাধারে কবিতা, গান-গজল, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, অভিভাষণ ইত্যাদি যা কিছু লিখেছেন তা ইসলামী ভাব, আদর্শ, ঐতিহ্য ও অধ্যাত্মবাদে পরিপুষ্ট। বলতে গেলে, তিরিশের কবিদের নাস্তিবাদী-অবিশ্বাসী চিন্তা-চেতনা যখন একশ্রেণীর তরুণদেরকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, নজরুলের এসব লেখা তখন অনেককেই বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা করে। ঐ সময় নজরুল ছিলেন সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ। কিন্তু ১৯৪২ সনে তিনি বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ায় এ ধারাকে তখন চলমান রাখেন ফররুখ আহমদ ও উপরোক্ত মুসলিম কবিগণ। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। ইসলামী ভাব, আদর্শ ও ঐতিহ্য-চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে তাঁর কাব্য-কবিতা।

চল্লিশের দশকে তিরিশোত্তর যুগের নাস্তিক্যবাদী, প্রগতিবাদী কবিদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক উচ্চকণ্ঠ কবি ফররুখ আহমদ। ফররুখের গভীর ঐতিহ্যবোধ, প্রগাঢ় আদর্শ চেতনা ও শাশ্বত মানবতাবোধের কাছে নাস্তিক্যবাদী-প্রগতিবাদীরা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। বিশেষত অধিকাংশ বাঙালি ইসলামের আস্তিক্যবাদী ধারণায় বিশ্বাসী হওয়ায় মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের লেখা তাদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ফররুখের কালজয়ী প্রতিভা তখন বিশ্বাসীদের মনে এক নতুন আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করে। এ বিশ্বাসের প্রশ্রয়ে যাঁদের সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ ও বিকাশ ঘটে সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই একজন।

আলী আশরাফের প্রতিভা ও অবদানের তুলনায় তিনি কম আলোচিত। এটা তাঁর জন্য যতটা নয়, আমাদের জন্য ততোধিক দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর কবিতায় বিশুদ্ধ রুচি ও স্নিগ্ধ আবেগের প্রতিফলন ঘটেছে। সকালে সবুজ ঘাসের ডগায় স্বচ্ছ শিশিরবিন্দুর মত পরিচ্ছন্ন স্ফটিকসদৃশ তাঁর কবিতা। দুপুরের তীব্র

www.nagorikpathagar.org

দাহ নেই, প্রভাতের স্নিগ্ধ কোমলতা তাঁর কবিতার শরীরে নরম গোলাপের পাঁপড়ির মত ছড়ানো ছিটানো। অসাধারণ প্রজ্ঞা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাথে সংহত আবেগের সংমিশ্রণে তাঁর কবিতার সৃষ্টি। এটাকে বলা যায় আধ্যাত্মিকতা। ইসলামের গভীর উপলব্ধি এবং মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অভিপ্রায় থেকে এ আধ্যাত্মিকতার সৃষ্টি। তাঁর কবিতার প্রায় সর্বত্রই এ আধ্যাত্মিকতার প্রকাশ ঘটেছে। অন্যদিকে, তাঁর গদ্য-রচনা গভীর মননশীলতা, ব্যাপক অধ্যয়ন ও তীক্ষ্ণ ধীশক্তির পরিচয় বহন করে। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যেও ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে এ কথার যাথার্থ প্রমাণিত হবে।

কবিতা ঃ 'চৈত্র যখন' (১৯৫৭), 'বিসংগতি' (১৯৭৪), 'হিজরত' (১৯৮৪), 'সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা' (১৯৯১), 'রুবাইয়াতে জহীনি' (১৯৯১) ও 'প্রশ্নোত্তর' (১৯৯৬)।

অনুবাদ ঃ 'ইভানকে ক্লেয়ারগল' (১৯৬০) 'প্রেমের কবিতা' (সৈয়দ আলী আহসানের সাথে যৌথভাবে কৃত)।

গদ্য ঃ 'কাব্য পরিচয়' (১৯৫৭), 'নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়' (দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫), 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য', 'সংসদ যুগ

ঃ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ইতিকথা', 'অন্বেষা' (আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণনা)।

এছাড়া, ইংরাজি সাহিত্যের কৃতি ছাত্র ও অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফের প্রায় দু'ডজন ইংরেজি গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা। শুধু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট নিয়ে নয়, আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে লেখা এসব গ্রন্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁকে একজন কৃতী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ হিসাবে সুখ্যাতি দান করেছে। তাঁর চিন্তা, অভিজ্ঞতা ও প্রতিভার সার্বিক পরিচয় জানার জন্য এগুলোর যথাযথ মূল্যায়ন অপরিহার্য। আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সামাজিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থ দিক-নির্দেশিকাস্বরূপ।

সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁর কাব্য-চর্চার প্রেক্ষাপট বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ

"কাব্য রচনা করেছি নিজেকে জানার জন্য, ভাষার মারপ্যাঁচ দেখাবার জন্য নয় বা কোন মতবাদ প্রচার করার জন্য নয়।...মানবিক প্রেম আর বিরোধের রাজ্যে নিজেকে দেখেছি। কামনা, বাসনা, লোভ, হিংসার বিচিত্র দোলায়

www.nagorikpathagar.org

নিজেকে দোলায়িত অবস্থায় অনুভব করেছি। মানুষকে বিশ্বাস করে অকৃপণ বর্বরতার আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছি। তবু মানুষের পরম সত্যের উপর বিশ্বাস হারাইনি বরঞ্চ এমন সমস্ত মহৎ আত্মার স্পর্শে আমার সত্তা জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং আলোকিত হয়েছে যে মানবতার মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস গাঢ়তর হয়েছে, সমাজের অসঙ্গতির অন্তরালে, সঙ্গতির উৎসের সন্ধান পেয়েছি এবং মানবাত্মার কল্যাণ কামনায় অসুন্দরের বিরুদ্ধে জেহাদ করেছি।" **(সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা ভূমিকাংশ, প্রকাশকাল, নভেম্বর, ১৯৯১, পৃ. ৭)**।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে কবির কাব্য-চর্চার প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য, উপলব্ধি, মানবপ্রেম ও মানব চরিত্র সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনেই প্রেম অনিবার্য। দাম্পত্য-প্রেম, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য, সাধারণ মানুষের প্রতি প্রেম, জীবজন্তুর প্রতি প্রেম ইত্যাদি প্রেমের নানা প্রকারভেদ রয়েছে। এ মানবিক প্রেম জীবনকে মাধুর্যময় করে তোলে, মানুষকে করে উদার ও মহৎ। এ মানবিক প্রেমই আল্লাহ-প্রেমের অতল সলিল-ধারার সাথে সংমিশ্রিত হয়ে প্রেমের পূর্ণ ও সফল পরিণতি দান করে। কবির এ সাধারণ প্রেম বা মানবপ্রেম ক্রমান্বয়ে আল্লাহপ্রেম বা অধ্যাত্মপ্রেমের অন্তহীন সাগরে বিলীন হয়ে যায়। এখানেই কবি মানবজীবনের পরম সার্থকতা অনুভব করেন। কবি তাই বলেন ঃ

"মেজবানি শেষ হলো ? এসো তবে, এখন দুজনে
মুখোমুখি বসি এইখানে। রজনীগন্ধার গন্ধে
আমোদিত মলয়-কুজন-এমন নিবিড়ভাবে
বহুদিন বসিনি দুজন, বসিনি নিকটে।"

(জন্মদিন ঃ চৈত্র যখন)

প্রিয়তমা পত্নীর নিবিড় সান্নিধ্যে যে মানবিক প্রেমের স্ফুরণ ঘটে, কবির নিকট সে প্রেমের পরিণতি কীরূপ তা নিচের কয়েকটি লাইনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

"যে মুহূর্তে প্রেম পায় বিশ্বাসের
মধুর স্বাক্ষর তখনি শুধু এ
নিবেদন বিশ্ব মুক্ত হয় প্রাণ
হীন মরীচিকার হৃদয়হীন
প্রেতনৃত্য থেকে, তখনি সৃষ্টির
সত্য অনুভূত হয় শিরায় শিরায়।

www.nagorikpathagar.org

আমার প্রণয় তাই ঈমানের
বলে বলীয়ান কর, হে রহিম,
হে রহমানুর রহিম।"

(আস্‌ফালা সাফেলীন ঃ হিজরত)

কবি মানবিক প্রেমের পরিণতি সম্পর্কে 'সকাল' পত্রিকায় তাঁর দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন ঃ "আমার কবিতায় প্রথম দিকে মানবিক প্রেম এবং হতাশার সঙ্গে ঐশী প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যেমন 'বসন্ত' কবিতায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আত্মিক সাধনার ফলে যে নিত্য-নব অভিজ্ঞতার সন্ধান পেয়েছি তার পরিণতি 'হিজরত' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। ইসলাম আমাকে তত্ত্ব দিয়েছে আর রূহানী সাধনা আমাকে জীবনকে নতুনভাবে দেখতে সাহায্য করেছে। এই সাধনায় অনেক দূরে অগ্রসর হয়েছিলাম বলেই বিলেত যেয়ে তাদের ভালোটা চয়ন করতে পেরেছি এবং ইসলামের মানদণ্ড যেহেতু আমার চিত্তে এবং চরিত্রের মধ্যে একাত্মতা লাভ করেছে, আমার দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য সভ্যতায় যা কিছু মূল্যবান এবং ইসলামী জীবন পদ্ধতির জন্য গ্রহণযোগ্য তাই স্বীকার করে নিয়েছে।" **(সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার ঃ 'সকাল', সৈয়দ আলী আশরাফ বিশেষ সংখ্যা - ১৯৯৭, সম্পাদনা- ইশাররফ হোসেন)।**

ইউরোপের শিল্পবিপ্লব পাশ্চাত্য জগতে যে হতাশা, যান্ত্রিকতা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানবিকবোধের বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সে হতাশা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে আরো দ্রুততর করে তোলে। এ অবস্থার অবসান ঘটানোর আশ্বাস নিয়ে আসে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় এক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু মানবতার মুক্তি সাধনের আশ্বাস নিয়ে যে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ লোককে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মানুষের স্বাধীনতা বিপন্ন, গণতন্ত্রের কণ্ঠ রুদ্ধ হয় এবং সমাজতান্ত্রিক লৌহ-যবনিকার অন্তরালে মানুষের বাক স্বাধীনতা হয় স্তব্ধ। গুটিকয়েক লোকের হাতে গণতন্ত্র, স্বাধীনতা ও মানবতাবিরোধী এ সমাজতন্ত্রকে পাশ্চাত্য জগত প্রত্যাখ্যান করে। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য জগতও মানুষের মুক্তির জন্য কোন কল্যাণকর ব্যবস্থা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে যুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ, পুঁজিবাদী শোষণ, সামাজিক অবক্ষয়, হতাশা ও বঞ্চনা তখন পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল। এ সময় আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস্ (১৮৬৫-১৯৩৯) এবং ইংরাজ কবি (জন্মসূত্রে আমেরিকান পরে বৃটিশ নাগরিক) টমাস স্টিয়ার্নস্ এলিয়ট খৃস্টীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে হতাশা-বঞ্চনার অবসান

www.nagorikpathagar.org

ঘটিয়ে মানুষের মনে আস্থা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করার প্রয়াস পান। এলিয়টের The Waste Land এবং ইয়েটস্-এর Sailing to Byzantium-এ খৃস্টীয় মূল্যবোধকে উচ্চকিত করে তোলে। তাঁদের অন্যান্য লেখার মধ্যেও এ ভাবের প্রতিফলন ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও তাঁদের কবিতা ও লেখা দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সাড়া জাগায়।

সৈয়দ আলী আশরাফের মধ্যেও ইয়েটস্ ও এলিয়টের একটা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মানব-প্রকৃতি ও ইতিহাস আলোচনার মাধ্যমে তিনিও মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি করে তার মাধ্যমে মানব-মুক্তির পথ অন্বেষণ করেছেন। বলাবাহুল্য, ইসলাম ও মহানবীর (স) জীবনাদর্শের মধ্যেই তিনি মানবতার এ মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর 'হিজরত', 'বনি আদম', 'বিসংগতি', 'দজ্জাল' 'শিরী ফরহাদ', 'ইতিহাস' 'আসফালা সাফেলীন', 'লাব্বায়েক' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর এ অন্বেষার পরিচয় বিধৃত। এলিয়ট ও ইয়েটস্ যেমন আধুনিক ভাবকল্পনা, রূপক, প্রতীক ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁদের অনুসরণে রূপক, উপমা, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করে আধুনিক কাব্য-কৌশল অবলম্বন করে কবিতা রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর সচেতনতা ও পারদর্শিতা সম্পর্কে কারো কোন সন্দেহ নেই। তাঁর প্রতীক ব্যবহারের কৌশল অনেকটা ইয়েটস্ ও এলিয়টকে, চিত্রকল্প ব্যবহারের পদ্ধতি ডিলান টমাস ও অমিয় চক্রবর্তীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া, চিত্রকল্প ও রূপকল্প ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি 'আল কুরআন', 'মুসলিম পুঁথি সাহিত্য', 'রুমীর মসনবী' ও ফারসি কবি নিজামীর 'ইউসুফ জোলায় খাঁ' এবং 'লায়লা মজনু'কেও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। তবে সব ক্ষেত্রেই তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা, স্টাইল ও স্বকীয়তার পরিচয় স্পষ্ট।

সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য-সচেতন কবি। তাঁর কবিতায় ইসলামী আদর্শের সাথে মুসলিম ঐতিহ্যের এক অনিবার্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। সব বড় কবিই মূলত ঐতিহ্যের অনুসারী। তাঁরা সকলেই নিজ নিজ ঐতিহ্যের অনুসরণে মহৎ কাব্য রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। সৈয়দ আলী আশরাফও ঐতিহ্যবাদী। তিনি তাঁর স্বকীয় ঐতিহ্যের আলোকে কবিতার সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেছেন। প্রতীক ও রূপকের মাধ্যমে তিনি ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তবে প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার সকলের নিকট এক রকম নয়। সৈয়দ আলী আশরাফের মতে, প্রতীক দুই ধরনের– ঐতিহ্য-সংশ্লিষ্ট ও বুদ্ধিজাত। এলিয়ট যেমন তাঁর

www.nagorikpathagar.org

'ওয়েস্টল্যান্ড' কাব্যে খৃস্টীয় ভাবধারা, আর্থুরীয়ান রোম্যান্স এবং বিভিন্ন মধ্যযুগীয় ও গ্রীক উপকথা থেকে উপমা-প্রতীক আহরণ করে তাঁর নিজস্ব জীবনোপলব্ধির আলোকে নবরূপ দান করেছেন, ইয়েটস্ যেমন আইরিশ উপকথা থেকে প্রতীক সংগ্রহ করেছেন আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধিজাত প্রতীক-উপমাও সৃষ্টি করেছেন, সৈয়দ আলী আশরাফও তেমনি তাঁর জীবনের প্রধানতম অনুপ্রেরণার উৎস ঐশীগ্রন্থ আল কুরআন, মুসলিম ঐতিহ্য, ইতিহাস, ফারসী সাহিত্য, পুঁথিসাহিত্য থেকে অকাতরে উপমা-প্রতীক সংগ্রহ করে তাঁর নিজস্ব মনন ও আধুনিক কাব্য-ভাবনার উপযোগী করে তা প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে নজরুল-ফররুখের সাথে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কিছুটা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য-চেতনার ক্ষেত্রে পূর্বসূরী এ দুই কবির সাথে সৈয়দ আলী আশরাফের সাজুয্য ছিল একান্তই স্বাভাবিক।

নজরুল ইসলামী বিশ্বাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে ভাব, ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা গ্রহণ করেন। মুসলমানদের ঘরোয়া জীবনের আচার-আচরণ থেকে বিভিন্ন চিত্র গ্রহণ করেও তিনি তাঁর কাব্য-কবিতায় স্বচ্ছন্দভাবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া, আরবি-ফারসি আয়াত, সম্পূর্ণ বাক্য বা অসংখ্য উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেও তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ও বলিষ্ঠ কাব্য-ভাষা নির্মাণ করেছেন। ফররুখ আহমদ নজরুল-প্রদর্শিত এ ভাষা-রীতিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন এবং মুসলিম ঐতিহ্য ও পুঁথি সাহিত্য থেকে বিভিন্ন শব্দ, রূপক, প্রতীক, উপমা ও রূপকল্প গ্রহণ করে আধুনিক রূপাঙ্গীকে তার অভিনব রূপ দান করেছেন তাঁর বিভিন্ন কাব্যে। তিনি 'সিন্দবাদ' ও 'হাতেম তা'য়ী' নামক মধ্যযুগীয় দুই প্রবাদপুরুষকে সমকালীন বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা ও আশা-প্রত্যাশার প্রতীক হিসাবে অভিনব কাব্য-সৌন্দর্যে রূপায়িত করেছেন। চল্লিশের দশকে 'সিন্দবাদে'র প্রতীকে ফররুখ 'সাত সাগরের মাঝি'তে তৎকালীন বাঙালি মুসলমানের স্বপ্ন-কল্পনা ও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা প্রমূর্ত করে তুলেছেন এবং 'হাতেম তা'য়ী'র প্রতীকে তৎকালীন পাকিস্তানে মুসলিম সমাজের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, দ্বন্দ্ব-কলহ ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে তাদেরকে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার ও মহৎ মানবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সৈয়দ আলী আশরাফও অনেকটা ফররুখ আহমদের মতোই মানবতার মুক্তি কামনা করেছেন। ব্যক্তিগত জীবন থেকে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘাত, মিথ্যা ও অন্যায়ের যে বিস্তার ঘটেছে, তার মূলে রয়েছে স্বার্থান্ধ নাফ্সের আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা। একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য

www.nagorikpathagar.org

ও রূহানী শক্তির চর্চা বা আত্মিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই এ চিরন্তন দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে, অন্যায়-অশান্তি-মিথ্যার বিনাশ ঘটিয়ে সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হতে পারে। সৈয়দ আলী আশরাফের প্রায় সব কাব্যেই বিশেষত 'হিজরত', 'রুবাইয়াতে জহীনি', কাব্যে কবির এ প্রতীকী অনুভব অপরূপ কাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। এজন্য কবি আল মাহমুদ সৈয়দ আলী আশরাফ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন, তা যথার্থ বলেই মনে হয়। কবি আল মাহমুদ বলেন ঃ

"তাঁর (সৈয়দ আলী আশরাফ) কবিতায় রয়েছে এমন ধরনের রহস্যময় আধ্যাত্মিক গুণ যা তাঁর সমসাময়িক কবিগণ প্রায় উপেক্ষা করেই আধুনিকতার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আলী আশরাফ ঐতিহ্য ও পরম আস্তি কতাকেই কবিতার উপজীব্য করে দূরে সরে যান। এই দূরে সরে যাওয়ার অন্য একটি কারণ সম্ভবত তাঁর দীর্ঘ প্রবাস যাপন এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপনা সূত্রে ব্যাপকতর উদার মানসিক আদান-প্রদান।... বাংলা কবিতার অন্য একটা দিক যার নাম বিশ্বাসের নির্ভরতা তা সৈয়দ আলী আশরাফ আমাদের দোদুল্যমান চিত্তচাঞ্চল্যের উপশম হিসাবে উপস্থিত করেছেন। বাংলা কবিতাকে দিগ্বিজয়ী করতে হলে এই কবিতা আমাদের একান্ত দরকার।"

এ সম্পর্কে কথাশিল্পী আবু রুশ্‌দের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেনঃ

"তিনি (সৈয়দ আলী আশরাফ) জীবনের অসংশোধনীয় অযৌক্তিকতা ও ক্ষণভঙ্গুরতার মধ্য দিয়ে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতার দ্বন্দ্ব বিক্ষুদ্ধ সন্ধানী এবং সর্বশেষ তিনি কিছুটা মরমী ধরনের অধ্যাত্মবাদের ও নিজের ধর্মের নিগূঢ় আশ্রয় সন্ধানী।... ব্যক্তিগত প্রেম অতিক্রম করে তিনি স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, জীবনের হতাশা ও গ্লানি প্রবলভাবে মনের জোরের সঙ্গে অতিক্রম করে নিজের ধর্মের স্থায়ী আশ্রয় ও শীতল ছায়ায় এসে স্বস্তি পেয়েছেন। কিন্তু যেটা কবি হিসাবে তাঁর সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য গুণ সেটা হলো তাঁর নিজস্ব কণ্ঠছাপ।...দেশজ প্রভাবের বাইরে কবি মাঝে মধ্যে আন্তর্জাতিকতাও অর্জন করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফের কয়েকটি ধর্মীয় কবিতায়...বিশ্বাসী অবস্থায় ও খোদার ইচ্ছের প্রতি প্রত্যয়দীপ্ত সমর্পণই বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। এ ধরনের কবিতার মধ্যে 'কাবা শরীফ', 'হেরা', 'মদীনার উদ্দেশ্যে', 'মদীনা' উল্লেখযোগ্য। বস্তুত তাঁর উপরোক্ত চারটা ধর্মীয় কবিতায় বিশ্বাস, আবেগ ও নতুন কাব্যিক ভাষার সমন্বয় অনেকটা সফলতার সাথে ঘটেছে।"

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আলী আশরাফ ইংরাজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তী জীবনে দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যে তাঁর দক্ষতা ছিল অগাধ। তাই তাঁর কাব্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব ছিল একান্তই স্বাভাবিক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'চৈত্র যখন'-এ কবির ইংরাজি কাব্য পাঠের স্পষ্ট স্বাক্ষর বিদ্যমান। বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহসানের মতে এ গ্রন্থের প্রথম দুটি কবিতা ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর মনোলোগের ধাঁচে রচিত। তিনি বলেন ঃ

"বাংলা ভাষায় এই ভঙ্গিতে কখনো কবিতা রচিত হয়নি। ভঙ্গিটি বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাও পরীক্ষিত হয়নি। সৈয়দ আলী আশরাফই প্রথম ব্যক্তি যিনি এই পরীক্ষার সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু মাত্র দুটি কবিতায় এই পরীক্ষার নিবৃত্তি ঘটায় আমরা ভঙ্গীটির পরিণত রূপ দেখতে সক্ষম হলাম না। তবু একথা বলা যায়, এ ভঙ্গীটির সূত্রপাতের জন্য আলী আশরাফ প্রশংসা পাবার অধিকারী।" **(সৈয়দ আলী আহসান ঃ সৈয়দ আলী আশরাফের কবিতা)**।

মনোলোগ বা স্বগতোক্তি যা আমরা পূর্বে সাধারণত নাটকে প্রত্যক্ষ করেছি, কবিতায় তা সাধারণত দেখা যায় না। আলী আশরাফ কবিতার এ বিশেষ ভঙ্গীটি ইংরাজি কবিতা থেকে বাংলায় নিয়ে এসেছেন। এটা তাঁর ইংরাজি কবিতা পাঠেরই ফল। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আশরাফ বলেন ঃ "ইংরাজি সাহিত্যে ব্রাউনিং 'ড্রামাটিক মনোলোগে' রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন বিএ অনার্সের ছাত্র ছিলাম তখন ব্রাউনিং আমার বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁর প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই আঙ্গিকে কাব্য রচনা করি।...মনোলোগ মধুসূদন রচনা করে গেছেন– 'ব্রজঙ্গনা' কাব্য। সার্থক মনোলোগ– 'দশরথের প্রতি কৈকেয়ী' একটি সার্থক ড্রামাটিক মনোলোগ।" **(সৈয়দ আলী আশরাফের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত)**।

সৈয়দ আলী আশরাফের পূর্বসূরী কবি ফররুখ আহমদের মধ্যেও এ ভঙ্গীটি বিদ্যমান। তাঁর রচিত 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যের অন্তর্গত বেশ কয়েকটি কবিতা এ মনোলোগ ভঙ্গীতে রচিত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ফররুখ আহমদেরও অনেক আগে এ মনোলোগ ভঙ্গীতে কাব্য রচনা করেছেন। একথা সৈয়দ আলী আশরাফও উল্লেখ করেছেন। অতএব, সৈয়দ আলী আহসান বাংলা কাব্যে এ ভঙ্গীতে প্রথম কবিতা রচনার কৃতিত্ব সৈয়দ আশরাফকে দিলেও সেটা যে যথার্থ নয়, তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না। অর্থাৎ বাংলা কাব্যে এ ভঙ্গীতে

www.nagorikpathagar.org

প্রথম কবিতা রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদনের এবং তারপর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ তাঁর প্রখ্যাত 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে এ ভঙ্গীতে বেশ কয়েকটি কালজয়ী কবিতা লিখে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। সৈয়দ আলী আশরাফ ইংরেজ কবি ব্রাউনিং, মধুসূদন ও ফররুখ আহমদের পরবর্তী কবি হিসাবে তাঁদেরকে সার্থকরূপে অনুসরণ করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। এ কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধি, বিশ্বাস, প্রেম, অধ্যাত্মবোধ, প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম ফুটে উঠেছে। তবে এখানে তাঁর প্রকাশ-ভঙ্গী অনেকটা ভিন্ন ধরনের। কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

"খুঁজেছি অনেক তাকে
অন্ধকার মাঝরাতে বিদ্যুতের চকিত আভায়
অথবা ধানের ক্ষেতে ফসলের নম্র পূর্ণতায়
খুঁজেছি।"

(পূর্ণিমা স্বদেশ ঃ চৈত্র যখন)

অন্বেষার মাধ্যমেই নিজেকে জানা যায়। অন্বেষার মাধ্যমেই সত্যোপলব্ধি ঘটে। অন্বেষার মাধ্যমেই বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা সৃষ্টি হয়, প্রেমের বিভিন্ন স্তরে পূর্ণতা আসে। ব্যক্তিগত প্রেম, মানবিকপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, অধ্যাত্মপ্রেম ক্রমান্বয়ে উচ্চাঙ্গ মার্গে তথা মহান স্রষ্টার প্রতি অনাবিল প্রেমে উন্নীত হয়। মানুষ পরিণত হয় ইনসানে কামিলে। হাদীস শরীফে তাই বলা হয়েছে ঃ 'ফাকাদ আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'– অর্থাৎ নিজেকে জান, তাহলে তোমার রব বা প্রভুকেও জানতে পারবে। ইংরেজিতে বলা হয়– Know thyself, অর্থাৎ নিজেকে জান। প্রত্যেক জ্ঞানের উৎসই এ অন্বেষা। হযরত ইব্রাহিম (আ) এ অন্বেষার মাধ্যমেই তাঁর রব বা পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। মহানবী (স) এ অন্বেষার বশবর্তী হয়েই দীর্ঘ পনেরো বছর হেরা পর্বতের গুহায় কঠোর সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। গৌতম বুদ্ধও সত্যানুসন্ধানে বোধিবৃক্ষের ছায়ায় দীর্ঘকাল তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। আলী আশরাফের অন্বেষাও এভাবে তাঁকে এক জায়গায় এনে স্থিতধী করে। কবি বলেন ঃ

"অসীম সসীম তার মিলে গেছে সমুদ্র-উল্লাসে।
অতনু প্রবাহ তার
অন্তরের অন্তরীক্ষে বাজিয়েছে প্রত্যক্ষ কিঙ্কিনি।"

'চৈত্র যখন' কাব্যের প্রতিটি কবিতাই বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। এ কাব্যের প্রতিটি কবিতায়ই জিজ্ঞাসা আছে, অন্বেষা আছে এবং শেষ পর্যন্ত পাঠকের

www.nagorikpathagar.org

মনকে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট উপলব্ধির প্রান্তে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, যা পাঠকের মনকে আশ্বস্ত করে, পরিতৃপ্তির আনন্দে উদ্ভাসিত করে তোলে। বিশ্বাসী কবির এ এক অপরিহার্য গুণ। এ কাব্যের অন্তর্গত 'বনি আদম' কবিতাটি সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কবিতায় কাব্যের কেন্দ্রীয় ভাব পরিব্যক্ত হয়েছে। ছয় পর্বে বিভক্ত এ কবিতায় কবি মানব-জীবনের আদি-অন্ত, এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরূপ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কাব্যময়তার সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। এক মহাকাব্যিক অনুভব একটি মাত্র কবিতায় ছন্দময় ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিতার প্রথম কয়টি লাইন এরূপ ঃ

"হে বনী আদম
আমরা ভাসন্ত চন্দ্র পৃথিবীর বুকে
ক্রমশঃ বর্ধন আর ক্রমশঃ বিক্ষয়
শূন্যময় আমাদের গোধুলি জীবন।"
(বনি আদম ঃ চৈত্র যখন)

সৈয়দ আলী আশরাফের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিসংগতি'। এখানে কবির অধ্যাত্ম সাধনার বিষয় কাব্যাকারে বর্ণিত হয়েছে। সাধনার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। সুফী তত্ত্বে অধ্যাত্ম-সাধনার প্রথম স্তর হলো জিজ্ঞাসা ও অন্বেষার মাধ্যমে নিজেকে জানা। দ্বিতীয় স্তর হলো অধ্যাত্ম-গুরুর সাথে আধ্যাত্মিকভাবে একাত্ম হওয়া। তৃতীয় স্তর হলো আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের সাথে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া। সুফীরা যেটাকে বলেন 'ফানাফিল্লাহ'। অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বশেষ স্তরে উপনীত হওয়ার পর সাধক তাঁর নিজের জৈব-সত্তা বিস্তৃত হয়ে পরম স্রষ্টার শাশ্বত সত্তার সাথে একাত্মতা অনুভব করেন। এটা সাধকের সর্বোচ্চ মার্গ। 'বিসংগতি' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় নিসর্গ, মানুষ, মানুষের বহিরঙ্গ ও অন্তর-রাজ্যের বিভিন্ন দোলাচল, পৃথিবীর নানা বাস্তবতার কবিত্বময় বর্ণনার মাধ্যমে কবি তাঁর অধ্যাত্মবোধকেই ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন। নানা রূপক, উপমা, প্রতীকের মাধ্যমে কবি এ বোধকে আরো তাৎপর্যময় করে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। যেমন ঃ

"লঞ্চের লাঞ্ছনা শেষ। মুক্তপ্রাণ ছন্দবিদ্ধ হাওয়া;
নরম বিছানা মাটি সদ্য ভেজা বর্ষণ সরস;
ঝাঁ ঝাঁ দুপুরের মাঠে ভরামন আউষের সোনা;
ছলছল নদীবেগ অস্পষ্ট অধরা তবু নাচে।
সামনে সবুজ শাড়ী পাটক্ষেত; ভাঙা মন জোড়া

www.nagorikpathagar.org

তীক্ষ্ণ চিল; বিরহ সমৃদ্ধি ঘন কুহু, কুহু, কুহু ;
ডাহুকও দরদী। তবুও অস্থিরচিত্ত। মনোলীন
যদিও বা ধান্যগন্ধী দেহ, মৃত্যুলগ্নী মোহের মোক্ষনে
চিনেছি তো তারে।"
(বিসংগতি ঃ বিসংগতি)

'বিসংগতি'র কয়েকটি কবিতা ইংরাজ কবি এজরা পাউন্ড, ক্যান্টো, ই.ই. কামিংস-এর অনুসরণে লেখা। এখানেও কবির ইংরাজি কাব্য পাঠের প্রভাব স্পষ্ট। 'বিসংগতি'র মধ্যে যে ভাব ও অনুভূতি কোরক মেলেছে কবির তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'হিজরত'-এ তা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়েছে। এখানে আত্মগত অনুভব পূর্ণ অধ্যাত্ম-চেতনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে প্রতিটি কবিতায় আল্লাহ, রাসূল (স) ও ইসলামের সুমহান আদর্শের আবেগঘন বর্ণনা আছে। হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে কবি মক্কা, মদীনা, আরাফাত ও অন্যান্য ঐতিহাসিক-ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গমনকে হিজরতের সাথে তুলনা করেছেন। হিজরতের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ বা আল্লাহর দ্বীনের জন্য স্বগৃহ পরিত্যাগ করা। হজ্জের উদ্দেশ্যও তাই। তবে কবির এ হিজরতে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রাই গুরুত্ব লাভ করেছে। সেদিক দিয়ে আলী আশরাফের এ কাব্য সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ও অসাধারণ সংযোজন হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"এ কাব্যগ্রন্থের 'হিজরত' এবং 'লাব্বায়েক' নামক কবিতা দুটি বাংলা কাব্য সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন। ঠিক এ ধরনের কবিতা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে আর কখনো লিখিত হয়নি। 'হিজরত' কবিতাটিতে কবির আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের রূপচিত্র পাই। বাস্তব জগতের প্রেম, লোভ, ক্ষয়ক্ষতি সব কিছু ত্যাগ করে কবি হিজরত করেছেন আল্লাহ এবং রাসূলের নিকটতম সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশে। এ কবিতাটি টি.এস. এলিয়টের 'অ্যাশ ওয়েড্নেসডে' (Ash Wednesday) কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। এখানেও কবি এলিয়টের মত কয়েকটি প্রতীক ব্যবহার করেছেন যে সমস্ত প্রতীক আধ্যাত্মিক অবস্থার অনুভূতি জাগ্রত করে।...চতুর্থ কবিতাটিতে ('লাব্বায়েক') ইয়েট্সের 'সেইলিং টু বাইজ্যান্টিয়াম' (Sailing to Byzantium) কবিতার প্রভাব লক্ষ্য করি। ইয়েট্সও সন্ধান করেছেন চিরন্তনকে, এ কবিও চাচ্ছেন আল্লাহ ও রাসূলের সান্নিধ্য লাভের পর এই ক্ষয়িষ্ণু দুনিয়াতে চিরন্তনকে। মদীনা মুনাওয়ারাকে সেই চিরন্তনের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন এবং রাসূল (স)-এর মধ্যে সেই 'নিবেদন অমরত্বে'র সন্ধান

www.nagorikpathagar.org

পেলেন তাই কবি সম্পূর্ণ নতুন অর্থ যোজনা করে বাংলা পুরাতন রূপকল্পকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করেছেন- এবং একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।" (পূর্বোক্ত)।

'হিজরত' কাব্যটি কবির রূহানী পীর 'হজরত বাবা শাহ তাজী রহমাতুল্লাহ আলায়হের স্মরণে' উৎসর্গীকৃত। তিনি সৈয়দ আলী আশরাফের আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। কবি তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর সান্নিধ্যে এসে যে উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, সেটারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এ কাব্যের বিভিন্ন কবিতায়। মূলত এটা গতানুগতিক কোন ধর্মীয় কাব্য নয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে কবি আধুনিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই এখানে আবেগের যেমন প্রশ্রয় আছে তেমনি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতারও প্রকাশ ঘটেছে।

কবির পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের নাম 'রূবাইয়াত এ জহীনী'। এখানেও কবির অধ্যাত্ম-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ কাব্য সম্পর্কে সৈয়দ আলী আশরাফ যে কথা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। কবি বলেন ঃ "মানবিক প্রেম ও ঐশীপ্রেম এ দুয়ের প্রকাশ আমার কাব্যে রয়েছে এবং মানবিক প্রেম থেকে ঐশীপ্রেমের পথে যে যাত্রা এবং যে নতুন রূপ তা 'রূপাইয়াত এ জেহিনী'-তে ভালভাবেই প্রকাশিত হয়েছে।"

একটি উদাহরণ ঃ

"প্রিয়ারে আমার শুকরিয়া দিই; শান্ত ঘরের মন্ত্রণায়
আমারে কখনো বন্দী করেনি গল্পগুজব সান্ত্বনায়
আগুনে পুড়িয়ে কঠিন জ্বালায় আমারে করেছে দীপ্ত শিখা
সেই আলো দিয়ে তোমারে চিনব- মিলাবে মিটাবে অন্তরায়।"

(রূবাইয়াৎ-ই-জহীনী)

সৈয়দ আলী আশরাফের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'প্রশ্নোত্তর'। এ কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে ঃ "প্রশ্নোত্তর' বইতে কবি বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরম সত্তার সঙ্গে নিজস্ব পরিচিতির আনন্দ যেমন পরিবেশন করতে চেষ্টা করেছেন, তেমনি সেই সত্তার সঙ্গে অপরিচয়ের অন্ধত্ব এবং তার ফলগত ক্রুরতা ও স্বার্থপরতার বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রশ্ন করেছেন কেন এই অপরিচয় ? অন্তরাত্মায় বেদনাক্ত যে উত্তর উদিত হচ্ছে কবি তা-ই এ বইতে প্রকাশ করেছেন।"

www.nagorikpathagar.org

সৈয়দ আলী আশরাফ মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী জীবনবোধ ও গভীর অধ্যাত্ম-চেতনাসম্পন্ন একজন আধুনিক কবি। বাংলা কাব্যে এটা কোন নতুন বিষয় নয়; মধ্যযুগে শাহ্ মোহাম্মদ সগীর থেকে এর উৎপত্তি এবং বিভিন্ন যুগে অসংখ্য মুসলিম কবির কাব্য-কবিতায় এর রূপায়ণ ঘটেছে বিভিন্নভাবে। আধুনিক যুগে নজরুল-ফররুখ এ ধারার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি। সৈয়দ আলী আশরাফ তাঁদেরই সার্থক উত্তরসূরী। তবে তাঁর আধ্যাত্মিক বোধ ও জীবন-অভিজ্ঞতার রূপায়ণ ও নিজস্ব কাব্যভাষা নির্মিতির ক্ষেত্রে তাঁর সচেতন-সক্ষম প্রয়াস তাঁকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এ কারণে তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল একজন কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এছাড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ উন্নয়ন ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর যে অসামান্য অবদান রয়েছে সেজন্য তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত। এসব বিষয়ে ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় তাঁর রচিত বিভিন্ন জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাদি তাঁকে বিশ্বে জ্ঞানী-গুণী মহলে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে ইসলামী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে এক উন্নত মানব-কল্যাণধর্মী শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রে তিনি জীবনব্যাপী গবেষণা ও চেষ্টা-সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর এ অনুশীলন কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকায় দারুল ইহ্সান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

www.nagorikpathagar.org

আবদুর রশীদ খান

১৯৫০ এর দশকে কাব্যক্ষেত্রে সাড়া জাগানো এক নবীন কবির সদম্ভ আত্মপ্রকাশ। বহুল আলোচিত বাংলাদেশের প্রথম কাব্য সংকলন 'নতুন কবিতা'র অন্যতম সম্পাদক কবি আবদুর রশীদ খান (ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদনা করেন) কবিতার ভুবনে এক সময় প্রাণের উষ্ণতা ছড়িয়ে মানুষের অনুভূতির জগতে সাড়া জাগাতেন, তিনি আজ অনেকটাই শব্দ-গন্ধময় পৃথিবী থেকে লোক-চক্ষুর অন্তরালে সুদূর আমেরিকায় প্রবাস-জীবন যাপন করছেন।

যুগ-বিবর্তনের সহজাত যন্ত্রণা, মূল্যবোধের অবক্ষয় ও মানবতার চরম লাঞ্ছনার বিপরীতে এক অনিবার্য প্রতিবাদী কণ্ঠ আবদুর রশীদ খান ১ জানুয়ারি ১৯২৪ সনে (সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১৯২৭, কিন্তু কবি নিজে আমাকে তাঁর জন্ম ১৯২৪ বলে জানান) বর্তমান চাঁদপুর জেলার, চাঁদপুর শহরের পার্শ্ববর্তী পশ্চিম জাফরাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী ওয়াইজ উদ্দীন খান, মাতা-কাদ্‌রুন নেসা। রঘুনাথপুর প্রাইমারি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি গৃদকালিন্দিয়া এম.ই.স্কুলে ভর্তি হন। সেখান থেকে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, জামুর্কী নবাব স্যার আবদুল গণি হাই স্কুল, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও সবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫০ সনে ইংরাজিতে অনার্সসহ এম এ ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে আবদুর রশীদ খান প্রথমে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক হিসাবে ১৯৫১-৫২ পর্যন্ত এবং ঢাকা গভঃ কলেজে ১৯৫২-৫৫ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। এরপর তিনি ১৯৫৫-৭৫ পর্যন্ত সরকারের বাংলা অনুবাদক ও প্রকাশনা রেজিস্ট্রার হিসাবে এবং ১৯৭৫-৮৩ পর্যন্ত পরিচালক, অনুবাদ ও প্রকাশনা নিবন্ধন পরিদপ্তরে চাকরি করেন। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন-যাপন করছেন।

www.nagorikpathagar.org

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র থাকা অবস্থায় স্কুল ম্যাগাজিনে আবদুর রশীদ খানের গল্প, প্রবন্ধ ছাপা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে
অধ্যয়নরত অবস্থায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। এরপর ঢাকা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৫২ সনে তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সনে ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকীসহ তিনি যৌথভাবে 'নতুন কবিতা' সম্পাদনা করেন। ১৯৫৯ সনে তাঁর সম্পাদনায় 'প্রেমের কবিতা' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা এরূপ ঃ

কবিতাগ্রন্থ ঃ ১. নক্ষত্র ঃ মানুষ ঃ মন (০১-০৩-১৯৫২), ২. বন্দী মুহূর্ত (১৬-১০-১৯৫৯), ৩. মহুয়া (নভেম্বর ১৯৬৫), ৪. বিম্বিত প্রহর (২৫-১০-১৯৬৮), ৫. অম্বিষ্ট স্বদেশ (জুন ১৯৭০), ৬. সমস্ত প্রশংসা তাঁর (মার্চ, ১৯৮০ ও ১৯৮৬), ৭. তিমির হনন (অক্টোবর, ১৯৮৮), ৮. অলৌকিক এক দীপ (১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৯১), ৯. নির্বাচিত কবিতা (সেপ্টেম্বর ২০০৬)।

কবিতা সংকলন সম্পাদনা ঃ ১. নতুন কবিতা (বাংলাদেশের প্রথম কাব্য সংকলন, মার্চ, ১৯৫০), ২. প্রেমের কবিতা (বাংলাদেশের প্রথম প্রেমের কবিতা সংকলন (সেপ্টেম্বর ১৯৫৯)।

অনুবাদ ঃ ১. আকাশ জয়ের ইতিকথা (জানুয়ারি, ১৯৬০), ২. মুক্তা (জুন, ১৯৬২), ৩. কিশোর মনীষী (ডিসেম্বর, ১৯৬৭), ৪. ইকবালের যবূর-ই-আজম (কাব্যানুবাদ, এপ্রিল, ১৯৮৭), ৫. Some Selected Poems of Farrukh Ahmad (Published by Muhammad Matiur Rahman, Farrukh Gabeshana Foundation, June, 2008), ৬. Mirrored Moments (Translation of own poems-অপ্রকাশিত)

কিশোর কাব্য ঃ ১. আল-আমীন (১৯৯১)

অপ্রকাশিত রচনাবলী ঃ ১. ফুল হবো, না পাখি হবো (অপ্রকাশিত), ২. অদৃশ্য বন্দর খুঁজি (কাব্যগ্রন্থ), ৩. শুরু নেই শেষ নেই (কাব্যগ্রন্থ), ৪. দুরন্ত কৈশোর (স্মৃতি কথা), ৫. হাকল্ বেরী ফিন (ভাবানুবাদ), ৬. টম সয়ার (ভাবানুবাদ), ৭. টম কাকার কুটির (ভাবানুবাদ), ৮. ভালো লাগার প্রতিধ্বনি (বিদেশী কবিতার অনুবাদ), ৯. কিশোর কবিতা, ১০. গানের বাণী ও ১১. হারানো দিন (কিশোর কবিতা)।

উপরোক্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, কবির প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ২৭টি। এর মধ্যে মৌলিক রচনা, অনূদিত কবিতা ও ভাবানুবাদ

www.nagorikpathagar.org

ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর রচনা রয়েছে। কবিতার মধ্যে আবার রয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক সনেট। গীতি কবিতা ও সনেট উভয় শ্রেণীর রচনাতেই কবি বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কবিতা রচনার পটভূমি দেশ ও বিদেশ অর্থাৎ শেষ জীবনে তিনি ২০০৩-এর ১২ মার্চ থেকে অদ্যাবধি উত্তর আমেরিকায় বসবাস করেছেন। বিদেশে নিরবচ্ছিন্ন অবসর জীবনে তিনি লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। স্বদেশে অবস্থানকালে তাঁর লেখার ভাব-বিষয় ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই যেমন তাঁর স্বদেশ-ভাবনার পরিচয় অধিক পাওয়া যায়, তেমনি বিদেশে অবস্থানকালে তাঁর লেখালেখির মধ্যেও সেখানকার অনেক কিছুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটা খুবই স্বাভাবিক। কবি বা লেখক দেশ-কালের প্রতিনিধিত্ব করেন। যখন যে দেশে বা যে সময়ে তাঁরা অবস্থান করেন, তখন সে দেশ ও সময়ের প্রভাব তাঁদের লেখার মধ্যে ফুটে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। বিদেশে অবস্থানকালে দেখা যায়, কবি তাঁর নিজের কবিতা বিদেশীদের নিকট পরিচয় করাবার জন্য ইংরাজিতে তা অনুবাদ করেছেন। অনুরূপভাবে প্রখ্যাত বিভিন্ন ইংরাজ কবির কবিতা তিনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে স্বদেশবাসীর নিকট তা পরিচিত করাবার প্রয়াস পেয়েছেন। বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষাতেই তাঁর দখল থাকাতে তাঁর পক্ষে এটা সহজ হয়েছে। এখানে কবি আবদুর রশীদ খানের 'রেল-লাইন' শীর্ষক একটি বিখ্যাত কবিতা উদ্ধৃত হলো ঃ

রেল লাইন

এই রেল-লাইনের পাশে
তুমি-আমি আজ মুখোমুখি।
চারিদিকে জল আর জল,
সবুজ ধানের গাছে উতলা বাতাস
কী যে কয়ে যায় ঃ
কিছু বুঝি,
কিছু তা'র বাতাসেই হয়ে যায় লয়।

এই রেল-লাইনের পাশে
তুমি আর আমি,
কতো গাড়ী যায় আর আসে,
আসে আর যায়,
জল ছুঁয়ে চাঁদ ডুবে যায়,
জল তবু পেয়েছে কি চাঁদের পরশ।

www.nagorikpathagar.org

তবু দেখি চাঁদ এসে জল ছুঁয়ে যায় ;
রেল-লাইন চলে গেছে দুরে,
বহুদূরে-আরো দূরে,
দুইটি লাইনে জানি সব-ব্যবধান,
কোনোখানে মিলে নাই তা'রা
তবু যেন মনে হয় দিগন্তের কোণে
তা'রা মিশে গেছে,
এক হ'য়ে গেছে।
তুমি-আমি আজো কাছে কাছে-
এই দেখো ঃ তুমি তো আমার হাতে
তোমার কোমল হাত
আলগোছে রেখেছো এখন,
তবু জানি ঃ
আমাদের ব্যবধান হাজারো যোজন ;
গাড়ী যায়, গাড়ী আসে,
রেল-লাইন সমান্তরাল,
কা'রো চোখে মিশে গেছি,
তবু, মিশি নাই,
তবু কাছাকাছি ঃ
এই রেল-লাইনের মতো।
(নক্ষত্র মানুষ মন ঃ মার্চ ১৯৫২)

এ সময় কবি পাবনা এড্ওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনা করতেন। বয়সে তরুণ। তাই কবিতাটিতে তারুণ্যের আবেগ, প্রেম ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয় বিদ্যমান। উপরোক্ত কবিতায় তাঁর প্রকাশ ঘটেছে। কবিতাটি একসময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিচে ঐ সময় লেখা তাঁর আর একটি জনপ্রিয় কবিতা উদ্ধৃত হলোঃ

উল্লাপাড়া স্টেশন

উনিশ বছর পরে
উল্লাপাড়ায় দেখা হলো আবার নতুন ক'রে
উনিশ বছর আগে
রোশনা বেগম দাঁড়িয়েছিলেন সবার পুরোভাগে।
চোখের দেখায় মনের নেশায় মত্ত ঝড়ের খেলা ;

www.nagorikpathagar.org

রক্তে নাচন বক্ষে কাঁপন, পৃথ্বী অবহেলা।
মনের আশা মুখের ভাষা সদ্য-ফোটা পদ্ম ;
ধরায় কেবল দুইটি নয়ন নেশায় অনবদ্য।
রাত হলো দিন, দিন হলো রাত,
স্বষ্টিছাড়া ঘূর্ণি-হাওয়া-ঘুর ঃ
বুঝেছিলাম একটা নতুন সুর।
এরই মধ্যে ঊনিশ বছর বইলো কালের ধারা।
গাড়ীর চাকায় মনকে বেঁধে এখন উল্লাপাড়া ॥
কাছে এলাম, দূরে গেলাম ;
নতুন ক'রে শপথ নিলাম।
যুদ্ধ এলো, চলে গেলো ; মড়ক এসে হাড় ছড়ালো ;
স্বাধীনতার নতুন আলো
চক্ষে লেগে ধন্য হলাম
কোথাকার সেই রোশনা বেগম
জীবন-যুদ্ধে কোন অতলে তলিয়ে গেলো ;
গহন নিশির অতল মনে তবুও তার খানিক পরিচয়
মিথ্যা হবার নয়।
ঊনিশ বছর ধ'রে
তন্বী রোশনা বেগম ছিলেন আমার মনের ঘরে ॥
ঊনিশ বছর পরে
উল্লাপাড়ায় রোশনা বেগম এলেন হঠাৎ করে।
চিনতে পারা কঠিন বটে চোখ দু'টো তার ছাড়া ;
স্বামী পুত্র মেয়ে নাত্‌নি নিয়ে আত্মহারা।
হেসে তিনি বলেছিলেন আগের দু'চোখ তুলে ঃ
'একটিবারও খবর নিতে হয় না বুঝি ভুলে ?'
দিব্যি মোটা, দিব্যি খুশী, কানে হীরের ফুল,
সত্যি কি এ রোশনা বেগম ? – ভুল!
'কয়টি ছেলেমেয়ে ?'
রোশনা বেগম বলেছিলেন যেন এক গা নেয়ে
বলেছিলেন, বিয়ে আমার হয়নি আজো, তাই...
দীপ্তিতে এক চমক দিয়েই রোশনা বেগম হয়ে গেলেন ছাই।

www.nagorikpathagar.org

উল্লাপাড়ায় রওশন-আরার চরম পরাজয়।
উল্লাপাড়ায় হারিয়ে এলাম জীবন স্বপ্নময়॥
(বন্দী মুহূর্ত ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫)

উপরোক্ত কবিতাটি যখন লেখেন, তখন কবি বাংলাদেশ সচিবালয়ে চাকরি করতেন। তাঁর জীবনের প্রথম কর্মস্থল পাবনা যাওয়া-আসার পথে বিখ্যাত উল্লাপাড়া স্টেশন। সেখানকারই এক মুহূর্তের একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন কবিতাটিতে। জীবনে এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে থাকে। কিন্তু কোন কোন মুহূর্তের আকস্মিক ঘটনা সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকে। কবিতায় নাটকীয় আকস্মিকতার মাধ্যমে কবি জীবনের এক করুণ চিত্র তুলে ধরেছেন। তাই কবিতাটির আবেদন চিরকালীন।

'মহুয়া' একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় গাঁথা। মোমেনশাহী-গীতিকার একটি বিখ্যাত গাঁথার নাম 'মহুয়া'। এ গাঁথার অনুসরণে কবি সনেট কাব্য হিসাবে 'মহুয়া' রচনা করেছেন। মোট ৫৮টি সনেট রয়েছে এতে। সনেটের মাধ্যমে তিনি পুরো কাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রথম সনেটটি নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

মহুয়া আমার নাম। একদিন ধনু নদী পারে
ব্রাহ্মণের শিশুকন্যা ব'লে মো'র ছিল পরিচয়।
আজ মনে নেই কারো। এ জীবনে পাইনি সময়
ফিরে যেতে সেই আদি পরিচয়ে ; তাই বিধাতারে
কখনো করিনি ক্ষমা। কে জেনেছে বিশাল সংসারে
বিচিত্র বেদের দলে জীবনের বিপুল সঞ্চয়
শুরু হবে শিশুকালে। আজ তাই লোকে শুধু ক'য়
হোমরা বেদের মেয়ে অপহৃতা এই মহুয়ারে।
হোমরা বেদের মেয়ে! আর আমি যখন ছিলাম
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে বিষণ্ণ হাসির মতো, তার
নেই কোন পরিচয় ? তখন কেবল মাস ছয়
বয়স আমার হবে, সে সময় কিনেছি সুনাম
পরমা সুন্দরী ব'লে। ডাকাতের প্রলুব্ধ সর্দার
চিরন্তন করে গেলো অনির্বাণ সেই পরিচয়।
(মহুয়া)

কবি মহুয়ার শৈশব জীবনের বর্ণনা দেয়ার পর অবশেষে তার জীবনের সর্বশেষ পরিণতি নিয়ে যে সনেটটি রচনা করেছেন তা মহুয়ার জীবনের মতই

www.nagorikpathagar.org

বিষাদ-করুণ। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে 'মহুয়া' আত্মহননের পথ বেছে নেয়। তারই বর্ণনা সর্বশেষ সনেটটিতে এভাবে রূপায়িত হয়েছে ঃ

নির্মম সর্দার শোনো ঃ দেখেছো কি অমর প্রণয় ?
বিন্দু বিন্দু অশ্রু দিয়ে, চিরন্তন দুই হৃদয়ের
বেদনার উপচারে গড়ে-ওঠা স্বর্গীয় প্রেমের
অপার মহান ত্যাগ ? মানে না সে কোন পরাজয়।
তোমার হিংসার বহু ঊর্ধ্বে সেই প্রেম ; কোন ভয়
শংকিত করে না তারে। কোন দিন যদি ঈশ্বরের
একটু করুণা পাও, ভেবে দেখো, শুধু ক্ষণিকের
স্ফুলিংগের স্পর্শে তুমি হয়ে ওঠো চির প্রেমময়।
হিংসাকে করুণা শুধু। ব্যথাদীর্ণ তরুণ তপন
আরক্তিম হোক্ আরো। স্তব্ধ হয়ে বন আর নদী
দেখুক মহান মৃত্যু। সাক্ষী থাক্ আকাশ পাহাড়।
সাক্ষী থেকো তুমি সই। সাক্ষী থেকো নির্মম সর্দার।
প্রিয়তম! ক্ষমা করো। এ পৃথিবী কোনদিন যদি
হিংসা ভোলে, তারই লাগি', মহুয়ার যাত্রা চিরন্তন ॥

'বিস্মিত প্রহর' কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সনে। উক্ত কাব্যগ্রন্থের একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত হলো ঃ

বৃষ্টি

যখন মুক্তার মতো বৃষ্টি নামে সত্তার গভীরে,
আকুল রাত্রির জ্বালা শান্ত হয় প্রশান্ত মায়ায়:
উজ্জ্বল হীরার দ্যুতি নেচে ওঠে আলো-ইশারায়
দূর্বাদলে কিংবা মনে হৃতরিক্ত বসন্তের তীরে।
নিষ্ফল বসন্ত-রাত যে সময় হারায় তিমির
প্রতীক্ষার শেষ লগ্নে, অকৃপণ শয্যার প্রচ্ছায়
কৃপণ মনের কান্না শ্রাবণের আকাশের প্রায়,
তখন নামে যে বৃষ্টি দিগন্তের সবদিক ঘিরে।

'তিমির হনন' কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সনে। এ কাব্য গ্রন্থ থেকে নিচে একটি কবিতা উদ্ধৃত হলো ঃ

নেশাগ্রস্তের শহর

ট্রাফিক বাতির রক্তচক্ষু দেখেই হঠাৎ

www.nagorikpathagar.org

থমকে দাঁড়ালো নেশায় মত্ত গতির আবেগ ;
বিরক্তি তার ঝরলো দুপাশে ব্রেকের খেলায় ঃ
ন্যায়ের পথকে রুদ্ধ করেছে যেন অন্যায়।
পদে পদে বাধা, বাধার দেয়াল টপকে কখন
যাবে পার্কের যেমন খুশির খেয়ালীপনায় ;
লোনা ঘামে ভেজা হাত দুটো তার মনের আবেগে
হবে দুটো চোখ, শুধু তার চোখ যার গাঢ়তায়
সন্ধ্যার সুর ; তখন দুজনে সবুজ ঘাসের
পশ্চাৎপটে শিল্পীর আঁকা এলানো মূর্তি
হয়ে কথা কবে নীরব ভাষায় ; মোনালিসা-হাসি
যার স্বাভাবিক সে তখন চুলে বুলাবে আদর
অবোধ মনের উপায়হীনের গভীর নেশায়।

(তিমির হনন)

কবি বিদেশে বসবাসকালে যেসব কবিতা লিখেছেন, তার কিছু নমুনা ঃ

জানালার ওই পাশে

জানালার ওই পাশে সোমা হয়ে জ্বলছে পাহাড় ;
আকাশ ছবির নীলে ডুবে আছে ;
ভোরের বিমুগ্ধ আলো চেরি গাছটার
নগ্নতাকে মুছে দিয়ে হাসে প্রিয় দাদিমার মতো।
হাওয়ার ঘূর্ণির তালে ঝরা পাতাগুলো
লুটোপুটি খেতে কথা কয় বাতাসের কানে।
তুষার গলছে ধীরে ; প্রিয়বন্ধু কাঠ-বিড়ালীরা
দুরন্তপনায় তোলে ঐক্যতান প্রকৃতির কোলে।
বসন্তের আগমন দূরে নেই ভেবে
গাছে গাছে ডালে ডালে খুশির উৎসবে
কাঠ-বিড়ালীর তাই ছুটাছুটি দীর্ঘ শীত শেষে।
দু' একটা কচি পাতা রঙের বিভায়
ধরায় আকুল নেশা প্রতীক্ষার অতৃপ্ত নয়নে।

ম্যানচেস্টার, ইউ.এস.এ ঃ ১৮.০৩.২০০৩

কেউ এসেছিল নাকি?

কেউ এসেছিল নাকি ? মনে হলো দরজায় কার

www.nagorikpathagar.org

শব্দের তরংগ হলো ; নাকি মাঝ রাতে
বাতাসের কান্নার ঘোর মনে লেগে আছে!
কেউ কি আসার কথা দিয়েছিল কোনো একদিন!
বাহিরে তুষার-ঝড়ে অবিরাম কার হাহাকার ;
বাতাসে বৃষ্টির সুরে মনে হয় কার কবেকার
করুণ কান্নার ধ্বনি ভেসে আসে কোন
অতীতের অন্ধকার ভেদ করে এই বন্ধ দ্বারে।

ম্যানচেষ্টার, ইউ.এস.এ ঃ ২৯.০৩.২০০৩

শিকার

সকালের সোনারোদে অপরূপ পায়রার ঝাঁক
নীলাকাশে বারবার শুধু চমকায় ;
বৃত্তাকারে ওঠে নামে দলবেঁধে মাতাল খেলায় ;
তারই ফাঁকে গিরিবাজ নিপুণ কৌশলে
শিকারকে গিরে ফেলে নামায় খাঁচায়।

(ম্যানচেষ্টার, ইউ.এস.এ ঃ ১৫.০৪.২০০৩)

অচেনা আগন্তুক

শৈশবে উধাও ভাই, খোঁজ নেই ; বহুদিন পরে
জানা গেল তার বাস মায়াপুরী রঙিলা বার্মায় ;
বাবা-মা প্রয়াত বলে যোগাযোগ নির্বাসিত-প্রায় ;
আঠারো বছর পরে অকস্মাৎ কি যে মনে করে
খবর দিলেন তিনি ফিরেছেন নিজের শহরে।
এখন বয়স তার অনুমান ত্রিশের কোঠায়,
যৌবনের কারুকাজে তাই তাকে চেনা হবে দায়,
সারা গ্রাম ছোটে তাই শঙ্কাপূর্ণ বিস্মিত অন্তরে।
চেনার উপায় নেই-বয়সের এতো ব্যবধান ;
বাংলাও বলেন, তবে ভাঙা ভাঙা ; কি যে পরিচয়
কেমনে তা ধরা যায়-তার মতো সম সাময়িক
অজস্র প্রশ্নের জালে পূর্বস্মৃতি করে বিনির্মাণ ;
প্রবীণের সাক্ষ্যে তার শৈশবের হলো পূর্ণ জয় ;
মেঘনা আছড়ে তীরে বলে গেল ঠিক, সব ঠিক।

ম্যানচেষ্টার, ইউএসএ ঃ ০৬.০৫.২০০৪

www.nagorikpathagar.org

জুয়াড়ি

জুয়ার নেশায় পেলো দেশটাকে ; জুয়াড়ির দল
আদিকাল থেকে এই একবিংশ শতকে কেমন
জুয়ার নেমায় মত্ত ; নেশাঘোরে কি যে ধরে পণ
খেয়াল রাখে না তার ; রাজ্যপট যায় রসাতল ;
বিত্ত যায় ঘর যায় বউ হয় অন্যের দখল ;
কিছুই থাকে না যদি মত্ততায় নিজেকে তখন
বাজীতে উঠায়ে করে আজীবন অশ্রু বিসর্জন ;
জনতাকে বাজী ধরে জুয়াড়িরা খোঁজে ভাগ্যফল।

ম্যানচেষ্টার, ইউএসএ ঃ ০৮.০৫.২০০৪

সত্যই প্রথম বলি

"True Poets must be truthful"
-Wilfred Owen (1893-1918)

'সত্যবাদী হতে হবে অবশ্যই খাঁটি কবিদের'
তুমি তো বলোনি খাঁটি কবিদের লক্ষণ কেমন ;
নিজেই সত্যের পথে সমর্পণ করেছো জীবন ;
সত্যই প্রথম বলি হামেশাই পাই সেটা টের ;
চোখ বন্ধ করে রাখে দাবিদার যারা বিবেকের।
তুমি তাই বলো নাই সেই প্রিয় কবির মতন ঃ
ঘটে যা তা সত্য নয়- সেই সত্য যা তোমার মন
এঁকে যায় ; তাই পাই আপেক্ষিক চেহারা সত্যের।
নিটোল সত্যকে ওরা কাচে-বন্দি বর্ণালীর মতো
রাঙিয়ে ছড়ায় মাঠে ; তাই চোখে ঘোর লেগে থাকে;
নিমর্ম সত্যের সাদা তেজোদীপ্ত অস্তিত্বে কেমন
অস্বস্তি ওদের বুকে ; ভ্রান্তির আবহে অবিরত
অবশ ওদের প্রাণ সত্য মানে তাই ভুলটাকে।
প্রকৃত কবির কাব্যে উদ্ভাসিত সত্যের গগন।

ম্যানচেষ্টার, ইউএসএ ঃ ০২.০৬.২০০৪

হালের কবিতা

হালের কবিতা কেউ দুবার পড়ে না-
কোনোটার সিকি ভাগ অথবা অর্ধেক,

www.nagorikpathagar.org

বড় জোর পুরোটাই পড়ার মতন
ভাগ্য কোনো কবিতার হয় কি না হয়
গুণিজন জানেন সেকথা ; আমি জানি
পড়াশেষে তাগিদে কারো মুখস্ত থাকে না-
পড়ার গরজ হলে পড়ে তার খোঁজ ;
পড়াশেষে থেকে যায় ছিল তা যেখানেম ;
মনের গভীরে তার থাকে না ঝংকার।

ম্যানচেষ্টার, ইউএসএ ঃ ১০.০৬.২০০৪

উপরে উদ্ধৃত কবিতাংশগুলো বিদেশের মাটিতে বসে লেখা। এতে বিদেশের জীবন ও প্রকৃতির কিছু বর্ণনা রয়েছে। বিদেশে বসবাসকারী কবির হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধের পরিচয়ও এতে ফুটে উঠেছে। শেষোক্ত কবিতাটিতে আধুনিক কবিতা সম্পর্কে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক অনেক কবির রচনায়ই জীবন ও জগত সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকে না, কবিতার যথার্থ আবেদনও এতে অবর্তমান। তাই কবি এগুলোকে 'হালের কবিতা' নাম দিয়ে অনেকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছেন।

আবদুর রশীদ খান একজন প্রবীণ কবি। তিনি লিখেছেন প্রচুর। তাঁর লেখা অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থভুক্ত হয়নি এবং তিনি নিজে প্রচার-বিমুখ হওয়ার কারণে তাঁর কবিতার যথোচিত মূল্যায়ন হয়নি। তিনি নিঃসন্দেহে একজন বড় কবি। এখানে ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁর সম্পর্কে একটি ধারণা মাত্র দেয়ার চেষ্টা করা হলো। তাঁর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন করতে হলে ব্যাপক পরিসরে গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। আশা করি সেরূপ মহতী উদ্যোগ অচিরেই কেউ না কেউ গ্রহণ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

আসকার ইবনে শাইখ

বাংলাদেশে 'নাট্যাচার্য' হিসাবে পরিচিত ও নাট্যাঙ্গণের একজন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব আসকার ইবনে শাইখ (জন্ম ৩০ মার্চ ১৯২৫, মৃত্যু ১৮ মে ২০০৯)। বাংলাদেশের নাট্যকারদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক নাটকের রচয়িতা। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যা ১১৬টির অধিক। এর মধ্যে ৮০টির অধিক নাটক মঞ্চ-সফল। তিনি একদিকে নাটক রচনা করেছেন, নাটক মঞ্চায়নে নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নাট্যান্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তাই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে আসকার ইবনে শাইখ এক অবিস্মরণীয় নাম। নাটক রচনা ছাড়াও তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ, গান ও অনুবাদ-কর্মে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর প্রবন্ধ প্রধানত ঐতিহাসিক, ঐতিহ্যনির্ভর ও সমাজ-সচেতনতামূলক। নাটকের প্রয়োজনে তিনি কিছুসংখ্যক গানও রচনা করেছেন। এছাড়া, ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। ভাষা আন্দোলনের সূচনাকারী প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশে'র তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। মজলিশের 'সাহিত্য ও লোককোলা' বিভাগ থেকে প্রকাশিত মাসিক 'দ্রুতি' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি পালন করেন।

আসকার ইবনে শাইখ ময়মনসিংহ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম এম. ওবায়দুল্লাহ্। তিনি একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯৫১ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উক্ত একই বিভাগে দীর্ঘ চল্লিশ বছরকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯৮৩ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৭৮ সনে তিনি পরিসংখ্যান গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরিচালক ও ১৯৮৪ সনে অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। ১৯৯০ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

www.nagorikpathagar.org

> পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্র ও পরবর্তীতে শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। দেশ বিভাগের পূর্বে বাংলা নাটকের প্রধান কেন্দ্র ছিল কলকাতা।

নাটক রচনা, নাটকের অভিনয় ও মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে তখন হিন্দুদের ছিলো একাধিপত্য। মুসলিম সমাজে নাটক তখনও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। নাটক মঞ্চায়ন ও অভিনয়ের ক্ষেত্রেও মুসলমানরা তেমন উৎসাহী ছিল না। প্রধানত ধর্মীয় কারণে তখন মুসলিম সমাজ নাটকের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। কিন্তু ১৯৪৭ সনের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুনভাবে নাট্যান্দোলন শুরু হয়। ঢাকাতে ইতঃপূর্বে যারা নাট্যজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তারা সকলেই হিন্দু। দেশ বিভাগের পর তারা অনেকেই কলকাতায় চলে যান। ফলে এক্ষেত্রে একটা শূণ্যতা সৃষ্টি হয়। এ শূণ্যতা পূরণে যাঁরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাঁদের মধ্যে আসকার ইবনে শাইখ অন্যতম। তিনি নাটক রচনা, নাটক মঞ্চায়ন ও নির্দেশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম ঢাকায় নাট্য একাডেমী গড়ে তোলেন তাঁর নিজ বাসভবনে।

নাটক একটি সুসংবদ্ধ শিল্পকলা। নাটককে বলা হয় Reflection of life বা 'জীবন শিল্প', অর্থাৎ জীবন-বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত হয় নাটক। সেজন্য নাট্যকারকে অতি সচেতনভাবে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, তা হলো–নাটকের আখ্যান ভাগ বা প্লট রচনা, নাটকের ঘটনা পরম্পরা বা গতিময়তা সৃষ্টি, চরিত্র নির্মাণ, সংলাপ রচনা, পরিবেশ সৃষ্টি ও জীবন-জগৎ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী। সার্থক নাট্যকার এসব বিষয়ের দিকে অত্যন্ত সচেতন থেকে নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন। এ জন্য নাটককে বস্তুনিষ্ঠ শিল্প বলা হয়। অন্যান্য শিল্পের তুলনায় নাটকে কল্পনার স্থান তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তাই নাটক রচনা এক দূরহ কাজ, সকলের পক্ষে সার্থক নাটক রচনা করা সম্ভব নয়।

এদেশে প্রাচীনকালে সংস্কৃত ভাষায় নাটক রচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন নাটক রচিত হয়নি। তবে নাটক রচিত না হলেও প্রাচীনকাল থেকে বাংলাদেশে যাত্রা, লেটো গান, পালা গান, কবি গান, কথকথা, টপ্পা, খেউড়, হাফ আখরাই ইত্যাদির প্রচলন ছিল এবং এখনো তা কোন না কোনভাবে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে। অনেকে নাটককে এসবের ধারাবাহিকতা বা আধুনিক রূপ বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আধুনিক নাটক এগুলোর কোন ধারাবাহিকতা নয়, সম্পূর্ণ নতুন ধরনের শিল্পকলা, যার উদ্ভব হয়েছে ইংরাজ শাসনামলে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে

www.nagorikpathagar.org

ইংরাজি সাহিত্যের আদলে। বলতে গেলে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক হিসাবে খ্যাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) আধুনিক বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রেও পথিকৃৎ। ইংরাজি নাটকের অনুসরণে তিনি দু'টি বাংলা নাটক ও দু'টি প্রহসন রচনা করেন। গ্রীক ট্রাজেডির আদর্শে তিনি বাংলা ভাষায় তাঁর প্রখ্যাত 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক প্রণয়ন করেন।

মধুসূদনের পূর্বে বাংলা ভাষায় জনৈক রুশ যুবক ১৭৯৫ সনে কলকাতায় The Disguise এবং Love is the Best Doctor শীর্ষক দুটি ইংরাজি নাটকের অনুবাদ করে তা মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু তা ছিলো অনুবাদ, কোন মৌলিক রচনা নয়। এরপর ১৮৫২ সনে তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' ও যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্ত্তিবিলাস' এবং ১৮৫৩ সনে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতি চিত্ত বিলাস', 'কৌরব বিয়োগ' (১৮৫৮), 'চারুমুখ চিত্তহারা' (১৮৬৪), 'রজতগিরিনন্দিনী' (১৮৭০) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপরিউক্ত নাটকগুলো প্রখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার সেক্সপিয়রের বিভিন্ন নাটকের ভাবানুবাদ। অতঃপর রামনারায়ণ তর্কালংকারের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেনীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা] (১৮৬০), 'মালতী মাধব' (১৮৬৭), রুক্মিণীহরণ (১৮৭১) কংসবধ (১৮৭৫), 'ধর্মবিজয়' (১৮৭৫) ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এগুলোও অনুবাদ বা সংস্কৃত নাটকের ভাবানুবাদ মাত্র। এরপর রামনারায়ণ 'যেমন কর্ম তেমন ফল' (১৮২৭), 'উভয় সংকট' (১৮৬৯), 'চক্ষুদান' (১৮৬৯), 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩), 'সম্বন্ধ সমাধী' (১৮৬৭), 'নব নাটক' ইত্যাদি এবং তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' (১৮৫৭) ও শ্যামাচরণ দত্তের 'অনুতাপিনী নবকামিনী' (১৮৫৬) অনুবাদ নাটক প্রকাশিত হয়। আধুনিক শিল্পকলার বিচারে উপরোক্ত নাটকগুলোকে সার্থক বলা যায় না। এর কোনটিই মৌলিক রচনা নয়, ইংরাজি বা সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে রচিত। তাই শিল্পকলা ও মৌলিকত্বের বিচারে, এগুলোকে সার্থক নাটক বলা যায় না। তবে বাংলা নাটকের সূত্রপাত ও ধারবাহিকতা রক্ষায় এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক বাংলা নাটকের শিল্পসম্মত সার্থক রচনা মধুসূদনের হাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

নাটক রচনায় মুসলমান লেখকদের আবির্ভাব ঘটে কিছুটা পরে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২) প্রথম মুসলিম নাট্যকার হিসাবে আবির্ভূত হন। এরপর মুসলিম নাট্যকারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন, শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬), আবুল ফজল (১৯০৩-৮৩), আযিম উদ্দিন (১৯০৪-৭৩), বন্দে আলী মিয়া (১৯০৬-৭৯), নূরুল মোমেন (১৯০৬-৯৯), আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (১৯০৯-৮৩), শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪),

www.nagorikpathagar.org

সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫), আবদুল হক (১৯২০-৯৭), ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম (১৯২১-২০০০), সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ (১৯২২-৭১), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), কবীর চৌধুরী (১৯২৩), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-৭১) প্রমুখ।

নাট্য-জগতে যারা ইতঃপূর্বে কলকাতাকে কেন্দ্র করে মঞ্চনাটক তৈরি ও অভিনয়ের চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন, তাদের মধ্যে মুসলমানদের কোন ভূমিকা ছিল না বললেই চলে। নাটক রচনা ও তার অভিনয়ের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে নানারকম বাধা-নিষেধ ছিল। মুসলমান অভিনেতাগণের জন্য তখন নাটকে অভিনয় করার সুযোগ ছিল না। কেউ কেউ অতি উৎসাহে নাটক মঞ্চায়ন ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলেও তাদেরকে মুসলমান নাম পরিত্যাগ করে ছদ্মনাম অর্থাৎ কোন হিন্দুর নাম ধারণ করতে হয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইতঃপূর্বে নাটকের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু, দেশ-বিভাগের পর তারা অনেকেই দেশত্যাগ করেন। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে এগিয়ে আসতে হয়। ফলে মুসলমান নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ ক্রমান্বয়ে নাটক রচনা ও তা মঞ্চায়নে উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ঢাকায় পূর্ব-পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপিত হওয়ার ফলে ঢাকাকে কেন্দ্র করেই প্রধানত এ নতুন নাট্যান্দোলনের সূত্রপাত। পরবর্তীতে তা সমগ্র বাংলাদেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফজলুল হক মুসলিম হলে' বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক খ্যাতনামা নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখের 'বিরোধ' নাটকটির মঞ্চায়নের মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের মঞ্চনাট্যের যাত্রা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ পরবর্তীকালে যে স্মৃতিচারণ করেন তা থেকেই ঢাকা-কেন্দ্রিক এ নতুন সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবন বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তিনি লিখেছেন ঃ

"হল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'বিরোধ'-এর নির্বাচন করেছিলেন সর্বজনমান্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁর নাকি যুক্তি ছিল : মুসলমান সমাজ নিয়ে মুসলমান রচিত এই পূর্ণাঙ্গ নাটকটি মঞ্চায়ন প্রয়োজন। এর পরিকল্পনার দায়িত্ব ন্যাস্ত হয় পরলোকগত দু'শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সর্বজনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই (বাংলা বিভাগ) ও জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা (ইংরাজী বিভাগ)। শেষ পর্যন্ত জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই সাহেব একাই অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কার্জন হলে স্টেজ বেঁধে মঞ্চস্থ হচ্ছে 'বিরোধ'। নাট্যারম্ভে হলের প্রভোস্ট ডক্টর আব্দুল

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল হালিম মঞ্চে এসে হাত জোড় করে (আক্ষরিক অর্থেই) দর্শকবৃন্দের কাছে অনুরোধ জানালেন, এই প্রথম মুসলমান সমাজের উপর একজন মুসলমান নাট্যকারের পূর্ণাঙ্গ নাটক মঞ্চস্থ হতে যাচ্ছে। দর্শকদের চোখ-কানের অভ্যাসে হয়তো বিসদৃশ নাড়া লাগবে। তারা যেনো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি নিয়ে নাট্যাভিনয়ের পুরোটাই দেখে যান। অর্থাৎ বিরক্ত হয়ে চলে না যান।" **(আসকার ইবনে শাইখ ঃ বাংলা মঞ্চনাট্যের পশ্চাৎভূমি ঃ সাত রং প্রকাশনী, ঢাকা, একুশে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬, পৃ. ৯৬-৯৭)**।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা ও লেখক ওবায়দুল হক সরকারের মন্ত ব্যটিও স্মরণীয় ঃ "মঞ্চ ছিল হিন্দুদের দখলে মঞ্চে প্রবেশ করতে হলে হিন্দু হয়ে প্রবেশ করতে হতো। মঞ্চে এতোকাল চরিত্রগুলো ধূতি-নামাবলী জড়িয়ে 'জয় মা কালী' বলে এসেছে, দর্শকদের চোখ-কান তাতেই অভ্যস্ত, হঠাৎ করে পায়জামা, পাঞ্জাবী, টুপি পরিহিত চরিত্র দেখলে চোখে ধাক্কা খাওয়ার কথা। আমি ১৯৪৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া শহরে প্রথম মঞ্চে পদার্পণ করি। দেশ ভাগের (১৯৪৭) পূর্বে ও পরেও কিছুকাল ধূতি-নামাবলী জড়িয়ে মঞ্চে উঠে 'দুর্গা' 'দুর্গা' করেছি। আসকার ইবনে শাইখই প্রথম সুযোগ করে দিলেন মুসলমান হয়ে মঞ্চে প্রবেশ করার। নাটক জীবনের প্রতিচ্ছবি, বিশ্বের সর্বত্র সত্য হলেও, এদেশে সত্য ছিল না। এদেশে নাটক দেখলে মনেই হতো না যে দেশে মুসলমান বলে কেউ আছে, মনে হতো দেশবাসীর শতকরা ১০০% ই হিন্দু। বাস্তবে অবশ্য ভিন্ন। অবিভক্ত বাংলায় মুসলমানের হার ছিলো শতকরা ৫৪% জন, আর বাকী ৪৬% জন ছিল হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়। বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কোন ঠাঁই ছিলো না সেদিনের দেশীয় নাটকে মুসলমান ছিলো অপাংক্তেয়। আসকার ইবনে শাইখ, নূরুল মোমেন প্রমুখ প্রথম মুসলমান চরিত্রকে বরণ করে নিলেন মঞ্চে।" **(মহান বিজয় দিবস ঃ ওবায়দুল হক সরকার ঃ দৈনিক সংগ্রাম, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৭)**।

এভাবে ধীরে ধীরে ঢাকা-কেন্দ্রিক নাট্যান্দোলনের সূত্রপাত। পরবর্তীতে এ আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং মুসলিম লেখকেরা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন ও তা মঞ্চায়নেও মুসলিম কলা-কুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসেন। কিন্তু প্রথমদিকে নাটক রচিত ও তা অভিনীত হলেও কোন স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। ফলে নাটকের সার্থক মঞ্চায়নে যথেষ্ট বাধা-প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ক্রমান্বয়ে সে বাধা-প্রতিবন্ধকতাও অপসারিত হয় এবং বর্তমানে ঢাকা ও বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে অসংখ্য স্থায়ী মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে নাটক রচনার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আসকার ইবনে শাইখ প্রথম থেকেই ঢাকায় নাট্যান্দোলনের এ উদ্যোগের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৮৬ সনে প্রকাশিত 'বাংলা নাট্যমঞ্চের পশ্চাৎভূমি' শিরোনামীয় গ্রন্থে লেখক পরিচিতি প্রসঙ্গে তোফা হোসেন লিখেছেন ঃ "শাইখ মঞ্চ-রেডিও টেলিভিশনের জন্য নিয়মিত নাটক লিখে আসছেন এবং নির্দেশনা করছেন। এ দেশের মানুষের মন ও মানস, তাদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক-ঐতিহ্য ও চেতনা, তাদের সংগ্রাম ও আশা-বাসনার প্রতিফলন তার নাট্যকৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি অনলস নাট্যকর্মী। বাংলা নাটকের উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য। চারদিকে আজ নাট্য প্রয়াসের যে শুভ কর্মচাঞ্চল্য বিদ্যমান, তার সূচনাকারীদের প্রধান পুরুষ জনাব শাইখ।"

প্রকৃতপক্ষে আসকার ইবনে শাইখ ঢাকা-কেন্দ্রিক নাট্যান্দোলনে একজন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। শুধু নাটক রচনা নয়, নাটকের অভিনয় ও মঞ্চায়নেও তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নাট্যজগতের পথিকৃৎ ছিলেন তিনি। পরবর্তীকালের বিশিষ্ট নাট্যকারেরা তাঁর হাত ধরেই নাটকের ভুবনে আবির্ভূত হয়েছেন। সেজন্য তিনি বাংলাদেশে 'নাট্যগুরু', 'নাট্যাচার্য' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হয়ে থাকেন।

আসকার ইবনে শাইখ প্রধানত সামাজিক, ঐতিহাসিক, ধর্মীয় আদর্শ ও দেশাত্মবোধক বিষয় নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। নাটকের মাধ্যমে তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। ঐতিহাসিক নাটকের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় তুলে ধরে ঐতিহ্যিক প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে সমাজে জাগরণের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বদেশ-প্রেমিক, স্বজাতি-প্রেমিক ও মানবতাবাদে বিশ্বাসী নিষ্ঠাবান নাট্যকার। নাটকের মাধ্যমে তিনি একদিকে দেশ ও জাতিকে যেমন জাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি স্বচ্ছ জীবন-চেতনা ও মানবিক বোধে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'বিরোধ'। এটি ১৯৪৭ সনে রচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৯০টি। অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩২টি, এর মধ্যে ২৬টিই নাটক। বাংলাদেশ টেলিভিশনে তাঁর ৩০টি নাটক, ৮টি সিরিজ নাটক এবং বাংলাদেশ বেতারে তাঁর পঞ্চাশটি নাটক প্রচারিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'বিদ্রোহী পদ্মা' নাটকটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। পদ্মা নদী বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান নদী। নদী-মেঘলা বাংলা সবুজাভায় সুষমামন্ডিত। আগে বাংলার নদীতে অবাধে নৌ-চলাচল করতো, চাষীরা ধান কেটে নৌকায় করে বাড়িতে নিয়ে আসতো,

www.nagorikpathagar.org

ব্যবসায়ীরা পণ্য আনা-নেয়া করতো, জেলেরা মাছ ধরতো, তরুণেরা নৌকা বাইচ দিতো, নদীর পানিতে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা গোসল করতো, নদীর পানি দিয়ে ঘরের কাজ-কর্ম চলতো, নদীর মাছ খেয়ে সকলে সুখি-সম্পন্ন জীবন-যাপন করতো। এভাবে বাংলার নদীর সাথে বাংলার মানুষের জীবন ও জনপদের এক গভীর সম্পর্ক। নদী শুকিয়ে গেলে জীবনও হয় বিপন্ন। পদ্মার উজানে ফরাক্কা বাধ দিয়ে আজ পদ্মাকে শুকিয়ে মৃতপ্রায় করা হয়েছে। তাই বাংলার চেহারাও আজ পাল্টে গেছে, নদী শুকিয়ে চৌচির হয়েছে। 'বিদ্রোহী পদ্মা'র এখন আর কোন দ্রোহ নেই, ক্ষোভ নেই। 'বিদ্রোহী পদ্মা'য় নাট্যকার এ জীবন-বাস্তবতা ও দুরবস্থার চিত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। আসকার ইবনে শাইখের নাটককে মোটামুটি নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

সামাজিক নাটক ঃ বিরোধ (১৯৪৭), পদক্ষেপ (১৯৪৯), বিদ্রোহী পদ্মা (১৯৫০), মৃত্যুক্ষুধা (১৯৫১), দুরন্ত ঢেউ (১৯৫২), শেষ অধ্যায় (১৯৫৩), অনুবর্তন (১৯৫৩), বিল বাওরের ডেউ (১৯৫৪), এপার ওপার (১৯৫৫), প্রতীক্ষা (১৯৫৬), প্রচ্ছদপট (১৯৫৮), লালন ফকির (১৯৫৯), দেওয়ানা মদিনা (১৯৬০), কবি চন্দ্রবতী (১৯৬৫), লীলাকঙ্ক (১৯৬৫), অতল সায়র (১৯৬৬), ইন্টারভিউ (১৯৮১), পদ্মগোখরা (১৯৮৮) প্রভৃতি।

ঐতিহাসিক নাটকঃ অগ্নিগিরি (১৯৫৭), তিতুমীর (১৯৫৭), টিপু সুলতান (১৯৫৮), কর্ডোভার আগে (১৯৫৯), তাহমিনা (১৯৬৮), অশ্রুনির্ঝর (১৯৬৯), প্রতিধ্বনি (১৯৮০), মহাবিজয় (১৯৮০), আক্রান্ত যখন (১৯৮০), রাজপুত্র (১৯৮০), রাজা রাজ্য রাজধানী (১৯৮১), মেঘলা রাতের তারা (১৯৮১), কন্যা জায়া জননী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৮৭) প্রভৃতি।

গীতিনাট্য ঃ চান্দের ভিটা (১৯৬১)।

কাব্যনাট্য ঃ দৃষ্টি ফুল (১৯৬২) ও বাদুড় (১৯৬৩)।

টেলিনাট্য ঃ মীরজাফরের পালা ও দৌলত আলীর সন্তানেরা।

আসকার ইবনে শাইখ প্রধানত নাট্যকার। তবে নাটক রচনা ছাড়াও প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে, অনুবাদ-কর্মে এবং গান ও গল্প সংকলনেও তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এগুলোর একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

গবেষণামূলক প্রবন্ধ ঃ বাংলা মঞ্চ নাটকের পশ্চাৎভূমি (১৯৮৬), মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা (১৯৮৬), বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে (১৯৯১), একটি জীবন (১৯৯১) ও ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত (১৯৯৪।

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদ ঃ বৈষয়িক উন্নয়নের গতিপথে (১৯৬৩), উত্তরণ (১৯৬৪), কাজের দিনের ভোর (১৯৬৫), মার্কিন পুঁজিবাদ (১৯৬৬) ও আমেরিকার অর্থনৈতিক সাধারণতন্ত্র (১৯৬৭) প্রভৃতি।

গানের সংকলন ঃ নবজীবনের গান (১৯৫৯)।

গল্প সংকলন ঃ কালো রাত তারার ফুল (১৯৮২)।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিশেষত ১৯৪৭ সন পরবর্তী বাংলাদেশের নাটকের ক্ষেত্রে আসকার ইবনে শাইখের মূল্যবান অবদান রয়েছে। বাংলাদেশে তিনি সর্বাধিক সংখ্যক নাটকের রচয়িতা। তাছাড়া, মঞ্চ-সফলতার দিক থেকেও তাঁর নাটকের কোন তুলনা হয় না বললেই চলে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে তিনি এক অসামান্য প্রতিভা। বাংলাদেশের নাট্যান্দোলনে ও নাটককে জনমানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। বর্তমানে বাংলাদেশে নাটক একটি জনপ্রিয় শিল্প হিসাবে বিবেচিত। কিন্তু এর শুরু থেকে নিয়ে নানা বাধার বিন্ধ্যাচল পেড়িয়ে তা ক্রমান্বয়ে বর্তমান স্তরে উপনীত হবার মূলে আসকার ইবনে শাইখের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এজন্যই তিনি 'নাট্যাচার্য', 'নাট্যগুরু' ইত্যাদি নানা বিশেষণে বিশেষিত হয়ে থাকেন।

নাট্যক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য আসকার ইবনে শাইখ ১৯৬১ সনে বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮৬ সনে একুশে পদক, ১৯৮৭ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কার, ১৯৮৯ সনে টেলিভিশন নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার সংসদ পুরস্কার, ১৯৯১ সনে বাংলাদেশ সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৯৬ ও ২০০২ সনে জিয়া স্বর্ণপদক, ২০০২ সনে মাতৃভাষা পদক ও ব্রহ্মপুত্র সাহিত্য পুরস্কার এবং বাংলা সাহিত্য পরিষদ গুণীজন সংবর্ধনা ও পুরস্কার লাভ করেন।

www.nagorikpathagar.org

কাজী দীন মুহম্মদ

শিক্ষা, সাহিত্য, ভাষা ও জ্ঞান-গবেষণার ক্ষেত্রে যেসব মনীষী বাংলাদেশে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, প্রফেসর ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ (জন্ম ১ ফ্রেবুয়ারি ১৯২৭- মৃত্যু ২৮ অক্টোবর ২০১১) নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। অর্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরে তিনি এসব ক্ষেত্রে ব্যাপক ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

কাজী দীন মুহম্মদ নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার অন্তর্গত রূপসী গ্রামে ১৯২৭ সনের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী আলিমুদ্দীন আহমদ, মাতা মোসাম্মৎ কাওসার বেগম। পিতা কাজী আলিমুদ্দীন সেকালে রেঙ্গুনে এক বিদেশী কোম্পানীতে চাকরী করতেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ের মধ্যে কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন মেঝ। তাঁর নানা মাওলানা শরাফতুল্লাহ চিশতী তৎকালে একজন পীর হিসাবে বিশেষ সম্মান ও খ্যাতি অর্জন করেন। কাজী দীন মুহম্মদের দাদা কাজী গোলাম হোসেন সোনারগাঁওয়ের ইতিহাসখ্যাত কাজী সিরাজ উদ্দীনের অধঃস্তন পুরুষ। উক্ত কাজীর ন্যায়বিচারের কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে। উক্ত কাজী বাংলার তৎকালীন সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে আদালতে এক সাধারণ বিধবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তলব করেছিলেন। পিতৃ ও মাতৃকূলের এ সমৃদ্ধ ঐতিহ্য কাজী দীন মুহম্মদের বংশধারায় প্রবাহমান।

কাজী দীন মুহম্মদ ক্ষুরধর মেধা ও ধী-শক্তির অধিকারী ছিলেন। ছাত্র জীবনে শিক্ষার সর্বস্তরে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সেকালে সম্ভ্রান্ত বংশের রীতি অনুযায়ী কাজী দীন মুহম্মদের শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তাঁর বিদূষী মাতা মোসাম্মৎ কাওসার বেগমের হাতে। মায়ের কাছে তিনি আরবি ভাষা শেখেন। এরপর তিনি রূপসী বোর্ড প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হন। চতুর্থ শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে তিনি ডবল প্রমোশন লাভ করেন। কিন্তু ডাবল প্রমোশনের সুযোগ না নিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করে মাছিমপুর জুনিয়র মাদরাসায় পঞ্চম শ্রেণীতে

www.nagorikpathagar.org

ভর্তি হন। উক্ত মাদরাসায় দু'বছর অধ্যয়নের পর তিনি ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ (বর্তমান কবি নজরুল কলেজ) সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখান থেকে ১৯৪৩ সনে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরপর তিনি হুগলী ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অধ্যয়ন করে ১৯৪৫ সনে কলকাতা বোর্ড থেকে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আই এ পাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হয়ে বাংলায় বি.এ (অনার্স) ও ১৯৪৯ সনে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে এম. এ পাশ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি সর্বদা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে সরকারী বৃত্তি লাভ করেছেন। ১৯৫৭ সনে কাজী দীন মুহম্মদ সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলাত গমন করেন। সেখানে তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের School of Oriental and African Studies বিভাগে ভর্তি হয়ে ১৯৬১ সনে ভাষাতত্ত্বে পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। এ বিষয়ে এদৎঞ্চলে তিনিই প্রথম ডক্টরেট ডিগ্রীধারী স্কলার।

এম এ পরীক্ষা শেষ করে ফল প্রকাশের আগেই কাজী দীন মুহম্মদ রংপুর কারমাইকেল কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। প্রথম জীবনে তিনি যে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন, সেটাই ছিল তাঁর আজীবনের পেশা ও সাধনা। এরপর তিনি ১৯৫১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৫১-৬১ পর্যন্ত লেকচারার, ১৯৬২-৭৬ পর্যন্ত রীডার এবং ১৯৭৬-৮৬ পর্যন্ত প্রফেসর হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ইতঃমধ্যে ১৯৮১-৮৪ পর্যন্ত চার বছর তিনি বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় তিনি ডেপুটেশনে ১৯৬৪-৬৫ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং ১৯৬৬-৬৯ পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালক (তখনো মহাপরিচালকের পদ সৃষ্টি হয় নি) হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

অবসর গ্রহণের পর কাজী দীন মুহম্মদ ১৯৯৬-২০০২ পর্যন্ত ঢাকাস্থ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ভারপ্রাপ্ত ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর নিজ উদ্যোগে গঠিত 'ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ আদর্শ শিক্ষায়তন' এর রেক্টর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, 'কলেজ অব এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট স্ট্যাডিজ' (সেডস) এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সভাপতি ও বিভিন্ন শিক্ষা-কার্যক্রমের সাথে জড়িত থেকে তিনি শিক্ষা ও জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে চলেছেন।

www.nagorikpathagar.org

কাজী দীন মুহম্মদ বাঙলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, লাহোরস্থ ল্যাঙ্গুয়েজ রিসার্স ইনস্টিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের জীবন সদস্য ছিলেন। তিনি নজরুল ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ আর্ট ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের পাঠক্রম কমিটি সহ বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে এসব ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকাস্থ 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন', 'ইসলাম প্রচার সমিতি' ও 'বাংলাদেশ মসজিদ মিশন' সহ বিভিন্ন শিক্ষা-সাহিত্য, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন।

ব্যক্তি জীবনে কাজী দীন মুহম্মদ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মনীষী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর একান্ত অনুরাগী ও প্রীতিধন্য ছাত্র ছিলেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মত তিনিও একজন জ্ঞান-সাধক, ভাষা-বিজ্ঞানী, সাহিত্য-সমালোচক ও কৃতি শিক্ষাবিদ। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। শিক্ষা-সাহিত্য ছাড়াও তিনি ডক্টর মুম্মদ শহীদুল্লাহর মতই একজন প্রসিদ্ধ চারণ-বক্তা হিসেবে খ্যাত। বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত সভা-সেমিনারে তিনি শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইসলামী বিষয়ের উপর তিনি বিভিন্ন সময় বক্তৃতা প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা ও অবদান কম নয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক, লেখক, কবি, শিক্ষাবিদ ইত্যাদি নানা পরিচিতির মধ্যে একজন সুফী-সাধক হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। এতগুলো বিরল গুণের অধিকারী এবং পাণ্ডিত্য ও মননশীলতায় একজন অসাধারণ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও নিরহংকারী। তাঁর দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর ছাত্র ও পরবর্তীতে তাঁর সহকর্মী প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডক্টর আনিসুজ্জামান বলেন ঃ

"ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ স্যারকে আমি তিন দশকেরও অধিককাল ধরে জানি। ঘনিষ্ঠতা দু'দশকের বেশি সময়ের। এ সময় আমরা কলা ভবনের দোতলায় পাশাপাশি রুমে বসতাম। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসকালে তো বটেই, এমনকি ষাট বছর বয়স হওয়ার পর নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে কলাবাগানে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ার পরও স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত

www.nagorikpathagar.org

আসতেন এবং তাঁর রুমে বসে কাজ করতেন। অনেক অধ্যাপকের মতো প্রায়ই অনুপস্থিত থাকতেন না। তাঁকে কেবল তাঁর নিজ কক্ষ ও ক্লাসরুমেই নিয়মিত পাওয়া যেত না, প্রয়োজনে পরীক্ষার হলে তত্ত্বাবধায়কের কাজ করতেও তিনি ইতঃস্তত করতেন না। অথচ একটু সিনিয়র হয়ে আমাদের মাঝে অনেকেই পরীক্ষার হলে যেতে উৎসাহবোধ করেন না। অথচ পরীক্ষার হলে তিনি অলসভাবে সময় কাটাতেন না।... স্যার অত্যন্ত কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং আমাদের এ অঞ্চলে তিনিই ভাষাতত্ত্বের ওপর প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ডিগ্রিপ্রাপ্ত।"

ছাত্রাবস্থায় কাজী দীন মুহম্মদ লেখালেখি শুরু করেন। সপ্তম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রথম তাঁর লেখা একটি প্রবন্ধ স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। এরপর প্রতি বছরই স্কুল ম্যাগাজিনে তাঁর লেখা প্রবন্ধ ছাপা হতো। অতঃপর সাপ্তাহিক ও মাসিক 'মোহাম্মদী', 'দৈনিক আজাদ' ও অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হয়। প্রথম দিকে তিনি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি সবকিছুই লিখেছেনে। তাঁর লেখা 'জঞ্জাল' শিরোনামে একটি গল্প তৎকালে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা কয়েকটি কাব্য ও গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে তিনি গল্প, কবিতা লেখায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন এবং গবেষণামূলক রচনায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ৩৮টি। এছাড়াও তাঁর রচিত বহুসংখ্যক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের একটি ধারাবাহিক তালিকা নিচে প্রদত্ত হলোঃ

১. মানব মর্যাদা (১৯৬০, ফ্রাঙ্কলিন পাবলিকেশনস)।
২. পাকিস্তান সংস্কৃতি (১৯৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
৩. সাহিত্য শিল্প (১৯৬৪, আহমদ পাবলিশিং হাউস)।
৪. সাহিত্য সম্ভার (১৯৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৪ খন্ড, ১৯৬৮, স্টুডেন্টস ওয়েজ)।
৬. লোকসাহিত্যে ধাধা ও প্রবাদ (১৯৬৮, বাংলা একাডেমী)।
৭. সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ (১৯৬৯, নওরোজ কিতাবস্তান)।
৮. সেকালোর সাহিত্য (১৯৬৯, পুথিপুস্তক)।
৯. সংস্কৃতি ও আর্শ (১৯৬৯, পুথিপুস্তক)।
১০. একালের সাহিত্য (১৯৭০, পুথিপুস্তক)।
১১. ভাষাতত্ত্ব (১৯৭১, বইবিতান)।

www.nagorikpathagar.org

১২. জীবন সৌন্দর্য (১৯৭৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
১৩. বর্ণমালা (১৯৭৪, স্বকীয়তা)।
১৪. প্রভাত (১৯৭৫, কাব্যগ্রন্থ; স্বকীয়তা প্রকাশনী)।
১৫. একুশের আগাছারা (১৯৭৬, কাব্যগ্রন্থ)।
১৬. সুফিবাদের গোড়ার কথা (১৯৮০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
১৭. মানব জীবন (১৯৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
১৮. প্রতিবর্ণায়ন নির্দেশিকা (১৯৮২৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
১৯. The Phonology of the verbal Structure in Colloquial Bengali (১৯৮৫, বাংলা একাডেমী)।
২০. ঘুষ (১৯৮৫, গল্পগ্রন্থ)।
২১. সুখের লাগিয়া (১৯৮৯, পুথিপুস্তক)।
২২. শিক্ষা (১৯৮৯, পুথিপুস্তক)।
২৩. ইসলামী সংস্কৃতি (১৯৮৯, পুতিপস্তক)।
২৪. সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৯০, পুথিপুস্তক)।
২৫. বাংলাদেশের ইসলামের আবির্ভাব (১৯৯০, স্বকীয়তা প্রকাশনী)।
২৬. বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯৯১, মারকাযুল কুরআন)।
২৭. অবিস্মরণীয় (১৯৯১, স্কবকীয়তা)।
২৮. জুমুআর ঘরে (১৯৯১, মারকাযুল কুরআন)।
২৯. নাস্তিকতা ও আস্তিকতা (১৯৯৩, মারকাযুল কুরআন)।
৩০. আমতো দিয়েছি তোমাকে কাওসার (১৯৯৩, মারকাযুল কুরআন)।
৩১. মহানবীর বাণী শতক (১৯৯৮, মারকাযুল কুরআন)।
৩২. বিধান ওতা আল্লাহরই (১৯৯৯, মারকযুল কুরআন)।
৩৩. অবিশ্বস্য (১৯৯৯, স্বকীয়তা)।
৩৪. বাণী চিরন্তন (১৯৯৯, পুতিপুস্তক)।
৩৫. ছোটদের হযরত মোহাম্মদ (সা.) (১৯৯৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।
৩৬. Thus Spoke Prophet Muhammad (sm) (২০০০, স্বকীয়তা প্রকাশনী)।
৩৭. হাসাহাসি (২০০০, পুথিপুস্তক)।
৩৮. বিসমিল্লাহর তাৎপর্য।

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর লেখা দশটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট হয়। এর মধ্যে ভাষাতত্ত্বের উপর লেখা তাঁর একটি অতি মূল্যবান

www.nagorikpathagar.org

পাণ্ডুলিপিও ছিল। কাজী দীন মুহম্মদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত কোরআন শরীফ, বোখারী, তিরমিযী, মোয়াত্তা, আবু দাউদ প্রভৃতি প্রখ্যাত হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ ও সম্পাদনার সাথেও জড়িত ছিলেন। তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে লেখালেখির কাজে নিয়োজিত থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। 'বাংলা একাডেমীর প্রান্তর থেকে' শিরোনামে তাঁর লেখা একটি ধারাবাহিক ভ্রমণ কাহিনী মাসিক 'নতুন কলম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত গ্রন্থ-তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ভাষা, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখেছেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছু কবিতা ও গল্প লিখলেও মূলত প্রবন্ধকার হিসাবেই তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সহজ-সরল ও অতিশয় প্রাঞ্জল। কঠিন বিষয়কেই তিনি সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর লেখার মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্ব-তথ্য ও প্রামাণ্য সূত্রের উপস্থাপনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। মননশীল ও গবেষণামূলক রচনাতেই তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন।

কাজী দীন মুহম্মদ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের উপর গবেষণা করে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করেন। ভাষাতত্ত্বের উপর শিক্ষকতা ও গবেষণা করে তিনি বিরল কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ভাষাতাত্ত্বিক হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় তিনি মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। বাংলা ভাষার বুৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর গবেষণাও পণ্ডিতজনদের নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরী ও ওস্তাদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর অনেকটা পদাঙ্কানুসারী। এ ক্ষেত্রে অবশ্য পরবর্তীরা আরো গবেষণা করেছেন এবং স্বভাবতই নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। তবু ভাষাতত্ত্বের গবেষণায় ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যে চিন্তা-গবেষণা করে গেছেন, তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ সে পথ অনুসরণ করে অনেক নতুন চিন্তার সংযোজন ও আলোক বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছেন। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকগণ এজন্য তাঁকে চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

বাংলা ভাষার ইতিহাস, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বাংলা বর্ণমালার পরিচিতি সম্পর্কে কাজী দীন মুহম্মদের রচিত গ্রন্থসমূহ সর্বাধিক গুরুত্ব লাভের অধিকারী। তাঁর রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' (১-৪ খণ্ড),'ভাষাতত্ত্ব', বর্ণমালা', The

www.nagorikpathagar.org

Phonology of the Verbal Structure in Colloquial Bengali' উল্লিখিত বিষয়ে মূল্যবান গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে বিশেষভাবে সমাদৃত। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' চার খণ্ডে ভিভক্ত একটি বিশালাকার গ্রন্থ। এতে বাংলা সাহিত্যের আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাস বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থটিও ভাষা-গবেষণার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান মাইলফলকতুল্য গ্রন্থ। 'বর্ণমালা' গ্রন্থটি বাংলা বর্ণমালার স্বকীয়তা বিষয়ক একটি গবেষণামূলক মূল্যবান গ্রন্থ।

ইংরেজি ভাষায় লেখা তাঁর 'The Phonology of the Verbal Structure in Colloquial Bengali' গ্রন্থটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গ্রামাটিক্যাল ক্যাটালিরিজ, সিট্যাটিক স্ট্রাকচার এবং সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন প্রণালী ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশে স্থান পেয়েছে বাংলা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জণধ্বনির আলোচনা। সর্বশেষ তৃতীয় অংশে বাংলা ক্রিয়াপদের নমুনা প্যালাটোগ্রাম ও কিমোগ্রাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে তিনি গ্রন্থটিতে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা গবেষকদের মতামত উদ্ধৃত করেছেন। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদের অন্যতম কৃতি ছাত্র ও পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সহকর্মী বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোর্শেদ বলেন ঃ "অধ্যাপক দীন মুহম্মদের ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও উপরিউক্ত গ্রন্থটি নানা কারণে বাংলা ভাষার ওপর একটি মৌলিক গবেষণা গ্রন্থ। বিষয় উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসূ ও বিশ্লেষণধর্মী মনের উপস্থিতিই বিশেষ লক্ষ্যণীয়। অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কিত নিজের আদর্শ ও মনোভাব উপস্থাপন করেছেন।"

কাজী দীন মুহম্মদের সাহিত্য ও গবেষণা সম্পর্কে তাঁর আরো দু'জন ছাত্র ও প্রখ্যাত সাহিত্যিকের মন্তব্য তুলে ধরছি। ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরেশী বলেন- "আমাদের দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তির জগতে তাঁর অবদান অসামান্য। বহু বিষয়ে তিনি লিখেছেন। সরস, প্রাঞ্জল সেসব লেখা, তাঁর ব্যক্তিত্বেরই যথাযথ প্রতিফলন। ক্রিয়াপদের ওপর তাঁর চমৎকার কাজটি গবেষকেরা বহুকাল ব্যবহার করতে থাকবেন। স্বধর্মে নিষ্ঠাবান ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ইসলামি চিন্তাবিদ। তবে স্বদেশের ভিন্ন সংস্কৃতিকেও তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কোনো সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হননি কখনো। শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যে তিনি ছিলেন তারই তুলনা।" **(ডক্টর মাহমুদ শাহ**

www.nagorikpathagar.org

কোরেশীঃ "কাজী দীন মুহম্মদঃ শুদ্ধতা ও সৌন্দর্যে ছিলেন অনন্য", দৈনিক নয়াদিগন্ত, ৪ নভেম্বর ২০১১)।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ বলেন- "কাজী দীন মুহম্মদ মধ্যযুগের সাহিত্য এবং মুসলিম সংস্কৃতিবিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। চলতি ভাষার পুঁথিকারদের রচনার পরিচিতি-নির্মাণ এবং উৎকর্ষ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার পরিচয় মেলে। তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনার ওপর আলোকপাত করেছেন; তবে মধ্যযুগের সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনাতেই তিনি স্বচ্ছন্দবিহারী; তাঁর মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক আলোচনায় নতুন তথ্য উপস্থাপনা কিংবা গভীরতর বিশ্লেষণ ধর্মিতার পরিচয় না থাকলেও একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণের উদ্ভাস লক্ষ্যণীয়।... তিনি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে এবং ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক বই লিখেছেন। তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শ ঐতিহ্য ও মূল্যবোধে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক স্বকীয়তায় আস্থাবান।" **(মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহঃ কিছু স্মৃতি, কিছু কথাঃ দৈনিক আমার দেশ, ১১ নভেম্বর ২০১১)।**

একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও খ্যাতিসম্পন্ন গবেষক হিসাবে কাজী দীন মুহম্মদ বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। সেসব সেমিনারগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলোঃ

1. Third International Congress for Classical Studies, London, 1958.
2. Asian Writers Conference, New Delhi, 1950.
3. Pakistan Linguistic Association, Lahore, 1964, 65 & 68.
4. International Islamic Conference, Colombo, 1978.
5. International Seminar, Iran, 1984.

বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সভা-সেমিনারে যোগদান করা ছাড়াও কাজী দীন মুহম্মদ হজ্জ্ব উপলক্ষে এবং নিজের দেশ দেখার অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি যেসব দেশ সফর করেছেন তার তালিকা নিম্নরূপ ঃ পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, সৌদি আরব, জর্ডান, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ইরান, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, তুরস্ক, সাইপ্রাস, গ্রীস, সিরিয়া, বৃটেন, জার্মানী, ইতালী, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, আলজেরিয়া, মরক্কো, সুদান, নাইজেরিয়া, কঙ্গো, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, মেক্সিকো, কিউবা, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা, মিসর।

www.nagorikpathagar.org

কাজী দীন মুহম্মদ ভাষা, বর্ণমালা, ব্যাকরণ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে লেখালেখি ও গবেষণা করেছেন। বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ভাষাতাত্ত্বিক গবেষক, শিক্ষাবিদ ও মনীষী হিসাবে তিনি দেশে-বিদেশে বিশেষভাবে সুপরিচিত ও খ্যাতিমান ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত এতবড় একজন সাধক ও চিন্তাশীল গবেষককে জাতি তাঁর জীবনকালে উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি। তিনি এ পর্যন্ত যেসব পুরস্কার, সম্মাননা ও স্বীকৃতি পেয়েছেন, নিচে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

১. বাংলাদেশ দায়েমী কমপ্লেক্স পুরস্কার (১৯৮৯)
২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার (১৯৯০)
৩. Distinguished Leadership Award, American Biographical Institute Published in 7th Edition of Biographical Encyclopedia.
৪. Pandit Iswar Chandra Vidyasagar Gold Plaque (2002), The Asiatic Society, Calcutta, India.
৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রকল্প স্বর্ণপদক (২০০৩)।

ব্যক্তি হিসাবে কাজী দীন মুহম্মদ ছিলেন একজন মহৎ সহজ-সরল ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী সজ্জন ব্যক্তি। গবেষক হিসাবে তিনি অনন্যতুল্য। পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়। ধর্মবেত্তা ও সুফী-সাধক হিসাবে তিনি একজন অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন উদার ও মহানুভব। তাঁর মত এমন অসাধারণ প্রতিভাবান আদর্শ ব্যক্তিত্ব সমাজে অতিশয় বিরল। দেশ-জাতি যদিও তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা দিতে সমর্থ হয়নি, তবু দেশ ও জাতিকে সারা জীবন তিনি দিয়েছেন অকৃপণ হাতে।

www.nagorikpathagar.org

আবদুস সাত্তার

অনেকেই সাহিত্য রচনা করেন, কিন্তু সাহিত্য-মগ্ন সাধকের সংখ্যা অতিশয় বিরল। কবি আবদুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০) সেরূপ বিরল প্রতিভাধর একজন সাহিত্য-সাধক। তাঁর পিতার নাম আবদুস সোবহান, মাতা সাবির উন-নেসা। টাঙ্গাইলের গোলরা গ্রামে তিনি ২০ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। গোপালদিঘী কে. পি ইউনিয়ন হাই ইংলিশ স্কুল, টাঙ্গাইল থেকে ১৯৪৭ সনে মাধ্যমিক; সা'দত কলেজ, করটিয়া, টাঙ্গাইল থেকে ১৯৪৯ সনে উচ্চ মাধ্যমিক ও ১৯৫১ সনে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। চাকরি জীবনে তিনি বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দফতরে সম্পাদক হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আবদুস সাত্তার একাধারে কবি, গবেষক, ভাষাবিদ, অনুবাদক, সম্পাদক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি বাংলা, ইংরাজি, আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৪৩ সনে 'দৈনিক আজাদে' মুকুলের মাহফিলে তাঁর প্রথম ছড়া ছাপা হয়। ১৯৪৫ সনে মাসিক মোহাম্মাদীতে তাঁর প্রথম কবিতা ছাপা হয়। তিনি অজস্রধারায় লেখালেখি করেছেন। তিনি যেমন সাহিত্যের বিভিন্ন রূপরীতিতে লিখেছেন, তেমনি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও শতাধিক। নিচে তাঁর গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

প্রবন্ধ-গবেষণা: আরণ্য জনপদে (১৯৬৬); The Manipuris (1969); Tribesmen of Mymensing (1969); Proud people the Murangs (1969); The Khasis (1969); The Marmas (1970); The Chakmas (1970); The Tipras (1970); The Santals (1970); The Oraons (1970); In the Sylvan Shadows (1971); আধুনিক আরবি সাহিত্য (১৯৭৪); আরবি লোকসাহিত্য (১৯৭৪); Tribal Culture in Bangladesh (1975); আরণ্য সংস্কৃতি (১৯৭৭); আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য (১৯৭৮); Tribal Arts and Crafts of Bangladesh (1978); Tribal Music and Dance of Bangladesh (1978);

www.nagorikpathagar.org

আরবি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান (১৯৭৮); ফারসি সাহিত্যের কালক্রম (১৯৭৯); The Sowing of Seeds (1979); উপজাতীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য (১৯৭৯); গারোদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (১৯৮০); ফারসি সাহিত্যে লৌকিক উপাদান (১৯৮০); আলোকের সন্ধানে শেখ সাদী (১৯৮০); কাহিনী কাব্য নয় কাব্য কাহিনী (১৯৮০)।

কবিতা: বৃষ্টি মুখর (১৯৫৯); অন্তরঙ্গ ধ্বনি (১৯৭০); নামের মৌমাছি (১৯৭৩); আমার ঘর নিজের বাড়ি (১৯৭৬); The Intimate Voice (1978); আমার বনবাস (১৯৮২); বিস্মিত স্বরূপ (১৯৮৫); আমার বাবা মার কসিদা (১৯৮৫); আবদুস সাত্তার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯০); Human Portrait (1990)।

স্মৃতিকথা: নিজেরেই নিজে খুঁজি (১৯৮৫); সুরভি অন্যতর (১৯৮৫); কেউ দেখে, কেউ দেখ না (১৯৮৫); আত্মার সংলাপ (১৯১৭); ঢাকায় ঢাকা আছি (১৯৯০); ভিন্নতর সুরভি (১৯৯০)।

জীবনী: ছোটদের জীবনীগ্রন্থ (১-২৫ খণ্ড, ১৯৮৬)।

অনুবাদ: আরবি কবিতা (১৯৬৫); বালি ও ফেনা (১৯৭৩); আধুনিক আরবি গল্প (১৯৭৫); আধুনিক আরবি নাটক (১৯৭৬); আধুনিক আরবি কবিতা (১৯৭৬); ফারসি কবিতা (১৯৭৬); নির্বাচিত আরবি গল্প (১৯৭৭); সম্রাটের যুদ্ধ (১৯৮৭); শ্রেষ্ঠ আরবি গল্প (১৯৮৮); ইমরাউল কায়েসের কবিতা (১৯৯০); মিদাক গলি (১৯৯০); আরবি ফারসি তুর্কি কবিতা (১৯৯০)।

সম্পাদনা : না'ত যুগে যুগে (১৯৯০)।

শিশুতোষ: মওলানা রুমী (১৯৮০); কাছের মানুষ আপনজন (১৯৮০); ছোটদের আরবি গল্প (১৯৮০); মসনবীর গল্প (১৯৮০); শেখ সাদীর গল্প (১৯৮০); কবি কায়কোবাদ (১৯৮০); মিয়া তানসেন (১৯৮০); জলটঙ্গী (১৯৮১); উপজাতীয় জন্ম কাহিনী (১৯৮১); ইরানি রূপকথা (১৯৮১); তুর্কি রূপকথা (১৯৮১); আরবি রূপকথা (১৯৮১); উপজাতীয় রূপকথা (১৯৮২); সে তুমি এবং আমি (১৯৮৫) অন্ধ হয়েও অন্ধ নয় (১৯৮৬); সোনার সিংহ (১৯৮৭)। উপরের গ্রন্থ তালিকা থেকে আবদুস সাত্তারের বিশাল সাহিত্য-সম্ভার সম্পর্কে যেমন অবহিত হওয়া যায়, তেমনি তাঁর সৃষ্টি-বৈচিত্র্য সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা জন্মে। তিনি বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ বিশেষত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি বা আরণ্য জনপদ সম্পর্কে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। এ গবেষণা শুধু গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জীবনের একটি বিরাট অংশ

www.nagorikpathagar.org

এসব জনপদ ও জনগোষ্ঠির সঙ্গে কাটিয়ে তাদের জীবনধারা, জীবনাচার, ধর্মীয় আচার-আচরণ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন-বৈচিত্র্যের নানা দিক সম্পর্কে দীর্ঘকাল গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণ করে এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাই এসব গ্রন্থ তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও গভীর পরিশ্রমলব্ধ অনুসন্ধিৎসার সারাৎসার। ফলে তাঁর গষেণালব্ধ এসব গ্রন্থ অতিশয় মূলবান হয়ে উঠেছে। দেশে-বিদেশে এগুলো ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ রেফারেন্স হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে। আরণ্য জনপদ সম্পর্কে যারা জানতে আগ্রহী ও গবেষণা কাজে লিপ্ত, তাদের জন্য এসব গ্রন্থ অতিশয় মূল্যবান।

আরবি, ফারসি সাহিত্য এবং সেসব সাহিত্যের কতিপয় বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্পর্কেও তিনি গবেষণামূলক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এসব গ্রন্থ পাঠে বাংলাভাষী পাঠক বিদেশী সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সাথে সাথে ঐসব বিশ্বখ্যাত সাহিত্যি দের সম্পর্কেও জানার সুযোগ পেয়েছেন। আবদুস সাত্তার মূলত বিদেশী সাহিত্যের সাথে বাংলাভাষীদের একটি সুন্দর মেল-বন্ধন রচনার কাজ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা অনন্যসাধারণ। বিশেষত আরবি ভাষার অনেক বিখ্যাত কবিতা বাংলা অনুবাদ করে তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের রসপিপাসা বহুলাংশে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তার আগে এ ক্ষেত্রে আর কেউ এতটা সাফল্য অর্জন করেন নি।

কবি হিসাবে আবদুস সাত্তার সমধিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় এক ডজন। মানুষ ও প্রকৃতিই তাঁর কবিতার উপজীব্য। তিনি তাঁর চার পাশের জীবন ও জগতকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তা শিল্প- সুন্দরভাবে তা তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-ভালবাসা এবং মানুষের সাথে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্কের বিষয় তিনি তাঁর কাব্যে অপরূপভাবে তুলে ধরেছেন। এ সম্পর্ক-সূত্র তিনি তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতির দ্বারা উপলব্ধি করে ছন্দময় ভাষায় কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। আবদুস সাত্তারের কবিতায় এক অপরূপ স্নিগ্ধতা, কমলতা এবং কখনো কখনো সুখের ঝলক এবং কখনো বিষাদের করুণ আবহ গভীর সংবেদনায় ব্যক্ত হয়েছে। এখানে তাঁর কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি–

> কেবল আশ্চর্য হই; ঝুড়িতে কাঠের বোঝা রেখে
> সহজেই পিঠে বেঁধে চাকমা মেয়েটা অনায়াসে
> সুউচ্চ পাহাড় বেয়ে কি করে উপরে এলো। ত্রাসে

www.nagorikpathagar.org

একটু কাঁপেনি বুক। আবার নামতে হবে, দেখে
কেবল আশ্চর্য হই। প্রশ্নের জবাবে মিহি সুরে
কে যেন বললো সেই মেয়েটার বুকের অতলে
অনন্য জীবনবোধ মোমের মতন খালি জ্বলে
সমস্ত শ্রমের খুশী ফোটে তার দেহের মুকুরে।

হৃদয়ে আনন্দ আছে। দেহের গঠনে কারুকাজ
পাহাড়ের। মৃন্ময় সূর্যের হাসি নিয়ে দীপ্তমুখে
বুকে বেঁধে 'রাঙা-খাদী' কী যে সুখে পরম কৌতুকে
মেয়েটা নিয়েছে পাঠ পাহাড়ী-গ্রন্থের। আমি আজ
তার সে সংজ্ঞার কাছে পরাজিত। শিক্ষার বদলে
সে এখন সব ঋণ শোধ করে কর্ম কোলাহলে।

(আবদুস সাত্তারঃ গ্রন্থ: অন্তরঙ্গ ধ্বনি)

গীতি কবিতার পাশাপাশি আব্দুস সাত্তার সনেট রচনায়ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। এখানে তাঁর রচিত একটি সনেট কবিতা উদ্ধৃত হলো-

ভাগ্যে হয়নি আজো রাসূলের পবিত্র মাযারে
পাপের সমস্ত অস্ত্র ধুয়ে আনি পুণ্যের সলিলে;
যেহেতু পারিনি যেতে সেহেতু এ কাব্যের দলিলে
তাঁর সে পবিত্র নাম সশ্রদ্ধায় লিখে বারে বারে

আলোর দর্শন চাই- যে আলোর ত্বরিৎ গতিতে
পাপের আঁধার সব দীর্ণ হয়ে আমার হৃদয়ে
কাবার আসন হয়। স্নিগ্ধ আবে যমযম বয়ে
চারিদিকে শান্তি আনে পিয়াসের তৃপ্তি শুধু দিতে।
এ ভাগ্যে হয়নি আজো রাসূলের পবিত্র মাযার
যিয়ারত করে আসি। ওয়ায়েস করনী জীবনে
পাননি দর্শন তাঁর, অথচ হৃদয় তনু মনে
রাসূলের মহব্বত আপ্লুত ছিল যে অনিবার!
এবং না দেখা সেই রাসূলের পবিত্র মাযার
দেখার অধিক হয়ে থাক এই আত্মায় আমার।

(আত্মার সম্পদ)

www.nagorikpathagar.org

আবদুস সাত্তারের অসাধারণ কৃতিত্ব তাঁর অনুবাদ সাহিত্যে। বিভিন্ন দেশের সাহিত্য সম্পর্কে জানার উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীর নানা ভাষা আয়ত্ত করেন। সেসব ভাষার সাহিত্য পড়ে তা থেকে রসোপলব্ধি করেই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না, সেসব ভাষার উৎকৃষ্ট সাহিত্য তিনি বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য বাংলায় ভাষান্তর করেছেন। ইংরাজি, আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষা থেকে তিনি বহু কবিতা, গল্প ও অন্যান্য বিষয় অনুবাদ করেছেন। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যার দিকে তাকালেই এক্ষেত্রে তাঁর বিপুল কর্মদ্যোগ আমাদেরকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। অনুবাদের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেন। এক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যে তিনি অনেকটা তুলনারহিত অনন্য প্রতিভার অধিকারী।

শিশুতোষ রচনায় আব্দুস সাত্তারের কৃতিত্ব কম নয়। তিনি মোট ষোলটি শিশুতোষ কাব্য ও গ্রন্থ রচনা করেছেন। দেশ-বিদেশের নানা রসালো ও শিক্ষামূলক কাহিনী ও গল্প নিয়ে তিনি ছোটদের উপযোগী সহজ-সরল ভাষায় এসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। ছোটদের উপযোগী জীবনী গ্রন্থ রচনায়ও তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। জীবন-স্মৃতি রচনায়ও আবদুস সাত্তারের পারদর্শিতা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আবদুস সাত্তার ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন অতিশয় সহজ-সরল মানুষ। তাঁর মধ্যে ছিল গভীর রসবোধ। তাঁর সুখ-দুঃখ-সারল্যপূর্ণ দুঃখ-দারিদ্রময় জীবনে তিনি সব কিছু সহজভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর জীবন স্মৃতি রচনায় এবং অন্যান্য রচনার ক্ষেত্রেও এ সহজ-সরল-রসময় জীবনের অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে। আবদুস সাত্তার তাঁর বিপুল সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চির অমর হয়ে থাকবেন। তবে পরিতাপের বিষয়, তাঁর মত এত বড় মাপের একজন কবি-লেখক-গবেষক ও অনুবাদক বাংলা সাহিত্যকে যিনি বিপুল অবদানে সুসমৃদ্ধ করে গেছেন, তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য আবদুস সাত্তার যেসব পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন তার একটি তালিকা নিম্নরূপঃ দাউদ পুরস্কার (১৯৬৬); বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৭৫); আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮০); বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (১৯৮৪); আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার (জাতিসংঘের সৌজন্যে দায়েমী কমপ্লেক্স ঢাকা কর্তক প্রদত্ত, ১৯৮৬); ধর্মীয় পুরস্কার, দায়েমী কমপ্লেক্স, ঢাকা(১৯৮৬); আশরাফ ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ঢাকা (১৯৮৬); টাঙ্গাইল জেলা সমিতি পুরস্কার (১৯৮৬); অরুণী সাহিত্য শিল্পী গোষ্ঠী পদক, টাঙ্গাইল (১৯৬৮); টাঙ্গাইল জেলাবাসী কর্তৃক প্রদত্ত পদক (১৯৭৫); ঢাকা পৌরসভা পদক (১৯৮৮); আলবার্ট আইনস্টাইন একাডেমী ব্রোঞ্জপদক, আমেরিকা (১৯৯০)।

www.nagorikpathagar.org

সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ্ নূরী

"See how far a candle throws its beems
So Shines a good deed in a naughty world"
-William Shakespeare

'প্রদীপের আলো যেমন ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে, সৎকর্মও তেমনি অসৎ পৃথিবীতে জ্বল জ্বল করে'– প্রখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের উপরোক্ত অমর বাণীর সারবত্তা আমরা সর্বদাই অনুভব করে থাকি। এ অন্যায়-অবিচার ও দুষ্কর্মপূর্ণ পৃথিবীতে মহৎ ও কল্যাণব্রতী মানুষের সংখ্যা বেশী নয়, কিন্তু সে ধরনের মানুষ মানব জাতির মুকুটস্বরূপ। বিশিষ্ট সাংবাদিক-সাহিত্যিক সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন তেমনি একজন মহৎপ্রাণ, কল্যাণব্রতী মানুষ। সাংবাদিকতা, সাহিত্য, ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে তাঁর অসামান্য অবদান চিরদিন তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। সাংবাদিক হিসাবে তিনি সমধিক খ্যাতি অর্জন করলেও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান ও মানবকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি একাধারে সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সমসাময়িক সময়ের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত।

সানাউল্লাহ্ নূরী (জন্ম ২৮ মে ১৯২৮-মৃত্যু ১৫ জুন ২০০১) বৃহত্তর নোয়াখালী জেলার রামগতি থানার চর ফলকনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুহম্মদ সালামতউল্লাহ। তিনি অবিভক্ত ভারতের উত্তর প্রদেশের ইসলামী আইন ও আরবী ভাষা-সাহিত্যের উচ্চ বিদ্যাপীঠ রামপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দাওরা' ডিগ্রী লাভ করেন। মওলনা সালামত উল্লাহ ১৯২০-২১ খিলাফত আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংয়ের গারো অঞ্চল ও আসামে দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচারে ব্যাপৃত থাকেন। বাংলা, আরবী, ফারসী,উর্দু, হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। সুশিক্ষিত, বহু ভাষাবিদ ও ধর্মপ্রাণ পিতার আদর্শে গড়ে উঠেছিলেন সানাউল্লাহ নূরী। দাদা আমিন উদ্দীন ছিলেন উকিল এবং নানা মুনশী আব্দুর রহমান ছিলেন সুফী সাধক।

www.nagorikpathagar.org

পাঁচ বছর বয়সে মা ও বাবার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর বিসমিল্লাহখানি। মা ছিলেন শিক্ষয়িত্রী, নিজ বাড়িতেই মক্তব পরিচালনা করতেন। তাঁর মক্তবে গ্রামের অনেক মেয়ে, শিশু ও বয়স্ক মহিলা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা ও আরবি ভাষা শিক্ষাদান ছাড়াও তাঁর মা মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্নের জনপ্রিয় উপন্যাস 'আনোয়ারা', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি এবং বিভিন্ন পুঁথিসাহিত্য পাঠ করতেন। মা-বাবার তত্ত্বাবধানে বাংলা, আরবি ও প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষালাভের পর সানাউল্লাহ নূরী গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে প্রথম শ্রেণীতে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হবার পর ডবল প্রমোশন নিয়ে গঞ্জের অ্যাংলো-অ্যারাবিক মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চতর নিউ স্কীম মাদ্রাসায় সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকা গারো পাহাড়ের সানুদেশে নেত্রকোনা শহরের আঞ্জুমান হাইস্কুলে তাঁকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। এখানে মাতুলালয়ে থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করে ঢাকাতে এসে জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'তমদ্দুন মজলিশের' কাজে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ায় তিনি লেখাপড়া শেষ করতে পারেননি। পরে নিউ মডেল ডিগ্রী কলেজ থেকে তিনি এই-এ ও বি.এ পাশ করেন। ১৯৪৭ সনে জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নকালেই সানাউল্লাহ নূরী সাংবাদিকতা পেশার সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি কখনো একস্থানে স্থির হয়ে থাকেননি। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মজীবন।

১৯৪৭ সনের ডিসেম্বরে সহ-সম্পাদক হিসাবে ঢাকাস্থ অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ইনসান' পত্রিকায় যোগদান করেন। ১৯৪৮ সনে 'ইনসান' বন্ধ হলে কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত দৈনিক আজাদে'র বার্তা বিভাগে যোগদান করেন। একই সাথে তিনি ভাষা আন্দোলনের নির্ভীক মুখপত্র 'সৈনিকে'ও কাজ করেন। ১৯৪৭ সনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খাঁন ভাসানী প্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাকে' যোগ দেন। এরপর তিনি কিছুদিন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ঢাকা থেকে নব পর্যায়ে প্রকাশিত 'দৈনিক মিল্লাতে' যোগ দেন। ১৯৫১ সনে খায়রুল কবীরের সম্পাদনায় 'দৈনিক সংবাদ' প্রকাশিত হলে তিনি সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৩-৫৪তে মাসিক 'মাহে নও', অতঃপর ১৯৫৪-৬০ পর্যন্ত 'মাসিক সওগাতে' কাজ করেন। ১৯৫৫ সনে Silver Bird নামক মার্কিন প্রকাশনা সংস্থার ঢাকা শাখার পাঠ্যপুস্তক বিভাগের খণ্ডকালীন সম্পাদক পদে যোগ দেন। ১৯৫৭-১৯৬৯ পর্যন্ত মার্কিন প্রকাশনা সংস্থা

www.nagorikpathagar.org

Franklin Publication (পরবর্তীতে Franklin Book Programs) এর ঢাকা শাখায় খণ্ডকালীন সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৬৪-১৯৭৯ পর্যন্ত 'দৈনিক পাকিস্তান' (পরবর্তীতে দৈনিক বাংলা) এ সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৭৯-৮৬ পর্যন্ত 'দৈনিক দেশ' এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৭ সনে স্বল্প সময়ের জন্য 'সাপ্তাহিক' মেঘনা'য় কাজ করেন। ১৯৮৭-৯৪ পর্যন্ত 'দৈনিক জনতা'র সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৯৪-৯৭ পর্যন্ত 'দৈনিক দিনকালে' সম্পাদক ছিলেন।

সাংবাদিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী বহু পত্রিকায় সুদীর্ঘ প্রায় অর্ধশত বছর বিভিন্নভাবে কাজ করে সাংবাদিকতার উচ্চমান সৃষ্টির প্রয়াস পান। তিনি ছিলেন, নিরলস, যোগ্য ও নির্ভীক কলম সৈনিক। ১৯৮৮ সনে তিনি পত্রিকা-সম্পাদক ও সংবাদাতা সংস্থাসমূহের প্রধানদের নিয়ে 'বাংলাদেশ কাউন্সিল অব এডিটরস' নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন। ১৯৯১ সনে তিনি এর সভাপতি নির্বাচিত হন।

সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন একজন মানব-দরদী অক্লান্ত সমাজকর্মী । তিনি যেসব সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার স্যাথে জড়িত ছিলেন, তার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ জাতীয় শিশ-কিশোর প্রতিষ্ঠান 'ফুলকুঁড়ি আসরের' কেন্দ্রীয় সভাপতি (ফ্রেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) জাতীয় প্রেসক্লাব ও শিশু একাডেমীর জীবন সদস্য। বাংলাদেশ নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান।

সাংবাদিক-সমাজকর্মী সানাউল্লাহ নূরী পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াকালেই কবিতা লেখ শুরু করেন। অষ্টম শ্রেণীতে পড়াকালে তিনি দু'জন বিখ্যাত ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর 'লুসি গ্রে' ও কীট্স-এর 'ফায়ারিং সং' কবিতার অনুবাদ করেন। স্কুলে অধ্যয়নকালেই তিনি ছোটগল্প, নাটক ও উপন্যাস রচনায় হাত দেন। দশম শ্রেণীতে পড়াকালে তাঁর রচিত উপন্যাস 'আনধার মানিকের রাজকন্যা' পরবর্তীতে ১৯৫২ সনে ঢাকা থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্র 'দ্যুতি'তে ছাপা হয়। পরে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত আকারে এর প্রথম খণ্ড সাপ্তাহিক ' রোববারে' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় এবং 'দিনকাল' পত্রিকায় বার্ষিক সংখ্যায় একত্রে প্রকাশিত হয়। মুহম্মদ সানাউল্লাহ নূরীর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

উপন্যাস ঃ ১. অনধার মানিকের রাজকন্যা, ২. নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান, ৩. রোহিঙ্গা কন্যা, ৪. আফ্রিকানা আমার ভালবাসা, ৫. সোনার হরিণ চাই।

www.nagorikpathagar.org

কাব্যগ্রন্থ ঃ ১. আন্দোলিত জলপাই, ২. নিবেদিত পঙতিমালা, ৩. শান্তির পদাবলী।

শিশুতোষ রচনা ঃ ১. বুদ্ধি শেখার গল্প, ২. মানুষ যাকে ভোলেনি, ৩. চীনা পুতুলের দেশে, ৪. বঙ্গোপসাগরের রূপকথা, ৫. রূপকথা দেশে দেশে, ৬. বোশেখ আসে পাগলা ঘোড়ায়, ৭. মেঘের নৌকায় চাঁদের দেশে।

অনুবাদ ঃ ১. আদিগন্ত, ২. মোহক নদীর বাঁকে, ৩. স্বর্গের এ প্রান্তে, ৪. কর্ণেল গাদ্দাফী-এর গ্রীন বুকের বঙ্গানুবাদ, ৫. ভাষার বিবর্তনে সংবাদপত্রের ভূমিকা, ৬. বিশ্বের প্রথম রিপোর্টার।

বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ ঃ ১. বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা, ২. হি উংচাং যখন এলেন, ৩. নোয়াখালী ভুলায়ার ইতিহাস ও সভ্যতা, ৪. স্বাধীনতা বিপ্লবের মহানায়ক, ৫. উপমহাদেশের শতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ৬. ইউরোপের পুনর্জাগরণে ইসলামের অবদান, ৭. মহানবীর বিশ্বচিন্তা, ৮. মহানবীর রাষ্ট্রদর্শন ও পররাষ্ট্রনীতি। **ভ্রমণ ঃ** ১. পৃথিবীর দেশে দেশে ভ্রমণ, ২. মহা প্রাচীরের কথা, ৩. লোহিত সাগরের দেশে, ৪. আমু দরিয়ার দেশে, ৫. হাজার এক রাতের দেশে, ৬. দারুচিনি দ্বীপের দেশে।

অপ্রকাশিত রচনাবলী ঃ ১. বিশ্ব সাহিত্য জানালা, ২. বাংলার কৃষক বিপ্লব, ৩. ফকির মজনু থেকে তিতুমীর, ৪. স্বাধীনতা সংগ্রাম যুগে যুগে, ৫. শাহজাদী জাহান আরা (উপন্যাস), ৬. সুজা বাদশার সড়ক (উপন্যাস), ৭. প্রত্নপ্রস্তর যুগের বাংলা (ইতিহাস), ৮. বাংলা সাহিত্যের বিবর্তন, ৯. বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ও ভাষার বির্বতন, ১০. আর যুদ্ধ নয় (কাবা), ১১. সাংবাদিকতায় ও কাব্যে নজরুলের বিদ্রোহ, ১২. সাহিত্যের অগ্রচারণেরা ১৩. ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি, ১৪. বিশ্বের সেরা শিশু।

উপরোক্ত গ্রন্থতালিকা অসম্পূর্ণ। তাঁর রচিত বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি এখানো সুবিন্যাস্তভাবে তালিকাভুক্ত ও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া, তিনি যেসব পত্রিকায় চাকরি করেছেন সেসব পত্রিকায় অসংখ্যা সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লিখেছেন যার অধিকাংশই সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ। এগুলোও সংগ্রহ করে গ্রন্থবদ্ধ করতে পারলে কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ হতে পারে। সানাউল্লাহ নূরী কোন গতানুগতিক সাংবাদিক ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রতিবেদন, এমনকি, সাধারণ রিপোর্ট পর্যন্ত সাহিত্য-গুণসম্পন্ন ও মানবিক আবেদনে সিক্ত। তাঁর, ভাষা, বাক্যগঠন, শব্দচয়ন ও রচনাশৈলীর মধ্যে এমন একটা শিল্পমাধুর্য ও আকর্ষণ বিদ্যমান যে তা সকল পাঠককেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ

www.nagorikpathagar.org

করে। তিনি ছিলেন এক উন্নতমানের ভাষা-শিল্পী। তাঁর গদ্য রচনা নানা অলংকার সুষমা, নিপুণ বাণী-বিন্যাস ও বৈভবে পূর্ণ।

ঔপন্যাসিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী একজন বাস্তববাদী বলিষ্ঠ জীবনধর্মী লেখক। তাঁর 'আনধার মানিকের রাজকন্যা', 'নিঝুম দ্বীপের উপাখ্যান', রোহিঙ্গা কন্যা' ইত্যাদি সবগুলো উপন্যাসেই এ বাস্তববাদিতা ও জীবনধর্মীতার পরিচয় সুস্পষ্ট। মাটি ও মানুষের বাস্তব জীবন-চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। উদাহরণত 'রোহিঙ্গা কন্যার' কথা ধরা যাক। এ গ্রন্থের কাহিনী সম্পর্কে লেখক ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন ঃ

"বঙ্গোপসাগরের প্রাচীন জনপদ রোহাং তথা রোসাঙ্গভূমির চারপাশের প্রতিবেশে বিচরণ এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার এবং সংলগ্ন সব কটি চরিত্রের। এরা এই ভূখণ্ডের আদিম, মধ্যযুগীয় এবং সাম্প্রতিক ইতিহাসের ভাঙ্গাগড়ার অন্তরালবর্তী যন্ত্রণা, ক্ষোভ এবং বঞ্চণা, অশ্রু এবং রক্তক্ষরণের সুদীর্ঘ ধারাপ্রবাহের সর্বশেষ মুখচ্ছবি। এরা এই ইতিহাস কখনো অকৃপণ দাক্ষিণ্যে সভ্যতার তুঙ্গে তুলেছে এদের পূর্বগামীদের। আবার কখনো রূঢ় নির্মমতায় ভূলণ্ঠিত, রুধিরাক্ত এবং নীড়ভ্রষ্ট করেছে এদের গোটা বিড়ম্বিত সমাজটাকে। এই সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক জনগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহ্নিশিখা উপাখ্যানের মুখ্য চরিত্র রোহিঙ্গা কন্যা রাশো। সহিংস উৎপীড়নের শিকার এই উচ্চ শিক্ষিতা ইতিহাস-প্রবণ যুবতী ইওমা পর্বতের আদিম সেগুন-কানিয়ারির অরণ্যে পালিয়ে এসে প্রাচীন শিলার বুকে দেখতে পেয়েছে তার পূর্বপুরুষ অস্ট্রিক গুহাচারীদের পায়ের ছাপ। খাদের পরবর্তী ভূমিকেন্দ্রিক কৃষি-সংস্কৃতি এবং নব্য জীবনধারার বিশ্বগামী প্রবাহ থেকে উৎসারিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরীয় সভ্যতা। বাংলা ভাষা এবং রোসাঙ্গ-বাংলার পল্লবায়ন ঘটেছে যাদের বুলি, কথকথা আর বাক্‌ভঙ্গির নির্যাস চেঁখে নিয়ে। এই উপপাখ্যানের মুখ্য উপজীব্য কর্ণফুলি, নাফ আর লেমরু নদী তীরের সাঁতরানো নরনারীর ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনযুদ্ধ। সেখানকার মইষাল আর বাথানিয়াদের সুখ-দুঃখের চালচিত্র এবং এদের পুঁথিপ্রবণ মনের রসবোধ। পুঁথিয়াল হাশমত আলী পণ্ডিতের গল্পে ওরা খুঁজে পায় ওদের রসদ। পুরাতত্ত্ববিদ আহমদ আলী ওদের অতীত এবং বর্তমানের এক উচ্চনাদী কণ্ঠস্বর। যুবক মামুন উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতায় মুখ্য যোগসূত্র। ইতিহাস-গবেষক রফিকের অবস্থান গোটা কাহিনীর কেন্দ্রবিন্দুতে। এই যুবকের সংগ্রামী চৈতন্য এবং তার ভালবাসার একান্ত অনুভূতি রাশেদার নীড়ভ্রষ্ট জীবনযন্ত্রণাকে সুরভিত করেছে অপার এক বিশ্বাসে।"

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে উপন্যাসের মূল কাহিনী অতি সংক্ষেপে গবেষকের অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কাব্যময় ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, নৃতত্ত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে মানুষের জীবনের আশা-অভীপ্সা ও সংগ্রামের চিত্রকে লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এ বইটি পড়তে পড়তে আমেরিকার বিশ্বখ্যাত ঔপন্যাসিক আর্নেস্ট হেমিংওয়েব অমর উপন্যাস Old Man and the Sea এর কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। জীবন-সংগ্রামের এমন বিচিত্রতর বাস্তব জীবনোপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে অতিশয় বিরল। তাঁর অন্যান্য উপনাসেও এ জীবনধর্মিতার ছাপ সুস্পষ্ট। নূরীর ভাষা লালিত্যময়, ঝংকারময়, কাব্যিক সুষমামণ্ডিত। তাঁর বর্ণনা মনোমুগ্ধকর, কাহিনী নির্মাণ ও চরিত্র চিত্রায়ণে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসনীয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে একজন উল্লেখযোগ্য শক্তিমান লেখক।

প্রবন্ধকার হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী সম্ভবত সর্বাধিক সার্থক। তাঁর প্রবন্ধের ভাষাও অত্যন্ত স্বচ্ছন্দ ও ঝর ঝরে। বর্ণনা ও যুক্তির উপস্থাপনার গুণে তাঁর প্রবন্ধও হয়ে উঠেছে চিত্তাকর্ষক। আবেগ ও মননশীলতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে তাঁর প্রবন্ধে। গভীর নিষ্ঠা, অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানগর্ভ গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রবন্ধে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তুও বৈচিত্রময়। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ভাষা, নৃতত্ত্ব, জীবনের নানা বিচিত্র সমস্যা ও প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি লিখেছেন।

সাংবাদিক হিসাবে সানাউল্লাহ নূরী পৃথিবীর ষাটটির অধিক দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক বিভিন্ন গ্রন্থ সে সব দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ভাষা ও মানুষের কথা বাস্তবসম্মত ও চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন। এতে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও জীবনশিল্পী হিসাবে তাঁর এক অনবদ্য পরিচয় ফুটে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের এ শাখায়ও নূরীর অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অজনাকে জানার অদম্য আগ্রহ তাঁকে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিচিত্র মানুষ, জনপদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিয়ে গেছে। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেসব বিচিত্র মানুষ জনপদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীমূলক রচনায়। তাই তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক রচনাবলী শুধুমাত্র সরস সাহিত্য হিসাবেই নয়, একাধারে তা নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান, মননশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার অপরূপ সমন্বয়।

শিশুতোষ রচনায় সানাউল্লাহ্ নূরীর অবদান কম নয়। শিশুতোষ উপযোগী অসংখ্য ছড়া, কবিতা, কাহিনী, গল্প ইত্যাদি রচনা করেছেন তিনি। এগুলোর ভাষা যেমন সহজ, সরল ও শিশু-কিশোরদের উপযোগী, বিষয়বস্তুও তেমনি

www.nagorikpathagar.org

বৈচিত্রময়। তাঁর শিশুতোষ রচনার সংখ্যাও কম নয়। তাঁর শিশুতোষমূলক রচনার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি তাঁর কথার বুনন এভাবে সাজিয়েছেন যেন কচি-কিশোর পাঠকদের সাথে তিনি আলপচারিতায় মগ্ন হয়েছেন। শিশু মনস্তত্ব অনুধাবন, শিশু-মনের নানা কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানে নূরী অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। শিশু-কিশোর মনোরঞ্জনে তাই স্যানউল্লাহ নূরীর কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

কবি হিসাবে বিশেষ খ্যাতি অর্জিত না হলেও সানাউল্লাহ নূরী শিশু-কিশোর ও বড়দের উপযোগী বেশ কিছুসংখ্যক কাব্য রচনা করেছেন। সাংবাদিক-সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর সমধিক খ্যাতির কারণে কবি হিসাবে তাঁর পরিচিতি হয়ত অতটা ব্যাপকতা লাভ করেনি। তাছাড়া, তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'আন্দোলিত জলপাই' প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে। মানব-শ্রেষ্ঠ হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে তাঁর 'আন্দোলিত জলপাই' এক অনুপম কাব্যগন্থ। তাঁর হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অনাবিল প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যে। তাঁর ইতিহাস-চেতনা ও অধ্যাত্মবোধের এক অসাধারণ প্রকাশও পরিলক্ষিত হয় এ কাব্যে। এখানে 'আন্দোলিত জলপাই' থেকে কয়েকটি লাইন উদ্বৃত করছি। এখানে রাসূল (স) এর মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা কবি তাঁর অনুপম ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"উদ্বেলিত শিহরিত আজ তাঁর
অতলান্ত বিশাল হৃদয়
সদয় চক্ষুতে তাঁর আন্দোলিত
এক-আকাশ স্নিগ্ধশ্যাম
জলপাই শাখা।
কণ্ঠে তাঁর উচ্চারিত সৌভ্রাত্রের
উদ্ভাসিত পঙতিমালা
ওষ্ঠপুটে তাঁর জাগমান
লোহিত সাগর তটের
নিদ্রামগ্ন পুষ্পদল কলি।
শুনে তাঁর পদধ্বনি
কণ্ঠে তাঁর সাম্যগান শুনি
উড়ে এল যেন মুহূর্তেই
এক ঝাঁক শুভ্র ডানা কবুতর
সুউচ্চ সিনাইয়ের চবুতর হতে।

www.nagorikpathagar.org

... ...
বললেন তিনি অশ্রুসিক্ত চোখে;
শোনো বন্ধুরা নগরের
শোনো আমন্ত্রণ নিকট বন্দরের
আজ ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা-
দায়মুক্ত আজ তারা
ছিল যারা বাঁধা একদিন
সন্ত্রাস আর বিভ্রান্তির জটলাজালে।
আজ বিজয় নয়
ঘৃণা নয়, প্রতিশোধ নয় কোনো
আজ নির্বাধ স্বাধীনতা সব মানুষের
স্বাধীনতা সব নারী পুরুষের
দাস এবং ক্রীতদাসদের ।
বাহু প্রসারিত আজ বন্ধুত্বের
মিত্রতার এবং সুমধুর মিলনের।
ঘরে ঘরে তোমাদের উচ্চারিত
হোক আজ
কেবল শান্তির অনির্বাণ বাণী।

'আন্দোলিত জলপাই' সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি-সমালোচক আব্দুল মান্নান সৈয়দ বলেন ঃ "সানাউল্লাহ নূরী ছিলেন মূলত গদ্যলেখক। সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের জোড় কলম নিয়ে জন্মেছিলেন তিনি- কিন্তু জীবনের উপান্তে এসে তিনি যে এ রকম কবিতা লিখে ফেলবেন- এতো অভাবিত। এমন কিছু আত্মিক উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি, যার জন্য ইসলামের মহানবী (স) সম্পর্কে এ রকম একটি অভূতপূর্ব বই লিখে ফেললেন। আবার এক হিসাবে আশ্চর্যেরও নয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী আমাদের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হাসান হাফিজুর রহমান একবার মৌখিক আলাপে সানাউল্লাহ নূরীর গদ্যের ভাষাকে বলেছিলেন, 'পুষ্পিত ভাষা'। এ পুষ্পিত ভাষার অধিকারী যিনি তাঁর পক্ষে 'আন্দোলিত জলপাই'-এর মত কবিতা গ্রন্থ রচনা সম্ভবপর, খুবই সম্ভবপর। শুধুমাত্র এই গ্রন্থের সাক্ষ্যেই বলা যায় ; সানাউল্লাহ নূরী অনেক যশস্বী তথাকথিত কবির চেয়ে বেশি কবি। জীবনের অন্ত বেলায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটি সম্পর্কে তিনি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলী পেশ করে

www.nagorikpathagar.org

গেলেন।" **(আব্দুল মান্নান সৈয়দ ঃ ঐতিহ্যসচেতন আধুনিক, দৈনিক ইনকিলাব, ২২ জুন, ২০০১)।**

সানাউল্লাহ নূরীর গ্রন্থ-তালিকা থেকে সুস্পষ্ট যে, তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান রয়েছে। উন্যাস, গল্প, কাব্য, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, শিশুতোষ রচনা, রূপকথা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বৈশিষ্টপূর্ণ অবদান বাংলা সাহিত্যে তাঁকে বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছে। সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিশু-সাহিত্যিক, গবেষক, সমাজকর্মী, সংগঠক ইত্যাদি নানামুখী গুণাবলীর অধিকারী অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী সানাউল্লাহ নূরী চূড়ান্ত বিচারে শেষ পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য-কর্মের জন্যই চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে আমার ধারণা। তিনি আমাদের সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-জগতের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-একথা নিসন্দেহে বলা যায়।

www.nagorikpathagar.org

কথাসাহিত্যিক রাজিয়া মজিদ

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একজন প্রথিতযশা প্রতিভাধর শিল্পী রাজিয়া মজিদের জন্ম ১ জানুয়ারী ১৯৩০ সনে জামালপুর জেলার শ্যামপুর গ্রামে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস টাঙ্গাইলে। তাঁর পিতা আব্দুস সবুর সিদ্দিকী ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, ফারসি সাহিত্যের অধ্যাপক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি। মাতার নাম কামরুন নেসা। রাজিয়া মজিদের চার ভাই ও পাঁচ বোন। তাঁরা সকলেই উচ্চ শিক্ষিত। তাঁর শৈশব কেটেছে গ্রামের স্নিগ্ধ সবুজ-শ্যামল পরিবেশে। শৈশবের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন–"ছেলেবেলার স্মৃতি যেন মরুভূমিতে মরুদ্যান। জীবনের সংগ্রামের মাঝে সেই মরুদ্যান ঝিরি ঝিরি বারি সিঞ্চন করে। স্নিগ্ধ বাতাসের দোলা দেয়। কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনের তিক্ততা ভুলিয়ে মনকে ভরে দেয় অতুলনীয় রূপ রস ও গন্ধে।"

রাজিয়া মজিদ শৈশবে তাঁর নানার বাড়িতে বড় খালা আতরন নেছার কাছে আরবি শিক্ষার তালিম নেন। পরে বাবার কর্মস্থল ফরিদপুরে এক মক্তবে ভর্তি হন। এখানে তিনি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অসাধারণ মেধার অধিকারী রাজিয়া মজিদ ১৯৪০ সনে ফরিদপুরের হালিমা জুনিয়র মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে 'জুনিয়র মাদ্রাসা' পাশ করেন। অবিভক্ত বাংলার সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তিনি মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে সরকারী বৃত্তি ও স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি ১৯৪৪ সনে ফরিদপুর ঈশান ইনস্টিটিউট থেকে লেটার মার্কসহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাঙ্গুয়েজে মেরিট স্থান অধিকার ও মারহাবা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

www.nagorikpathagar.org

১৯৪৬ সনে তিনি কলকাতা লেডি ব্রাবোর্ন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এ এবং ১৯৪৮ সনে বিএ পাশ করেন। বি এ ডিগ্রি লাভের পর তিনি ফরিদপুরের সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় যোগদান করেন। শিক্ষকতা করা কালে ১৯৫০-৫১ সনে তিনি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে ১ম শ্রেণীতে বি টি ডিগ্রী লাভ করেন।

পেশাগতভাবে রাজিয়া মজিদ আজীবন একজন কৃতি শিক্ষিকা হিসাবে পরম নিষ্ঠার সাথে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুলনার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী মরহুম এস এম আহমেদ মজিদের সহধর্মিনী ও এক কন্যা সন্তানের জননী। বিয়ের মাত্র দশ বছর পর স্বামী ইন্তেকাল করেন এবং তাঁর একমাত্র কন্যা বর্তমানে আমেরিকার স্থায়ী অধিবাসী।

কর্মজীবনে রাজিয়া মজিদ বাংলা ভাষা বিশেষজ্ঞ হিসাবে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের অধীনে পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রিয় রাজধানি করাচিতে চাকরী করেন (১৯৫১-৫৪)। অতঃপর ফরিদপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষিকা (১৯৫৫-৬১), পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীনে খুলনা বিভাগীয় সহকারী স্কুল পরিদর্শক (১৯৬২-৬৭), খুলনা সরকারী গার্লস উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা (১৯৬৭-৭০), ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা (১৯৭০-৭৬), কামরুন নাহার সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, ধানমণ্ডি, ঢাকা-এর প্রধান শিক্ষিকা (১৯৭৬-৮২), শেরে বাংলা নগর সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা (১৯৮২-৮৬) হিসাবে দীর্ঘ ৩৫ বছর শিক্ষকতার মহৎ পেশায় নিয়োজিত থেকে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া, ১৯৬৩ সনে তিনি খুলনা গার্লস গাইড-এর বিভাগীয় কমিশনার হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন কর্মদ্যোগী, সমাজ-হিতৌষী, সেবাব্রতী মহিলা। শিক্ষকতা করার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যসেবায়ও গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এক সময় তাঁর লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত ছাপা হতো এবং একজন জনপ্রিয় লেখিকা হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন।

রাজিয়া মজিদের বাবা আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় দক্ষ ছিলেন। এ সব ভাষার সাহিত্য তিনি অধ্যয়ন করেছেন। শৈশবে বাবার কাছে তিনি ফারসি সাহিত্যের বিভিন্ন গল্প-কাহিনী শুনে এগুলোর প্রতি তাঁর মনে গভীর আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। ফারসি সাহিত্যের 'গুলে বাকাওলী', 'সাইফুল মুলক বদিউজ্জামাল',

www.nagorikpathagar.org

'সোনাভান', 'হাতেম তায়ী' ইত্যাদি বিখ্যাত কাহিনী কাব্য শুনে তাঁর মধ্যেও গল্প লেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এভাবে, সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা তিনি প্রধানত শৈশবে তাঁর পিতার নিকট থেকেই লাভ করেন।

১৯৪০ সনে মাত্র দশ বছর বয়সে রাজিয়া মজিদের সাহিত্য প্রতিভার উন্মেষ ঘটে। ঐ সময় অধুনালুপ্ত 'দৈনিক আজদ' পত্রিকার 'মুকুলের মাহফিলে' তাঁর প্রথম গল্প ছাপা হয়। ১৯৪৪ সনে ম্যাট্রিক পাসের পর রাজিয়া মজিদ কলকাতা গিয়ে লেডি ব্রাবোর্ন কলেজে ভর্তি হন। ঐ সময় কলকাতার পরিবেশে সাহিত্য চর্চার ব্যাপক সুযোগ লাভ করেন। ১৯৪৬ সন থেকে কলকাতার 'ইত্তেহাদ' পত্রিকার 'আগুনের ফুল্‌কি' ও পরে বড়দের পাতায় এবং 'বেগম' পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ সনে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এসে বসবাস শুরু করেন এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাক', 'ইত্তেহাদ', 'দৈনিক পাকিস্তান','পাকিস্তানী খবর', 'মাহে নও' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় লেখা শুরু করেন। পরবর্তীতে 'সাপ্তাহিক রোববার', 'সচিত্র বাংলাদেশ', 'চিত্রালী', 'নবারুণ', 'দৈনিক ইনকিলাব', 'দৈনিক দিনকাল', 'যুগান্তর' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়। এছাড়া, রেডিও-টিভিতে তাঁর কয়েকটি নাটিকা এবং 'পেনশন' ছায়াছবির কাহিনীকার হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

রাজিয়া মজিদের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় চল্লিশটি। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণ কাহিনী, আলেখ্য, জীবনী ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি তালিকা নিম্নরূপ-

উপন্যাসঃ তমসা বলয় (১৯৬৬), দিগন্তের স্বপ্ন (১৯৬৭), আঁধারে প্রদীপ জ্বলে (১৯৭২), আকাশে অনেক রং (১৯৭৯), নক্ষত্রের পতন (১৯৮২), সেই তুমি (১৯৮৪), অশঙ্কিনী সুদর্শনা (১৯৮৪), দিনের আলো রাতের আঁধার (১৯৮৪), মেঘে জল তরঙ্গ (১৯৮৫), এই মাটি এই প্রেম (১৯৮৫), সোনার মেয়ে রূপবতী (১৯৮৬), দাঁড়িয়ে আছি একা (১৯৮৭), অরণ্যে জনতা (১৯৮৭), শতাব্দীর সূর্যশিখা, প্রথম খণ্ড (১৯৮৭), শতাব্দীর সূর্যশিখা, দ্বিতীয় খণ্ড, (১৯৯৪), সুন্দরতম (১৯৮৮), জ্যোৎসনার শুন্য মাঠ (১৯৮৯), যুদ্ধ ও ভালবাসা (১৯৯৩), অন্তরলোকে জ্বলে জোনাকী (১৯৯৪), বৃষ্টি ভেজা মুখ (১৯৯৪)।

ছোটগল্পঃ ভালবাসার সেই মেয়েটি (১৯৮৫), যুদ্ধ ও ভালবাসা (১৯৯৬), রাজিয়া মজিদের গল্প সংগ্রহ (২০০২), দোলা (২০০৩), পালক (২০০৭), ফুলে ফুলে সৌরভ (২০০৯)।

www.nagorikpathagar.org

ভ্রমণ কাহিনীঃ মক্কা মদীনা ঘুরে এলাম (১৯৮৪), করাচীর চিঠি ১ম সংস্করণ, ২য় সংস্করণ, ৩য় সংস্করণ (১৯৮৬), রাজিয়া মজিদের গল্প সংগ্রহ (১৯৮৮)।

আলেখ্যঃ রাজিয়া মজিদের সেরা গল্প (২০০০)।

জীবনীঃ এক মহান কর্মবীর (১৯৮০), মহা নবীর মহাগুণ (১৯৮২), (১৯৮৫), ময়েজ মঞ্জিলের সোনার ছেলে (১৯৮৭), ইতিহাস কথা বলে (১৯৮৯)।

শিশুতোষ গল্পঃ কাঠুরিয়ার মেয়ে (২০১১), ছোট গল্প সংগ্রহ, শিশুদের গল্প।

রাজিয়া মজিদের প্রখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'ভালবাসার সেই মেয়েটি' ২০০৮ সনে ইংরাজি ভাষায় 'The Girl in Love' নামে অনূদিত হয়। এটি অনুবাদ করেন খ্যাতনামা লেখক ও সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিন। এছাড়াও রাজিয়া মজিদের লেখা বেশ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রয়েছে।

উপরের গ্রন্থ-তালিকা থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, কথাসাহিত্যিক রাজিয়া মজিদের ব্যাপ্তি শুধুমাত্র উপন্যাস ও ছোটগল্পকে ঘিরে নয়। তিনি ইতিহাস, সমাজ ও সাধারণ নর-নারীর প্রেম ও জীবন-বৈচিত্র্য নিয়ে একাধারে উপন্যাস, ছোটগল্প, জীবনী, আলেখ্য ও ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় কাজ করেছেন। মহৎ ব্যক্তিদের জীবন কাহিনী লেখার সাথে সাথে ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা ও লব্ধ জ্ঞানের বিষয় নিয়ে তিনি নানা ধরনের গল্প-উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। শিশু-কিশোরদের উপযোগী তাঁর লেখার সংখ্যাও কম নয়। তাই বলা যায়, তাঁর রচনার পরিমাণ যেমন ব্যাপক, তেমনি তাঁর সাহিত্যের বিষয়-বৈভব ও আঙ্গিকও তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাছাড়া, তাঁর লেখার মধ্যে বাস্তব জীবন-চিত্র ও অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটেছে সর্বত্র। সে কারণে তিনি সকল শ্রেণীর পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি ও তাদের রস-পিপাসা নিবৃত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

রাজিয়া মজিদের প্রথম সাড়া জাগানো লেখা 'করাচির চিঠি'। ধারাবাহিকভাবে এটি সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ১৯৫১ সনে তিনি চাকরী সূত্রে করাচি গিয়েছিলেন। সেখানকার পরিবেশ অভিজ্ঞতা ও জীবন-বৈচিত্রের নানা দিক ফুটে ওঠেছে এ গ্রন্থে। এ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য– "নতুন, কিছু দেখবো, নতুন কিছু শিখবো এই উত্তেজনায় আমার মন ভরা। করাচির সব কিছুই নতুন লেগেছে চোখে। মানুষের তৈরি সম্পদ, প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্যে এবং দেশের মানুষের হাবভাব সবকিছুর বৈচিত্র্যের ডালি সাজিয়ে দিলো আমার চোখের সামনে। ঘুরে বেড়াই করাচির এখানে ওখানে।

www.nagorikpathagar.org

কতো কিছু দেখি ও শুনি। সেগুলো আবার রাতে নোট বইয়ে টুকে রাখি। একদিন ওগুলো সাজিয়ে লিখতে বসলাম! ওমা! একি! বাংলা ভাষা আর মনে আসে না। কিছুতেই আর লিখতে পারলাম না। চোখে পানি। এটাও একটা কারণ যে আমি করাচি ছেড়ে চলে আসি। আমি বাংলা ভাষায় ওখানে বসে কিছু লিখতে পারতাম না।"

এ বইটি সম্পর্কে জনৈক সমালোচকের মন্তব্য– 'It is an apple of gold in a network of silver'। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে প্রখ্যাত বিজ্ঞান-লেখক ডক্টর আব্দুলাহ আল মুতী শরফুদ্দিন বলেন– "সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে রম্য রচনা ও ভ্রমণ কাহিনীর উল্লেখ্যযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে। পাঠক মহলে সৈয়দ মুজতবা আলী, যাযাবর প্রমুখ লেখকের বইগুলোর বহুল সমাদর তার প্রমাণ। করাচির চিঠিও ওই জাতীয় একটি বই। লেখিকার রচনানৈপুণ্যে এক একটি অধ্যায় যেনো ছোটো গল্পের স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বলাবাহুল্য রাজনৈতিক মূল্য ছাড়াও শুধু সাহিত্যিক মূল্যেই বইটি বহুল সমাদর লাভ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।"

করাচির চিঠি সম্পর্কে প্রখ্যাত নাট্যকার নুরুল মোমেন বলেন– "করাচির চিঠি পড়ে দেখলাম, লেখিকার লেখার শক্তি ভালো, প্রকাশের শক্তিও জোরালো বইখানাতে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে করাচিকে অবতারণা করে যে প্রাথমিক সুবিধেটা লেখিকা করেছেন তাকে সমৃদ্ধ করেছে লেখিকার বলার ভঙ্গি--তাঁর করাচির অবস্থিতি তার পক্ষে ক্ষণেক হলেও সাহিত্যের পক্ষে স্থায়ি হয়ে থাকবে বহুদিন।"

রাজিয়া মজিদের রোমান্টিক উপন্যাস 'তমসা বলয়' প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনে এতে বিভিন্ন চরিত্র চিত্রনে তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এর প্রতিটি চরিত্র আত্মবিশ্লেষণ ও গভীর মননশীলতার প্রতীক। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিগন্তের স্বপ্ন' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সনে। এতে তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহিনী বিন্যাসে তাঁর দক্ষতাও লক্ষ্য করা যায়। তাঁর রচিত 'নক্ষত্রের পতন' (১৯৮২) উপন্যাসের বিষয়-বস্তু, আঙ্গিক ও চরিত্র চিত্রনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সমাজ-বাস্তবতার পরিচয় বিধৃত। সমাজের সনাতন মূল্যবোধ কীভাবে ক্ষয়িত হচ্ছে এগ্রন্থে তিনি তা তুলে ধরেছেন। সমাজ-সচেতনতা ও দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি ঘটেছে এ গ্রন্থে। 'সেই তুমি' (১৯৮৪) উপন্যাসটিতে রাজিয়া মজিদ আধুনিক যুগে মধ্যবিত্ত সমাজের হতাশা, দুঃখ-দারিদ্র-বঞ্চনা ও নানা আশাভঙ্গের মর্মন্তদ কাহিনী নিপুণ শিল্প-কুশলতার সাথে বর্ণনা করেছেন। 'অশঙ্কিনী সুদর্শনা'(১৯৮৪) উপন্যাসটিতেও সমাজের ক্রান্তিকালের অবস্থা বাস্তবতার

www.nagorikpathagar.org

নিরিখে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত অবহেলিত নারী জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার মর্মন্তদ কাহিনী এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। 'দিনের আলো রাতের আঁধার' (১৯৮৪) মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি উপন্যাস। এ গ্রন্থে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ তরুণদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন দেশে স্বপ্নভঙ্গের দুঃসহ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। 'মেঘে জলতরঙ্গ' (১৯৮৫) উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে একটি এতিমখানাকে কেন্দ্র করে। এতিমখানায় যে অসহায় শিশুরা মানুষের দয়ার উপরে নির্ভর করে কোন রকমে বেড়ে উঠছে, তিনি এগ্রন্থে তার বর্ণনা দিয়েছেন। লেখিকা 'মানুষের মতো বাঁচতে চাই' এ শ্লোগানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পেয়েছেন। 'এই মাটি এই প্রেম' (১৯৮৫) উপন্যাসটিতে লেখিকা গ্রামের সাধারণ মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণীর মানুষ যেখানে রাজনীতির পাশা খেলায় মত্ত, তিনি তাদের সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। দু'খণ্ডে প্রণীত 'শতাব্দীর সূর্যশিখা' ফরায়েজী আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রথম খণ্ড ফরায়েজী আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা হাজী শরীয়তুল্লাহ্, যিনি ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, মুসলিম নবজাগরণ ও মুসলিম সমাজ সংস্কারে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছিলেন, তাঁর জীবন-ভিত্তিক একটি উপন্যাস। দ্বিতীয় খণ্ডটি হাজী শরীয়তুল্লাহর যোগ্য উত্তরসূরী (পুত্র) পীর মুহসীনউদ্দীন দুদু মিয়ার সংগ্রামময় জীবনের কাহিনী অবলম্বনে রচিত উপন্যাস। এ দু'টি উপন্যাসই ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং এ পর্যন্ত প্রতিটি খণ্ডের দু'টি করে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও তা থেকে জাগরণের উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রণীত এ ঐতিহাসিক উপন্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম। 'বৃষ্টি ভেজা মুখ' (১৯৯৪) একটি প্রেম কাহিনীমূলক উপন্যাস। 'যুদ্ধ ও ভালবাসা' (১৯৯৩) একটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রেমের উপন্যাস। 'সুন্দরতম' (১৯৮৮) মাত্র তিনটি চরিত্রের স্বগতোক্তির মাধ্যমে রচিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী ছোট উপন্যাস। উপন্যাসের চরিত্র, কাহিনী বর্ণনায় লেখিকার নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজিয়া মজিদের 'গল্প সমগ্র' একশ চারটি গল্পের সংকলন। এ গ্রন্থ প্রকাশের পর ২০০২ সনে 'দোলা' নামে তাঁর আরো একটি ছোটগল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে রাজিয়া মজিদের অবদান সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। ছোটগল্প রচনায় তাঁর দক্ষতা ও নৈপুণ্যও অসাধারণ। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে তাঁর অবদান তাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজিয়া মজিদ বাংলা কথাসাহিত্যে যখন আবির্ভূত হন, তখন বলা যায় উপমহাদেশে এক বিশেষ ক্রান্তিকাল চলছে। রাজনৈতিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নানা টানাপড়েনের মধ্যে তখন জনজীবনে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে রাজিয়া মজিদের আবির্ভাবের সময় কালটি অর্থাৎ বিগত

www.nagorikpathagar.org

শতাব্দির চল্লিশের দশক নানা কারণে উপমহাদেশের একটি বিশেষ ক্রান্তিকাল। এসময় বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে যেমন নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি উপমহাদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃশ্যপটেও ঐতিহাসিক বির্বতনের ধারা সূচিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫) চলাকালে রাজিয়া মজিদের সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব। যুদ্ধজনিত উদ্বেগ, হতাশা, দুর্ভিক্ষ এবং দুর্ভিক্ষের কারণে লক্ষ লক্ষ নিরন্ন মানুষের করুণ মৃত্যু, বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র তথা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, তৎকালীন পাকিস্তানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে নানা বিক্ষোভ-অসন্তোষ, গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ ইত্যাদি নানা সংগ্রাম-সংঘর্ষ-উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অনিশ্চিত পরিবেশে রাজিয়া মজিদের অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তাঁর সাহিত্য চর্চা বিশেষভাবে গতি লাভ করে ও বিশেষ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর সাহিত্য চর্চা আরো ব্যাপকতা ও পূর্ণতা লাভ করে। বর্তমানে তিনি পরিণত বয়সে নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ায় স্বাভাবিক সৃজনশীলতার বিকাশে অনেকটাই অক্ষম। তবু মন্থর গতিতে হলেও এখনও তাঁর সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রয়েছে।

যে কাল ও সময়ের উপকূলে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর সাহিত্য চর্চা চালাবার প্রয়াস পেয়েছেন, সে সময়কার নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও বিবর্তনের ধারা-চিত্র তাঁর সাহিত্যে বহুলাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সমকালের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিবর্তন এ ভূ-খণ্ডের জনমণ্ডলীকে যেমন নানাভাবে প্রভাবিত করেছে, রাজিয়া মজিদের জীবন-অভিজ্ঞতায়ও তা গভীরভাবে দাগ কেটেছে। এসময়ে ভূ-রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজিয়া মজিদের সাহিত্যিক জীবন বিকশিত ও পল্লবিত হয়েছে। ফলে তাঁর সাহিত্যে তাঁর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা-উপলব্ধি বিশেষভাবে রূপায়িত হয়েছে। এটাই স্বাভাবিক; কারণ সাহিত্য জীবনের দর্পণ। সাহিত্য যখন যথার্থ বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে শিল্পসম্মত অভিব্যক্তি লাভ করে, কেবল তখনই তা পাঠককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করতে ও রস-পিপাসা মিটাতে সক্ষম হয়। সাহিত্যের সাফল্য মূলত এখানেই। রাজিয়া মজিদের সমগ্র সাহিত্য-কর্ম তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা, লব্ধজ্ঞান, বাস্তববোধ ও উপলব্ধির রসে জারিত। তাঁর এ চৈতন্যগত দিক এবং সাহিত্যে তা প্রতিফলিত হওয়া সম্পর্কে জনৈক সমালোচক বলেনঃ “রাজিয়া মজিদ পঞ্চাশের দশকে কিশোর সাহিত্য জগৎ থেকে বড়দের

www.nagorikpathagar.org

সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। সেই থেকে চার যুগেরও (বর্তমানে পাঁচ যুগ) বেশি সময় ধরে তিনি নীরবে নিরবচ্ছিন্নভাবে লিখে চলেছেন। তাঁর অবিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিশাল, গভীর এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন। আদর্শ, সত্যনিষ্ঠা এবং বিবেকবোধের শৈল্পিক উপলব্ধিতে রাজিয়া মজিদ সংগ্রামী এবং আপোষহীন। উপন্যাস এবং ছোটগল্প উভয় রচনার ক্ষেত্রেই তিনি সমান দক্ষ, মননশীল এবং মানবিকবোধে বিস্ময়করভাবে সমৃদ্ধ। তাঁর গল্পের ঘটনাগুলো যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি মর্মস্পর্শী এবং অন্তঃনিসৃত আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত।"

রাজিয়া মজিদ বাংলা কথাসাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী। তাঁর সাহিত্যে ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক ব্যবস্থা, মানুষের সুখ-দুঃখ-ভালবাসার কাহিনী, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, দেশ-বিদেশের নানা বিষয় এবং সর্বোপরি ইতিহাস-ঐতিহ্যের উদ্দীপনাময় চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই বিষয়-বৈচিত্র্যে, শিল্প-নৈপুণ্যে ও জীবন-বাস্তবতা রূপায়ণে তাঁর দক্ষতা বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ছয় দশকের অধিক কাল ধরে তিনি নিরলসভাবে সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। বিশেষত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম নারীদের অবদান যেখানে অতিশয় নগণ্য, সেখানে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর বিশাল অবদান অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং আমাদের সাহিত্যের ভাণ্ডারকে তা নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর এ বিপুল অবদানের যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া এখন সময়ের অপরিহার্য দাবি।

বাংলা কথাসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য রাজিয়া মজিদ এ যাবৎ 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' (১৯৭৮), 'বাংলাদেশ লেখিকা সংঘের স্বর্ণপদক' (১৯৮৪), 'একুশে পদক' (১৯৮৯), 'কবি জসীমউদদীন স্বর্ণপদক' (২০০৬) ইত্যাদি পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তিনি রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবন লাভ করে আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলুন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট কবি ও গদ্য লেখক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র জন্ম ১৯৩৩ সনের ১ জানুয়ারী {সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাঁর জন্ম ১৯৩৬ সনে বলে উল্লেখ করা হলেও তিনি নিজে আমাকে তাঁর প্রকৃত জন্ম সন জানিয়েছেন।} বর্তমান ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত নাওঘাট গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মরহুম আব্দুল আওয়াল এবং মাতা মরহুমা লুসিয়া খাতুন। তিনি ১৯৫৫ সনে ঢাকা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করেন। এম.এ. প্রথম পর্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারী চাকুরীতে যোগদান করার ফলে তিনি এম.এ. ফাইনাল পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

১৯৫৬ সনে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের বাংলা মুখপত্র সাহিত্য-সাময়িকী 'মাহে নও'-এর সহ-সম্পাদক হিসাবে চাকুরী নেন এবং ১৯৬১ সন পর্যন্ত উক্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি মাসিক 'পুবালী' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'পুবালী' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে নাম ছাপা হতো এর মালিক-স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ নূরুল ইসলামের। কিন্তু এর সম্পাদনার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করতেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌। তাঁর যোগ্য সম্পাদনায় ঐ সময় 'পুবালী' একটি উন্নতমানের সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৪ সনে তিনি 'দৈনিক পাকিস্তান' -এর (পরবর্তীতে 'দৈনিক বাংলা') ফিচার-এডিটর হিসাবে যোগদান করেন এবং অধুনালুপ্ত 'দৈনিক বাংলা'র সিনিয়র সহকারী সম্পাদক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি 'নজরুল ইনিস্টিটিউট' এর প্রতিষ্ঠাকালীন নির্বাহী পরিচালক হিসাবে ১৯৮৫-১৯৯৫ পর্যন্ত চুক্তির ভিত্তিতে নয় বছর বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। 'নজরুল একাডেমী'র প্রতিষ্ঠার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সব্যসাচী লেখক হিসাবে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবি হিসাবে তাঁর প্রথম আর্বিভাব এবং বিশেষ পরিচিতি ঘটলেও পরবর্তীতে কাব্য রচনার পাশাপাশি আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণামূলক লেখায় নিজেকে তিনি এত নিমগ্ন রাখেন যে, এক সময় তাঁর সাহিত্যিক পরিচিতি ব্যাপকতা পায়।

তবে কাব্য-চর্চায় তিনি কখনো বিরতি দেননি। বরং উভয় ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রেখে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। কখনো পেশাগত কারণে, কখনো সামাজিক দায়িত্ববোধের তাগিদে আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণামূলক দিকটাকে বেশি প্রাধ্যান্য দিয়ে থাকলেও কাব্য-চর্চাকে তিনি কখনো উপেক্ষা করেননি।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র সমগ্র সাহিত্য-কর্ম বিবেচনায় রেখে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, তিনি মূলত ও প্রধানত কবি। এ কথার দ্বারা সাহিত্যিক মাহ্ফুজউল্লাহ্কে কোনক্রমেই খাটো করা হয় না। বরং এ কথা বলার তাৎপর্য এই যে, একজন বড় মাপের সাহিত্যিক হওয়া সত্ত্বেও মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ মূলত কবি এবং তাঁর সমকালের একজন বহুল আলোচিত উল্লেখযোগ্য কবি-প্রতিভা। এটা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতারও স্বাক্ষর বহন করে।

কবিরা যখন গদ্যের আশ্রয় নেন, তখন গদ্য হয়ে ওঠে প্রসাদ-গুণসম্পন্ন, লালিত্যময়, নিপুণ শব্দ-বিন্যাসে ও কাব্য-সৌন্দর্যে মহিমাময়। মাহ্ফুজউল্লাহ্র ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাঁর কবিতা যেমন আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ও নিটোল ভাবৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ, তাঁর গদ্যও তেমনি সহজ-সাবলীল, লালিত্যময় প্রকাশভঙ্গী ও চিন্তা-চেতনা-মননশীলতায় সুস্মিত। কবিতার আবেদন মনে, মননশীল রচনার আবেদন মস্তিষ্কে। মানুষের মনে আবেগের প্রাবল্য আর মস্তিষ্কে বুদ্ধি, যুক্তি ও মননশীলতার প্রাধান্য। আবেগের সাথে মননের যখন সমন্বয় ঘটে তখন তা মন ও মস্তিষ্ক উভয় ক্ষেত্রেই সাড়া জাগায় এবং তার গ্রহণযোগ্যতাও হয় সমধিক। মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র কবিতায় আবেগের সাথে যেমন মননশীলতার সংযোগ ঘটেছে, তাঁর গদ্য রচনায় তেমনি মননশীলতার সাথে আবেগের খানিকটা আশ্লেষ জড়িত হয়ে তাঁর গদ্যের ভাষাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে এবং তাঁর রচনার বিষয়কে করেছে উপভোগ্য ও রসোত্তীর্ণ।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র প্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা নিচে প্রদত্ত হলো ঃ

www.nagorikpathagar.org

কাব্য ঃ ১. জুলেখার মন (১৯৫৯), ২. অন্ধকারে একা (১৯৬৬), ৩. রক্তিম হৃদয় (১৯৭০), ৪. আপন ভুবনে (১৯৭৫), ৫. মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাব্য-সম্ভার (১৯৮২), ৬. বৈরিতার হাতে বন্দী (১৯৯০), ৭. সময়ের বিমর্ষ দর্পণে (২০০৬), ৮. কবিতা সংগ্রহ–মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ (২০০১)। এছাড়া, কয়েকটি সুদীর্ঘ ও সংলাপধর্মী কবিতাসহ তাঁর অগ্রন্থিত কবিতার সংখ্যা প্রায় পাঁচশো।

প্রবন্ধ ঃ ১.নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা (প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৬৩। ইতঃমধ্যে গ্রন্থটির তিনটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।), ২. সমকালীন সাহিত্যের ধারা (প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫), ৩. সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা (প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র, ১৩৭৪), ৪. মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ (প্রথম প্রকাশ ঃ পৌষ, ১৩৭৪), ৫. নজরুল-কাব্যের শিল্পরূপ (প্রথম পকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০), ৬. সাহিত্য ও সাহিত্যিক (প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৭৮) ৭. বুদ্ধির মুক্তি ও রেনেসাঁ আন্দোলন (প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই, ১৯৮০, ইতঃমধ্যে গ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে), ৮. বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য (প্রথম প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২ ইতঃমধ্যে গ্রন্থটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে), ৯. কবিতা ও প্রসঙ্গ কথা (প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬) ১০. সাহিত্যের রূপকার (প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৮১), ১১. বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি, ১২. মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৩), ১৩. গোলাম মোস্তফা (জীবনী-গ্রন্থ) (প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭), ১৪. সুফী মোতাহার হোসেন (জীবনী-গ্রন্থ) (প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮), ১৫. কৈশোর কালের কথা ও সাহিত্য-জীবনের সূচনা পর্ব (১৯৯৮), ১৬. প্রাতিষ্ঠানিক নজরুল-চর্চার ইতিবৃত্ত (প্রথম প্রকাশ ঃ জুন, ১৯৯৪), ১৭. ভাষা আন্দোলনে আবুল কালাম শামসুদ্দীন (প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৯), ১৮. বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি নজরুল (প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ২০০১), ১৯. বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ (প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর, ২০০৩), ২০. পূবালীর দিনগুলি ও সমকালীন সাহিত্য-সংস্কৃতি (২০০৫), ২১. ইতিহাস ও স্মৃতির আলোকে ঢাকা মহানগরীর সাহিত্য-সংস্কৃতি (২০০৫), ২২. ভাষা আন্দোলন যুগে যুগে (২০০৬), ২৩. বাংলা ভাষা যুগে যুগে (২০০৯) ২৪. নজরুল সঙ্গীত (২০১১), ২৫. আমার সাহিত্য জীবনের নেপথ্য কথা (২০১২), ২৬. যাঁদের হারিয়ে খুঁজি (রেখাচিত্র), ২৭. Muslim Tradition in Bengali Literature প্রভৃতি।

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ মূলত কবি, সাহিত্য-সমালোচক ও গবেষক-প্রবন্ধকার হলেও তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'পাণ্ডুর আকাশ', 'মাসিক মোহাম্মদী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর অন্য আর একটি উপন্যাস 'জীবন খাঁচার পাখী', 'সচিত্র স্বদেশ' পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া, তিনি এক ডজনের উপর ছোটগল্প রচনা করেছেন যা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। তবে তাঁর রচিত গল্প-উপন্যাস এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবত মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ অবিরত লিখে চলেছেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই উভয় বাংলার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা ছাপা হয়। পঞ্চাশের দশকেই কবি হিসাবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর কাব্য-চর্চা ও সাহিত্যিক জীবনের স্ফুরণ কীভাবে ঘটে সে সম্পর্কে মাহ্ফুজউল্লাহ্ নিজেই বলেন ঃ "ছবি আঁকতে আঁকতে কৈশোরেই কবিতা লেখায় হাতে-খড়ি হয়েছিল। তারও আগে মন বাঁধা পড়ে গিয়েছিল সুর, ধ্বনি, ছন্দ, যতি ও মিলের সম্মোহনে। পুঁথিপাঠ, কবিতা আবৃত্তি ও গান শুনে মন উদাস আর তন্ময় হয়ে যেতো, চোঁখের সামনে ভেসে উঠতো যত রূপ-কথা ও রূপ-কাহিনী। সেই অচেনা ও বিস্ময়কর জগতের ছবিই ধরা পড়তো কাগজের ক্যানভাসে, কৈশোরে আঁকা কাল্পনিক চিত্রকর্মে। তারই পাশাপাশি রূপ নিতো পরিবেশ ও প্রকৃতি, চেনা-জানা জগতের মানুষ, তাদের সুখ-দুঃখ ও আনন্দ-বেদনা।

"একদা এই ছবির জগৎ দখল করে নিলো কবিতা, তুলির বদলে হাতে এলো কলম। শুধু ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই মন বাঁধা পড়ে রইলো না, স্কুলজীবনেই আগ্রহ জাগলো কবিতা, গল্প-উপন্যাস-বিশেষত ডিটেকটিভ উপন্যাস রচনায়। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কবিতা রচনাই মন অধিকার করে রেখেছে গত পঞ্চাশ বছর। অবশ্য গত চার দশক ধরে অব্যাহতভাবে গদ্য-চর্চা ও প্রবন্ধ রচনার ফলে কবিতা কখনো-কখনো হয়েছে কিছুটা উপেক্ষিত, কিন্তু তার প্রতি গভীর ও আন্তরিক ভালবাসায় কখনো কার্পণ্য ঘটেনি।" (**মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ঃ নিবেদন/ কবিতা সংগ্রহ, প্রথম প্রকাশ**, মে, ২০০১)।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জুলেখার মন' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের জুন মাসে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৫৩-১৯৫৯। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক কবি ফররুখ আহমদকে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পরই তিনি বিদগ্ধ পাঠকের সপ্রশংস দৃষ্টি

www.nagorikpathagar.org

আকর্ষণে সমর্থ হন। তাঁর এ কাব্যে প্রেম, ঐতিহ্য-চেতনা ও নিসর্গ-প্রীতি একত্রে প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে। যেমন–

"একটি মেয়ের চোঁখে দেখি আমি সমুদ্রের নীল,
প্রতিদিন, প্রতি-সন্ধ্যা তার দু'টি চোখ যেন জ্বলে–
যেমন আকাশে জাগে রূপালি রেখার ঝিল্‌মিল্‌;
না-বলে অনেক কথা সেই মেয়ে দু'টি চোঁখে বলে।
তা'র গায়ে কে মেখেছে লাবণ্যের গোলাবী-পরাগ!
সে যেন ফুলের মতো হেসে ওঠে সবুজ সকালে
তার মুখ-অবয়বে লাগেনি তো কলঙ্কের দাগ,
ফুটন্ত পদ্মের মতো ফুটে আছে চিকন-মৃণালে।
লাবণ্যময়ীর দেহে উচ্ছ্বসিত প্রথম যৌবন–
তাকে পেরে ফিরে পাই স্নিগ্ধ এই পৃথিবীর মন।"

(একটি মেয়ের চোঁখে ঃ জুলেখার মন)

এখানে প্রেমের কথা আছে, একজন লাবণ্যবতী সুন্দরী, রমণীর বর্ণনা আছে। কিন্তু সেটা কত স্বচ্ছ, সুন্দর, আবেগময়, রুচিশীল বর্ণনা। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রেমের কবিতায় কোথাও শরীরী কামনা-বাসনা, যৌনতা, অশ্লীলতার লেশ মাত্র নেই, যেটা আধুনিক কবিতায় আজকাল প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রেম হলো তাঁর হৃদয়ের গভীর অনুভূতিসঞ্জাত এক নির্মল আত্মিক উপলব্ধি। প্রেম ও প্রেয়সীর সৌন্দর্যকে তিনি সর্বদা প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে সমান্তরালভাবে দাঁড় করিয়েছেন। তাই নারীপ্রেমের মধ্যেও তিনি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিপ্রেমের অনুধ্যান করেছেন। ফলে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রেমিক সত্তা বিশেষভাবে বৈশিষ্ট্যময় হয়ে উঠেছে। সমকালীন অনেক কবি থেকেই এক্ষেত্রে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র স্বাতন্ত্র্য ও নিজস্বতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঐতিহ্য-প্রীতি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র একটি সহজাত বিষয় বলে মনে হয়। চল্লিশের দশকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানগণ যখন ইংরাজদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে লিপ্ত, তখন আমাদের স্বকীয় আদর্শ, ইতিহাস, ঐতিহ্যের গৌরবময় পরিচিতি উদ্ধারে আমাদের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সৃজনশীল ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ এক প্রত্যয় ও আবেগানুভূতির সৃষ্টি হয়। শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীমউদ্‌দীন, বে-নজীর আহমদ, আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান, মুফাখখারুল

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম, প্রমুখ সেই বিশেষ যুগ-পরিবেশে জাতির স্বপ্ন-কল্পনাকে রূপায়িত করার প্রয়াস পান। এ বিশেষ যুগ-পরিবেশেই মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবি-মানস পরিগঠিত। তাই ঐতিহ্য-প্রীতি তাঁর অনেকটা সহজাত। 'জুলেখার মন'-এ এর প্রকাশ সুস্পষ্ট।

ফররুখ আহমদের অনুরাগী মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এক্ষেত্রে স্বভাবতই তাঁর পূর্বসূরীর দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত। তাঁর কবি-কল্পনা, শব্দ-চয়ন, রূপকল্প নির্মাণে এ প্রভাব অনেকটা লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ অনুকরণ-প্রয়াসী নন। তিনি সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিজস্বতা ও স্বকীয় প্রতিভার উন্মোচনে সতত আগ্রহী। ফররুখ আহমদের পথ ধরে তিনি চলতে চেয়েছেন, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ চলার পথে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত পথ করে নিয়েছেন। তাই পুঁথি-সাহিত্যের আখ্যান ও চরিত্র তিনি সম্পূর্ণ আধুনিক ভাব, ভাষা, রুচি ও আঙ্গিকে সম্পূর্ণ আধুনিক কবিতা নির্মাণ করেন। এটা তাঁর শক্তিমত্তার এবং সে অর্থে মৌলিকতারও পরিচয় বহন করে।

নিসর্গ-প্রীতি মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। শেলী, কীটস্‌, ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মত মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যে একান্ত মুগ্ধ। বাংলার মনোরম শ্যামল প্রকৃতি চিরদিন কবি-শিল্পীদেরকে আকর্ষণ করেছে। কালিদাস, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, আলাওল, রবীন্দ্রনাথ, জসীম উদ্‌দীন, জীবনানন্দ এঁরা সকলেই প্রকৃতির কবি। তাঁদের কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা আছে, বিশেষভাবে প্রকৃতির সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন তাঁরা। নজরুল-ফররুখ বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি হিসাবে খ্যাত না হলেও তাঁদের কবিতায়ও প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের অপরূপ বর্ণনা আছে। মূলতঃ সব কবি-শিল্পীই প্রকৃতি-প্রেমে মুগ্ধ এবং কম-বেশী সকলের কাব্য-কবিতায়ই প্রকৃতির বর্ণনা আছে। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ও সে রকম একজন নিসর্গপ্রেমী। তাঁর কবি-কল্পনা ও হৃদয়ের একান্ত অনুভূতির বিস্তার ঘটেছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করে। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় কবি সর্বদা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। যেমন–

"অফুরন্ত বৃষ্টি চাই আজ।
গ্রীষ্মের দুপুরে ক্ষীণ-কণ্ঠে বাজে কান্নার আওয়াজ
অফুরন্ত বৃষ্টি চাই আজ॥
আষাঢ়ে যেমন ছিল নতুন মেঘের অভিসার
এখন এখানে যদি স্নিগ্ধ ছায়া তা'র
পাওয়া যেতো

www.nagorikpathagar.org

অথবা, চঞ্চলা সেই শ্রাবণ-রাতের কোনো নদী
বয়ে যেতো যদি–
তা'হলে হৃদয় হতো আঙুরের রসে টুপ্‌টুপ
হঠাৎ আকাশ-প্রান্তে যদি বৃষ্টি নামে ঝুপ-ঝুপ!"

(বৃষ্টির জন্য ঃ জুলেখার মন)

"ঘুম নেই দু'চোখে আমার।
এখন রাতের ছোঁয়া সময়ের পাখীর পালকে:
মাঝে মাঝে ছায়া-অন্ধকারে
আকাশে ছিটানো তারা-অবারিত তারার জৌলুস।"

(তারার প্রেম ঃ জুলেখার মন)

তবে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ নিছক নিসর্গ-প্রীতির জন্যই প্রকৃতি-আশ্রয়ী হননি। তিনি প্রকৃতিকে অনেক কবিতায় প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'বৃষ্টির জন্য', 'শিকার' প্রভৃতি কবিতায় প্রতীকের ব্যবহার লক্ষণীয়। 'বৃষ্টির জন্য' প্রার্থনার মাধ্যমে কবি গ্রীষ্মকে অশান্তির প্রতীক এবং বৃষ্টিকে শান্তির প্রতীকরূপে ব্যবহার করেছেন। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ প্রকৃতিকে প্রেয়সীর সমান্তরাল করে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর আরাধ্য নারীকে প্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্যের মধ্যেই কবি তাঁর প্রেয়সীর অনুধ্যান করেন। কবির মনের আনন্দানুভূতি প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণ-সুষমায় নানাভাবে পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে। 'জুলেখার মন'-এর নাম কবিতায় কবি বলেন ঃ

"দক্ষিণের বাতায়নে আসে স্নিগ্ধ মালতীর ঘ্রাণ
সুন্দরী জুলেখা জাগে একা রাত্রি-নৈশব্দের বুকে
ঘুমের ঝরোকা তার খুলে দিয়ে চাঁদের আলোকে
সারা রাত কান পেতে শোনে দূর অরণ্যের গান ;
যেখানে তারার ফুল গুচ্ছবদ্ধ রয়েছে অম্লান,
দুধের মতন চাঁদ একাকীই জানালয় জ্বলে–
আকাশ-সমুদ্র থেকে সে-ও যেন মৃদু কথা বলে
জুলেখা শুনেছে আজ সেই দূর-চাঁদের আহ্বান।
জোৎস্নায় ভরেছে বন, তারি ঢেউ লাগে বাতায়নে,
মনের অরণ্যে তার প্রেমের সোনালী ফুল ফোটে
কে যেন একাকী এসে বলে তাকে একান্ত অস্ফুটে–
অরণ্যের গন্ধ মেখে প্রেমিকের স্বপ্ন নিয়ে মনে ঃ

www.nagorikpathagar.org

'প্রেমের অজস্র ফুল তুলে নেবো আমরা দু'জন'
মালতীর সুরভিতে জেগে ওঠে জুলেখার মন!"
(জুলেখার মন ঃ জুলেখার মন)

'জুলেখার মন' মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রথম কাব্যগ্রন্থ। আমার ধারণা, এটি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবি-কর্মও বটে। এখানে তাঁর আবেগের প্রকাশ ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা অন্যান্য কাব্য থেকে অধিক বাঙময়। ফলে 'জুলেখার মন' পাঠক-মনকে নিবিড়ভাবে আবিষ্ট করে। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য এ কাব্যে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। 'জুলেখার মন' প্রকাশের পর বিদগ্ধ সমালোচকেরা এ সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন তা থেকে সংক্ষেপে কয়েকটি মতামত উদ্বৃত করছি। বিশিষ্ট সমালোচক আব্দুল হক বলেন ঃ "মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ বিশুদ্ধ গীতি-কবিতার শিল্পী। কবিতা ব্যক্তিগত অনুভব ও চিন্তার শিল্পসম্মত প্রকাশ, এই তো গীতি-কবিতার লক্ষণ। বিশুদ্ধ গীতি-কবিতা আপনাতেই সম্পূর্ণ ; শিল্প-সুন্দর রূপ-সৃষ্টি তার লক্ষ্য, কোনো পার্থিব বা পরমার্থিক প্রয়োজন সাধন তার কাজ নয়। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতা প্রেমের চেয়ে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। ...তাঁর ভাষা ও ছন্দের পালিশ আছে। বাংলা কবিতার তিনটি প্রধান ছন্দেই তিনি কবিতা লিখেছেন, তবে অক্ষরবৃত্তই তার প্রিয়তম ছন্দ।..."**(আব্দুল হক, সমকাল, আশ্বিন, ১৩৬৬)**।

বিশিষ্ট সমালোচক ডক্টর সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ "কবিতাকে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ অনুভূতির জগতেই আবিষ্কার করেছেন। বাস্তব সেখানে যদিবা উপস্থিত হয়েছে, তা-ও রোমান্সের রসে সিক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়ে। 'জুলেখার মন' আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- আধুনিকতার চোরাগলিতে হারিয়ে গেলেও মানুষের মন এখনো ঐশ্বর্যরিক্ত হয়নি। তাতে স্নেহ, প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, আদর্শনিষ্ঠা, ঐতিহ্য-প্রীতি আজও অনেক পরিমাণে ক্রিয়াশীল।...লেখক মূলত রোমান্টিক, আর তাঁর রোমান্টিক মন ইসলামী ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের দ্বারা কতকটা প্রভাবিত। পুঁথি-সাহিত্যের নব রূপায়ণের প্রচেষ্টায়, কাব্যের নামকরণে, তাঁর এ-বিশিষ্ট মানসিকতার পরিচয় মিলে। তবুও মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ মূলত রোমান্টিক কবি ; বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবিতা রচনায় তাঁরই কৃতিত্ব সমধিক। আর তাঁর রোমান্টিক মনের অবলম্বন প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ।...মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাব্যে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। এ প্রকৃতি তাঁর রোমান্টিক-মনের স্পর্শে অপরূপ হয়ে দেখা দিয়েছে। চিত্রকল্প সৃষ্টিতে, উপমার প্রয়োগে ওসুষ্ঠু শব্দচয়নে এসব ক্ষেত্রে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কৃতিত্ব কম নয়। ...মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কাব্যে ভাষা ও ছন্দের

www.nagorikpathagar.org

ব্যবহারে মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে প্রায় সর্বত্র।" **(সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, পূবালী, মাঘ, ১৩৬৭)।**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান মুহম্মদ আব্দুল হাই বলেন ঃ

"পুঁথি-সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার কাহিনী, শব্দ-বিন্যাসরীতি এবং শব্দের বয়ন-কুশলতা তথা ফ্রিজোলজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেগুলো স্বীকরণ সাধন করে শালীন কাব্য-সাহিত্যে তার ব্যবহার করতে পারলে আমাদের একালের সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র 'জলেখার মন' (১৯৫৯) কাব্যটির কয়েকটি কবিতায় ফররুখ আহমদ-প্রদর্শিত পথে পুঁথি-সাহিত্যের বাক-বিন্যাসরীতি ও তাঁর স্বপ্ন-কল্পনার অনুবর্তন আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে...।" **(অধ্যক্ষ মুহম্মদ আব্দুল হাই ঃ 'ভাষা ও সাহিত্য')।**

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক সৈয়দ আলী আহ্‌সান বলেন ঃ

"তাঁর (মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌) কবিতায় পুঁথি-সাহিত্য-ধারার অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। ইসলামের ঐতিহ্য, শ্রেষ্ঠত্ব কাব্যের মাধ্যমে লালন করা তাঁর কবি-স্বভাবের অন্তর্গত। **(সৈয়দ আলী আহ্‌সান সম্পাদিত কবিতা সংকলন)।**

মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'অন্ধকারে একা'র রচনাকাল ১৯৫৭-৬৬। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সনের অক্টোবরে। ৫০টি সনেট বিশিষ্ট এ কাব্যটি মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবি-প্রতিভার একটি বিশেষ দিক উন্মোচন করেছে। বাংলা কাব্যে সনেটের প্রথম প্রবর্তক ও সার্থকতম রচয়িতা হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ইংরাজি ও গ্রীক কাব্যকলার অনুসরণে তিনি বাংলা ভাষায় চৌদ্দ লাইন বিশিষ্ট এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ঠাস-বুননের কাব্য-কলার প্রবর্তন করেন। বাংলা ভাষায় মধুসূদন সনেটের প্রবর্তক এবং তিনিই সার্থকতম রচয়িতা। তাঁর রচিত শতাধিক সনেট বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর অনুসরণে পরবর্তীতে অনেকেই সনেট লিখেছেন তবে সার্থক সনেটের রচয়িতার সংখ্যা হাতে গোণা। সনেটের বিশিষ্ট শিল্পরীতি অনুসরণ করে এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন ফররুখ আহমদ। সনেট তাঁর নিকট ছিল একটি প্রিয় কাব্য-ফর্ম। সনেট রচনায় তিনি যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে মধুসূদনের পরে তাঁকেই সার্থকতম সনেটের রচয়িতা বলে বিবেচনা করা হয়। বাংলা সাহিত্যে সর্বাধিক সংখ্যক সনেট রচনার কৃতিত্বও ফররুখ আহমদের। শিল্প-সচেতন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কৃতিত্বও এক্ষেত্রে কম নয়। ফররুখ আহমদের পরেই সর্বাধিক সংখ্যক সনেট-

www.nagorikpathagar.org

রচয়িতা মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌। তাঁর সনেটে নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় মেলে। গভীর শিল্প-সচেতনতা ও নিপুণ কলাবিদ হিসাবে মধুসূদন-ফররুখের পরেই মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহত্ব কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র এ কৃতিত্বের দিকটি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র এ সনেট গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর বিভিন্ন সুধীজন এর প্রশংসা করে যেসব মন্তব্য করেন সংক্ষেপে তার দু'একটি নিচে উদ্ধৃত হলো। বিশিষ্ট সাহিত্যক আবুল ফজল বলেন ঃ "পঞ্চাশটি সনেটের এ সংকলনে আপনার মনের পঞ্চাশটি মুহূর্ত যেন ধরা পড়েছে–ধরা পড়েছে ছন্দের সংহত বন্ধনে। সনেট এক দুরূহ শিল্পকর্ম–ভাষা, ছন্দ আর বক্তব্যে এতটুকু শৈথিলের সুযোগ নেই এখানে। তাই খুব কম কবিই সনেট রচনায় সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।...আপনার প্রতিটি সনেট আমার ভাল লেগেছে।...এ সনেটগুলোতে আপনার মন কোন সংকীর্ণ গণ্ডিতে বাধা পড়েনি– আশ্চর্যভাবে প্রসারিত আপনার মনের দিগন্ত।... সনেট রচনায় আপনার দক্ষতা আর সাফল্যের নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর রয়েছে 'অন্ধকারে একা'য়।" **(৩০.১.৬৭ তারিখে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌কে লেখা পত্রের অংশ বিশেষ)।**

বিশিষ্ট সাহিত্যেক বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর বলেন ঃ "প্রথম বই থেকে দ্বিতীয় বই পর্যন্ত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ অনেক পথ অতিক্রম করেছেন। এই অতিক্রম তাঁর কবি-চিত্তে সমৃদ্ধি এনেছে, তাঁর হৃদয়কে অভিজ্ঞ করেছে, চেতনাকে সংহত করেছে। প্রথম বই 'জুলেখার মন' -এ প্রায় বর্ণনামূলক উল্লেখ থেকে তিনি এসে পৌঁছেছেন বক্তব্যের ব্যাপ্তিতে, যে বক্তব্য তিনি চতুদর্শপদী কবিতার মধ্যে সংহত করেছেন, অভিজ্ঞতার পর্যায়ভেদ সম্বন্ধে সতর্ক হয়েছেন। বর্ণনামূলক অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্লেষণমূলক অভিজ্ঞতায় পৌঁছাতে গেলে যে পথ অতিক্রম করে যেতে হয় তার ছাপ পড়েছে এখানে। প্রকৃতি ও প্রেম তাঁর হৃদয়ে আগে যে বর্ণনামূলক উচ্চারণ ও উচ্ছ্বাস জাগাতো, তার বদলে এসেছে বক্তব্যের বহুমুখী বিস্তার, যে-কোন ঘটনাকে বক্তব্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার সংকল্প, উচ্ছ্বাসের বদলে আবেগের অন্তর্লীন শৃঙ্খলাবোধ প্রসঙ্গে আগ্রহ।...তাঁর কবিচিত্তে যে পরিবর্তনের ঋতু দেখা দিয়েছে, এ তারই ইঙ্গিতবহ।...তাঁর আগের কবিতার চেয়ে এখনকার কবিতা ভিন্নধর্মী। তাঁর সমসাময়িকেরা যে-দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি তা থেকে মুক্ত নন। তাঁর কাব্যবিষয়ক ধারণা স্পষ্ট, ঋজু কবিতার মূল বিশ্লেষণ স্বদেশের গভীরে, মর্মে... কবিতা পড়ে মুগ্ধ হতে হয়, অনেক ভাবনা জাগে মনে, নানা ইঙ্গিত, বিকীর্ণ, কিন্তু সংহত কারুকর্মের জন্য কবিকে ধন্যবাদ দিতেই হয়।" **(বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, পূবালী, ৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ-৭ম সংখ্যা)।**

www.nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট সাহিত্যিক অধ্যাপক আব্দুল গফুর বলেন ঃ "'অন্ধকারে একা' মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ সাহেবের সদ্য প্রকাশিত সনেট কাব্য। ৫০টি সনেটেই এ-কাব্যের অলঙ্কার। ...'অন্ধকারে একা' কাব্যে প্রত্যেকটি সনেটের প্রত্যেকটি পংক্তিই অষ্টাদশ অক্ষর বিশিষ্ট। পংক্তির অক্ষর ১৪ স্থলে ১৮ বলে আলোচ্য কাব্যের সনেটের ছন্দে সঙ্গীত-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কবিতায় তা সুপরিস্ফুট হয়েছে। ...তাঁর সনেট অনায়াসে পাঠকের মনে আনন্দরস সিঞ্চনের ক্ষমতা রাখে। ...সমকালীন যুগ-চিত্র এবং স্বদেশপ্রেম তাঁর সনেটে সবচেয়ে জীবন্ত হয়ে ফুট উঠেছে। এগুলো সরস ও উপভোগ্য। কবি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার রঙ মিশিয়ে অতি সন্তর্পণে অতি সংযতভাবে তাঁর কাব্যদেহ্ নির্মাণ করেছেন। বস্তুত মৃন্ময়ধর্মী (Subjective) কাব্যকলায় কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশভঙ্গী প্রশংসনীয়। আলোচ্য-কাব্যের শেষের দিকের সনেটগুলি অধিকতর মর্মস্পর্শী।" **(অধ্যাপক আব্দুল গফুর, সওগাত, মাঘ, ১৩৭৩)**।

মাহ্ফুজউল্লাহ্র তৃতীয় কাব্যগন্থ 'রক্তিম হৃদয়' প্রকাশিত হয় ১৩৭৭ সনের (১৯৭০) ১১ই জ্যৈষ্ঠ। গ্রন্থভুক্ত কবিতাসমূহের রচনাকাল ১৯৬৬-৭০। 'রক্তিম হৃদয়' -এর অধিকাংশ কবিতাই সনেট জাতীয়। তাঁর এসব কবিতায় গভীর হৃদয়াবেগের প্রকাশ ঘটেছে। কঠিন এবং অনেক সময় নির্দয় বাস্তবতার কষাঘাতে কবির হৃদয় রুধিরাক্ত হয়েছে, যন্ত্রণায় কাতর হয়েছে। প্রতিদিনের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই জীবনের নিরন্তর যাত্রা। কবি এ গ্লানিময়, ব্যথা-জর্জর জীবন ও জগতের চিত্রই তুলে ধরেছেন তাঁর 'রক্তিম হৃদয়ে'র বিভিন্ন কবিতায়। কবি বলেন ঃ

"এ রক্তিম হৃদয়ের সব দুঃখ ফোটাবো কেমনে ?
অধুনা দেয় না ধরা পরিচিত চেনা উপমায়
বহু ব্যবহারে ম্লান কবিদের পোশাকী ভাষায়
অব্যক্ত যন্ত্রণা-জ্বালা হৃদয়ের বিষণ্ন লগনে ;
লতিয়ে ওঠে না মনে আবেগে অধীর সঞ্চরণে
আশা কিম্বা হতাশার অবুঝ সবুজ অভিপ্রায়
অপ্রকাশ বেদনার ভারে দীর্ণ, প্রাণের সভায়
প্রতারক স্মৃতি শুধু সুখ-স্বপ্নে মুখর ভাষণে।

বদলে যায় ক্রমাগত নিষ্করুণ সময়ের হাতে
সুখ-দুঃখ অনুভূতি চিরচেনা রক্তের স্পন্দন
যেন স্থির ক্লান্ত-নদী, স্রোতাবর্তে তীক্ষ্ণ অভিঘাতে

www.nagorikpathagar.org

ভাসিয়ে নেয় না আর দুই পাড় যখন তখন।
দেখি অবসিত সেই প্রাণ-বন্যা উদ্দাম অধীর
সমস্ত আকাঙ্ক্ষা স্তব্ধ-পুরানো, প্রাচীন পৃথিবীর।"
(এ রক্তিম হৃদয়ের ঃ রক্তিম হৃদয়)

'রক্তিম হৃদয়' প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁদের কয়েকজনের মতামত উদ্ধৃত করা হলো। কবি হাবীবুর রহমান এ সম্পর্কে বলেন ঃ "মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ আধুনিক কবি নন, তিনি সমকালীন কবি– সর্বোপরি তাঁর কবি-মানস ও কবি-দৃষ্টি রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যে সজীব। সে দৃষ্টি-মানসের প্রেক্ষিতেই তিনি সমকালীন সমস্যা ও যুগ-যন্ত্রণাকে অধ্যয়ন করেছেন। আর তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতাকেই কাব্যে প্রকটিত করেছেন। এর ফলে 'রক্তিম হৃদয়ের' কবিতাগুলি যেমন সুস্পষ্ট হয়েছে, তেমনি সমকালীন যুগ-মানসের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করেছে। ...কবিতাগুলির প্রত্যেকটি আপন বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র হলেও, একটি সূক্ষ্ম যন্ত্রণার সুর নিয়ে গাঁথা। যেন নানা রঙের ফুল দিয়ে গাঁথা একটি অখণ্ড মালা, যার মধ্যে রঙের স্বাতন্ত্র্য আছে, কিন্তু গ্রন্থনের সূত্রটি অবিচ্ছিন্ন।...তাঁর কাব্য বুদ্ধিনির্ভর দীপ্তি ভাস্বর। সেই দীপ্তিতে তাঁর কবিতার অন্তর-লোকটি পর্যন্ত অতি সহজে দেখতে পাওয়া যায়। এটি তাঁর কবি-কৃতির অমল মহিমা এবং তাঁর স্বতন্ত্র কবিসত্তার দ্যোতক। আত্মপ্রকাশে তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবিহারী কিন্তু ভাব-ব্যঞ্জনায় গভীরতা সৃষ্টির প্রয়াসী ; সব মিলিয়ে যেন স্বচ্ছতোয়া নদী- তার তল পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা গেলেও সে নদীর গভীরতা কম নয়।" **(কবি হাবীবুর রহমান, চিত্রাকাশ, ১২নভেম্বর, ১৯৭০)**।

বিশিষ্ট সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম বেদু বলেন ঃ "...এই কাব্যগ্রন্থটিতে কবির 'মানুষ প্রীতি'র রূপটি স্বচ্ছভাবে ফুটে উঠেছে। কবির ছন্দ ও যতির মিল কবিতার গতিকে আধুনিক জটিল কবিতা থেকে পৃথক করেছে। ... এর প্রতিটি কবিতা মানুষের বিচিত্র জীবনের ছোট ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষার রসগ্রাহী বর্ণনা। ... হৃদয়ে যা বাজে তাই কবিতা। মাহ্ফুজউল্লাহ্র কবিতা বোঝাও যায় এবং হৃদয়েও বাজে। ... "মাহ্ফুজউল্লাহ্ মানুষের সুখ-দুঃখে-বাস্তব-আশা-নিরাশার ছবি তাঁর কবি হৃদয় দিয়ে দেখেছেন। ... মাহ্ফুজউল্লাহ্র 'রক্তিম হৃদয়ে'র প্রতিটি কবিতা অতিশয় রসসিক্ত ও হৃদয়গ্রাহী। প্রতিটি কবিতায় 'মানুষ, দেশ ও মাটি'র গন্ধ পাওয়া যায়। 'জুলেখার মন' -এর রোমান্টিকতা 'রক্তিম হৃদয়ে' নেই। 'রক্তিম হৃদয়ে' কবি দেশ, মানুষ আর মাটির গন্ধে বিমুগ্ধ। সমস্ত কবিতা-গ্রন্থে কবিচিত্ত হিউমেনিটেরিয়ান এ্যাগোনিতে আপ্লুত।" **(আমিনুল ইসলাম বেদু, বই, নভেম্বর, ১৯৭০)**।

www.nagorikpathagar.org

বিশিষ্ট সাংবাদিক-লেখক কাজী সিরাজ বলেন ঃ "চুয়ান্নটি কবিতায় সমৃদ্ধ 'রক্তিম হৃদয়' মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ রচিত একটি অনবদ্য কাব্য-সংকলন। কবিতার আঙ্গিক, দেহ-সৌষ্ঠব আর ভাব-বিন্যাসের আন্তরিকতায় 'শব্দের খাঁচায়' পুরে আমাদের ভাবনাগুলোকে কল্পরাজ্যের আঙ্গিনা এনে সাজিয়েছেন– 'দাও আমাদের সেই প্রিয় দিনগুলি স্বপ্নে মুখর হয়ে।' কবিতার ভাববস্তু কবির আত্মগত চিন্তার ফসল কেবল নয়, বাস্তবতার আক্ষরিক রূপায়ণ এবং সর্বোপরি প্রতিটি কবিতার ছত্রে-ছত্রে কবি-মানসের আন্তরিক স্পর্শে কাব্য ধারার রূপকল্প হয়েই যেন নয়, পাঠ-সুখের অনাবিল আনন্দের ভরপুর বলেই এ-কাব্য বাংলা সাহিত্যের এক নতুন সংযোজন বলে ধরে নিলে ভুল হবে না।...আধুনিকতার পূর্ণ স্বাক্ষর বহন করছে প্রতিটি কবিতার অঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে জীবন-দর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ...জীবন-রসের প্রাচুর্যে কবিতাগুলো ভরপুর। বাস্তবধর্মী কবিতার অন্তরালে কবি সত্তার জীবন্ত মূর্তি ধরা পড়েছে। – তা সত্যি অনবদ্য। ছোট-ছোট কবিতাগুলো বাস্তব জগতের ছোট ছোট একটি সংগ্রামময় জীবন।" **(কাজী সিরাজ, পাকিস্তানী খবর, ১১-০৯-৭০)।**

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'আপন ভুবনে' প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সনে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৭০-৭৫। এ কাব্যে আশাহত কবির মনোজগতে নতুন আশার উদ্‌গম লক্ষ্য করা যায়। ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনে একদিকে যেমন হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অন্যদিকে, তেমনি আবেগাকুল চিত্তের নিবিড় প্রত্যাশা কবিকে নতুন প্রাণবন্ত স্বপ্নে বিভোর করে তোলে। এটা জীবন-বাস্তবতারই একটি দিক। কবি এখানে আবেগের সাথে জীবন-বাস্তবতা ও অন্তর্লীন অনুভূতির সাথে মননশীলতার এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কবি বলেন ঃ

"খরায় বিনষ্ট হয় শস্যক্ষেত সবুজ বিপ্লব
তবুও আমার স্বপ্ন জন্ম দিতে থাকে
মানুষের মতো সব অন্তর্গত সুনীল বিষাদে
গভীর গভীর কোনো মনোময় মনোবেদনায়
মাটির নিহিত প্রেম সোঁদাগন্ধ ক্রমে ক্ষয়ে আসে
তৃণহীন হয়ে যায় সবুজ শস্যের মাঠ, মলিন বসুধা
তবুও আমার স্বপ্ন জন্ম নিতে থাকে।

(তবুও আমার স্বপ্ন ঃ আপন ভুবনে)

'আপন ভুবন' কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচক বশীর আল হেলাল বলেনঃ

www.nagorikpathagar.org

"মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতা শান্ত, সহজ, উপাদেয়। তিনি প্রচলিত অর্থে আধুনিক নন বলেই তাঁর কবিতা আস্বাদ্য। আমাদের কবিতায় নজরুল-যুগের প্রথাগত, প্রণালীবদ্ধ ধারাটিকে যতদূর সম্ভব আধুনিক রূপায়ণে তিনি উপস্থিত করেছেন। তাঁর ও নজরুলের মাঝখানের সেতু ফররুখ আহমদ। দেশ ও প্রকৃতির প্রতি ভালবাসাকে তিনি সহজ ও অনাবিলভাবে উপস্থিত করেন। আমাদের একালের প্রকৃত আধুনিক কবিদের থেকে তাঁর প্রভেদ হচ্ছে তিনি আমাদের কাব্যের 'স্বপ্নময় জীবনময় উজ্জ্বল আশাবাদকে' আজকের প্রখর বিভ্রান্ত কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন।

"মিলবিন্যাস, অলংকরণ, ছন্দ-প্রকরণ এসব আঙ্গিকগত দিকের প্রতিই তিনি বেশী যত্নবান। দেশ ও দেশের মানুষকে, আমাদের পরিপার্শ্বের আনন্দ ও যন্ত্রণার ছবিকে তিনি বিশ্বস্তভাবে তাঁর কবিতায় তুলে আনেন। মনে হয়, পূর্ব-গ্রন্থগুলির তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে তাঁর কবিতা আরও উত্তীর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর এই স্পষ্ট অগ্রসরতার বিষয়টি খুব উল্লেখযোগ্য। উপমা ও তার চেয়ে বেশী চিত্ররচনার স্বভাব তাঁর এ গ্রন্থেও সমান রয়েছে। প্রফুল্ল-উৎফুল্ল তাঁর কবিতা। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ যে বিশিষ্ট, পৃথক ও সহজলক্ষ্য কবি, এই কথাটি সহজেই বলা যায়। আমাদের আদর্শহীন বিখ্যাত সব সাম্প্রতিক কবিদের ধূসর ভিড়ে তাঁর উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় বর্ণের উদ্ভাস হারিয়ে যাওয়ার নয়।" **(বশীর আল হেলাল ঃ পটভূমি, দ্বিতীয় সংকলন, ১৯৭৭)**।

'আপন ভুবন' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবিক বিপর্যয়ের এবং অর্থনৈতিক সমস্যা-সংকটের চিত্র তুলে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও প্রশান্ত রূপ যেমন ধরা পড়েছে। তেমনি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন প্রকৃতির রুদ্র ও ভয়াল রূপ, বিধৃত করেছেন ধ্বংসলীলা।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ 'বৈরিতার হাতে বন্দী' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সনে। গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৮০-৯০। এ কাব্যের কবিতাসমূহে কবির প্রজ্ঞা, জীবনের অভিজ্ঞতা, অপূর্ণতা ও অতিশয় সহজ, স্বচ্ছন্দ কিন্তু ছন্দ-সুষমা, চিত্রকল্প, রূপক-উপমায় অসাধারণ কাব্যময়। তাঁর কবিতার এই সহজ, সাবলীল, রূপময় ভঙ্গীর কারণে তিনি তাঁর সমকালের অন্যদের থেকে যেমন স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল তেমনি সাধারণ পাঠকের নিকট তিনি সহজগ্রাহ্য ও জনপ্রিয়। তিনি আধুনিক কবি হয়েও আধুনিক কবিদের দুর্জ্ঞেয়তা, অনৈতিকতা, অশ্লীল প্রবণতাকে সযত্নে পরিহার করেছেন। এ কাব্যের প্রথম কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁর কাব্যের সহজাত, কাব্যময়তা, সংযত বাক্‌-বিন্যাস, মার্জিত

www.nagorikpathagar.org

রুচিবোধ ও উদার মানবিকতা পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। এক্ষেত্রে অন্যদের থেকে তাঁর পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রথম কবিতাটির কয়েকটি লাইন ঃ

"কবিতা বাঁচাবে এই বিপন্ন পৃথিবী ?
কিন্তু সেই কবিতার চেহারা কেমন
এবং কেমন তার অন্তর্গত স্বভাব-প্রকৃতি ?
সে কি শুধু ক্লেদজ-কুসুম কিছু
কিছু প্রেম-ভালবাসা
শব্দের মোহন কারুকাজ।
নারী ও প্রকৃতি নিয়ে কিছু স্তব-গান,
ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ বেদনা বিষাদ
আত্মরতি ছাড়া যার অন্য কোনো
অঙ্গীকার নেই!
লোকালয়ে বাস করে একা তবু
থাকে নির্বাসনে
স্বেচ্ছাবন্দী চিরকাল,
জানে না 'বিদ্রোহী' হতে
অন্তহীন বঞ্চনা ও
বৈরিতার মুখে,
সুন্দরের প্রতি আছে
আজীবন আগ্রহ প্রবল।"
(কবিতার কথা ঃ বৈরিতার হাতে বন্দী)

'বৈরিতার হাতে বন্দী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর অনেক সমালোচক এর প্রশংসা করেছেন। এখানে তার দু'একটি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হলো। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক তিতাশ চৌধুরী এ সম্পর্কে বলেন ঃ "মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির ভিতর দিয়ে আমাদের চিন্তা ও চেতনায়, কর্মে ও জিজ্ঞাসায় এবং সৃষ্টি ও বেদনায় যে তীব্র তীক্ষ্ম দৃশ্যটি ফুটিয়ে দিতে পেরেছেন– সেজন্য তিনি আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। তাঁর মননজিজ্ঞাসা আমাদের চিন্তা, প্রতিভা ও চেতনাকে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছে। ...একদিন সুন্দর পৃথিবী গড়ার স্বপ্নেই কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ তাঁর কবিতায় যুদ্ধ, ক্ষুধা, নারী, মৃত্যু প্রভৃতির চিত্র এঁকেছেন। সুন্দর ও কল্যাণের দিকেই তাঁর ইঙ্গিত। ... কানো কবির শক্তি ও লাবণ্য ফুটে ওঠে তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি ইত্যাদি নির্মাণে। কাব্যালংকার ও শব্দালংকারও কবিতার সংহত রূপকে প্রকট করে। ফলে কবিতা হয়ে ওঠে শিল্পের আধার। কবি মোহাম্মদ

মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে কবিতার এ রূপ ও ঐশ্বর্য সতত সঞ্চারমান।" **(তিতাশ চৌধুরী, দৈনিক বাংলা, সাহিত্য সাময়িকী)।**

ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক বিশিষ্ট সমালোচক ও অনুবাদক এস.এন.কিউ. জুলফিকার আলী বলেন ঃ "Md. Mahafuzullah is both an idealist and realist. Many of these sonnets … breathe the lofty idealism of the poet. Mahafuzullah is also perfectly aware of the hard realities of our life and paints them in sharp strokes. The poet has control over his emotion, and uses his language with economy and telling effect, which of course is a mark of good sonnets. Discerning reader will also note irony and paths in some of the poems. There are many memorable lines in the book. Mahafuzullah writes in the tradition of the modern poet. But it is a pleasure to note that he has never fallen into the trap of unnecessary obscurity of some of the so-called moderns." **(S.N.Q. Zulfizar Ali : Observer Sunday Magazine).**

বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক আব্দুস সাত্তার বলেন ঃ "Mohammed Mahafuzullah who first presented 'Julekhar Mon' in the literary horizon writes essentially on the varied aspects of love and the beauties of nature. His essentially a romantic self and his expressions are constructed in keeping with his personal nature. His other works 'Raktim Hridayey' and 'Andkakary Eka' have re-established his fame." **(Abdus Sattar, Counterpoint, June 8, 1975).**

মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম 'সময়ের বিমর্ষ দর্পণে'। ১৯৯০ সনে 'বৈরিতার হাতে বন্দী' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর পর তাঁর 'সময়ের বিমর্ষ দর্পণে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। যদিও এসময় তিনি বিভিন্ন লেখালেখির ফাঁকে অজস্র কবিতাও রচনা করেছেন, কিন্তু সুযোগের অভাবে গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয়নি। মাহ্‌ফুজউল্লাহ মূলত রোমান্টিক কবি হলেও তাঁর এ গ্রন্থে বাস্তবতার দিকটি প্রবলভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। প্রথম যৌবনে তাঁর কবিতায় নারীপ্রেম ও নিসর্গ-প্রীতি প্রাধান্য পেলেও এ সর্বশেষ কাব্যে তা পর্যবসিত হয়েছে মানব-প্রেমে। স্বদেশপ্রেমী ও মানবতাবাদী কবি মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌'র কবিতায় স্বদেশের খেটে খাওয়া মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা এবং সংগ্রাম-সাধনার পাশাপাশি বিধৃত হয়েছে দৈশিক ও সামাজিক সংকট-সমস্যা, তিনি রূপায়িত

www.nagorikpathagar.org

করেছেন আন্তর্জাতিক সমস্যা-সংকটের অনেক আলেখ্য, তাঁর রচনায় রূপ পেয়েছে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিত্র, যুদ্ধ, মাড়ী-মড়ক, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, নদী-ভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি মানব-সৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের পাশাপাশি মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের বিরুদ্ধে মাহ্ফুজউল্লাহ্'র কবিতায় উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদী সুর, এ দুর্যোগের শিকার বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি গভীর সহমর্মিতা।

'সময়ের বিমর্ষ দর্পণে' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন কবিতায় ক্রমান্বয়ে স্বদেশপ্রেম, মানবতাবোধ ও বাস্তব-সচেতনতার এবং চিন্তা-চেতনার পরিচয়ই বিধৃত হয়েছে। নিচে এ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি কবিতার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো ঃ

সময় প্রবহমান-অন্তহীন অবিভাজ্য, তার
অদৃশ্য স্রোতের ধারা অবিচ্ছিন্ন বয়ে চলে বেগে
কেটে যায় পল আর অনুপল-দিন বর্ষ-মাস
ঋতু পরিক্রমা শেষে পুরাতন বছরের পর
নতুন বছর আসে, প্রকৃতিও বদলায়, ক্রমে
নানারূপ-রঙ তার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের ধারা
কখনো ভয়াল রূপে, কখনো বা স্নিগ্ধ মহিমায়
সৃষ্টি ও ধ্বংসের পালা যুগ যুগ চলে, আর
মানুষের জন্যে আনে বিপর্যয়, সৃষ্টির উৎসবে-
এই দুই ধারা দেখি পাশাপাশি চিরন্তনরূপে
অন্তহীন সময়ের ইতিহাসে-কখনো উজ্জ্বল
অনন্য গৌরবময় ঘটনার সমারোহ, তবে
কখনো কলঙ্কভরা, ধ্বংসাত্মক সময়ের স্মৃতি
শোকাবহ হয়ে যায়, ইতিহাসে কখনো কখনো
বিজয়ী মানুষ সব মুছে ফেলে, নয়া ইতিহাস
সৃষ্টির আনন্দে মাতে, মাস, দশক, শতক
কারও কারও কৃতকর্মে গ্লানিময় হয়ে ওঠে, দেখি
সভ্যতার ইতিহাসে, কলঙ্কের কখনো স্বাক্ষর
কালিমা বিধৃত হয়, ট্রাজেডির এই এক ধারা
... ...
মানুষের বড় শত্রু মানুষের চেয়ে কেউ নয়,
কখনো বন্ধুর বেশে শত্রুতা সে দেখায় চরম
বাঘ নখ পুষে রাখে সুকৌশলে আস্তিনের নীচে
প্রতিশোধ-স্পৃহা তার জেগে ওঠে অতি সন্তর্পণে
হত্যার নেশায় সে যে মেতে যায় কখনো কখনো।

www.nagorikpathagar.org

(সময়ের স্রোতে মানুষ ও প্রকৃতি)

মানুষের ইতিহাসে কায়া ও ছায়া
এবং আলো ও অন্ধকারে আঁকা
মানব-সভ্যতা সে-তো অন্ধকারকে মাড়িয়ে
আলোকের অভিযাত্রারই অন্য নাম।
জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও সভ্যতা
সবকিছুই মানুষের সংগ্রাম ও সাধনার অর্জন
মানুষের এই সুকৃতি ও গৌরব-গাঁথা
প্রতিটি মানুষকেই অহংকারে উদ্দীপ্ত
এবং আশা ও প্রত্যাশায় সমুন্নত করে তোলে
কিন্তু ছায়া ও প্রচ্ছায়া থেকে প্রকৃত মানুষকে
চিনে নেওয়া কঠিন
কায়ার অন্তরালে থাকে অদৃশ্য এক
অ-মানুষের ছায়া
মানুষের মধ্যেই বাস করে হৃদয়হীন অ-মানুষ।
যে মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির সাধনায়
সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়

(মানব-প্রবাহের চিরন্তন ধারা)

এখনো স্বপ্ন হৃদয়ের দরোজায় কড়া নাড়ে
কল্পনা ডানা মেলে অন্তর্গত নীলিম আকাশে
রোমান্সের ধারা সত্তার গভীরে অনিঃশেষ হতে চায়
আবেগ-অনুভূতি, আর্তি-আকুলতা
অদৃশ্য ঝরণার মতো উৎসারিত হয়
আশা ও প্রত্যাশা সজীব চারার শ্যামলিমায়
ক্রমাগত বেড়ে উঠে
প্রেম-প্রীতি ভালোবাসা হৃদয়বত্তার মহিমায়
ছড়িয়ে পড়তে চায়
মানবিক মূল্যবোধ উত্তুঙ্গ মিনারের মতো মাথা তোলে
সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা মনের গভীরে জন্ম নেয়
সৃষ্টির ধারায় উৎসারণের আকুলতা জেগে ওঠে।

(স্বগত-সংলাপ-১)

শত বৈরিতা ও ষড়যন্ত্রের মুখে
মানব-সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক দুর্গোগের মুকাবিলায়
আমি তোমর মতো অটল ও অভয় চিত্তে
দাঁড়িয়ে থাকতে চাই
গড়ে তুলতে চাই সু-উচ্চ বিশাল প্রাচীর

www.nagorikpathagar.org

তোমার মতো কখনো এক পদও পিছু না হটে
আকাশের দিকে শির সমুন্নত রেখে
নির্মাণ করতে চাই প্রতিরোধের দুর্ভেদ্য দেয়াল।
(সু-উচ্চ পাহাড়েরর পাদদেশে দাঁড়িয়ে)
জীবনে আনন্দ নেই, দুঃখ নেই, নেই কোনো স্মৃতি
এখন কেবল চাই একাকীত্ব-একান্ত নিভৃতি।
বিস্মৃতির অন্তরালে আনন্দ গিয়েছে চলে
দুঃখবোধও তা-ই
সুখ-দুঃখ কোনোটাই কাম্য নয়
জীবনের থেকে মুক্তি চাই।
(স্বগত-সংলাপ-৪)
মহানগরী ঢাকার অসহ্য যানজট
আর হাজার হাজার যানবাহনের
জটিল-জটলা
দুপুরের ভীষণ খররৌদ্রের সুতীব্র দাহন
গ্রীষ্মের দুঃসহ গরমের অদৃশ্য প্রতিরোধ
অথবা বর্ষার প্রবল বর্ষণের
তীক্ষ্ণ ফলা
আকাশের বজ্র ও বিদ্যুৎ
সারা শহরময় বৃষ্টি বন্যা
কিংবা শীতের হাড়-কাঁপানো কামড়
মাঘের শীতে যখন জঙ্গলের বাঘও পালিয়ে বেড়ায়
কোনো কিছুই আমার মানস-ভ্রমণকে
ক্ষণ-মুহূর্তের জন্যেও
থামিয়ে দিতে পারে না
আটকে রাখতে পারে না এই রাজধানী নগরীর
ইট-কাঠ-পাথরে গড়া
সুউচ্চ দালান-কোঠা
আকাশচুম্বী দর-দালানের
সুবিশাল কারাগার।
(মানস-ভ্রমণ)
"হত্যা, মৃত্যু আর ধ্বংসকে আলিঙ্গণ করে
অগণিত শহীদের রক্তে স্রোত হয়ে
ইরাকের বীর বাহিনী ও স্বদেশ প্রেমিক জনতা
সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির বিরুদ্ধে
রুখে দাঁড়িয়েছে প্রাণপণে

www.nagorikpathagar.org

....
পররাজ্য লোভী বুশ ও ব্লেয়ারের হামলাকারী সেনাদের
কবর রচিত হচ্ছে ইরাকের মাটিতে মরু-ময়দানে।”

(প্রতিবাদী ঝড়ের তাণ্ডব)

শান্তির কোনো ললিত বাণী নয়
যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধিক্কারের ধ্বনি
কোটি কোটি কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে বিশ্বের দেশে-দেশে
শান্তিপ্রিয় প্রতিটি মানুষ সরবে কিংবা নীরবে প্রতিবাদী
অগণিত মানুষের হাতে শান্তির ব্যানার
অসংখ্য পোস্টার, ফেস্টুন, প্লে-কার্ড
পৃথিবীর দেশে-দেশে জনপদে, শহরে-বন্দরে
সংখ্যাহীন মানুষের হাতে শোভা পাচ্ছে,
রাজপথে, মিছিলে, সমাবেশে
শান্তির সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সবাই দীপ্তকণ্ঠ
এ-ও এক শান্তিপূর্ণ অস্ত্রহীন যুদ্ধ
যুদ্ধবাজ বুশের দেশেও শান্তিবাদীরা সোচ্চার

(যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)

এভাবে দেখা যায়, 'সময়ের বিমর্ষ দর্পণে' কাব্য গ্রন্থের কবি কল্পনার স্বপ্নিল অধিবাস থেকে বাস্তবের দুঃখ-বেদনাপূর্ণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পৃথিবীতে নেমে এসেছেন। এখানে রোমান্টিক ভাব অতটা নেই, আছে নিরবচ্ছিন্ন জীবন সংগ্রামের কথা। তাই কবির ভাব-বিলাসিতা নয়, বরং জীবনের অভিজ্ঞতার যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

পূর্বে উল্লেখ করেছি, মাহ্ফুজউল্লাহ্'র প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও তাঁর আরো প্রায় পাঁচশো অগ্রন্থিত কবিতা রয়েছে, যা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো দিয়ে আরো প্রায় আট/দশটি গ্রন্থ প্রকাশ করা যায়। এ কাজটি কোনভাবে সম্ভব হলে সমকালের একজন প্রধান ও স্বাতন্ত্র্যধর্মী কবিকে জানার এবং তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন করা সহজসাধ্য হতে পারে। এর দ্বারা বাংলা কাব্যের পরিসর ও ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধ হতে পারে।

'সময়ের বিমর্ষ দর্পণে' কাব্যগ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য কাব্যে মাহ্ফুজউল্লাহ্ মূলত রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবিরা মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিকে সুর ও ছন্দের শব্দিত কারুকাজের মাধ্যমে অভিব্যক্ত করেন। মাহ্ফুজউল্লাহ্ অত্যন্ত অনুভূতি-প্রবণ কবি-মনের অধিকারী। জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না, প্রেম-ভালবাসা, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, দারিদ্র্য ইত্যাদি তাঁর কবি-মনে যে অভিঘাত সৃষ্টি করে, তিনি সুর, ছন্দ,

www.nagorikpathagar.org

রঙ, রেখা, শব্দের ব্যঞ্জনায় তা হৃদয়গ্রাহীভাবে প্রকাশ করেছেন। কবির এ প্রকাশভঙ্গী সর্বত্র এক রকম নয়, বহু বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বে অপরূপ। শুধু প্রকাশভঙ্গীই নয়, বিষয়-বৈচিত্র্যেও তা হৃদয়গ্রাহী। এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মাহ্ফুজউল্লাহ্র প্রত্যেকটি কাব্যের বিষয়, ভাব ও উপস্থাপনা একটি থেকে আরেকটি স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। তার ফলে তাঁর প্রতিটি কাব্যের আকর্ষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাহ্ফুজউল্লাহ্ সম্পর্কে অনেকে বলেন, তিনি তাঁর পূর্বসূরী বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ফররুখকে অনুসরণ করেছেন। উত্তরসূরীর উপর পূর্বসূরীর প্রভাব অস্বাভাবিক নয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর পূর্বসূরী কালিদাস, বিদ্যাপতি, বিহারীলাল চক্রবর্তীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রখ্যাত ইংরাজ কবি টেনিসন, শেলী, কীট্স, বায়রন, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ প্রমুখ এবং বিশ্ববিখ্যাত ফারসি কবি হাফিজ, রুমী ও ওমরখৈয়ামের দ্বারাও বহুলাংশে প্রভাবিত হন। প্রতিভাবানরাই কেবল অন্যের প্রতিভা উপলব্ধি করতে পারেন ও তা থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে থাকেন। এটা দোষের কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ঢং বিশেষত বলাকার সুর, ছন্দ, ও প্রকাশভঙ্গীর অনুরণন, 'জুলেখার মনে'র কিছু কিছু কবিতায় লক্ষ্যণীয়। ঐতিহ্যানুসরণ ও পুঁথির ভাষার শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মাহ্ফুজউল্লাহ্ নজরুল-ফররুখ-এর অনুসরণ করেছেন। তবে তিনি কখনও কাউকে অনুকরণ করেন নি। মাহ্ফুজউল্লাহ্ অত্যন্ত শিল্প-সচেতন কবি। কাব্যের কলা-কৌশল, রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে ওয়াকিফহাল। তাঁর কাব্যে পূর্বসূরীদের প্রভাব অস্বীকার না করেও বলা যায়, তিনি কাব্যের ভাব, বিষয়, ছন্দ, শব্দ-চয়ন, প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সর্বদা স্বাতন্ত্র্য-প্রয়াসী ও নিজস্বতা সৃষ্টিতে তৎপর। মাহ্ফুজউল্লাহ্ তাঁর নিজস্ব বর্ণ-সুষমা ও মৌলিকত্বে উজ্জ্বল আধুনিক বাংলা-কাব্যের এক উল্লেখযোগ্য প্রতিভা।

এখানে মাহ্ফুজউল্লাহ্র কবিকৃতি সম্পর্কে দু'টি প্রণিধানযোগ্য উদ্ধৃতি পেশ করছি :

১. "এই সন্তপ্ত জগৎ সংসারের কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্। যেখানে জীবন, যেখানে স্পন্দন, যেখানে হাসির কলধ্বনি, বেদনার নীল ছায়া, যেখানে নদী, নারী, মৃত্তিকা, সেখানেই প্রোথিত তাঁর মূল, সেখানেই বিস্তারিত তাঁর শিকড়। স্নিগ্ধ মমতায়, আর্দ্র ভালবাসায় আর অপরিমিত প্রীতিতে তিনি আঁকড়ে ধরেছেন মনোহর এই জীবনকে, মোহন এই পৃথিবীকে। অমিল থেকে মিলের দিকে তাঁর অনন্ত অভিসার, ঘৃণা থেকে ভালবাসার দিকে তাঁর দীর্ঘ পদযাত্রা। চেতনায় তাঁর কারুকাজ অনুপম, ছন্দিত শব্দ নিয়ে খেলা তাঁর অফুরান। আমাদের হতাশা,

www.nagorikpathagar.org

হাহাকার আর হৃদস্পন্দন ধ্বনিত এই শব্দাবলীর মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের ঝংকার। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌'র কাব্য সম্ভার বাংলা সাহিত্যের সম্পন্ন সম্পদ।" **(আহমেদ হুমায়ুন ঃ ২১.২.১৯৮২)।**

২. "নানা ভাব ও বিষয়কে সচেতন আঙ্গিক বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতায় মূর্ত হয়ে উঠতে দেখি। ...তিনি পুঁথির ভাষার সঙ্গে আধুনিক আঙ্গিককে যুক্ত করে কাব্যরচনায় নিরীক্ষামূলক প্রয়াস পেয়েছেন। আমরা একদিকে তাঁর কবিতায় সৌন্দয্য-সচেতন বিস্ময়মাখা রোমান্টিক সুর সহজেই লক্ষ্য করি, অন্যদিকে অনেক কবিতায় তিনি আবার ব্যঙ্গাত্মক, কঠোর বাস্তববাদী, ঋজু ও দৃঢ়, জীবনে হতাশা, নৈরাশ্য, শঙ্কা, বঞ্চনা এবং অশুভের উপস্থিতি সম্পর্কে নির্ভুলভাবে সচেতন। তাঁর রোমান্টিক কবিতাবলীতে নিসর্গ, পাখি, বৃষ্টি, অরণ্য সন্ধ্যা, রূপালি জলের নদী, প্রেম ও স্বদেশপ্রীতির অনুভূতি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। ...অসুস্থতা, অশুভ এবং ভয়ের উপস্থিতির কথা উচ্চারিত হতে দেখি মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতার অনেক চরণে। কিন্তু কবির মন হতাশায় নিমজ্জিত নয়, তিনি সন্ধানী আশার আলোকের। ... প্রথমে বেদনা, নৈরাশ্যের সুর এবং তারপর প্রত্যয় লালিত বলিষ্ঠ আশাবাদী উচ্চারণ। ... কখনো কখনো হয়তো কবির আশাবাদী উচ্চারণকে মনে হতে পারে ততটা জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তব অভিজ্ঞতা নয় যতটা তাঁর বিশেষ মনোভঙ্গী লালিত রোমান্টিক প্রত্যয়ে অনুপ্রাণিত। এ সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন করা শক্ত। তবে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কিছু লঘু সুরে ব্যঙ্গাত্মক, তীর্যক বিদ্রূপ সমৃদ্ধ কবিতা তাঁর অনুভূতি ও চেতনার প্রসারিত মাত্রিকতা আমাদের সামনে উন্মোচিত করে।...কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমকালীন যুগ-যন্ত্রণার শিকার হয়েও তিনি নৈরাশ্যে বা নৈরাজ্যে নিমজ্জিত নন। তাঁর কাজে তিনি শুভ ও কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন, নিজের অন্তরসত্তার আবেগ ও অনুভূতিকে আকর্ষণীয় উপমা ও চিত্রকল্পের মাধ্যমে রূপায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন। বিশেষভাবে তাঁর অনেকগুলি সনেটের ঋজু সংহত রূপ, মিল-বিন্যাস, ছন্দ প্রকরণ এবং ভাবের অভিব্যক্তি তাঁকে একজন যত্নবান কৃতি কারু-শিল্পী রূপে তুলে ধরেছে।" **(কবীর চৌধুরী ঃ সচিত্র সন্ধানী, ২৭শ সংখ্যা, নভেম্বর, ১৯৮২)।**

'মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত এবং অগ্রন্থিত (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত) অনেক কবিতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মানব-সৃষ্ট বিপর্যয় যে স্বদেশের, বিদেশের ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের মানুষের তথা বিশ্বমানবের জন্য চরম অকল্যাণ ডেকে এনেছে, হত্যা-মৃত্যু-ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছে, সে-কথাও বলেছেন, সে-সবের আলেখ্য বিধৃত করেছেন। বন্যা, নদী-

www.nagorikpathagar.org

ভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদির ভয়াবহ প্রয়ংকারী রূপ এবং মানবিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র বিধৃত হয়েছে তাঁর কবিতায়। অন্যদিকে, মানবসৃষ্ট দুর্যোগ, তথা যুদ্ধ-বিগৃহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, পররাজ্য দখল ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতায় বিধৃত হয়েছে। মানবতাবাদী কবি তাঁর অনেক কবিতায় যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারণাস্ত্রের ব্যবহার ও হত্যা-যজ্ঞের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী এবং সোচ্চার-কণ্ঠ। ইরাকের কুয়েত আক্রমণ, ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আফগানিস্তানে রুশ হামলা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখল এবং ইরাকে মার্কিন হামলা ও ইরাক দখল ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী-কণ্ঠ উচ্চারিত হয়েছে মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কবিতায়।

বায়ান্নর ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ 'বাংলা ভাষা', 'মাতৃভাষা', 'অমর একুশ', ইত্যাদি বিষয়ে বহুসংখ্যক খণ্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা এবং সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছেন। স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিপ্রেমিক, মাতৃভাষা-প্রেমিক মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ স্বদেশ এবং স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও তার ফলে অর্জিত স্বাধীনতা সম্পর্কে অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ মূলত এবং প্রধানত কবি হলেও এক সময় গবেষণা ও মননশীল গদ্য রচয়িতা হিসাবে তাঁর খ্যাতি, তাঁর কবি-খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এতেই বোঝা যায়, এক্ষেত্রে তাঁর অবদান কতটা ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখসহ বহু কবি-সাহিত্যিক সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি বিভিন্ন, বিচিত্র বিষয়ে তিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনা-সমালোচনামূলক অসংখ্য রচনার দ্বারা আমাদের চিন্তা ও মননশীলতার দিগন্তকে প্রসারিত করেছেন। তাঁর গদ্য রচনার ভাষা, বিষয় ও আবেদন যেমন মনোজ্ঞ তেমনি আকর্ষণীয়। আমাদের প্রবন্ধ সাহিত্য তাঁর মূল্যবান অবদানে নানাভাবে ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ।

কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য-সমালোচক ও নজরুল-গবেষক হিসাবে খ্যাতিমান মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ গত অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককাল ধরে কবিতা রচনার পাশাপাশি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি এবং বিশেষভাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করে আসছেন। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক বিশেষত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তিনি গবেষণাধর্মী, তথ্যপূর্ণ ও

www.nagorikpathagar.org

বিশ্লেষণমূলক বহুসংখ্যক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচনায় একটি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদান এবং বিভিন্ন যুগের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের অবদানের মূল্যায়ন। মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থে সমগ্র বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ ও সমকালীন যুগের সাহিত্যের ধারা বিশ্লেষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কবি-সাহিত্যিকদের মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা ছাড়াও ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলন সম্পর্কে বহু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ১৯৫২ সনের ঐতিহাসিক ভাষা-আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তাঁর বহু কবিতা বাংলা ভাষা ও ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পটভূমিতে যুগ-সৃষ্টা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং রবীন্দ্র ও নজরুল যুগের কবিদের বিশেষত তিরিশ ও চল্লিশ দশকের এবং সমকালীন কবিদের নিয়েও গবেষণাধর্মী, বিশ্লেষণমূলক ও মূল্যায়নধর্মী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহী চেতনার ও আধুনিকতার অসামান্য রূপকার কাজী নজরুল ইসলামের জীবন, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সামগ্রিক অবদান সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ বহু মূল্যবান গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন, কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। নজরুল-প্রতিভা ও তাঁর সাহিত্য-সঙ্গীতের মূল্যায়নও করেছেন। চল্লিশ দশকের তথা বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভাধর কবি ফররুখ আহমদের কবি-প্রতিভা এবং তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ সম্পর্কে এবং বাংলা কাব্যে তাঁর অসামান্য অবদান সম্পর্কে মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ষাটের দশকের গোড়া থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। একজন ছান্দসিক কবি হিসাবে তিনি তাঁর বহু প্রবন্ধে-নিবন্ধে কবিতার ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক, রূপরীতি এবং শিল্পরূপ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা লিখেছেন।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র প্রকাশিত প্রবন্ধ-গ্রন্থের তালিকা থেকেই তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতা উপলব্ধি করা যায়। উল্লেখ্য যে, তিনি তাঁর রচনায় সাহিত্যের আলোচনাকে দাঁড় করিয়েছেন ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকায়, মূল্যায়ন করেছেন সমগ্র বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে।

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ একজন দক্ষ গদ্য লেখক, পরিশ্রমী ও তথ্যানুসন্ধানী গবেষক এবং তীক্ষ্ণধী সাহিত্য সমালোচক। তাঁর গদ্য রচনার ও সাহিত্য

www.nagorikpathagar.org

সমালোচনার ভাষা সহজ-সাবলীল ও অবলীলাময়। প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক আবুল ফজলের ভাষায় "(তাঁর) ভাষা সুন্দর, অর্থবহ ও সমালোচনার উপযোগী। নিজেকে ইচ্ছামত প্রকাশের দুর্লভ ক্ষমতাটুকু (তাঁর) আয়ত্তে।" **('নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক গ্রন্থ পাঠের পর অধ্যাপক আবুল ফজলের লেখা পত্র থেকে)।**

'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে ১৯৬৩ সনে প্রখ্যাত নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক মুনীর চৌধূরী বলেন ঃ "... আধুনিক বাংলা কবিতার একজন সচেতন এবং সমঝদার পাঠক হিসাবে গ্রন্থকার নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি বিশ্বাস এবং ধারণাকে হৃদয়গ্রাহী ওজস্বিতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। ...গোটা বইটাই ভ্রান্ত প্রতিপক্ষের এক জোরালো জবাবের ঢঙে লেখা। সে কাজ লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেছেন। মাহ্ফুজউল্লাহ্র বক্তব্য সর্বত্রই স্পষ্ট অনেক স্থলেই কেবল যে জোরালো তাই নয়, ধারালোও বটে। ... মাহ্ফুজউল্লাহ্র বইয়ের আকর্ষণীয় গুণ এর রচনা-প্রণালীর বেগবান ও অনর্গল প্রবাহমানতা... ।" **(রেডিও পাকিস্তান ঢাকা থেকে প্রচারিত)।**

'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' গ্রন্থটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সওগাত' পত্রিকায় বলা হয়, "মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ এই গ্রন্থটিতে ব্যাপকওভাবে সমগ্র বাংলা কাব্য সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। ... গ্রন্থটিতে সর্বত্র লেখকের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণী মনোভাব কাজ করেছে। তাঁর রচনার একটি প্রধান গুণ এই যে, তা অত্যন্ত স্পষ্টবাদিতায় উচ্চারিত ; মন্তব্য প্রকাশে তিনি কোথাও দ্বিধা বা প্রহেলিকার আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

'বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদ ঃ তাঁর শক্তি ও স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপ' গ্রন্থ আলোচনা প্রসঙ্গে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় বলা হয় ঃ "এতোদিন জানতাম তিনি নজরুলের বিশেষজ্ঞ, এখন দেখছি তিনি ফররুখ বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ মূলত এবং প্রধানত কবি। তা সত্ত্বেও তিনি একজন অনুসন্ধিৎসূ গবেষক, অন্নিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং বিশ্লেষণধর্মী সাহিত্য সমালোচক। এত সব গুণের জন্যই তাঁর আলোচনা এতো বিস্তৃতি পেয়েছে এবং আমাদের আকর্ষণ ও কৌতূহলকে জাগ্রত রাখতে পেরেছে। বোধকরি, এখানেই তাঁর আলোচনার সিদ্ধি। কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র মহৎ গুণ তিনি সাহিত্যের সব কঠিন বিষয়গুলিকে সহজভাবে পাঠক-দরবারে উপস্থিত করতে পারেন– তাঁর স্বকীয় ব্যক্তিত্ব-প্রকাশক স্টাইলের মাধ্যমে। এখানেই তাঁর আলোচনার সহজ জয়।" **(তিতাশ চৌধুরী, দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী, ১৫ই জুলাই, ২০০৫)।**

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র সব ধরনের গদ্য রচনা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও সাহিত্য সমালোচনা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তব্য প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি শুধু সূক্ষ্ম অর্ন্তদৃষ্টির অধিকারী সাহিত্য সমালোচকই নন, বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী এবং স্পষ্টবাদী লেখক ও সাহিত্য সমালোচক। প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনা-সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি তথ্যানুসন্ধানী, বিশ্লেষণধর্মী এবং সংশ্লিষ্ট লেখক ও তাঁর রচনার মূল্যায়নে সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভিকচিত্ত।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট অবদানের জন্য ১৯৭৭ সনে বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার লাভ ছাড়াও আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যে ও সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের জন্য 'নজরুল স্মৃতি পুরস্কার' (কলকাতা), আবুল মনসুর আহমদ সাহিত্য পুরস্কার, ভাষা আন্দোলনের অগ্রণী সংস্থা তমদ্দুন মজলিস প্রদত্ত 'মাতৃভাষা পদক' (২০০৩) এবং চট্টগ্রাম সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রদত্ত 'ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৪), একুশে পদক (২০০৭), 'ফররুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন পুরস্কার (২০০৮) লাভ করেন। এছাড়াও তিনি সাংবাদিকতায় বিশিষ্ট অবদানের জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাব প্রদত্ত সম্মাননা পদক এবং ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন প্রদত্ত সম্মাননা পদক ও সংবর্ধনা লাভ করেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা, বিশেষভাবে কাব্য ও প্রবন্ধ, এমনকি, উপন্যাস ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান রয়েছে। তাঁর গল্প ও উপন্যাস এখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এ যাবত তাঁর মোট আটটি কাব্য ও ২৭টি প্রবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও এখনো অগ্রন্থিত কবিতা ও প্রবন্ধের সংখ্যা প্রায় এক হাজার বলে জানা যায় (বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। তাছাড়া, তাঁর রচিত দুটি অগ্রন্থিত উপন্যাস ও এক ডজনের উপর ছোটগল্প রয়েছে। এ থেকে বাংলা সাহিত্যে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র ব্যাপক ও বিচিত্রতর অবদান সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

www.nagorikpathagar.org

আল মাহমুদ ও তাঁর নিজস্ব কাব্যভুবন

আল মাহমুদ (১৯৩৬-) আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি। অসংখ্য কবির ভিড়ে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সনাক্তযোগ্য একজন কবি হিসাবে আধুনিক বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ ভুবনে নিজের আসন চিহ্নিত করে স্বকীয়তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় আধুনিকতার সাথে সনাতন ঐতিহ্য ও গ্রাম-বাংলার প্রকৃতি ও পরিবেশের এক স্বচ্ছন্দ সংমিশ্রণ ঘটেছে। যে কারণে তাঁর কবিতার আবেদন হয়েছে অনেকটা সর্বজনীন ও কালাতিক্রম্য।

আধুনিক বাংলা কাব্যের জনক হিসাবে পরিচিত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩) সবদিক থেকেই বাংলা কাব্যের এক নতুন যুগের প্রবর্তন করেন। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাবকে ধারণ করে বাংলা সাহিত্যে তিনি আধুনিকতার প্রবর্তন করেন। কাব্যের আঙ্গিক, ভাষা-ছন্দ, আবেদন ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী কবিদের থেকে আলাদা। তাঁর কাব্যের ভুবন একান্তই তাঁর নিজস্ব। মাইকেলের পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) এক স্বতন্ত্র কাব্য-ভাষা, ভাব-বিষয়, ঐতিহ্য-চেতনা, আবেদন ও ওজস্বিতা নিয়ে তাঁর এক নিজস্ব বর্ণাঢ্য কাব্য-ভুবন নির্মাণ করেন। রবীন্দ্রনাথের পর কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা কাব্যে তাঁর নিজস্ব ধারা ও স্বতন্ত্র পরিচয় নিয়ে আবির্ভূত হলেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়ের জীবনকালে এবং তাঁদের অব্যবহিত পরে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), 'পল্লী কবি' হিসেবে খ্যাত জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৪), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৪), তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯) প্রমুখ। তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের নিজস্ব ও স্বতন্ত্র ঢং-এ কাব্যের সুষমামন্ডিত বর্ণাঢ্য ভূবন নির্মাণ করেছেন। তাঁদের কবিতার দূরাগত স্বপ্নময় উজ্জ্বল ভূবনে তাঁরা স্ব স্ব মহিমায় দীপ্ত, সমুজ্জ্বল। তাঁদের সমকালে আরো অনেকেই বাংলা কাব্যে তাঁদের নিজ নিজ প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং বাংলা কাব্যে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছেন।

www.nagorikpathagar.org

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে প্রতিভাবান যেসব কবি বাংলা কাব্যের দিগন্তকে নানা বৈচিত্র্য ও বর্ণাঢ্যতায় সুষমামণ্ডিত করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন- সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-৭৫), আব্দুল গণি হাজারী (১৯২১-৭৬), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২), আবুল হোসেন (১৯২২-), সানাউল হক (১৯২৪-৮৩), আবদুর রশীদ খান (১৯২৪-), আতাউর রহমান (১৯২৫-২০০১), আশরাফ সিদ্দিকী (১৯২৭-), আব্দুস সাত্তার (১৯২৭-২০০০), মাযহারুল ইসলাম (১৯২৮-৮৩), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৮), মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ (১৯৩৩-), ফজল শাহাবুদ্দিন (১৯৩৬-), আল মাহমুদ (১৯৩৬-), ওমর আলী (১৯৩৯-), শহীদ কাদরী (১৯৪২-) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আল মাহমুদ নিঃসন্দেহে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। হাজার বছরের বাংলা কাব্যের ইতিহাসে অসংখ্য কবির আগমন ঘটেছে, কিন্তু তাঁদের ক'জন অক্ষয়-অমর হয়ে আছেন কালের ইতিহাসে? কেবল মৌলিক প্রতিভার অধিকারী কবি-সত্তাই টিকে থাকে কালের উদ্দাম গতি ও ঝড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে আর তাঁদের প্রত্যেকেরই থাকে এক একটা স্বতন্ত্র পরিচয়, যা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় তাঁদের কাব্যে।

প্রত্যেক মৌলিক কবিরই একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। এ বৈশিষ্ট্য সব সময় এক রকম হয় না। কিন্তু যার যে রকম বৈশিষ্ট্যই থাক না কেন, প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে আমরা সহজে তাঁকে চিহ্নিত করতে পারি। গোলাপ, বেলী, বকুল- প্রত্যেকেই তার নিজস্ব রং, গঠন ও গন্ধেই সুপরিচিত। প্রত্যেক কবিও তেমনি তাঁর নিজস্ব ভাব, ভাষা, শিল্পনৈপুণ্য ও কাব্যিক আবেদনের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জল। আল মাহমুদ তাঁর নিজস্ব ভাষা-রীতি, শিল্প-নৈপুণ্য, উপমা-রূপকল্পের ব্যবহার ও বিষয়-ভাবনার দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে উঠেছেন।

বাংলা কাব্যে আল মাহমুদের আবির্ভাব উনিশ শতকেব মধ্য-পঞ্চাশে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মৌড়াইলের মোল্লাবাড়িতে ১৯৩৬ সনের ১১ জুলাই তাঁর জন্ম। পিতার নাম মীর আবদুর রব, মাতা রওশন আরা মীর। পিতামহ মীর আবদুল ওয়াহাব আরবি, ফারসি, সংস্কৃত ভাষা জানতেন। মাতামহী বেগম হাসিনা বানু মীরের নিকট বিসমিল্লাহ খানির পর তিনি গ্রামের মসজিদের ইমামের নিকট ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এম. ই. স্কুলে ভর্তি

www.nagorikpathagar.org

হন। সেখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়নের পর জর্জ হিক্সথ হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। অতঃপর সীতাকুণ্ড হাইস্কুল ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। শেষোক্ত হাইস্কুলে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে ১৯৫২ সনে তিনি ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে পড়াশোনা সাঙ্গ করে আত্মগোপনের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভাষা আন্দোলন কমিটির পক্ষ থেকে ঐ সময় একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তরুণ আল মাহমুদের চার লাইনের একটি কবিতা ছাপা হয়। আর তাতেই পুলিশের রোষাণলে পড়ে আত্মগোপন করেন। এ অবস্থায় তিনি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে গিয়েও আশ্রয় নেন। তারপর ঘুরে ফিরে ঢাকা শহরে এসে আশ্রয় নেন ১৯৫৪ সনে এবং কালক্রমে এটাই হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ী আস্তানা। ঢাকায় আসার আগেই স্কুল-জীবনে তিনি কবিতা লেখার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কবিতা লেখার কলা-কৌশল জানার জন্য তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্য আরেকজন খ্যাতনামা এবং তাঁর অগ্রজ কবি মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্র সান্নিধ্যে যান এবং বাংলা কবিতার ছন্দ সম্পর্কে তাঁর নিকট তালিম গ্রহণ করেন। আল মাহমুদ তাঁর আত্ম-জীবনীতে এ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেছেন। ঢাকায় এসে তিনি ওমর আলী, শহীদ কাদরী, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, জিয়া হায়দার, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ কবিদের সাথে পরিচিত হন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে কবিতা চর্চায় মেতে উঠেন।

ঢাকায় এসে আল মাহমুদ ১৯৫৪ সনে প্রথমে 'দৈনিক মিল্লাত' পত্রিকায় প্রুফরীডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৫৫ সনে মিল্লাত ছেড়ে তিনি 'কাফেলা'য় যোগ দেন সহ-সম্পাদক হিসাবে। সেখান থেকে 'দৈনিক ইত্তেফাক'এ প্রুফ রীডার হিসাবে যোগ দেন ১৯৬৩ সনে। পরে সেখানে তিনি মফস্বল সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৮ সনে সাময়িকভাবে 'ইত্তেফাক' বন্ধ হলে তিনি চট্টগ্রামে 'বই ঘর'-এর প্রকাশনা কর্মকর্তা হিসাবে যোগ দেন। এ সময়ই অর্থাৎ ১৯৬৮ সনের সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁর বিখ্যাত 'সোনালী কাবিনে'র সনেটগুলো রচিত হয়। অতঃপর দৈনিক ইত্তেফাক পুনরায় চালু হলে তিনি তাতে সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতে গিয়ে তৎকালীন মুজিবনগর সরকারের ৮নং থিয়েটার রোডে প্রতিরক্ষা বিভাগের স্টাফ অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

www.nagorikpathagar.org

দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী একটি গ্রুপ ঢাকাস্থ র‍্যাঙ্কিং স্ট্রীটস্থ 'দৈনিক সংগ্রাম' অফিস দখল করে 'দৈনিক গণকণ্ঠ' প্রকাশ করলে আল মাহমুদ তার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার-বিরোধী র‍্যাডিক্যাল পত্রিকা হিসাবে গণকণ্ঠ সরকারের রোষাণলে পতিত হয় এবং আল মাহমুদ কারারুদ্ধ হন। এর তিন দিন পর গণকণ্ঠও বন্ধ হয়ে যায়। দশ মাস জেলে থাকার পর তৎকালীন সরকার প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭৫ সনে নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীতে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত করেন। ১৮ বছর চাকরি করার পর তিনি ১৯৯৩ সনের ১০ জুলাই শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পরিচালক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 'দৈনিক সংগ্রামে' সহকারী সম্পাদক হিসাবে কয়েক বছর কাজ করেন।

ইতঃমধ্যে চট্টগ্রাম থেকে 'দৈনিক কর্ণফুলি' প্রকাশিত হলে সম্পাদক হিসাবে সেখানেও তাঁর নামে মুদ্রিত হতে থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্রিকার লেখক ও কলামিস্ট হিসাবে তিনি কাজ করেন। কবিতা লেখা ও সাহিত্য-চর্চায় তিনি এখনো সক্রিয় রয়েছেন। সমকালীন বাংলা কাব্যে তিনি অন্যতম প্রধান শক্তিমান কবি হিসাবে পরিচিত। তবে কবি হিসাবে সমধিক পরিচিত হলেও গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ সাহিত্যেও তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আল মাহমুদ এক অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

মধুসূদন আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রথম এবং অন্যতম প্রধান কবি হলেও রবীন্দ্রনাথ আধুনিক তথা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। রবীন্দ্র-যুগে রবীন্দ্র-প্রভাব এত ব্যাপক ও সর্বব্যাপী ছিল যে, সেটা অনেকটা একঘেঁয়েমীর মতো মনে হয়। নজরুল এ একঘেঁয়েমীর হাত থেকে মুক্তি দিয়ে বাংলা কাব্যে নতুন প্রাণ-প্রবাহ সৃষ্টি করেন। এরপর তিরিশের কবিরা বাংলা কাব্যে আরেকটি নতুন মাত্রা যোগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীতে যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি-প্রত্যাশী চেতনার বিস্তার ঘটে। তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশসহ তিরিশের অনেক কবিই তখন যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তি-প্রত্যাশী, মানবতাবাদী কবিতা চর্চায় ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশ তখন পরাধীন, দ্বিতীয় যুদ্ধের পর পঞ্চাশের (বাংলা ১৩৫০, ইংরাজি ১৯৪৩ সন) মন্বন্তরে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু, স্বাধীনতা

www.nagorikpathagar.org

আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, ইংরাজ ও হিন্দুদের দ্বিমুখী শোষণ-নির্যাতনে অতিষ্ঠ মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে যুদ্ধ-বিরোধী, শান্তিবাদী মনোভাবের কোন স্থান ছিল না। এ প্রেক্ষাপটে ফররুখ আহমদের আবির্ভাব। নিরন্ন-বুভুক্ষ, স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তৎকালীন পরাধীন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যে স্বপ্নময় আবেগ সৃষ্টি করে ফররুখ আহমদের কাব্যে সে আবেগ রোমান্টিক কাব্য-ভাষা খুঁজে পায়। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান সৃষ্টির নেতাদের ডিগবাজি, প্রতারণা ও মুনাফিকীর কারণে ফররুখ আহমদসহ অনেকেরই সে লালিত স্বপ্নের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হয়। নেতারা যে আদর্শের কথা বলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁরা বেমালুম সেটা ভুলে যান। ফলে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। এ হতাশা ক্রমান্বয়ে আরো বৃদ্ধি পায় বাংলা ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি নানারূপ বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে। এ ধরনের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কবি আল মাহমুদের কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে লেখালেখি শুরু করলেও তাঁর প্রথম কাব্য 'লোক লোকান্তর' প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩৭০ (১৯৬৩) সনে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় যেমন কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা ও জীবনী ইত্যাদি সাহিত্যের নানা আঙ্গিকে তিনি কাজ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদত্ত হলোঃ

কাব্যগ্রন্থ ঃ ১. লোক লোকান্তর (১৯৬৩), ২. কালের কলস (১৯৬৬), ৩. আল মাহমুদের কবিতা (অরুণা প্রকাশনী, ১৯৭১), ৪. সোনালী কাবিন (১৯৭৩), ৫. মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬), ৬. অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), ৭. পাখির কাছে ফুলের কাছে (১৯৮০), ৮. আল মাহমুদের কবিতা (আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৮০) ৯. প্রেমের কবিতা (আনন্দ প্রকাশনী, ১৯৮১), ১০. আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৭), ১১. প্রহরান্তে পাশফেরা (১৯৮৮), ১২. একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), ১৩. মিথ্যাবাদী রাখাল (১৯৯৩), ১৪. আমি, দূরগামী (১৯৯৪), ১৫. হৃদয়পুর (কোলকাতা, ১৯৯৫), ১৬. দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭), ১৭. কবিতাসমগ্র (অনন্যা, ১৯৯৭), ১৮. দ্বিতীয় ভাঙণ (২০০০), ১৯. একটি পাখি লেজঝোলা (২০০০), ২০. নদীর ভিতরে নদী (২০০১)।

গল্পগ্রন্থ ঃ ১. পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫), ২. সৌরভের কাছে পরাজিত (১৯৮৩), ৩. গন্ধবণিক (১৯৮৮), ৪. আল মাহমুদের গল্প (শিল্পতরু, ১৯৯১),

www.nagorikpathagar.org

৫. প্রেমের গল্প (১৯৯১), ৬. ময়ূরীর মুখ (১৯৯৪), ৭. গল্পসমগ্র (অনন্যা, ১৯৯৭)।

উপন্যাস ঃ ১. ডাহুকী (১৯৯২), ২. কাবিলের বোন (১৯৯৩), ৪. উপমহাদেশ (১৯৯৩), ৫. কবি ও কোলাহল (১৯৯৩), ৬. পুরুষ সুন্দর (১৯৯৪), ৭. নিশিন্দা নারী (১৯৯৫), ৮. মরু মুষিকের উপত্যকা (থ্রিলার, ১৯৯৫), ৯. আগুনের মেয়ে (১৯৯৫), ১০. যে পারো ভুলিয়ে দাও (১৯৯৬), ১১. পুত্র (২০০০), ১২. চেহারার চতুরঙ্গ (২০০১), ১৩. উপন্যাস সমগ্র-১ ও ২ (সময়, ২০০১)।

প্রবন্ধ ঃ ১. দিনযাপন (১৯৯০), ২. কবির আত্মবিশ্বাস (১৯৯১), ৩. কবিতার জন্য বহুদূর, ৪. নারী নিগ্রহ (১৯৯৭), ৫. কবিতার জন্য সাত সমুদ্র (১৯৯৯), ৬. সমকালীন কাব্য-আন্দোলনের ধারা, ৭. সাহিত্য সঙ্গীত চিত্রকলা।

আত্মজীবনী ঃ যেভাবে বেড়ে উঠি (১৯৮৬)

অন্যান্য গ্রন্থ ঃ ১. সঙ্গীত সিরিজ-১ (গুল মোহাম্মদ খান, কানাইলাল শীল, ফুলঝুরি খানা), ২. সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (১৩৮৪), ৩. সমকালীন কাব্য আন্দোলনের ধারা (স্মৃতিকথা), ৪. মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) (জীবনীগ্রন্থ), ৫. বাংলাদেশ শিশু একাডেমী (১৯৮৯)।

সম্পাদনা ঃ ১. কাফেলা (১৯৫৫), ২. গণকণ্ঠ (৭২-৭৫), ৩. আহত কোকিল-বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী (১৯৭৭), ৪. আব্বাসউদ্দীন (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), ৫. শিল্পকলা (১৯৮০), ৬. Shilpakala (১৯৮০), ৭. আফগানিস্তান আমার ভালোবাসা (যৌথ, ১৯৮৬), ৮. দৈনিক কর্ণফুলী (১৯৯৫-)।

আল মাহমুদের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতা বিদেশী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

Selected Poems of Al Mahmud (Translated by Kabir Chowdhury, 1981), Poems from Bangladesh : Ed : Pritish Nandy, Lyebrid press, London Voice of Modern Asia : Ed. Dorothy Blair Shimer, a Mentor Book, New York, 1973; Bharatiya Janpith, Delhi-1973; CBET BOZROJ, an anthology of poems from Bangladesh, Moscow 1973, Sherthaye Aj Bangladesh: an anthology of poems from Bangladesh-Tehran, 1973, Poems of Bangladesh: Ed: Pritendra Mukharjee, Paris 1974: GANGESDELTA: Ed. Lother Lutza and Aloker Anjan Dasgupta,

www.nagorikpathagar.org

Horst Erdman Verlaye-1994 : La POESIE CONTEMPO RAINE DU BANGLADESH : ALLANCE FRANCAISE, DACCA 1992 ; THEIS SAME SKY : A Collection of Poems from around the world. MAXWELL MAC MILLAN INTERNATIONAL, New York, 1992, Poetic Imagination of Al Mahmud : Beyond the Blue Beneath the Bliss, Transleted by Mahbubul Alam Akhond (2000), ইত্যাদি।

প্রত্যেক মানুষেরই একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকে। সৃষ্টিশীল প্রতিভার ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি প্রযোজ্য। তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব জীবনীদৃষ্টি দ্বারা আমাদের নিকট পরিচিত। অনেক সময় ভাল লাগা, মন্দ লাগার মাপকাঠিও তৈরি হয় এর ভিত্তিতে। নিজস্ব বর্ণ-সুষমা, সুরভি-সৌকর্যে যেমন ফুলের পরিচয়, কবির পরিচয়ও তেমনি তাঁর কাব্য-কর্মের মাধ্যমে। আর এ পরিচয়ের প্রধান ভিত্তি হলো তাঁর রচিত কাব্যে প্রতিফলিত বিশ্বাস, বিষয়-বৈভব, ভাবৈশ্বর্য, বাক-বিন্যাস, কলা-নৈপুণ্য, ছন্দ, প্রতীক, উপমা, রূপক ইত্যাদির ব্যবহারে। বিশ্ববিখ্যাত অমর কবি হোমার, মিল্টন, হাফিজ, রুমী, জামী, ফেরদৌসী, শেখ সাদী, ইকবাল, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ফররুখ এঁরা সকলেই তাঁদের স্বকীয় জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তাঁদের কাব্যে। এ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় ব্যতীত বলিষ্ঠ উজ্জ্বল কাব্য-কবিতা রচনা করা অসম্ভব। বিশ্বাসের দীপ্তি প্রত্যেক কবির কাব্য-ভুবনে চন্দ্রালোকের উজ্জ্বল কিরণ-প্রভা বিকিরণ করে। আল মাহমুদও বিশ্বাসের বৃত্তে আবর্তিত। তবে তাঁর বিশ্বাস কোন একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে স্থিত থাকেনি, নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে এক স্থায়ী, উজ্জ্বল রূপ লাভ করেছে।

প্রথম জীবনে আল মাহমুদ ছিলেন অনেকটা সংশয়বাদী, বামপন্থী, মার্কসীয় চিন্তা-চেতনার ধারক। ধীরে ধীরে তাঁর বিশ্বাসের বলয়ে পরিবর্তন ঘটে। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয়লাভকারী মুক্তিযোদ্ধা কবি। দেশ স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশে ফিরে তৎকালীন সরকারের বিরোধিতার কারণে কারারুদ্ধ হন। এ কারাবাসকালেই তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি সংঘটিত হয়। তাঁর ভাষায় ঃ

"আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগত-রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। ... এভাবেই আমি ধর্মে এবং ধর্মের সর্বশেষ এবং পূর্ণাঙ্গ বীজমন্ত্র পবিত্র কোরানে এসে উপনীত হয়েছি।" **(আল মাহমুদ ঃ কবিতার জন্য বহুদূর, পৃ. ৩২-৩৩)**।

www.nagorikpathagar.org

এরপর কবি আরো স্পষ্ট ভাষায় তাঁর বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের কথা উচ্চারণ করেন ঃ

"...আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহলোকেই আমার ধর্ম, ইহলোক ও পরলৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি। আমি মনে করি একটি পারমাণবিক বিশ্ববিনাশ যদি ঘটেই যায়, আর দৈবক্রমে মানবজাতির যদি কিছু অবশেষও চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে ইসলামই হবে তাদের একমাত্র আচরণীয় ধর্ম। এই ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্যই আমার কবিস্বভাবকে আমি উৎসর্গ করেছি। ... আল্লাহ্ প্রদত্ত কোন নিয়মনীতিই কেবল মানবজাতিকে শান্তি ও সাম্যের মধ্যে পৃথিবীতে বসবাসের সুযোগ দিতে পারে। আমার ধারণা পবিত্র কোরানেই সেই নীতিমালা সুরক্ষিত হয়েছে। এই হলো আমার বিশ্বাস। আমি এ ধারণারই একজন অতি নগণ্য কবি।" **(পূর্বোক্ত, পৃ.৩৩)**।

কবি অন্যত্র বলেন ঃ "আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি জীবনের একটি অলৌকিক কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম হিসেবে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে। **(আল মাহমুদ ঃ কবির আত্মবিশ্বাস, পৃ ১১)**।

আল মাহমুদ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আরো বলেনঃ "নাস্তিকতার ওপর মানবতা দাঁড়াতে পারে না, পারবে না।" **(ঐ, পৃ১৮)**।

আল মাহমুদ কোন গতানুগতিক মুসলমান নন। আধুনিক বিভিন্ন মতবাদ, প্রচলিত প্রধান ধর্মসমূহ ইত্যাদি গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের সাথে তা মিলিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই প্রচলিত ধারণা ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নয়, গভীর প্রত্যয়ের সাথে মুক্ত মন ও উদার যুক্তিপূর্ণ মানসিকতা থেকেই তিনি ইসলামকে একমাত্র সত্য ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি অবিচল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারেন ঃ

> উদিত নক্ষত্র আমি। শূণ্যতার বিরুদ্ধগামী, পূর্ণ করে তুলেছি বিস্তার।
> আমি আলো, দীপ্ত করে তুলেছি পৃথিবী।
> আমি তাল মাত্রা বাদ্যযন্ত্র ছাপিয়ে ওঠা আত্মার ক্বেরাত।
> আরম্ভ ও অন্তিমের মাঝখানে স্বপ্ন দেখি সূর্যের সিজদারত নিঃশেষিত
> আগুনের বিনীত গোলক।
> নবী ইব্রাহিমের মত অস্তগামীদের থেকে আমি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি।
> আমিও জেনে গেছি কে তুমি কখনো অস্ত যাও না।
> কে তুমি চির বিরাজমান। তোমাকে সালাম। তোমার প্রতি

www.nagorikpathagar.org

মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছি। এই আমার রুকু, এই আমার সেজদা।

(হে আমার আরম্ভ ও শেষ ঃ দোয়েল ও কবিতা)

এখানে কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়দীপ্ত আত্মসমর্পিত চিত্তের গভীর আকুতি নিঃসংশয় প্রার্থনার মত অভিব্যক্ত হয়েছে। কবির এ বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে, অন্তরের একান্ত গভীর উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। অতএব, ধরে নেয়া যায় তা নিখাদ ও অকৃত্রিম। কবির বিশ্বাসের সাথে বিষয়, বিষয়ের সাথে ঐতিহ্য-চেতনা ও বিষয়-বৈভবের দিক থেকে তাঁর পূর্বসূরী নজরুল-ফররুখের সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় থাকলেও কবি-কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন স্বাদ ও মেজাজের। এ বৈশিষ্ট্যের গুণেই আল মাহমুদকে সহজে চেনা যায়। ঐতিহ্য ধারণ করে ঐতিহ্যের ছড়ে নতুন ঝংকার সৃষ্টি করার মধ্যেই মৌলিকতার প্রকাশ। আল মাহমুদের মধ্যে সে মৌলিকতা সুস্পষ্ট।

আল মাহমুদের বিশ্বাস, ঐতিহ্যবোধ ও মৌলিকত্ব তাঁর জীবন-বাস্তবতার সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। অনেক চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে তিনি যে বিশ্বাসের পটভূমিতে এসে স্থিত হয়েছেন, তা মূলত তাঁর জীবন-স্বভাবের সাথে এবং তাঁর কবিতার সাথে অবিমিশ্র হয়ে গেছে। তাই তিনি দৃঢ়তার সাথে বলতে পারেন ঃ "এই জন্য আমাকে গাল দেয়া হয়। বলা হয়, আমি হলাম মৌলবাদী। যে যাই বলুক না কেন সবচেয়ে বড় কথা হলো, আমার একটা আদর্শ আছে। অনেকের তো এ জিনিসটি নেই। আমি মুসলমান। কাজেই আমার ধর্ম, আমার বিশ্বাস আমার সাহিত্যে আসবেই। এটাই তো আমি লিখবো। আমি যেটা জানি না সেটা কেনো লিখবো?" **(সাহিত্যে ত্রৈমাসিক 'চাঁড়ুলিয়া' ওমর বিশ্বাস সম্পাদিত, আল মাহমুদ সংখ্যা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট-সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ.১১৮)**

আল মাহমুদ রোমান্টিক কবি। রোমান্টিক কবি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হলো ঐন্দ্রজালিক কবি-কল্পনায় অবস্তুগত সৌন্দর্য, রূপ, সুষমা ও আনন্দের অনুধ্যান করা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কোন রোমান্টিক কবিই ইন্দ্রিয়ানুভূতির ঊর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ পরাবাস্তবতার উপর তাদের কল্পনার বিস্তার ঘটাতে পারে না। তারা একটা অবলম্বন খোঁজেন। কখনো এ অবলম্বন হয় নারী, কখনো ফুল, পাখি, গাছ-বৃক্ষ-লতা, অনন্ত নিঃসীম প্রকৃতি অথবা একত্রে এসব কিছুই। তবে তাদের কল্পনা বস্তু-গত অবলম্বনের মধ্যে কখনো সীমাবদ্ধ থাকে না। বিন্দু থেকে সিন্ধু, বস্তু থেকে অবস্তুগত, ইন্দ্রিয় থেকে অতিন্দ্রীয়লোকে ধাবিত হয়, সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের মধ্যে ঘটে তার অনন্ত বিস্তার। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি শেলি,

www.nagorikpathagar.org

কীটস্, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলের মধ্যেই রোমান্টিকতার এ প্রাণধর্ম বিদ্যমান। প্রথমোক্ত তিন ইংরাজ কবি প্রধানত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির রূপ- সৌন্দর্যের মধ্যেই তাঁদের কবি-কল্পনা প্রায়শ স্ফূর্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির কবি। তবে প্রথম জীবনে নারী, বিশেষত নারীর দেহগত সৌন্দর্য পরবর্তীতে দেহাতীত সৌন্দর্যের রূপ লাভ করেছে এবং আরো পরে তা অধ্যাত্ম্য সৌন্দর্যের অসীমতায় বিলীন হয়েছে। আল মাহমুদের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। তাঁর কবিতার প্রধান উপজীব্য হলো নারী ও প্রকৃতি। নারীর দেহগত রূপ- সৌন্দর্যের উপলব্ধি কবি-কল্পনাকে এমন বিহ্বল করেছে যে, তিনি প্রায়ই শ্লীলতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রম করে গেছেন। দেহজ কামনা-বাসনার অভিব্যক্তি কবি-কল্পনাকে বহুলাংশে ম্লান করে দিয়েছে। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে অতিন্দ্রীয়লোকে তাঁর আর অগ্রগতি ঘটেনি। বস্তুকে অতিক্রম করে দেহাতীত অবস্তুগত কল্পনার দৈরথের স্পর্শ তিনি পাননি। দেহজ কামনা-বাসনা এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতি তাঁর কবি-কল্পনাকে মাটির সংলগ্ন করে রেখেছে। যেমন–

১. শঙ্খমাজা স্তন দু'টি মনে হবে শ্বেতপদ্ম কলি,
(সিম্ফনি : লোক-লোকান্তর)

২. স্তন দুটি দুধের ভারে ফলের আবেগে ঝুলে আছে।
(অন্তরভেদী অবলোকন : সোনালি কাবিন)

৩. চাষীর বিষয় নারী
উঠোনে ধানের কাছে নূয়ে থাকা
পূর্ণস্তনী ঘর্মাক্ত যুবতী।
(কবির বিষয় : অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না)

৪. সামান্য চৌকাঠ শুধু তুচ্ছ করে এসো এই ঘরে
বাসনার স্থিরমুদ্রা স্পর্শ যদি করে নাভিমূল ;
কী হবে শরীর ঢেকে, জানালার পাট বন্ধ করে ?
(বধির টঙ্গার : কালের কলস)

৫. তারপর তুলতে চাও কামের প্রসঙ্গ যদি নারী
ক্ষেতের আড়ালে এসে নগ্ন কর যৌবন জরদ,
(সনেট-১০ : সোনালী কাবিন)

৬. গাছের আড়াল থেকে ইশারায় ডাকছে। ফলটার
হলুদ কষ গড়িয়ে পড়ছে তার নগ্ন উরু বেয়ে।
(চিঠি : একচক্ষু হরিণ)

৭. রাতের নদীতে ভাসা পাউড়ী পাখির ছতরে,
শ্লিষ্ট ঢেউয়ের পাল যে কিসিমে ভাঙ্গে ছলছল

www.nagorikpathagar.org

আমার চুম্বন রাশি ক্রমাগত তোমার গতরে
ঢেলে দেবো চিরদিন মুক্ত করে লজ্জার আগল

(সনেট-১৪ : সোনালী কাবিন)

আল মাহমুদের প্রথম দিককার কাব্য-কবিতায় এরূপ দেহজ কামনা-বাসনা ও নারীর নগ্ন দেহের উত্তেজক বর্ণনা বহু রয়েছে। তবে পরিণত বয়সে আল মাহমুদ অনেকটা মার্জিত হয়ে এসেছেন। নারী, নদী, প্রকৃতির প্রসঙ্গ এখনো আছে, কিন্তু তাঁর উপস্থাপনা ও রূপকল্প সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। বিশেষ করে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে আল মাহমুদের চিন্তা-চেতনার জগতে যে পরিবর্তন ঘটে, তখন থেকে তাঁর কাব্যের উপজীব্য, রূপকল্প, চিত্রকল্প, উপমা ও প্রতীকের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। যেমন–

... ঝড়ো বাতাসের
ঝাপটা থেকে তোমার উড়ন্ত চুলের গোছাকে
ফিরিয়ে আনো মুঠোর মধ্যে। বেণীতে বাঁধো
অবাধ্য অলোকদাম।
কেন জিনেরা তোমার কেশ নিয়ে খেলা করবে?
আজ সমুদ্রের দিকে তাকাও। দ্যাখো জোয়ারে ফুলে উঠেছে
দরিয়া। চাঁদের গুঁড়িয়ে যাওয়া প্রতিবিম্বকে নিয়ে
টাকার মতো লোফালুফি করছে উন্মত্ত তরঙ্গের মাতাল হাত।
তোমার আব্রু ঠিক করে নাও। এইতো ছতর ঢাকার সময়।
কোথায় হারিয়ে এসেছো তোমার বুকের
সেপটিপিন?
আজ ইবলিসকে তোমার ইজ্জত শুঁকতে দিও না।

(নীল মসজিদের ইমাম : বখতিয়ারের ঘোড়া)

এখানেও নারী আছে। কিন্তু এ নারী নগ্ন দেহের আদিম লালসার প্রতীক নয়, সম্ভ্রমশীলা মহিয়সী নারী। এ নারী কামোত্তজনা সৃষ্টি করে না, সম্ভ্রম জাগায়। নারীর তিন শাশ্বত রূপ : বধূ, মাতা, জায়া। তিন রূপই যেমন প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার প্রতীক আবার তেমনি চিরন্তন কল্যাণ ও শান্তি-সুখের শাশ্বত প্রতীক। আল মাহমুদ প্রথম জীবনে এবং যৌবনে নারীকে শুধুই বধূ, প্রেমময়ী কামসঙ্গীরূপে দেখেছেন। এখনো তাই দেখেন। তবে সে প্রেমময়ী বিবসনা রমণী এখন খানিকটা বসনাবৃত মাধুর্যময়ী কল্যাণব্রতী রমণীর রূপ লাভ করেছে। পরিণত আল মাহমুদের রোমান্টিক কবি-দৃষ্টিতে নারী অনেকটা মাতা-জায়ার

www.nagorikpathagar.org

রূপেও আবির্ভূত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে তাঁর সুপরিণতির লক্ষণ। আল মাহমুদ তাঁর কবিতায় নারী ও প্রকৃতিকে উপজীব্য করার বিষয়ে লিখেছেন ঃ "আমার কবিতার প্রধান বিষয় হলো নারী। আমি এক সময় ভাবতাম একজন কবি-পুরুষের কাছে নারীর চেয়ে সুন্দর আর কী আছে ? না, কিছু নেই। পৃথিবীর যত জাতির কবিতায় যত উপমা আছে আমি আমার সাধ্যমত পরীক্ষা করে দেখেছি সবই নারীর সাথে তুলনা করেই দয়িতার দেহের উপমা দিতে কবিরা পৃথিবী নামক এই গ্রহকে চষে ফেলেছেন। এমন নদী, পর্বত বা প্রান্তর নেই যার সাথে কবিতা তাদের প্রেমিকার দেহ-সৌন্দর্যের তুলনা দেননি।

আমার কবিতার আরেক প্রধান বিষয় হলো প্রকৃতি। আমি নিসর্গরাজি অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে এমন একটা সংগুপ্ত প্রেমের মঙ্গলময় ষড়যন্ত্র দেখতে পাই যা আমাকে জগৎ রহস্যের কার্যকারণের কথা ভাবায়। এক ঝাঁক পাখি যখন গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে বেড়ায়, মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে আসে পতঙ্গ ও পিঁপড়ের সারি, আর মৌমাছিরা ফুল থেকে ফুলে মধু শুষে ফিরতে থাকে আমি তখন শুধু এই আয়োজনকে সুন্দরই বলি না বরং অন্তরালবর্তী এক গভীর প্রেমময় রমণ ও প্রজনন ক্রিয়ার নিঃশব্দ উত্তেজনা দেখে পুলকে শিহরিত হই।" **(কবিতার জন্য বহু দূর, পৃ.৩২-৩৩)**

আল মাহমুদ তাঁর কবিতার অন্যতম প্রধান উপজীব্য প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন ঃ "আমি একদা আমার কৈশোরে প্রকৃতির মধ্যে নিজের তন্ময় মুগ্ধতাকে আবিষ্কার করে মত্ত হয়ে থাকতাম। ট্রেনে কোথাও যেতে একটা পাহাড় বা বেগবতী নদীর দিকে তাকিয়ে এমন পুলক অনুভব করতাম যে, কি আর বলবো! মনে হতো প্রকৃতির দিগন্ত প্রসারিত বিস্তারের মধ্যেই বুঝি জগৎ রহস্যের চাবিখানি আমার জন্য কেউ লুকিয়ে রেখেছে। একদিন আমি তা খুঁজে পাবো। কিন্তু ভ্রমরের মতো প্রতিটি ফুলের প্রস্ফুটনে আমার অনুসন্ধানী মন ঘুরে বেড়িয়েও জগৎ রহস্যের কোন কিনারা দেখতে পায়নি। বরং রহস্যের জাল আর বৃদ্ধি পেয়েছে। ... এই রহস্যের কথা আমি আমার কিশোর বয়সের কবিতায় খানিকটা উচ্চারণ করেছি। এই উচ্চারণের মধ্যে শুধু মুগ্ধতাই আছে।" **(দিন যাপন, পৃ.১০)**

কবির বক্তব্য থেকে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণা করা চলে। তবে সময় অতিক্রমের সাথে সাথে কবির অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুরও ব্যাপ্তি ঘটেছে, বিশেষ করে তাঁর নতুন উপলব্ধি তথা ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন তা তাঁর একাত্তরের স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য নারী ও নিসর্গ এ পর্যায়েও

www.nagorikpathagar.org

তাঁর অন্যতম প্রধান উপজীব্য। তবে তার উপস্থাপনা ও প্রকাশভঙ্গী হয়েছে ভিন্ন- অনেকটা শ্লীল ও রুচিশীল। এটা তাঁর সুপরিণতিরই লক্ষণ।

আল মাহমুদের একটি উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য হলো তাঁর কবিতার শব্দ চয়ন ও তার কুশলী বিন্যাস। অনেকের ধারণা, কবিতা মূলত শব্দের শিল্প। শব্দ ব্যবহারে সজ্ঞানতা ও তার সুপ্রযুক্ত কুশলী ব্যবহারের উপর কবিতার সাফল্য-সার্থকতা অনেকখানি নির্ভরশীল। কবিতায় অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় শব্দ ব্যবহারের কোনই অবকাশ নেই। সুনির্বাচিত শব্দের যথার্থ অর্থবহ প্রয়োগেই সার্থক কবিতার সৃষ্টি হয়। এজন্য মহানবী (স.) বলেন ঃ "আশ্‌শেয়রু বিমানঝিনাতিল কালাম, হুসনুহ কালামে ওয়া ক্বিহু হুকা কাবিহিল কালাম।" অর্থাৎ কবিতা মূলত কথা বা শব্দ- তার ভালটা ভাল এবং তার খারাপটা খারাপ বা পরিত্যাজ্য। **(মিশকাত শরীফ)**। মহানবী (স.) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন ঃ "কিছু কিছু কথা বা শব্দ এমন যা যাদুর মত।" **(আওন আল বারী, ৬/৯৬)**। এ কথার অর্থ হলো, সুচয়িত অর্থপূর্ণ শব্দের কুশলী বিন্যাস ভাব, কল্পনা, ছন্দ ও আবেগের সাথে যখন সুবিন্যাস্ত হয় তখনি তা কবিতার মোহনীয় জাদুতে পরিণত হয়।

শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আল মাহমুদের একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। এক্ষেত্রে তিনি যত না নজরুল-ফররুখের অনুসারী তার চেয়ে জসীম উদ্‌দীন অনেক কাছাকাছি। আল মাহমুদ তাঁর কবিতার শব্দ সন্ধানে অভিধান খুঁজে পেরেশান হন না, অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য গ্রীক বা হিন্দু মিথোলজি থেকে উপমা খোঁজেন না, আমাদের একান্ত পরিচিত, গ্রাম-বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত ও সহজবোধ্য শব্দের কুশলী ব্যবহারে তাঁর কবি-কল্পনার বর্ণাঢ্য রূপায়ন ঘটান। বিদেশী, অপরিচিত মিথোলজি থেকে দুর্বোধ্য উপমা সংগ্রহ না করে তিনি গ্রাম-বাংলার সাধারণ নারী-পুরুষ, তাদের বিচিত্র জীবন, নিসর্গের দৃশ্যপট থেকে সহজ ও সাধারণ উপমা-রূপক-চিত্রকল্প সংগ্রহ করে তাঁর কবিতার বাণী-রূপ নির্মাণ করেন। আল মাহমুদের এ সারল্য ও সহজতা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ফলে তাঁর কাব্যে কোন কৃত্রিমতা নেই, দুর্বোধ্যতা নেই। আবহমান বাংলার সোঁদা মাটির গন্ধ তাঁর কাব্যের শরীরে ছড়ানো-ছিটানো। যেমন–

কে জানে ফিরলো কেনো, তাকে দেখে কিষাণেরা অবাক সবাই।
তাড়াতাড়ি নিড়ানির স্তূপাকার জঞ্জাল সরিয়ে
শস্যের শিল্পীরা এসে আলের উপর কড়া তামাক সাজালো।
এক গাদা বিচালি বিছিয়ে দিতে দিতে
কে যেনো ডাকলো তাকে ; সস্নেহে বললো, বসে যাও,

www.nagorikpathagar.org

লজ্জার কি আছে বাপু, তুমি তো গাঁয়েরই ছেলে বটে,
আমাদেরই লোক তুমি। তোমার বাপের
মারফতির টান শুনে বাতাস বেহুঁশ হয়ে যেতো।
পুরনো সে কথা উঠলে এখনো দহলিজে
সমস্ত গাঁয়ের লোক নরম নীরব হয়ে শোনে।

কত সহজ অনাড়ম্বর আটপৌঢ়ে ভাষা! অথচ কত সুন্দর কাব্যময় চিত্রকল্প। এ অনাড়ম্বর শব্দ ব্যবহারে মুনশীয়ানা ও চিত্রকল্প ব্যবহারের কৌশল তাঁর একান্ত নিজস্ব। এ রকম আরো দু'একটি উদাহরণ :

গ্রামীণ ব্যাংকের চালে উড়ে এসে বসেছে হুতুম
রৌদ্রঝরা দিন শেষে ধেয়ে আসে মরুর রজনী,
চোর ও শেয়াল ছাড়া আর সবি নিঃসাড় নিঝুম
সিঁদেল ইঁদুর খোঁজে স্বাবলম্বী বিধবার ননী।
পেঁচা তা লক্ষীর পাখি চোরের ওপরে বাটপার
ইঁদুরের রক্ত চেটে পূজো পায় কুশীদজীবীর,
গ্রামীণ ব্যাংকের চালে চমৎকার ইঁদুর আহার
কিষাণীর শূন্য ভাঁড়ে এক ফোঁটা পুঁজির শিশির।

(খরা সনেট গুচ্ছ-৪, দোয়েল ও দয়িতা)

অথবা,

কখন যে কোন মেয়ে বলেছিল হেসে :
নাবিক তোমার হৃদয় আমাকে দাও,
জলদস্যুর জাহাজে যেও না ভেসে
নুন ভরা দেহে আমাকে জড়িয়ে নাও।
জল ছেড়ে এসো প্রবালেই ঘর বাঁধি
মাটির গন্ধ একবার ভালবেসে
জল ছেড়ে এসো মাটিতেই নীড় বাঁধি
মুক্তো কুড়াতে যেয়োনা সুদূরে ভেসে।

(সমুদ্র-বিষাদ/ লোক লোকান্তর)

আরো একটি উদাহরণ–

যদি যান, কাউতলী রেলব্রীজ পেরুলেই দেখবেন
মানুষের সাধ্যমত
ঘরবাড়ী।

www.nagorikpathagar.org

চাষা হাল বলদের গন্ধে থমথমে
হাওয়া।
কিষাণের ললাট লেখার মতো নদী,
সবুজে বিস্তীর্ণ দুঃখের সাম্রাজ্য।

(রাস্তাঃ লোক লোকান্তর)

শব্দ ব্যবহারে অনায়াস-সাধ্য সহজ নৈপুণ্য দেখাবার সাথে সাথে উপমা, রূপক ব্যবহারেও আল মাহমুদ বিরল মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। এক্ষেত্রেও তাঁর কবি-কল্পনার স্বাতন্ত্র্য ও সহজতা সকলকে বিমুগ্ধ করে, কবি মৌলিকত্বকে করে তোলে সুস্পষ্ট। যেমন–

মাটিতে মোরব্বার মত ছিদ্র করে ভরে তোলে নিজেদেরই কবরের ঢিবি।
(হে আমার অক্লান্ত বিচরণশীল উরতের প্রশংসায় ফুল তোলা বালিশ)।

(দৈত্যের বদলে এক পাল তোলা আত্মা ঃ দোয়েল ও দয়িতা)

পাতাল রেলের যান্ত্রিক অজগরের উদরে তুর্কী রাতার মশলদার রানের মত
হজম হতে হতে যখন একটু দুলনিতে দুলছি।

(লন্ডনের গল্প ঃ দোয়েল ও দয়িতা)

পিয়ালার মতো দুটি বক্ষপদ্মে উড়ে গেল দৃষ্টি ভ্রমর।

(অসুখে একজন ঃ কালের কলস)

তুমি আমার অসুখ ঘরে বাসক পাতা
অসুস্থতার গন্ধমোছা ঘরের দাওয়া
তুমি আমার বর্ষাজলের সিক্ত ছাতা
উষ্ণ কোন গ্রীষ্মদিনের ঠাণ্ডা হাওয়া।

(বেহায়া সুর ঃ কালের কলস)

তবে কি প্রার্থনা করবো ? না, মৃত্যু তো চেঙ্গিসের
অশ্বের মত দ্রুতগামী, বধির।

(অন্তরভেদী অবলোকন ঃ সোনালী কাবিন)

আর আমার চোখ ছিল গ্লাসে ভিজানো
ইছবগুলের দানার মতো জলভরা।

(আমার চোখের তলদেশে/ সোনালী কাবিন)

এ রকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। আমাদের পরিচিত পরিবেশ থেকে শব্দ, রূপক, উপমা, চিত্রকল্প সংগ্রহ করে আল মাহমুদ তাঁর সুরভিত, মনোরম, বর্ণাঢ্য কাব্যের উদ্যান সাজিয়েছেন। তাঁর কাব্য-ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য ঃ

www.nagorikpathagar.org

"কবিতা রচনার বেলায় আমি আমার নিজের জন্য একটি সুবিধামত ভাষা তৈরি করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। এই শব্দ-সম্ভারও বহমান। খুব ব্যাপকভাবে না পারলেও আধুনিক বাংলা ভাষার গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচুর শব্দরাজি আমি আমার রচনায় ব্যবহার করে পরিতৃপ্ত।" **(ভূমিকা ঃ আল মাহমুদের কবিতা)**।

আল মাহমুদ অন্যত্র বলেন ঃ "আমি আমার কবিতার জন্য একটি পছন্দমত ভাষাভঙ্গী উদ্ভাবন করতে গিয়ে আঞ্চলিক শব্দরাজির সন্ধান পাই। অকস্মাৎ আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বাংলা ভাষার সমকালীন সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দরাজি বহু কবির বিচিত্র ব্যবহারে ও যথেচ্ছ আচরণে তিরিশ দশকেই বিস্বাদ, এমন কি পরবর্তী কবিদের জন্য গন্ধহীন পুষ্পের পচা স্তূপে পণিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দের যে অক্ষয় ভাণ্ডার রয়েছে সেখান থেকে ব্যাপকভাবে শব্দ আহরণ করে সাহিত্য রচনা করতে না পারলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একঘেঁয়েমি কাটবে না। এই আহরণ নির্বিচার হলে চলবে না। প্রতিভাবান কবি ও কথাশিল্পীর অন্তরদৃষ্টি সেখানে একান্ত দরকার। ...আধুনিক বাংলা ভাষার চলতি কাঠামোকে পরিত্যাগ করে নয় বরং এই কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক শব্দের কাব্যময় প্রয়োগকে নিশ্চিত করতে হবে। তবেই ভাষা লাফিয়ে উঠবে সমুদ্র তরঙ্গের মত। ... আমাদের ভাষাও এক স্বতন্ত্র বাংলা ভাষা। আমাদের রাজধানী নগরীকে ঘিরে মহল্লায় মহল্লায় ইট-কাঠ ও ইমারতের প্রতিটি প্রকোষ্ঠে, সাজানো বিপণীকেন্দ্রে, মাঠে-ময়দানে পাক খাচ্ছে যে নব্য সতেজ শব্দরাজি আর বিচিত্র বাকভঙ্গী যা আধুনিক বাংলা ভাষার কাঠামোর মধ্যেই আঞ্চলিক ও প্রাকৃত শব্দের সচ্ছল গতায়াতে জেট প্লেনের মত গতিশীল, আমরা সেই দ্রুতগামী আধুনিক বাংলা ভাষারই কবি। আমি নিজেও।" **(কবিতার জন্য বহুদূর ঃ আল মাহমুদ, পৃ. ৩২)**।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আল মাহমুদের কাব্য-ভাষা সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গের ভাষা থেকে আমাদের ভাষার একটা পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য দিন দিন আরো বেড়ে যাচ্ছে কারণ আমাদের ভাষা যেখানে আঞ্চলিক ভাষার শব্দরাজিতে পূর্ণ হয়ে ক্রমান্বয়ে সতেজ ও সমৃদ্ধ হয়ে দেশের মানুষ ও মৃত্তিকা সংলগ্ন হচ্ছে, পশ্চিবঙ্গের বাংলা ভাষা ততই হিন্দী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবে দিন দিন তার নিজস্বতা হারাচ্ছে। আল মাহমুদ তাই যথার্থই আমাদের আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহার করে বাস্ত বতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি যথার্থই আমাদের কবিদের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে সর্বপ্রথম যিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আবুল মনসুর আহমদের মত ঢাকাকে আধুনিক বাংলা ভাষার রাজধানী বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এটা এক যথার্থ স্বপ্নদ্রষ্টা কবির সাহসী উচ্চরণ। আল মাহমুদের সবগুলো কাব্যেই এই বিশিষ্ট কবি-ভাষার পরিচয় সুস্পষ্ট। এ কারণেই ফররুখ-পরবর্তী বাংলা কাব্য সাহিত্যে আল মাহমুদ একজন সনাক্তযোগ্য স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মৌলিক প্রতিভাধর কবি।

আধুনিক জীবনে নানা ধরনের অস্থিরতা। আমাদের সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। ফলে অনেক কবির কবিতায়ও ভাষা ও চিন্তার অস্পষ্টতা ও জটিলতা এসেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আধুনিকতার সকল লক্ষণ ধারণ করেও আল মাহমুদ এ জটিলতা ও অস্পষ্টতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কয়েকটি উদাহরণঃ

১. "বধূবরণের নামে দাঁড়িয়েছে মহামাতৃকূল
গাঙের ঢেউয়ের মতো বলে কন্যা কবুল কবুল।"

২. "নদীর চরের প্রতি জলে-খাওয়া ডাঙার কিষাণ
যেমন প্রতিষ্ঠা করে বাজখাঁই অধিকার তার,
তোমার মস্তকে তেমনি তুলে আছি ন্যায়ের নিশান
দয়া ও দাবীতে দৃঢ় দীপ্তবর্ণ পতাকা আমার।"

৩. "কই হারামজাদা, দেখুম আজকা তোর হগল পুংটামি
কোনখানে পাড়ো তুমি জবর সোনার আন্ডা, কও মিছাখোর?
তাজ্জবের মতো তারপর বলেই টানবে লেপ,
পেখম উদাম করে দেখবে এক বেশরম কাউয়ার গতর।"

আল মাহমুদের কবিতায় গ্রাম বাংলা, গ্রামীণ দৃশ্যপট, গ্রামীণ মানুষ সবই এসেছে যেমন অনায়াস স্বচ্ছন্দে, আধুনিক নাগরিক জীবন ও নগর-প্রসঙ্গও এসেছে তেমনি অকৃত্রিম সহজতায়। কবি বলেন ঃ

"স্বপ্নে আমার কুশল পুছে রোজ
ভাল কি আছ ? হায়রে ভাল থাকা
নগরবাসী কে রাখে কার খোঁজ।"

(এক নদী ঃ সোনালী কাবিন)

ঊনিশ শো বায়ান্ন সনে ভাষা আন্দোলনের সময় কবি ভাষা আন্দোলন বিষয়ক কয়েক ছত্র কবিতা লিখে পুলিশের নজরে পড়ে সেই যে গ্রাম ছেড়ে ঢাকা শহরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারপর এ শহরই হয়েছে তাঁর জীবন-জীবিকার অবলম্বন। কবি এখানেই কাটিয়েছেন তাঁর যৌবনের প্রারম্ভ থেকে সারাটি জীবন।

www.nagorikpathagar.org

ঘর থেকে বের হয়ে শহরে আসার সে স্মৃতিটা তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে এভাবে–

> "ছিটকানিটা আস্তে খুলে পেরিয়ে গেলাম ঘর
> মস্ত বড় শহরটা এই করছিল থর থর।"

নগরবাসী কবি নগরকে যে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে স্বস্তি পেয়েছেন তা নয়। নগর জীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, কলুষতা, হৃদয়হীনতা ও ক্লান্তিকর একঘেঁয়েমিপূর্ণ জীবনযাত্রায় কবি প্রায়শই অসহায় ও বিপন্ন বোধ করেন। অনেক সময় তিনি মনে করতে বাধ্য হন যে, তিনি বুঝি এখানকার কেউ নন। কবি তাই বলেন ঃ

> "আপনি উল্টোপথে বাজারে এসেছেন,
> এটাতো বেঈমানের গলি।
> গাধামুখো পুরুষ আর কুকুরমুখো
> কসবীদের বাজার। এখানে সবুজ
> কোথায় পাবেন?
> আপনি বুঝেছি এ হাটের লোক নন।"
> **(হৃদয়পুর ঃ আমি দূরগামী)**

আল মাহমুদের এ জীবনবোধ ও উপলব্ধি সম্পর্কে বিশিষ্ট সাহিত্য-সামালোচক অন্নদা শংকর রায় বলেন ঃ "তাঁর কবিতার ভাষা অকৃত্রিম, অনাড়ম্বর, সহজ, সরল, প্রবাহমান, সুমধুর। ছন্দের উপর তাঁর অসামান্য দখল। তিনি স্পষ্টভাষী। তাঁর হৃদয় ঠিক জায়গাতেই আছে। গ্রামের জন্য গ্রামবাসী জনগণের জন্য পল্লী প্রকৃতির জন্য তাঁর হৃদয় আকুল। নাগরিক জীবন তাঁকে আকর্ষণ করে না। শহরে তিনি পরবাসী।"

আল মাহমুদের কবি-পরিচয় ও তাঁর বৈশিষ্ট্য উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্ণ সঙ্গত ও যথাযথ সন্দেহ নেই। বাংলা কাব্যে ফররুখ আহমদের পরে যে দু'জন কবি সর্বাধিক খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তাঁরা হলেন শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ। দু'জনেই প্রায় সমসাময়িক। পঞ্চাশের দশকে উভয়ের কাব্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। দু'জনের আদি নিবাস গ্রামাঞ্চলে হলেও প্রথম জন আজীবন নগরবাসী এবং দ্বিতীয় জন যৌবনের প্রারম্ভ থেকে নগরবাসী। তা সত্ত্বেও শামসুর রাহমান একজন নাগরিক কবি, আর আল মাহমুদ পরবর্তীতে নগরবাসী হয়েও গ্রাম-জনপদে মুক্ত প্রকৃতির অন্তর্লীন স্বভাবের কবি। একজন ইউরোপীয় ভাবধারা ও মানবতাবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ, অন্যজন দেশজ চিন্তা-চেতনা, আদর্শ ও

www.nagorikpathagar.org

ঐতিহ্য লালিত প্রগাঢ় আন্তরিকতায় দীপ্ত কবিসত্তা-অতএব, জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে তিনিই যে অধিক প্রাধান্য পাবার যোগ্য তা বোধ করি, বলার অপেক্ষা রাখে না। সাহিত্যে গ্রহণযোগ্যতার একটি চিরন্তর মানদণ্ড রয়েছে, তা হলো জীবনধর্মিতা-জীবনের সাথে যা ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট জীবনের সুখ-দুঃখ, পূর্ণতা-অপূর্ণতা, চাওয়া-পাওয়া, আশা ও স্বপ্নময়তার আশ্লেষে যা সৃষ্ট, তার আবেদন তত স্থায়ী ও ব্যাপক। এদিক থেকে আল মাহমুদ ফররুখ-উত্তর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কবি বলে অনেকের ধারণা। আল মাহমুদের জীবন-সংশ্লিষ্টতা, ঐতিহ্যপ্রিয়তা, বিশ্বাসের প্রগাঢ়তা এবং সর্বোপরি অসাধারণ কবি-প্রতিভা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিজস্ব কাব্য-ভুবন নির্মাণের সক্ষমতা তাঁকে বাংলা কাব্য-জগতে যথারীতি এক মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে।

'লোক লোকান্তর' 'কালের কলস', 'সোনালী কাবিন'-এর আল মাহমুদ আর 'বখতিয়ারের ঘোড়া', 'দোয়েল ও দায়িতা', 'দ্বিতীয় ভাঙন'এর আল মাহমুদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য সত্ত্বেও কবি-প্রতিভার স্ফূরণে উভয় ক্ষেত্রেই কবি আন্ত রিক ও জীবন-স্বভাবে উদ্দীপ্ত। এ প্রসঙ্গে ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'জিজ্ঞাসা' সম্পাদক শিবনারায়ণ রায়ের একটি মন্তব্য অতিশয় প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "পচাঁত্তর সালে আল মাহমুদের সঙ্গে প্রথম চাক্ষুস পরিচয় হবার আগে থেকেই আমি তাঁর কবিতার একজন মুগ্ধ পাঠক। সমকালীন যে দু'জন বাঙালি কবির দুর্দান্ত মৌলিকতা ও বহমানতা আমাকে বার বার আকৃষ্ট করেছে তাঁদের একজন বাংলাদেশের আল মাহমুদ অন্যজন পশ্চিমবঙ্গের শক্তি চট্টোপাধ্যায়। 'জিজ্ঞাসা' প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় আল মাহমুদের একগুচ্ছ কবিতা আগ্রহী হয়ে প্রকাশ করি। আমার মনে হয়েছে যে, বাংলা কবিতায় তিনি নতুন সম্ভাবনা এনে দিয়েছেন। পশ্চিম বাংলার কবিরা যা পারেননি তিনি সেই অসাধ্য সাধন করেছেন ; আঞ্চলিক ভাষা, অভিজ্ঞতা, রূপাবলীকে তিনি নাগরিক চেতনায় সন্নিবিষ্ট করে প্রাকৃত অথচ ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ এক কাব্য-জগৎ গড়ে তুলেছেন। জসীম উদ্‌দীন এবং জীবনানন্দ উভয়ের থেকেই তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কবি। আল মাহমুদের গুচ্ছ কবিতা প্রকাশের পর অনেক বাংলাদেশী পাঠক পত্র লিখে জানান যে, আল মাহমুদ বর্তমানে ইসলামপন্থী প্রচারক হয়ে উঠেছেন যে তিনি সরকারের সমর্থন ও প্রগতিবিরোধী, যে সেই কারণে তাঁর প্রতি আমার মত র‍্যাডিক্যাল মানবতন্ত্রীর অনুরাগ অযৌক্তিক ও অসঙ্গত। উত্তরে আমি আল মাহমুদের আরেক গুচ্ছ কবিতা 'জিজ্ঞাসা' তৃতীয় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় প্রকাশ করি এবং পাঠক-পাঠিকাদের জানাই যে, কবির ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অংশ

www.nagorikpathagar.org

ভাগ অথবা তার বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সমর্থক না হয়েও তাঁর কবিতা উপভোগ করা সম্ভব। অনুভবের সততায়, কল্পনার মৌলকতা, শব্দ ব্যবহারে দক্ষতা, উপমা ও ব্যঞ্জিত বাকপ্রতিমা উদ্ভাবন শক্তি যার কবিতায় প্রত্যক্ষ তার বিশ্বাস ও ব্যবহার যাই হোক না কেন তাঁর কবিতায় সাড়া দেয়া কাব্যনুরাগীর পক্ষে স্বাভাবিক। ঢাকায় পৌঁছার পর বিভিন্ন ছোটখাট আলোচনায় আল মাহমুদ সম্পর্কে বিরূপ কথা শুনি। যাঁরা বলেন, তাঁরা অধিকাংশই তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা অধ্যাপক ; কেউ কেউ কবি ও সাংবাদিক। তিনি যে একজন বড় কবি একথা অবশ্য তাঁরা অনেকেই মানেন। কিন্তু তাঁদের আশংকা যে ইসলামী গোঁড়ামি, পশ্চিম এশিয়ার পেট্রো ডলার এবং সামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা এই তিনে মিলে বাংলাদেশের সমূহ ক্ষতি করতে পারে এবং কোন শিল্পী তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, যখন ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং সামরিক সরকারকে সমর্থন করেন তখন তাঁকে আর শ্রদ্ধা করা চলে না। তাঁদের কথা থেকে এটুকু বুঝতে পারি যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই আল মাহমুদের বিরোধী এবং ঢাকয় বর্তমানে সম্ভবত তিনি নিঃসঙ্গ এবং প্রবাহমান প্রধান ভাবধারা থেকে বিচ্ছিন্ন।" **(দ্র. উপমা ঃ আল মাহমুদ সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২৫-২৬)।**

নজরুলকেও তাঁর ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য চেতনার কারণে নিঃসঙ্গ করে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাঁর প্রতিভার সাত রঙা ঔজ্জ্বল্যে সকল বিদ্বেষপূর্ণ প্রচারণাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেন। অনুরূপ একই কারণে ফররুখ আহমদকেও একঘরে করার চেষ্টা হয়। নজরুলের মত তিনি প্রতিবাদী ছিলেন না কিংবা আত্মপক্ষ সমর্থন বা আত্মপ্রচারণায় অভ্যস্থ ছিলেন না। আল্লাহর উপর দৃঢ় ঈমানে বলীয়ান ফররুখের মত এক অসাধারণ প্রতিভাকে তাই নীরবে অভিমানে, অনাহার ও বিনা চিকিৎসায় অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে অকালে ঝরে পড়তে হয়। আল মাহমুদকেও হয়ত একই ভাগ্যবরণে বাধ্য করার চেষ্টা চলে। উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে তার প্রমাণ মেলে। বাস্তবে আরো অনেক প্রমাণ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আল মাহমুদ কিছুটা ভিন্ন ধাঁচের। তাই নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

"আধুনিক কবির কোন বন্ধু হয় না।...যূথবদ্ধভাবে রাজনীতি, ছিনতাই বা অন্যকিছু চলতে পারে। কিন্তু কবি হবে নিঃসঙ্গ। কবির অনুরাগী কিংবা অনুরাগিণী দু'একজন থাকতে পারে। অবস্থার বিপাকে এক-আধজন প্রেমিকও। কিন্তু কবির সাথে অন্য কবির দিবস যামিনী সৌহার্দ্য রক্ষা কবিতা নির্মাণে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। **(উপমা, ১৯৯৪, পৃ. ১৭)।**

www.nagorikpathagar.org

অতএব, আদর্শিক কারণে আল মাহমুদের যে নিঃসঙ্গতা, তা কবিকে মনোক্ষুণ্ণ করেনি বরং কবির কাব্য-চর্চার ক্ষেত্রে নিঃসঙ্গতা বা অন্যের উপেক্ষা অনেকটা শাপে বর হয়েই দেখা দিয়েছে। এটা যে কোন অভিমানের কথা নয়, তা তাঁর নিরন্তর সৃষ্টিকর্ম ও এর বৈচিত্র্য থেকে সহজেই ধারণা করা চলে। কবির আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় থেকেই যে এরূপ ঘটেছে তা নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফররুখ আহমদ প্রসঙ্গে কবি বলেন ঃ "ফররুখ আহমদকে একঘরে করে রাখা, তাঁর সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও সাহিত্যিক পরিণাম জানা থাকা সত্ত্বেও আমি ইসলামকেই আমার ধর্ম, ইহলোক ও পারালৌকিক শান্তি বলে গ্রহণ করেছি।" **(কবিতার জন্য বহু দূর পৃ. ৩৩)।**

তাঁর পেট্রোডলার প্রাপ্তি সম্পর্কিত যে অপপ্রচার সে সম্পর্কে কবি বলেন ঃ "ইসলাম গ্রহণ করে বুঝেছি, আমি বৈষয়িক দিক দিয়ে খুব বেশী বুদ্ধিমানের মত কাজ করিনি। কারণ পেট্রোডলার দূরে থাক, আমার মত নও মুসলিমদের এ তল্লাটে পেটে পাথর বাঁধার মত অবস্থা প্রায় সবারই। ...যারা আমার ইসলাম গ্রহণকে পেট্রোডলারের কারসজি বলে প্রচার করে একধরনের আন্তর্জাতিক বিরূপতা সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন তাদের জানিয়ে রাখি, আমার ভাগ্যে এখনও কোনরূপ সিকে ছিঁড়ে নি। **(কবির আত্মবিশ্বাস পৃ. ১১)।**

তাই দেখা যায়, আল মাহমুদের নিঃসঙ্গতা তাঁর বিশ্বাসের কারণে। এ বিশ্বাসে তিনি দৃঢ়বদ্ধ, তাঁর আত্মার গভীর থেকে উৎপন্ন এ বিশ্বাস। তাই এ বিশ্বাস তাঁকে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, হতাশায় ম্রিয়মান ও স্থবির হয়ে পড়েননি।

আল মাহমুদের কাব্য-কর্মের প্রতি নিবিষ্ট দৃষ্টিপাত করলে তিনটি পর্যায় চোঁখে পড়ে। তাঁর 'লোক লোকান্তর' (১৯৬৩), 'কালের কলস' (১৯৬৬) ও ' সোনালী কাবিন' (১৯৭৩) পর্যন্ত একটি পর্যায়। এখানে নারী ও প্রকৃতি একান্ত ভাবে তাঁর কবি-কল্পনাকে উদ্রিক্ত করেছে। এ পর্যায়ে নারীর দেহগত রূপ-সৌন্দর্য কবিকে এমনভাবে আকৃষ্ট করেছে যে, তাঁর প্রেম যৌনতা ও দেহজ কামনা-বাসনার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। তাই এ প্রেম একান্ত বাস্তবসম্মত ও আবেগময়। পাঠকের মনকে তা সহজেই তরলিত করে। আল মাহমুদের প্রকৃতি-প্রেমও একান্ত অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক। বাংলার শ্যামল-সুন্দর প্রকৃতি চিরদিনই এর অধিবাসীদেরকে নানাভাবে আকৃষ্ট-মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলার সবুজ নিসর্গ, ফুল, পাখি, নদী, শ্যামলবরণ নারী সেই চর্যাপদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত সকল কবি-শিল্পী, সংবেদনশীল মানুষকেই কমবেশী আকৃষ্ট করেছে।

www.nagorikpathagar.org

সকলেই এর রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনায় অকুণ্ঠ। তবে সকলের বর্ণনাই যে একরকম তা নয়, আবার সকলের বর্ণনাই সমান মনোমুগ্ধকর তাও নয়। আল মাহমুদ বাংলার কোমল পলিমাটির কোলে মেঘ-মেদুর আকাশের নিচে বেড়ে ওঠা মানুষ। প্রকৃতির নিবিড় আলো-ছায়া, মেঘ-রৌদ্দুরের আনাগোনার মধ্যে আল মাহমুদের দুরন্ত কবি-কল্পনার বিকাশ। বাড়ির পাশের তিতাস নদী, নদী-পাড়ের ঘন শ্যামলতা, শালবন-বাঁশবনের ফাঁকে জীর্ণ মায়াবী কুটির, গাছে গাছে ফুল-ফলের বাহার, নানা রঙের পাখিদের কিচির মিচির শব্দ সবই একান্ত অন্তরঙ্গভাবে আল মাহমুদের কবিতায় রঙ-বর্ণ-গন্ধ-সুষমা বিস্তার করেছে।

'মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো' (১৯৭৬) থেকে 'দোয়েল ও দয়িতা' (১৯৯৭) পর্যন্ত কবিতার যুগকে আল মাহমুদের দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায়। ১৯৭৪ সনে কারাবাসের সময় থেকেই আল মাহমুদের চিন্তা-চেতানায় যে পরিবর্তন সূচিত হয় তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় তাঁর এ দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য-কবিতায়। তাঁর এ পর্যায়ের কবি-কর্মে ইসলামী ঐতিহ্য, ভাব-চেতনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষঙ্গ স্থান লাভ করেছে। কুরআনের বিভিন্ন বিষয়-কাহিনী, চরিত্র এই পর্যায়ে কবি-কল্পনার মূর্ত হয়ে উঠেছে। বরং এই চেতনার ফলে বাংলা কাব্যে বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নানা রূপকল্প, উপমা ও অনুষঙ্গ যুক্ত হয়েছে।

'দ্বিতীয় ভাঙনে' (২০০০) এসে আল মাহমুদ আবার বাঁক ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। এটাকে তাঁর কাব্য-কর্মের তৃতীয় পর্যায় বলা যায়। প্রতিভাবান ব্যক্তিরা কখনো একস্থানে স্থির হয়ে থাকে না বেশী দিন। একবিংশ শতকে আল মাহমুদ আরো বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব নিয়ে তাঁর কাব্য-ভুবনকে বিচিত্রতর করে তোলার প্রয়াসে তৎপর। আল মাহমুদের সে ক্ষমতা আছে। এ পর্যায়ে আল মাহমুদ অধিকতর ঐতিহ্যসচেতন হয়ে উঠেছেন। মূলত আল মাহমুদের চিন্তা-চেতনায় ইসলামের প্রভাব, তাঁর কাব্য-কবিতায় তার প্রকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং সে সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিশ্বানুভূতি ও দেশ-বিদেশ পরিভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আল মাহমুদ সাহিত্য-সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধি হিসাবে ভারত, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, বৃটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ সফর করেন। বিদেশ পরিভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর কাব্যে নতুন ব্যঞ্জনা, বক্তব্য ও অনুভূতির সঞ্চার করেছে। এটা তাঁর সুপরিণতিরই সুস্পষ্ট লক্ষণ।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি এ পর্যন্ত যেসব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন তা নিম্নরূপ ঃ

www.nagorikpathagar.org

১. বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৬৮)
২. জয়বাংলা সাহিত্য পুরস্কার, কলকাতা (কবিতা, ১৯৭২)
৩. জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার (কবিতা, ১৯৭৪)
৪. সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক (ছোটগল্প, ১৯৭৬)
৫. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮০)
৬. শিশু একাডেমী (অগ্রণী ব্যাংক) পুরস্কার (ছড়া কবিতা, ১৯৮১)
৭. আবুল মনসুর আহমদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার (ছড়া কবিতা, ১৯৮৩)
৮. অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৮৩)
৯. কাফেলা সাহিত্য পুরস্কার, কোলকাতা (কবিতা, ১৯৮৪)
১০. হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (ছোটগল্প, ১৯৮৪)
১১. একুশে পদক (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, কবিতা, ১৯৮৭)
১২. ফিলিপ্‌স সাহিত্য পুরস্কার (কবিতা, ১৯৯০)
১৩. নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক (কবিতা, ১৯৯০)
১৪. বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই-সাহিত্য পুরস্কার- ১৯৯১

www.nagorikpathagar.org

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

নজরুল-গবেষক হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ (জন্ম ঃ ৮ চৈত্র ১৩৪২, ২১ মার্চ ১৯৩৬; মৃত্যু : ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, ১৬ মে ২০০৭) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বশিরহাটের আরশুল্লাহ্ গ্রামে একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফিলউদ্দীন আহ্‌মদ, মাতার নাম মোমেনা খাতুন। তাঁর পরিবার বিপুল বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী ছিল। এছাড়া, কলকাতায় তাঁদের চামড়া ব্যবসা ছিল। এরূপ ধনাঢ্য ও বিত্তবান পরিবারে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশও বিরাজমান ছিল। সে সমৃদ্ধ আলোকিত পরিবেশেই তাঁর শৈশব জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তিনি বাদুড়িয়া মডেল ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৫২ সনে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর ১৯৫২ সনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে আই.এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ইতঃমধ্যে ১৯৫২ সনের অক্টোবরে তিনি তৎকালিন পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসার ফলে লেখাপড়ায় ব্যাঘাত ঘটে। অতঃপর ১৯৫৩-৫৪ সনে তিনি খুলনার বি.এল. কলেজে আই.এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তিনি আই.এস-সি পরীক্ষা দিতে পারেন নি। এখানেই তাঁর আনুষ্ঠানিক লেখাপড়ার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তিনি জীবিকার্জনের তাগিদে কর্ম-জীবনে প্রবেশ করেন।

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের কর্ম-জীবন তেমন বর্ণাঢ্য নয়। প্রায় সারাজীবনই তাঁকে নানা প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করে জীবন-যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়েছে। ১৯৬১ সনে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান লেখক সংঘের মুখপত্র 'লেখক সংঘ পত্রিকা'র সহকারী সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৬২ সনে লেখক সংঘ পত্রিকা 'পরিক্রম' নামে প্রকাশিত হলে তিনি তার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৭৩ সনে তিনি 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা'র সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৮০ সনের মার্চে ঢাকা ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে প্রকাশনা বিভাগে অনিয়মিত সম্পাদক ও পরে ১৯৮২ সনে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশে' নিয়মিত সম্পাদক হিসাবে যোগ

www.nagorikpathagar.org

দেন। উক্ত সংস্থায় তিনি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন 'অগ্রপথিকে'র প্রথম নির্বাহী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এরপর তিনি 'দৈনিক আল মুজাদ্দেদে' প্রথমে সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক নিযুক্ত হন। সর্বশেষে তিনি দৈনিক সংগ্রামের নিয়মিত কলাম লেখক হিসাবে কাজ করেন।

নজরুল-বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিশেষভাবে খ্যাত হলেও শাহাবুদ্দীন আহমদ শুধু জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) এর উপরই নয়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), জসীম উদ্‌দীন (১৯০৩-৭৬) বে-নজীর আহমদ (১৯০৩-৮৩), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) সহ বহু খ্যাতনামা কবি-সাহিত্যিকের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এছাড়া, বাংলা চতুর্দশ শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য সকল কবি-সাহিত্যিকদের উপর তিনি ধারাবাহিক ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত 'সাহিত্য-চিন্তা' গ্রন্থটি এ জাতীয় প্রবন্ধের একটি সংকলন। একজন প্রকৃত গবেষক, সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাই শুধু 'নজরুল-গবেষক' বা 'নজরুল-বিশেষজ্ঞ' অভীধায় তাঁর অসামান্য প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন করা অসঙ্গত।

এছাড়া, নজরুল-গবেষক বলতে যা বোঝায়, শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ ছিলেন তারও অধিক। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর অনেকেই গবেষণা করেছেন, কিন্তু শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ শুধু তাঁর উপর গবেষণা করেছেন, বললে যথেষ্ট বলা হয় না। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে নজরুল-অনুরক্ত, নজরুল-বিশারদ ও একান্তভাবে নজরুলগত প্রাণ। নজরুলের সমগ্র রচনাবলী তিনি অধ্যয়ন করেছেন, নজরুল কাব্যের একটা বিরাট অংশ তিনি যেকোন সময় অবলীলায় মুখস্ত আবৃত্তি করতে পারতেন এবং নজরুল সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। নজরুলের গান, কবিতা, প্রবন্ধ, অনুবাদ, নজরুল কাব্যের ভাষা, ছন্দ, রূপরীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাঁর যথাযথ মূল্যায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। এমন গভীরভাবে নজরুলকে হয়ত আর কেউ পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হন নি। তাই তাঁকে সাধারণ অর্থে নজরুল-গবেষক না বলে নজরুল-বিশেষজ্ঞ বলাই সঙ্গত। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক আব্দুল কাদিরের একটি মন্তব্য অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

"নজরুল সাহিত্যে আছে নতুন ভাব ও তার প্রকাশোপযোগী নতুন আঙ্গিক। তার বিষয়কল্পনার মাহাত্ম্য এবং উপস্থাপনার শিল্পমূল্য অনুসক্ত মনে বিশ্লেষণ

www.nagorikpathagar.org

করেই তার সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও গুণ নিরূপণ করতে হবে, সেক্ষেত্রে সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচি বা সংস্কারগত নীতির নিরিখে বিচার অচল ও অগ্রাহ্য। নজরুল সাহিত্য বিচারের প্রকৃত অধিকারী তিনিই হবেন, নজরুলের সাহিত্যভাবনা ও রূপাঙ্কন-রীতির প্রতি যাঁর সহানুভূতি হবে অকৃত্রিম ও অবিকৃত। সেই সহমর্মিতা, অবিদ্বেষ বা অনুরাগ ফুটে ওঠে নির্লিপ্তমন নিয়ে নজরুল সাহিত্য অধ্যয়নে নিবিড় অভিনিবেশ, ঔৎসুক্য ও নিষ্ঠা থেকে। ইদানীং তার সর্বোত্তম পরিচয় দিয়েছেন শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, ফলে তাঁর নজরুল সমালোচনা আমাদের সাহিত্যের এই বিভাগে সমুচ্চ শীর্ষে স্থান পেয়েছে।" **(আব্দুল কাদির : 'নজরুল-সাহিত্য-বিচার', 'নজরুল একাডেমী পত্রিকা', ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বাং-১৩৮৪, ইং-১৯৭৮)**।

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ একজন বিদগ্ধ লেখক। বিশেষভাবে তিনি নজরুল-গবেষক বা নজরুল-বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচিত হলেও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে তাঁর সাহিত্য-কর্মের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা চলে। গ্রন্থের তালিকাঃ

প্রবন্ধ : ১. শব্দ ধানুকী নজরুল ইসলাম (১৯৭০), ২. সাহিত্য-চিন্তা (১৯৭৬), ৩.নজরুল সাহিত্য-বিচার (১৯৭৬), ৪. ছোটদের নজরুল (১৯৭৮), ৫. ইসলাম ও নজরুল ইসলাম (১৯৮১), ৬. নজরুল সাহিত্য দর্শন (১৯৮৩), ৭. দ্রষ্টার চোখে স্রষ্টা (১৯৮৯), ৮. কবি ফররুখ : তাঁর মানস ও মনীষা (১৯৯৪), ৯. বহুরূপে নজরুল (১৯৯৯), ১০. লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাক নুড়ি (১৯৯৯), ১১. চতুর্দশ শতাব্দীর বাংলা কবিতা (২০০০), ১২. নজরুলের গদ্যে উপমা (২০০০), ১৩. বাংলা সাহিত্যে গোলাম মোস্তফা (২০০০), ১৪. ওমর খৈয়মের অনুবাদক নজরুল ইসলাম (২০০১), ১৫. উপমাশোভিত ফররুখ (২০০১), ১৬. মুসলিম রেনেসাঁসের কবি ফররুখ (২০০২), ১৭. নজরুল জীবন ও কবিতায় (২০০৩)।

সম্পাদনা ঃ ১৮. ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি (১৯৮৩), ১৯. নজরুল প্রতিভার স্বরূপ (১৯৮৯), ২০. নজরুলের পত্রাবলী (১৯৯৫), ২১.কাণ্ডারী হুঁশিয়ার (১৯৯৯)।

ছোটদের সাহিত্য ঃ ২২. ছোটদের নেপোলিয়ন (১৯৬৩), ২৩. ছোটদের নজরুল (১৯৭৬)।

অনুবাদ ঃ ২৪. তিন বোন : আন্তন চেখব (১৯৬৯), ২৫. শঙ্খচিল : আন্তন চেখব (১৯৭০)।

ক্রীড়া সাহিত্য ঃ ২৬. যুগস্রষ্টা মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী (১৯৬৯), ২৭.

www.nagorikpathagar.org

মোহাম্মদ আলী এবং মুক্তিযুদ্ধের দশ মহারথী (১৯৬৯), ২৮. আলী আলী মোহাম্মদ আলী (১৯৮১), ২৯. ছোটদের মোহাম্মদ আলী (১৯৮২), ৩০. বীর শ্রেষ্ঠ গামা (১৯৮৩)।

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের উপরোক্ত তালিকা থেকে বিচিত্র বিষয়ে তাঁর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ছাড়াও অপ্রকাশিত অনেক গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে, যেগুলো প্রকাশিত হলে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের বিশাল অবদান সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া সম্ভব হবে। যাই হোক, প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা থেকে দেখা যায়, তিনি বিভিন্ন-বিচিত্র বিষয়ে লেখালেখি করলেও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপর বিশেষভাবে গবেষণা-কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। নজরুলের উপর লেখা তাঁর মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১১টি। এছাড়া, নজরুলের উপর তিনি ৩টি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন এবং শিশুদের উপযোগী নজরুল-বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সব মিলিয়ে নজরুলের উপর লেখা ও তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ১৫টি। একজন কবির উপরে এত বেশি সংখ্যক গ্রন্থ রচনার উদাহরণ বড় একটা দেখা যায় না। নজরুলের উপর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি নজরুল প্রতিভার নানাদিক উন্মোচনের প্রয়াস পেয়েছেন।

নজরুলের উপর রচিত তাঁর প্রথম গ্রন্থের নাম 'শব্দ ধানুকী নজরুল'। নজরুল-বিষয়ক তাঁর লেখা এ গ্রন্থটি একাধারে প্রথম ও তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে সমাদৃত। নজরুল-কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ সম্পদ নিয়ে তিনি এতে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। নজরুলকে তিনি এ গ্রন্থে অতি নিবিড়ভাবে এবং নান্দনিক শিল্প-দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এ পর্যবেক্ষণ, বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা যে অসাধারণ ও মৌলিক গুণসম্পন্ন সে সম্পর্কে সকলে একমত। অসংখ্য আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে নজরুলের অসাধারণ নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি এতে আলোচনা করার সাথে সাথে এ ধরনের ভাষা-রীতি অবলম্বনে কবি যে ওজস্বিতা ও স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করেছেন, তিনি তা সম্যক তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।

নিরলসভাবে সমগ্র নজরুল-সাহিত্য অধ্যয়নের পর শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের মধ্যে নজরুলের প্রতি সম্ভবত এক ধরনের Obsession (আবেগ-প্রবণতা) গড়ে ওঠে। নজরুলের বিস্ময়কর প্রতিভা তাঁকে অভিভূত করে। অন্যদিকে, এ বিস্ময়কর প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তার অবমূল্যায়ন হওয়ায় নজরুলপ্রেমী শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ নিদারুণ মর্মজ্বালা অনুভব করেছেন। তবে এ জ্বালা তিনি নীরবে সহ্য

www.nagorikpathagar.org

করেন নি, বরং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণসহ তিনি নজরুল সমালোচকদের অপপ্রচারণার বিরুদ্ধে তীব্র মসীযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। একদিকে তিনি নজরুল প্রতিভার যথাযথ মূল্যায়নে যেমন অপরিসীম কষ্ট ও সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন, অন্যদিকে তেমনি যারা তাঁর অবমূল্যায়ন করেছেন তাদের উপযুক্ত জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের কোন জুড়ি ছিল না। তাঁর এ জবাব যেমন শানিত তেমনি যুক্তিপূর্ণ। এজন্য কবি আব্দুল কাদির যথার্থই বলেছেন ঃ

"এ যাবত বহু সাহিত্যরথী বৃহ্য রচনা করে নজরুলের প্রতি নানা দিক থেকে অযথা শরসন্ধান করেছেন। শাহাবুদ্দীন সেসকল তীক্ষ্ণ বাণ নিপুণ হাতে উৎপাটন করে নজরুলের বিরাট সাহিত্য শরীরের ঘাতসহ অবিক্ষত চিত্র পাঠক-সমক্ষে তুলে ধরেছেন ; এজন্য তিনি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে বহুদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। অতঃপর তাঁর রচিত সমালোচনা আদর্শের সুদৃঢ় ঢালে প্রতিহত হয়ে নজরুলের অভিমুখে সকল অন্যায় অস্ত্র নিক্ষেপ ব্যর্থ প্রতিপন্ন হবে। নজরুলের দিকে কেউ অকারণ কালিমা ক্ষেপণ করতে গেলে সে কালিমায় তিনি নিজেই হবেন কলঙ্কিত-কুখ্যাত।" (পূর্বোক্ত)।

এ প্রসঙ্গে শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ রচিত 'লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় নাক নুড়ি' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ 'নজরুল ইসলামের কবি স্বভাব : শক্তিপূজা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এটি কলকাতার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটিতে আহমদ শরীফ নজরুলকে একজন অদূরদর্শী, অন্ধআবেগী, স্থিরলক্ষ্যহীন, প্রচারণামূলক, আস্ফালনকারী, অকবি ও অসংলগ্ন ইত্যাদি নানারূপ তীর্যক বাক্যবাণে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেছেন। নজরুলের লেখায় কোনরূপ বুদ্ধিমত্তা ও মননশীলতার পরিচয় নেই বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। এভাবে নজরুল প্রতিভার শুধু অবমূল্যায়ন নয়, তাঁকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে আহমদ শরীফ নজরুলের প্রতি চরম বিদ্বেষমূলক ও একদেশদর্শী মানসিকতার পরিচয় দেন। শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ অত্যন্ত জোরালো ভাষায়, অসংখ্য উদ্ধৃতি, তত্ত্ব-তথ্য ও যুক্তি সহকারে আহমদ শরীফের উপরোক্ত প্রবন্ধের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তাঁর এ জবাবী লেখাটি প্রথমে তাঁর সম্পাদিত 'অগ্রপথিক' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ও পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। এ গ্রন্থটির মাধ্যমে শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের ব্যাপক নজরুল-অধ্যয়ন ও নজরুল সম্পর্কে তাঁর বিশেষজ্ঞ অভিমত সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়।

এছাড়া, বিভিন্ন সময় নজরুল সম্পর্কে কাজী আব্দুল ওদুদ, কবি জীবনানন্দ দাশ, কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসু, অরবিন্দ পোদ্দার, সৈয়দ আলী আহসান,

www.nagorikpathagar.org

আজহার উদ্দীন খান প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ নজরুল সম্পর্কে নানারূপ নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। কাজী আব্দুল ওদুদ নজরুলের কাব্যে গভীরতার অভাব বলে অভিযোগ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ নজরুল প্রতিভার মধ্যে কোন মহত্ত্বের সন্ধান পান নি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'গোলাপ কেন কালো' গ্রন্থে এক সময় বলেছিলেন, নজরুলের জনপ্রিয়তা মনে ঈর্ষার উদ্রেক করে। সে বুদ্ধদেবই পরবর্তীকালে নজরুলের তীব্র সমালোচনা করেন। অরবিন্দ পোদ্দার নজরুলের কাব্যভাষা ও কাব্যবোধ সীমিত বলে উল্লেখ করেন। সৈয়দ আলী আহসান অধঃপতিতদের প্রতি নজরুলের মমত্ববোধকে 'আদর্শ বিলাস' বলে অভিহিত করেন। আজহার উদ্দীন নজরুলের কণ্ঠকে 'মোসাহেব কণ্ঠ' বলে উল্লেখ করে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ছাত্ররা এ 'মোসাহেব কণ্ঠে' উচ্চারিত প্রচারপত্র পাঠ করে শিখেছেন নজরুল Great Poet নন Good Poet. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ তাঁর বিভিন্ন লেখায় এসব অর্বাচীনসুলভ হাল্কা মন্তব্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তার যথাযথ জবাব প্রদান করেছেন।

নজরুলকে কেউ কেউ 'অশিক্ষিত', 'মুর্খ' কবি নামে অভিহিত করার অপচেষ্টা করেছেন। শাহাবুদ্দীন আহ্মদ তার জবাবে প্রায়ই জোরালোভাবে বলতেন যে, 'বিদ্রোহী' কবিতার মত কবিতা যে কবি লিখতে পারেন, সে কবিকে যারা অশিক্ষিত বা মুর্খ বলেন তারা জানেন না যে তারা নিজেরাই কতটা অশিক্ষিত। কারণ, বিদ্রোহী কবিতায় পৃথিবীর তাবৎ বড় বড় ধর্মের তত্ত্ব-কাহিনীর উল্লেখ আছে, যা সেসব ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া কারো পক্ষে লেখা আদৌ সম্ভব নয়। তাছাড়া, বিদ্রোহী কবিতা বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অবিস্মরণীয় রচনা, এজাতীয় কবিতা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম কতিপয় কবির পক্ষেই কেবল রচনা করা সম্ভব হয়েছে। নজরুল সে মুষ্টিমেয় কতিপয় কীর্তিমান কবিদেরই একজন।

নজরুলের জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে শাহাবুদ্দীন আহ্মদ ব্যাপক গবেষণা করেছেন ও সেসব বিষয়ে মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করে গেছেন। নজরুল ছিলেন অসাধারণ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী একজন কালজয়ী কবি। বাংলা সাহিত্যে তিনি যুগ-প্রবর্তক কবি হিসাবে অনন্য মর্যাদার অধিকারী। তিনি এক নতুন কাব্য-ভাষা সৃষ্টি করেন। মূলত মুসলিম শাসনামলে প্রচলিত বাঙালি মুসলমানের গৌরবময় ভাষার ঐতিহ্যকে তিনি আধুনিক যুগের উপযোগী করে তাঁর সাহিত্যে বিশেষত কাব্যে ব্যবহার করেন। এটা ছিল এক অসাধারণ যুগান্তকারী ঘটনা। ইতঃপূর্বে বাংলা ভাষা রীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অনন্যতুল্য আদর্শ ব্যক্তি। তাঁর ব্যবহৃত বাংলা ভাষা Standard Bengali Language

www.nagorikpathagar.org

হিসাবে সর্বজন সমাদৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই নজরুল এক স্বতন্ত্র ভাষা রীতির প্রবর্তন করেন, যা কেবল নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও অবিস্মরণীয় কৃতিত্বেরই পরিচায়ক নয়, বাংলা সাহিত্যে যে আরেকটি স্বতন্ত্র 'মুসলমানী ঢংয়ে'র জনপ্রিয় ভাষা রীতি বিদ্যমান এবং যে ভাষা অধিকাংশ বাঙালির একান্ত নিজস্ব ভাষা, নজরুল সেটা বলিষ্ঠভাবে সপ্রমাণ করতে সক্ষম হন। নজরুল-সমকালে ও তাঁর পরবর্তীকালে বাঙালি মুসলিম সমাজ নজরুলের এ ভাষা রীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও তেমনি নজরুল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও ভাব-চেতনাকে তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেন। ইতঃপূর্বে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ স্ব স্ব সাহিত্যে হিন্দু-আদর্শ, ঐতিহ্য ও ভাব-চেতনাকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, তার পাশাপাশি মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫১), কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য-রত্ন (১৮৬০-১৯২৩), মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৯-১৯৬৮), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৮), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩-১৯৫৩), ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৫-১৯৬৪), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), আকবর উদ্দিন (১৮৯৬-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৭-১৯৭৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৯), মোহাম্মদ বরকতউল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) প্রমুখ মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জীবনাদর্শের আলোকে এক নতুন ও স্বতন্ত্র ধারা তুলে ধরেন। নজরুল তাঁর সাহিত্যে এ স্বতন্ত্র ধারাকে আরো বলিষ্ঠভাবে বেগবান করার প্রয়াস পান।

এছাড়া, বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী নজরুল ছিলেন মুসলিম নবজাগরণের উদ্গাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের অকুতোভয় বলিষ্ঠ কবি-কণ্ঠ এবং অবহেলিত-শোষিত-বঞ্চিত-নির্যাতিত জন-মানুষের কবি। নজরুলের এ অনন্যসাধারণ পরিচয় সম্যকভাবে তুলে ধরার জন্য শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ আজীবন নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। নজরুল বাংলাদেশের 'জাতীয় কবি' হিসাবে বরিত হওয়া সত্ত্বেও একসময় বাংলাদেশের একশ্রেণির লেখক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁকে উপেক্ষা করার প্রয়াস পান। এমনকি, জাতীয় কবি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সর্বপর্যায়ে নজরুল ব্যাপকভাবে

www.nagorikpathagar.org

উপেক্ষিত। শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ অত্যন্ত সাহসের সাথে এবং অকাট্য যুক্তি-প্রমাণসহ নজরুলের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব যথোচিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তাঁর ওজস্বিতাপূর্ণ বক্তৃতা, জলদগম্ভীর আবৃত্তি ও বলিষ্ঠ লেখনির মাধ্যমে তিনি নজরুলের বিরুদ্ধাচারীদের বক্তব্যের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেন। তিনি নজরুল সম্পর্কে এবং নজরুলের বিচিত্র দিক ও বিষয় নিয়ে যতগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন, তা আর কারো পক্ষে এ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সেদিক দিয়ে নজরুল-গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যেমন বিপুল তেমনি তিনি বিশিষ্টতায় অনন্য। এজন্য কবি আব্দুল কাদির যথার্থই বলেছেন ঃ

"শিল্প-দর্শনের যে স্বচ্ছ দর্পণে নজরুল প্রতিভার সৃষ্টি-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করতে হবে, নন্দন-তাত্ত্বিক নীতির যে নির্মল নিকষে সেই সৃষ্টিমহিমার প্রকৃত মূল্য পরখ করতে হবে, শাহাবুদ্দীন প্রচুর শ্রম ও প্রজ্ঞার বিনিময়ে তার এক মানোত্তীর্ণ রেখাচিত্র উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদের সুপারিশ যে, তাঁর নজরুল বিষয়ক নিবন্ধাবলী এদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পঠনীয় রূপে অনুমোদিত করা হোক। তাহলে নজরুল সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন করতেই তাঁরা শুধু শিখবেন না, সেই সাহিত্যের আসল স্বরূপ প্রত্যক্ষ করতেও তাঁরা পারগ হবেন। তাতে শিক্ষা ও আনন্দ দুইই লাভ হবে।

"নজরুলের দৈবী প্রতিভার বিস্ময়কর সৃষ্টি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীত। সেই অসামান্য সৃষ্টির ভাব-প্রস্থান, রূপ-প্রেরণা ও কলা-লক্ষণের সঙ্গে পরিচয় হবে যতখানি যথার্থ, অন্তরঙ্গ ও পুংখানুপুংখ, তার অনির্বাচনীয় রসের আনন্দময় আস্বাদ হবে ততখানি সার্থক ও সম্পূর্ণ। শাহাবুদ্দীনের অনন্য মনস্ক নজরুল অনুশীলন সেই পরিচয় লাভের পথ করেছে প্রশস্ত ও প্রজ্জ্বল। তাই তাঁর প্রতি আমাদের প্রশংসার সীমা নেই।" **(পূর্বোক্ত)**।

নজরুল-বিশেষজ্ঞ শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ মূলত একজন বিগদ্ধ সাহিত্য-সমালোচক। আধুনিক বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং কঠোর পরিশ্রমী লেখক। সমালোচনা করার জন্য ব্যাপক অধ্যয়ন প্রয়োজন, গভীর অভিনিবেশ, অনুসন্ধিৎসা, কৌতূহল ও তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির প্রয়োজন। সর্বোপরি প্রয়োজন সাহিত্যের প্রতি গভীর নিষ্ঠা ও আত্যন্তিক আগ্রহ। শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদের মধ্যে এসবই বিদ্যমান ছিল, যে কারণে তিনি একজন দক্ষ সাহিত্য-সমালোচক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদার অধিকারী হন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যথেষ্ট না হলেও ব্যক্তিগত চেষ্টায়, গভীর অধ্যবসায় ও স্বীয়-প্রতিভার গুণে তিনি এসব আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখা পাঠ

www.nagorikpathagar.org

করলে সহজেই তাঁর এসব গুণের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু নজরুলের উপরই নয়, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি যে কাজ করেছেন, তার মধ্যেও এর পরিচয় সুস্পষ্ট।

ইংরাজি criticism-এর বাংলা অর্থ করা হয় সমালোচনা। সম+আলোচনা = সমালোচনা, অর্থাৎ দোষ-ত্রুটি, ভাল-মন্দ, উৎকর্ষ-অপকর্ষ ইত্যাদি উভয় দিক সমভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করার অর্থ সমালোচনা। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে 'সমালোচনা' শব্দটি প্রায়শই খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোন কিছুর দোষ-ত্রুটি বা খারাপ ও মন্দ দিকটি তুলে ধরাকেই সাধারণত সমালোচনা বলা হয়। আসলে এটা কদর্থ। বাংলা অভিধানে বলা হয়েছে : 'ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শনপূর্বক আলোচনাকেই সমালোচনা বলে।' সাহিত্য বা শিল্পের দোষ-গুণের রসজ্ঞ আলোচনার নামই criticism বা সমালোচনা। তাই সমালোচনা করার কাজটি রীতিমত দুরূহ। কেননা এ কাজ করার পূর্বে যেকোন বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হতে হবে, তার ভাল-মন্দ উভয় দিক সম্পর্কে সম্যক বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে এবং আলোচ্য বিষয়টি পাঠকের সামনে যথাযথভাবে উপস্থাপন করার যোগ্যতা থাকতে হবে। মোটকথা, একটি সমালোচনা পড়ে যখন সমালোচিত বিষয়টির ভাল-মন্দ উভয় দিক সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়, তখন সেটাকেই প্রকৃষ্ট সমালোচনা বলা যায়। কিন্তু আমাদের দেশে সমালোচনা সাহিত্য বলতে যা বুঝি, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় আলোচনা মাত্র। সঠিক অর্থে সমালোচনার দুরূহ দায়িত্ব পালনে অনেকেই অনীহা প্রদর্শন করে থাকেন। শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ এক্ষেত্রে ছিলেন এক বিরল ব্যতিক্রম। তিনি যথার্থ সমালোচনার দুরূহ কর্মটি অনায়াসে সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছেন। তাই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের মধ্যে তিনি নিঃসন্দেহে অন্যতম।

শাহাবুদ্দীনের প্রকাশিত গ্রন্থ তালিকা থেকে জানা যায়, কবি ফররুখ আহমদের উপর তিনি ৩টি মৌলিক গ্রন্থ ও একটি বৃহদায়াকার গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন। তাঁর সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি' এক অতি মূল্যবান সংকলন গ্রন্থ। এতে দেশের বিশিষ্টজনদের লেখা মোট ৭৭টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। কবি ফররুখ আহমদের ব্যক্তি পরিচয় ও তাঁর প্রতিভার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এ গ্রন্থটিতে মূল্যবান তথ্যাদি স্থান লাভ করেছে। ফররুখ-অনুরাগী পাঠক ও গবেষকদের জন্য এটা একটি অপরিহার্য গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। ফররুখ আহমদের উপর লেখা তাঁর তিনটি মৌলিক গ্রন্থে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে ফররুখ-প্রতিভার মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। কবি গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীন ও বে-নজীর আহমদের উপর তিনি পৃথক গ্রন্থ

www.nagorikpathagar.org

রচনা করেছেন। তবে শেষোক্ত গ্রন্থটি এখনও প্রকাশিত হয় নি। এছাড়া, সাধারণভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর আগ্রহ কম ছিল না, তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থ তালিকা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলেও এটি এখনো গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নি। এতে তাঁর বিচিত্র জীবন অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে।

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ ছিলেন মূলত ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যে বিশ্বাসী একজন নিষ্ঠাবান লেখক। তাঁর বিভিন্ন লেখার মধ্যে ঐকান্তিক দেশপ্রেম, মুসলিম জাতীয়তাবোধ ও ইসলামী বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসাবে তাঁর আচরণে, কর্মে ও লেখার মধ্যে ইসলামী চিন্তাদর্শের পরিচয় ফুটে উঠেছে। তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটে। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ সাহিত্য-সমালোচক, সম্পাদক, আবৃত্তিকার, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, বক্তা, মুষ্ঠিযোদ্ধা ও ক্রীড়া-বিশ্লেষক। এরূপ নানামুখী প্রতিভার সমন্বয় সচরাচর কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও দেশ-বিভাগের পর পারিবারিক বিত্ত-বৈভব ছেড়ে বাংলাদেশে হিজরত করার পর তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থা ও চরম দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করে জীবন ধারণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সদা হাস্যোজ্জ্বল, সদালাপী, মজলিশী মেজাজের অধিকারী এক অসাধারণ প্রাণবন্ত মানুষ।

শাহাবুদ্দীন আহ্মদ সাহিত্য-ক্ষেত্রে যে অবদান রেখে গেছেন, দুর্ভাগ্যবশত তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি তিনি পান নি। জাতীয় পর্যায়ের কোন পুরস্কার বা স্বীকৃতি তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। তবে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে বিভিন্ন সময় নানা পুরস্কার, সম্মাননা ও স্বীকৃতি প্রদান করেছে। এগুলোর একটি তালিকা নিম্নরূপ ঃ

১. সুফী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার
২. কলকাতা নজরুল পরিষদ প্রদত্ত নজরুল পুরস্কার
৩. চুরুলিয়া নজরুল একাডেমী কর্তৃক প্রদত্ত নজরুল পুরস্কার
৪. ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার (চট্টগ্রাম সংস্কৃতি পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত)
৫. বাংলাদেশ সাহিত্য সংস্কৃতি পুরস্কার
৬. বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার-১৯৯৪
৭. জাতীয় সাংস্কৃতিক পরিষদ
৮. স্বদেশ সংস্কৃতি সংসদ প্রদত্ত নজরুল পুরস্কার-১৯৯৯
৯. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ সাহিত্য পদক।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য সাধনা

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আবদুল মান্নান তালিবের অবদান বহুমুখী, নানা বর্ণিল ও কলেবরের দিক দিয়েও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবিতা, প্রবন্ধ, শিশু-সাহিত্য, অনুবাদ, সম্পাদনা ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান গতানুগতিকতার বাইরে, লক্ষ্যভেদী ও আপন স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল। সাধারণ, গতানুগতিক চিন্তা-চেতনা ও প্রবণতা থেকে তিনি সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেননি, এটা ছিল তাঁর জীবনের এক নিরবিচ্ছিন্ন মিশন–স্বকীয় আদর্শ, ঐতিহ্য, জীবনবোধ, মানবিক প্রকৃত সত্তা ও গুণাবলী তুলে ধরে তার আলোকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করার এক নিরন্তর মহত্তর প্রয়াস। এ কাজে আবদুল মান্নান তালিব যে গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, আন্তরিকতা ও অবিচল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, তা অন্যদের জন্যও অনুসরণীয় ও প্রাণনাদায়ক। তাঁর সাহিত্য সাধনা তাঁর জীবন-বিশ্বাস ও জীবনের সকল কর্মায়োজনেরই প্রতিফলন-সবকিছু একই সূতায় গাঁথা।

আবদুল মান্নান তালিবের (জন্ম ১৫ মার্চ, ১৯৩৬, মৃত্যু ২২ সেপ্টেম্বর ২০১১) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম তালেব আলী মোল্লা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৫০ সালে ম্যাট্রিক, জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর থেকে ১৯৫৭ সালে দাওরা-ই-হাদীস ও ১৯৬৬ সালে ঢাকা বোর্ড থেকে এইচ.এস.সি. পাশ করেন। বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, আরবি, উর্দু ও ফারসি এই ছয়টি ভাষায় তিনি ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। বহু ভাষা শিক্ষার ফলে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের সাথেও তাঁর একটি যোগসূত্র সৃষ্টি হয়।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় শিউড়ির 'জিয়াউল ইসলাম' পত্রিকায়। স্বরচিত কবিতা ছাড়াও কাব্যানুবাদে তাঁর যথেষ্ট পারদর্শিতা পরিলক্ষিত হয়। লাহোর থাকাকালে তিনি কাজী নজরুল ইসলাম ও ফররুখ আহমদের বহু কবিতা উর্দু ভাষায় অনুবাদ করে সেখানকার বিভিন্ন পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন।

www.nagorikpathagar.org

ইকবালের ফারসি কাব্য 'রমূযে বেখূদী'র ব্যাখ্যাসহ বাংলা অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন। করাচীর 'ইকবাল একাডেমী'র তত্ত্বাবধানে ইকবালের আরো একটি কাব্য ও বহু সংখ্যক কবিতার তিনি অনুবাদ করেন। ১৯৫১-৭১ পর্যন্ত সময়ে তিনি কাব্য-চর্চায় বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। পরবর্তীতে এক্ষেত্রে ভাটা পড়ে, কারণ তখন তিনি মননশীল রচনা, অনুবাদ, গবেষণা, শিশুতোষ রচনা ও শিশু-কিশোরদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়নে বিশেষ মনোযোগী হয়ে পড়েন।

আবদুল মান্নান তালিবের কবি-খ্যাতি খুব একটা বিস্তৃতি লাভ করেনি। এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত তিনি মাত্র নির্দিষ্ট দু'একটি পত্রিকায়ই লিখেছেন, দুর্ভাগ্যবশত যার প্রচার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। ফলে বৃহত্তর পাঠক সমাজ তাঁকে জানার তেমন সুযোগ পায়নি। দ্বিতীয়ত তিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত কবিতা চর্চা করলেও এ পর্যন্ত তাঁর কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। একাধারে দারিদ্র্য এবং কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহাই হয়ত এজন্য দায়ী। তাঁর নিজের নির্লিপ্ত মানসিকতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। অবিলম্বে তাঁর সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। এরপরেই কেবল কবি হিসাবে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে।

দারিদ্র্য এবং নানা প্রতিকূলতার সাথে নিরন্তর সংগ্রাম করে পথ চলেছেন আবদুল মান্নান তালিব। পশ্চিম বঙ্গের বৈরী পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে আদর্শগত-প্রাণ আবদুল মান্নান তালিব নিজের বিশ্বাস ও দ্বীনী কাজের সুবিধার্থে জীবনে কয়েকবার হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন– পশ্চিমবঙ্গ থেকে তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে, সেখান থেকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে, এখান থেকে আবার পশ্চিমবঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত আবার স্বাধীন বাংলাদেশে হিজরত করেন। বিভিন্ন সময় জীবন-জীবিকার তাগিদে তিনি বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিয়োজিত থাকেন। তবে সব কাজের মূল ধরন হলো সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-সাধনা। নিচে এর বিবরণ দেয়া হলো ঃ

- ☐ সাময়িকপত্র "জিয়াউল ইসলাম" বার্ষিক, ১৯৫২, সম্পাদক, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
- ☐ সহ-সম্পাদক, উর্দু দৈনিক– "রোজনামা তাসনীম", লাহোর, ১৯৫৭-৫৯
- ☐ সহ-সম্পাদক, "দৈনিক ইত্তেহাদ", ঢাকা, ১৯৫৯-৬০
- ☐ সভাপতি, পাক সাহিত্য সংঘ, ঢাকা, ১৯৬১-৭১
- ☐ সহ-সম্পাদক ও পরে সম্পাদক সাপ্তাহিক "জাহানে নও" ১৯৬২-৬৬
- ☐ রিসার্চ স্কলার, ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭-৭১

www.nagorikpathagar.org

- ☐ সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী, ১৯৬৯-৭১
- ☐ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক মীযান, কলিকাতা ১৯৭৩-৭৫
- ☐ রিসার্চ স্কলার, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৭৫-৮৫
- ☐ সম্পাদক, ত্রৈমাসিক ও মাসিক কলম, ১৯৭৭-৯৪
- ☐ সম্পাদক, পৃথিবী, ১৯৮১-১৯৯৯
- ☐ সম্পাদক, শাহীন শিবির, দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭৭-৮২
- ☐ কলামিস্ট ও ফিচার এডিটর, দৈনিক সংগ্রাম ১৯৮৩ –২০১০
- ☐ পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭ –২০১১

উপরোক্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী তিনি সাংবাদিকতা পেশা, গবেষণা ও সাংগঠনিক কাজের সাথে জড়িত। তাঁর সকল কাজের পেছনে একটি মহৎ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য কাজ করছে। তাঁর সাংবাদিকতা করার পেছনে যে প্রধান তাগিদ কাজ করছে তা হলো, পরিচ্ছন্ন ও সুস্থ সাংবাদিকতার মাধ্যমে একটি মানবিক কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণ। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবন শুধুমাত্র গতানুগতিকভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটা তাঁর জীবনের এক নিরবচ্ছিন্ন মিশন। এ মিশন এক নতুন আলোর শপথে দীপ্ত। আবদুল মান্নান তালিব সে আলোর শপথে উদ্দীপ্ত এক প্রাণময় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তিনি নিজে দারিদ্র্য ও বিপদসংকুল সাংবাদিকতার বন্ধুর শ্বাপদঘেরা জনারণ্যে অবিশ্রাম পথ চলেছেন তাই নয়, আরো অনেককেই সে পথে চলার পথ-নিদের্শনা দিয়েছেন, হাতে ধরে অনেককেই এ পথে চলার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাই সাংবাদিক হিসাবে তাঁকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করার সাথে সাথে এ বন্ধুর অথচ গুরুত্বপূর্ণ পেশায় অন্য আরো অনেককেই চলার ক্ষেত্রে তিনি যে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তার গুরুত্বও বিবেচনাযোগ্য।

আবদুল মান্নান তালিবের প্রধান পরিচয় তিনি একজন গবেষক। বিভিন্ন বিষয়কে তিনি গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার পক্ষপাতি। তাঁর চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূলত ইসলামের মূলনীতির দ্বারা পরিচালিত। দীর্ঘদিন যাবত মুসলিম সমাজে জ্ঞান-সাধনার অভাবে, ইজতিহাদের দ্বার অনেকটা রুদ্ধ থাকায় এবং নানা সংস্কার ও গোড়ামীর কারণে মুসলমান সমাজে ইসলামের নামে অনেক অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ, চিন্তা-চেতনা ও জীবনধারা চলে আসছে। আবদুল মান্নান তালিব এসব ক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা ও নীতিমালা তুলে ধরার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। তাই শুধু গতানুগতিকভাবে গবেষণায় আত্মনিয়োগ না করে তিনি খোলা মনে মৌলিক ও আসল বিষয় ও প্রকৃত সত্য

www.nagorikpathagar.org

সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা মুফতী বা মুহাদ্দিসের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন বললে অত্যুক্তি হবে না।

এ দায়িত্ব পালনে তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন আধুনিক কতিপয় বিখ্যাত যুগান্তকারী জ্ঞান-সাধকের নিকট থেকে। এঁদের মধ্যে মহাকবি আল্লামা মোহাম্মদ ইকবাল, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম ও ডক্টর ইউসুফ আল কারদাভী প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিংশ শতাব্দীতে এঁরা ইসলামী জ্ঞানের প্রচার-প্রসারে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছেন এবং এঁদের মধ্যে শহীদ হাসানুল বান্না, শহীদ সাইয়েদ কুতুব ও মাওলানা মওদূদী বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের নিশানবরদার হিসাবে বিশ্বব্যাপী অগণিত অনুসারী সৃষ্টি করে একবিংশ শতকেও সে আন্দোলনকে এক অপ্রতিহত গতি দানে সক্ষম হয়েছেন।

আবদুল মান্নান তালিব তাঁদেরই নিষ্ঠাবান অনুসারী এবং বিশেষত সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাঁর সাহিত্য-কর্ম, বিশেষত মৌলিক প্রবন্ধ রচনায়, এর সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। অনুবাদ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অবদান বিবেচনা করলেও এ কথার সত্যতা প্রতিভাত হয়। শুধু মৌলিক রচনার ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বখ্যাত বিভিন্ন মনীষীর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী বাংলা ভাষায় তরজমা করে তিনি জ্ঞানানুশীলনের পথকে বাংলা-ভাষীদের জন্য অবারিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই তাঁর গবেষণা ও অনুবাদ-কর্ম উভয়ই যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। নিচে আবদুল মান্নান তালিবের সাহিত্য-কর্মের বিবরণ প্রদত্ত হলো ঃ

প্রবন্ধ গ্রন্থ ঃ ১. অবরুদ্ধ জীবনের কথা (১৯৬২), ২. মুসলমানের প্রথম কাজ (১৯৭৫), ৩. বাংলাদেশে ইসলাম (১৯৭৯), ৪. ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ ও উপাদান, (১৯৮৪) ৫. আমল ও আখলাক (১৯৮৬), ৬. ইমাম ইবনে তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন (১৯৮৭), ৭. ইসলামী আন্দোলন ও চিন্তার বিকাশ, ১৯৮৮, ৮. সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহ্যিক প্রেক্ষাপট (১৯৯১), ৯. ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন (১৯৯৪), ১০. সত্যের তরবারি ঝলসায় (২০০০), ১১. আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম (২০০১), ১২. উপমহাদেশে ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম, ২০০২।

শিশু-কিশোর সাহিত্য ঃ ১৩. সহজ পড়া, ১৯৮২, ১৪. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ, ১৯৮০, ১৫. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৮১, ১৬. ছোটদের ইসলাম শিক্ষা, ৩য় ভাগ, ১৯৮২, ১৭. ইসলাম শিক্ষা, ১ম ভাগ,

www.nagorikpathagar.org

১৯৭৬, ১৮. ইসলাম শিক্ষা, ২য় ভাগ, ১৯৭৬, ১৯. এসো জীবন গড়ি, ১ম ভাগ, ১৯৭৬, ২০. এসো জীবন গড়ি ২য় ভাগ, ১৯৭৫, ২১. পড়তে পড়তে অনেক জানা, ২০০০, ২২. মা আমার মা, ২০০১, ২৩. আমাদের প্রিয় নবী, ১৯৭৫, ২৪. মজার গল্প, ১৯৭৬, ২৫. কে রাজা? ১৯৮১, ২৬. হাতিসেনা কুপোকাত, ১৯৯০, ২৭. আদাবু আরাবীয়া, ১৯৮৪, ২৮. মা আমার মা, ২০০০।

সম্পাদিত গ্রন্থ ঃ ২৯. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, ১৯৬৯, ৩০. সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, ১৯৮২, ৩১. সহীহ আল বুখারী, ২য় খণ্ড, ১৯৯৬, ৩২. রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৫, ৩৩. মুসলিম শরীফের মুকদ্দমা, ১৯৮৬, ৩৪. নির্বাচিত গল্প, ১৯৮৫, ৩৫. সত্য সমুজ্জ্বল, ১৯৮১, ৩৬. রাসূলের যুগে নারীর স্বাধীনতা, ১ম খণ্ড, ১৯৯৫।

অনুবাদ সাহিত্য ঃ ৩৭. খতমে নবুওয়াত, ১৯৬২, ৩৮. পয়গামে মোহাম্মদী, ১৯৬৭, ৩৯. ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ, ১৯৬৪, ৪০. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন, ১৯৬৫, ৪১. ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন বীমা, ১৯৬৬, ৪২. ইসলামের সমাজ দর্শন, ১৯৬৭, ৪৩. সূদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, ১৯৭৯, ৪৪. আত্মশুদ্ধির ইসলামী পদ্ধতি, ১৯৭৬, ৪৫. আত্মশুদ্ধি কিভাবে ? ১৯৭৬, ৪৬. ভাষাভিত্তিক জাহেলিয়াতের পরিণাম, ১৯৭৫, ৪৭. ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, ১৯৬৮, ৪৮. মুসলিম নারীর নিকট ইসলামের দাবী, ১৯৮২, ৪৯. মহররমের শিক্ষা, ১৯৭৭, ৫০. ইসলামী আন্দোলনের সাফল্যের শর্তাবলী, ১৯৭৫, ৫১. কুরবানীর শিক্ষা, ১৯৭৬, ৫২. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, ১৯৬৮, ৫৩. রাসায়েল ও মাসায়েল, ২য় খণ্ড, ১৯৯১, ৫৪. যবরে কলীম, ১৯৯৪, ৫৫. সীরাতে সারওয়ারে আলম, ১ম খণ্ড, ১৯৮১, ৫৬. রাসায়েল ও মাসায়েল, ৩য় খণ্ড, ১৯৮৬, ৬০. রিয়াদুস সালেহীন, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮৭, ৬১. ইরান বিপ্লব ঃ একটি পর্যালোচনা, ১৯৮২, ৬২. সহীহ আল বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৯৮২, ৬৩. তাফহীমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, ১৯৮৯, ৬৪. তাফহীমুল কুরআন, ১৯শ খণ্ড, ১৯৯১, ৬৫. তাফহীমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, ১৯৯৩, ৬৬. তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, ১৯৯৪, ৬৭. তাফহীমুল কুরআন, ৪র্থ খণ্ড, ৬৮. তাফহীমুল কুরআন, ৫ম খণ্ড, ৬৯. তাফহীমুল কুরআন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭০. তাফহীমুল কুরআন, ৭ম খণ্ড, ৭১. তাফহীমুল কুরআন, ৮ম খণ্ড, ৭২. তাফহীমুল কুরআন, ৯ম খণ্ড, ৭৩. তাফহীমুল কুরআন, ১০ম খণ্ড, ৭৪. তাফহীমুল কুরআন, ১১ম খণ্ড, ৭৫. তাফহীমুল কুরআন, ১২ম খণ্ড, ৭৬. তাফহীমুল কুরআন, ১৩ম খণ্ড, ৭৭. প্রত্যয়ের সূর্যোদয়, ২০০০, ৭৮. অপরাজিত, ২০০৩।

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত তালিকা ছাড়াও তাঁর অপ্রকাশিত বেশ কয়েকটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এ থেকে সাহিত্যিক-গবেষক ও অনুবাদক আবদুল মান্নান তালিবের একটা মোটামুটি পরিচয় লাভ করা যায়। এর দ্বারা তাঁর প্রতিভার বহুমাত্রিকতা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যায়। মননশীল মৌলিক রচনা, সম্পাদনা, শিশুতোষ রচনা, অনুবাদ, কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ তাঁর বহুমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে। অনেকটা লোকচক্ষুর অন্তরালে, অবিচল নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশককাল ধরে আটাত্তরটি গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন তা আমাদেরকে বিস্ময়-আনন্দে নিরতিশয় অভিভূত করে। ফলে কৌতূহলী পাঠকের শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তিনি স্থায়ী আসন করে নিতে সক্ষম হয়েছেন। দীর্ঘকাল ধরে তাঁর লেখা ও অনূদিত রচনাবলী পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়ে আসছে। তাঁর লেখার একটি বিশেষ গুণ হলো এই যে, কঠিন বিষয়কেও তিনি সহজভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম। সহজ, সরল ভাষা, মার্জিত ও বোধগম্য প্রকাশ-ভঙ্গীর কারণে তাঁর লেখা সর্ব শ্রেণীর পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়ে উঠেছে।

আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বাংলাদেশে ইসলাম' একটি অতি মূল্যবান গ্রন্থ। লেখকের ইতিহাস-দৃষ্টি এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসা আমাদেরকে অনেক অজানা বিষয়ের সন্ধান দিয়েছে। আমরা যতটা জানতে পেরেছি তার চেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসাকে তিনি অধিক জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছেন। সেদিক দিয়ে তিনি ইতিহাস-পাঠকের সামনে এক নতুন দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাস এক জটিল বিষয়। কারণ যাঁরা এ ইতিহাস লিখেছেন তাঁরা নিরপেক্ষতার প্রমাণ দিতে পারেনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক মুসলমান– তাদের সম্পর্কে, তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য, জীবনায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিহাস-রচয়িতাগণ– দুর্ভাগ্যবশত যারা প্রায় অধিকাংশই অমুসলমান–যথাযথ, তথ্যপূর্ণ ও প্রমাণ-সাপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ পেশ করতে পারেন নি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও বিদ্বেষপরায়ণ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মুসলমান ও ইসলামের নামে কলংক লেপনের অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছেন। তাই অনেক সময় তাঁদের লেখা থেকে মুসলমান ও ইসলামের সঠিক ইতিহাস অনুসন্ধান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এহেন অবস্থায় আবদুল মান্নান তালিব অসংখ্য বাংলা, ইংরেজী, উর্দু, আরবী, ফারসী গ্রন্থ এবং দুষ্প্রাপ্য নানা তত্ত্ব-তথ্য, দলিল-দস্ত

www.nagorikpathagar.org

াবেজের সাহায্যে ব্যাপক অধ্যয়ন ও গবেষণার মাধ্যমে 'বাংলাদেশে ইসলাম' নামক তাঁর মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি শুধু ইতিহাস-পাঠকের জন্যই নয়, ইতিহাস-গবেষকদের জন্যও একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

'ইসলামী সাহিত্য ঃ মূল্যবোধ উপাদান' এবং 'সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ঃ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট' গ্রন্থ দুটিও অত্যন্ত মূল্যবান দুটি গবেষণাপ্রসূত মৌলিক গ্রন্থ। ইসলাম আল্লাহ-প্রদত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মহানবী (স.) স্বয়ং এ জীবন বিধানের ভিত্তিতে এক অনন্য আদর্শ সমাজ পরিগঠন করেন। ইসলামের মহান চার খলিফা (রা.) মহানবীর (স.) পদাংকানুসরণ করে সেই আদর্শ সমাজকে আরো সম্প্রসারিত ও মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। সে সমাজে আল কুরআনের ভিত্তিতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক অন্যান্য সকল ব্যবস্থাপনা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি পরিচালিত ও সম্পাদিত হতো। আল কুরআনের ভিত্তিতে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এ সকল ক্ষেত্রে নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কিন্তু খলাফায়ে রাশিদার পর খিলাফতের বদলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাসহ সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী নীতিমালা ও আদর্শ চরমভাবে উপেক্ষিত হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, অমুসলমানদের রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থা, অর্থ-ব্যবস্থা, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, সামাজিক রীতি-নীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি সবই মুসলমানরা অনুসরণ করতে শুরু করে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজস্বতা বলতে, স্বাতন্ত্র্য বলতে, বৈশিষ্ট্য বলতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। শুধুমাত্র মসজিদে যাওয়া, নামায-রোজাসহ কতিপয় বুনিযাদী ইবাদত ও অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত ব্যতীত মুসলমানদের চোখে পড়ার মত আর কোনই বৈশিষ্ট্য থাকলো না। অথচ মুসলমানরা এমন এক জাতি যার জীবনায়নের সকল ক্ষেত্রে অন্য সকল জাতি থেকে স্বতন্ত্র, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও সর্বোত্তম। মুসলিম জাতি তাদের এই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলীর কারণে এক সময় সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল আর এই স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও উত্তম গুণাবলী বিসর্জন দেয়ার ফলে তারা দীর্ঘকাল বিজাতির গোলামী করতে বাধ্য হয়। আজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের নীতি-আদর্শের কথা আমরা বিস্মৃত হয়ে পড়েছি। উদাহরণস্বরূপ সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের যে সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে, অমুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে মুসলমানদের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে যে মূলগত পার্থক্য তা বর্তমানের অধিকাংশ মুসলিম-রচিত কাব্য-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি পাঠ করে বোঝার উপায় নেই।

www.nagorikpathagar.org

আবদুল মান্নান তালিব কুরআন-হাদীসের নীতিমালার ভিত্তিতে ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ, উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও ধারণা উপরোক্ত গ্রন্থ দুটিতে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর গ্রন্থ দুটিতে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতা ও নতুন বিবেচনার অবকাশ থাকলেও এ যুগে বাংলা ভাষায় এসব বিষয়ে তিনি যে আলোচনার সূত্রপাত করে দিক-নির্দেশকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে আরো ব্যাপক আলোচনা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। তবে আবদুল মান্নান তালিবের উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় এ বিষয়ে নতুন গবেষকদের অনেক চিন্তার খোরাক যোগাতে সক্ষম। তাঁর অন্যান্য মৌলিক রচনাবলীতেও বহু মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ঘটেছে।

অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থের মধ্যে 'ইসলামী জীবন ও চিন্তার পুনর্গঠন' বইটি আবদুল মান্নান তালিবের জীবনের এক দীর্ঘ সময়ের গবেষণার ফল। এতে ছোট-বড় প্রায় ৭৬টি নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। তাঁর সম্পাদিত 'মাসিক পৃথিবী' ও 'দৈনিক সংগ্রাম' পত্রিকায় ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয়ের সংকলন গ্রন্থ এটি। ইসলামের আলোকে আমাদের জীবন, মুসলমানদের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত, আমাদের পতনের কারণ, নতুনভাবে ইসলামের সনাতন শাশ্বত আদর্শের আলোকে জীবন পুনর্গঠন ও তার ফলে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট রূপরেখা এতে বর্ণিত হয়েছে। এ গ্রন্থটি বর্তমান মুসলিম সমাজের এক দর্পণস্বরূপ। এ দর্পণে মুখ দেখে আমরা নিজেরাই নিজেদের চেহারা অবলোকন করে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করতে পারি।

'আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম' শীর্ষক গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিবের মৌলিক গবেষণা-প্রসূত আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন বিষয়ে লেখা মোট ৩৭টি নিবন্ধ 'জীবন ও সমাজ', 'সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য', 'শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষানীতি' এবং 'ইসলামী আন্দোলন'–এই চারটি ভাগে ভাগ করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। এ বিষয়-বিভাগ থেকেই গ্রন্থের মূল বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক এতে জীবন-সমস্যার নানা জটিলতার কথা উল্লেখ করে তার সঠিক ইসলামী সমাধানের পথ বাৎলে দিয়েছেন। এ গ্রন্থে লেখক ইসলামী বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন অবিচল, আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসা ও সমস্যা সম্পর্কেও তেমনি সম্যক অবহিত। উদার মানসিকতা, যুক্তিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি সত্যিকারের জ্ঞান-পিপাসুদের সামনে মৌলিক অনেক বিষয় তুলে ধরতে সক্ষম

www.nagorikpathagar.org

হয়েছেন। এ গ্রন্থটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে বোদ্ধা পাঠকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, আবদুল মান্নান তালিব কোন গতানুগতিক সাধারণ ইসলামী চিন্তাবিদ নন, আধুনিক জীবন-সমস্যা, যুগ-জিজ্ঞাসা ও ইসলাম-বৈরি সমাজে ইসলামের মৌল বিশ্বাস ও শাশ্বত আদর্শকে কীভাবে সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, তিনি সে ব্যাপারে এতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। ১৯৮১ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর এ গ্রন্থটি ইসলামী জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সংযোজন।

'উপমহাদেশে ইংরাজ-বিরোধী সংগ্রামের সূচনায় উলামায়ে কেরাম' শীর্ষক গ্রন্থটি আবদুল মান্নান তালিবের একটি মূল্যাবান ইতিহাস গ্রন্থ। এখানে ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অধ্যায় অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ বা মহাবিদ্রোহের সময় থেকে ইংরেজদের নিকট থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত উপমহাদেশের বরেণ্য আলেমগণ ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করে যে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করেছেন তার খন্ড-ক্ষুদ্র বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। ইংরাজ আমলে মুসলমানগণ শুধু নানাভাবে বঞ্চিত ও নির্যাতিত হয়েছে তাই নয়, তাদের ইতিহাসও বিকৃত করা হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের যে গৌরবোজ্জ্বল অবদান রয়েছে, হিন্দু ঐতিহাসিকগণ এত দিন পর্যন্ত তা ধামা-চাপা দিয়ে রাখার প্রয়াস পেয়ে ছিল। বিশেষত এক্ষেত্রে আলেম সমাজের যে কৃতিত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সে বিষয়ে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ নীরব। বস্তুত আলেম সমাজ শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রেই নয়, তাঁদের অনেকেই সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সঠিক নেতৃত্ব দিয়েছেন স্বাধীনতা আন্দোলন তথা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং এজন্য তাঁদেরকে চরম জুলুম-নির্যাতনও ভোগ করতে হয়েছে। এরই কিছু চিত্র ও বিবরণ পাওয়া যায় এ গ্রন্থে। সত্যানুসন্ধানে যেমন তেমনি সত্যের জন্য, দেশের জন্য আত্মত্যাগের মহিমান্বিত গৌরব-গাঁথা পড়ে উদ্দীপিত হবার তাগিদেও এ বইটি পাঠ করা প্রয়োজন। একাধারে জীবন-চরিত্র ও ইতিহাসের বর্ণনা থাকায় বইটি খুবই সুখপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়েছে।

শিশু-কিশোর সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিবের বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। শিশু-কিশোরেরা জাতির ভবিষ্যত। তাদের মন-মানসিকতা অনুযায়ী রুচিশীল সাহিত্য সৃষ্টি করার গুরুত্ব অপরিসীম। তাদেরকে সঠিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করা, মহৎ ও উন্নত জীবন গঠনে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করা শিশু-সাহিত্যিকের গুরু দায়িত্ব। আবদুল মান্নান

www.nagorikpathagar.org

তালিব এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আনজাম দিয়েছেন। তাঁর শিশুতোষ রচনায় আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য-মূল্যবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে। উন্নত আদর্শ ও নৈতিকতার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য রচিত। শিশু-কিশোরদের উপযোগী ভাষার ব্যবহার, কাহিনী অবলম্বন ও পরিমল আনন্দ প্রদানের জন্য রচিত তাঁর শিশু-কিশোর সাহিত্য ও বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক জাতীয় রচনা বিশেষ গুরুত্ববহ। এ জাতীয় গ্রন্থ আমাদের শিক্ষায়তনের বিভিন্ন স্তরে পাঠ্য-পুস্তক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

আবদুল মান্নান তালিবের এ পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬টি। শিশু-কিশোরদের উপযোগী তাঁর ছড়া, কবিতা, গল্প-কাহিনীমূলক রচনা বাংলা সাহিত্যের এ শাখায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, স্বতন্ত্র মহিমায় উজ্জ্বল এক বিশিষ্ট অবদান। এ জাতীয় রচনার ব্যাপক প্রচার হলে এবং এসব বই স্কুল-মাদ্রাসায় পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হলে দেশ-জাতি বিশেষত আগামী প্রজন্ম সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার প্রেরণা লাভ করবে। তাঁর এ জাতীয় গ্রন্থের ভাব-ভাষা, বিষয় ও রচনা-ভঙ্গিও শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অনুবাদক হিসাবে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। আরবি, উর্দু, বিভিন্ন ভাষার ৪২টি মূল্যবান গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন তিনি। এর মধ্যে তাফহীমূল কুরআন, বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থ, সীরাতে সারওয়ারে আলমসহ মাওলানা মওদূদীর বিভিন্ন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। তাঁর এসব অনুবাদের ফলে বাংলাভাষী পাঠক বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠের সৌভাগ্য অর্জন করে। আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তাঁর অনুবাদের ভাষা মূলের ন্যায় সহজ, প্রাঞ্জল ও সাবলীল। তাই ভাষা ও বিষয়বস্তুর কারণে আবদুল মান্নান তালিবের অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার অধিকারী। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর অবদান চিরভাস্বর, অমলিন ও স্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

সাহিত্য-সংগঠক হিসাবেও আবদুল মান্নান তালিবের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় তরুণ সাহিত্যিকের উদ্যোগে 'পাক সাহিত্য সংঘ' নামে যে প্রতিষ্ঠানটির জন্ম হয়, তিনি সে প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। সহ-সভাপতি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বিশিষ্ট ছাত্রনেতা ও তরুণ ইসলামী চিন্তাবিদ শাহ আবদুল হান্নান। বর্তমান লেখক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। সালেহউদ্দীন জহুরী (কোষাধ্যক্ষ), নুরুল আলম রইসী (সদস্য), এ.কে.এম.

www.nagorikpathagar.org

নাজির আহমদ (সদস্য) প্রমুখ ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কমিটির সদস্য। ষাটের দশকে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের আদলে সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নবচেতনার উন্মেষ ঘটানো ও আমাদের নিজস্ব রুচিশীল, সুস্থ জাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্মাণে 'পাক সাহিত্য সংঘ' তখন যে ইতিবাচক বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে, পরবর্তীতে সেই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হলেও উপরোক্ত ব্যক্তিগণ উক্ত একই ধারায় তাঁদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে সকলেই মূল্যবান অবদান রেখেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে, আমার ধারণা, আমাদের সকলের মধ্যে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বহু চড়াই-উৎড়াই পেরিয়ে, বাধা-প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে তিনি সাফল্যের স্বর্ণদ্বারে সমুপস্থিত। তাঁর জীবনের মিশন পূর্ণ করে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর সাংগঠনিক কর্ম-তৎপরতার প্রধান নিদর্শন হিসাবে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনার বিষয় উল্লেখ করা যায়। ১৯৮৭ সাল থেকে 'বাংলা সাহিত্য পরিষদে'র পরিচালক হিসাবে আমৃত্যু আবদুল মান্নান তালিব মূল্যবান ভূমিকা পালন করে গেছেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, গবেষণা, প্রকাশনা, মননশীলতার বিকাশ, সুস্থ-সৃজনশীল সাহিত্য নির্মাণে বাংলা সাহিত্য পরিষদ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সর্বাধিক।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আবদুল মান্নান তালিবের অবদান সম্পর্কে উপরে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হলো তা থেকে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায় এবং কতটুকু তা সহজেই নিরূপণ করা যেতে পারে। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাঁর যে সম্পর্ক ও সেক্ষেত্রে তাঁর যে অবদান সেটাও গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য সাংবাদিক হিসাবে আবদুল মান্নান তালিবের অবদানও কম নয়।

সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মূল্যবান অবদানের জন্য আবদুল মান্নান তালিব নিম্নোক্ত পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন ঃ

এক. "বাংলাদেশ ইসলামিক ইংলিশ স্কুল, দুবাই সাহিত্য পুরস্কার", ১৯৯৪।

দুই. "কিশোরকণ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার", ২০০২।

তিন. "কবি গোলাম মোহাম্মদ সাহিত্য পুরস্কার", ২০০৪।

www.nagorikpathagar.org

আফজাল চৌধুরী

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিমান কবি হিসাবে আফজাল চৌধুরী (জন্ম- ১০ মার্চ ১৯৪২, মৃত্যু- ৯ জানুয়ারি ২০০৪) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর জন্ম সিলেট জেলার হবিগঞ্জে (বর্তমানে জেলা)। পিতা- আবদুস সবুর চৌধুরী, মাতা- সৈয়দা ফয়জুন্নেছা খাতুন। তিনি ১৯৬৫ সনে বি.এ. (অনার্স) এবং ১৯৬৭ সনে বাংলাতে এম.এ. পাশ করেন।

বিগত শতাব্দির ষাটের দশকে কাব্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব। এর পর আমৃত্যু বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় তাঁর সুদীপ্ত পদচারণা সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যদিও স্বল্পপ্রজ কবি হিসাবে তাঁর একটি পরিচিতি আছে, তবু প্রতিভার বিচারে ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম, কারো কারো বিবেচনায় সর্বাগ্রগণ্য। আফজাল চৌধুরী একজন আত্মমগ্ন কবি ছিলেন, তেমনি ছিলেন শব্দ-সচেতন, বিষয়-সচেতন, আঙ্গিক-সচেতন ও ইতিহাস-সচেতন। পূর্বসূরী কবি ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) মত তিনি ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যানুসারী। তবে তাঁর কাব্য-ভঙ্গি ও ভাষা-ব্যবহার অনেকটা মাইকেল মধুসূদনের (১৮২৪-১৮৭৪) মতই ক্ল্যাসিক-ধর্মী। কবিতার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের চেয়ে অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাই অধিক।

তাঁর রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা ঃ ১. কল্যাণব্রত (কাব্যগ্রন্থ, ১৯৬৯), ২. হে পৃথিবী নিরাময় হও (তিনাঙ্ক কাব্য নাটক, ১৯৭৯), ৩. শ্বেতপত্র (কাব্য, ১৯৮৩), সামগীত দুঃসময়ের (কাব্য, ১৯৯৬), ৪. ঐতিহ্যচিন্তা ও রসূল প্রশস্তি (প্রবন্ধ, ১৯৭৯), ৫. বার্নাবাসের সুসমাচার (বার্নাবাসকৃত বাইবেলের অনুবাদ, ১৯৯৬)

www.nagorikpathagar.org

উপরোক্ত ছয়টি গ্রন্থ কবির জীবৎকালে প্রকাশিত হয়। তাঁর অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটি তালিকা দিয়েছেন আফজাল চৌধুরীর

একান্ত অনুরাগী ছাত্র কবি মুকুল চৌধুরী। তার দেয়া তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ ১. বন্দী আরাকান ও অন্যান্য কবিতা, ২. নয়া পৃথিবীর জন্য (কবিতা), ৩. খোশহাল খান খটকের জন্য (কবিতা), ৪. আরেক গোলার্ধে হৃদয় (কবিতা), ৫. শবমেহেরের মুক্তি (কবিতা), ৬. শেষ নবীর গৃহাঙ্গণ (কবিতা), ৭. শাশ্বতের পক্ষে (কবিতা),
৮. জালালুদ্দিন রুমী কবির কবিতা (অনুবাদ), ৯. আলী শরীয়তীর কবিতা (ঐ), ১০. বাঁশী (কাব্য-নাটক), ১১. সবুজ গম্বুজে ঢাকা ফুল (গীতি-নকশা), ১২. সিলেট বিজয় (নাটক), ১৩. কবিতার সংসারে জটিলতা (প্রবন্ধ), ১৪. প্রতিশ্রুত কথকতা (প্রবন্ধ)।

এ তালিকাও সম্পূর্ণ কিনা, তা নিঃসন্দেহে বলা দুঃষ্কর। এছাড়াও হয়ত তাঁর আরো পাণ্ডুলিপি থাকতে পারে। তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সকল গ্রন্থ পাঠকের নিকট পরিবেশিত হলে তাঁর সম্পর্কে একটি সঠিক ও পরিপূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব। তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান কবির সমগ্র রচনাবলী অবিলম্বে প্রকাশিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। আফজাল চৌধুরী ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণব্রতে'র শুরুতে উল্লেখ আছে ঃ

"একটি বিবেকহীন সমকালকে মহাকালের প্রমত্ততায় তৌলন করে যদি দেখা যায়, তবে এই যন্ত্রের আর্তনাদে পূর্ণ কলান্তরে আত্মা কি উধাও ? অযুত কবির মর্মালোকে যে অন্ধকার বিব্রত বিধাতার বীণা তথায় বাজাবেনা কেউ? একজন ব্রতচারী 'আলো আলো আরো আলো' বলে এক প্রগাঢ় ঈমান ব্যক্ত করে গেল। তাই কল্যাণব্রত একটি প্রতিজ্ঞা ও যুগপৎ আত্মার নাম, ভালো ও মন্দের দ্বন্দ্বে নিষ্ক্রান্ত হয়ত এক রক্ত পুষ্প সে -কবি আফজাল চৌধুরীর জীবন বৃক্ষের চূড়োয়।"

'কল্যাণব্রতে' মোট তেইশটি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর প্রথম কবিতার নাম 'স্বর'। এই কবিতার ভূমিকায় কবি লিখেছেন ঃ 'রাত্রির শেষ যামে কোন এক গভীর আলোক থেকে একদিন কেউ এসে আমাকে ডাক দিল। আমি তাকে জানিনে কিংবা, তাকে কোনদিনই দেখিনি। তৎক্ষণাৎ গাছের শাখে ঘুমের ঘোরে পাখিরাও ডাকলে, আঙিনায় পায়রারা বকতে শুরু করলে, দূর পল্লীর গৃহস্থ মোরগদল দীর্ঘ প্রণবনাদে অরুণোদয়ের পূর্বাভাস গাইতে লাগলো। সারারাত আমি

www.nagorikpathagar.org

ঘুমাইনি, অর্ধজাগরণ নিদ্রানীলিম চিত্তালোকে কেবলি ত্যক্ত হচ্ছিলাম- আমি কে, কেন আমি, কোথা হতে এই আমি! কান্তারব্যাপী নগ্নতায় এভাবেই আত্মাহীন সবুজ মরুভূমিতে হারিয়ে যাচ্ছিলাম, সহসা নিদ্রা খুলে বাইরে এলাম। আলোর অভিঘাতে কাঁপছে যেন রাত্রিশেষ। দূরালোকে নক্ষত্রের জ্বলজ্বলে অন্ধকারে মর্মাহত হয়ে দেখলাম কেউ নেই, যে ডাক দিয়েছে সেও নেই। দিনান্তে ঘটনাটি কবিতাকারে 'স্বর' নামে চিহ্নিত হল।"

কবির 'স্বর' কবিতাটি নিচে উদ্ধৃত হল ঃ

"কে যেন শূন্যলোকে ডেকে গেল কাছে আয়
কাছে আয় নারে
হেমন্তের একরাশ পাতা ঝরে যাওয়া গেরুয়ায়।
চারিদিকে নির্জনতা অস্বচ্ছ শূন্যতা কেঁপে যায় শুধু
করুণ হ্রেষায় দূরে হাওয়ার উর্ধশ্বাসে অস্থির বেলা,
পথচারী কেউ নেই, পথ নেই, আদিগন্ত ফসিল বিজন
ভাবলো সে শূন্যলোকে কোন ঠাঁই, কার কাছে
দাঁড়াবে কোথায়?
কে যেন বারংবার নাম ধরে ডেকে যায় তবু
কাছে আয় কাছে আয় নারে!
নিজেই নির্জন তার শূন্যলোক নিজের ভেতর ঃ
হায় ভিন্ন নামে ডাক দিয়ে যায় নিজেকেই।"

কবি আস্তিকতায় বিশ্বাসী। তাঁর সমগ্র সত্তা জুড়ে আধ্যাত্মিকতার রোমাঞ্চিত আবেশ। সাধারণ জীবন বাস্তবতার মধ্যেও তিনি এক অপার্থিব অন্তহীন সত্তার অস্তি ত্ব অনুভব করে থাকেন। উপরোক্ত কবিতায় তারই ব্যঞ্জনাময় অভিব্যক্তি ঘটেছে। 'কল্যাণব্রত' কাব্যের নাম কবিতাটিতে উপরোক্ত অনুভবের দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। কবিতাটির কয়েকটি লাইন নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"বলিও আমার প্রেম ঈশ্বরের ভস্ম নয় ভূমা
দীপ্তিমান কোলাহলে সমতল আত্মার সঙ্গীত
রাশি রাশি পুলকের বিন্দু বিন্দু বোধের অতীত
অন্য এক বোধ শুধু স্পন্দমান আলোর উপমা
আলোক সে নির্ভুলের আন্তরিক বলীয়ান ক্ষমা
বলিও আমার প্রেম ঈশ্বরের ভস্ম নয় ভূমা।
নভচারী আনন্দেরা বালুকায় ঝরে দুই বেলা

www.nagorikpathagar.org

নিয়মিত অভিসারে সৈকত সমীরে গলে গিয়ে
স্ফুরিত শিশির হয়ে অপরূপ আগ্রহে তিমিরে
মোহন সূর্যরশ্মি বুকে নিয়ে স্মিত ভোরবেলা,
প্রাচীন রোদের স্মৃতি মুছে গেলে আনন্দ জাগিয়ে
শুভ্রদেহী কিশরীরা প্রার্থনায় নত হয়ে তীরে
এখনি উজ্জ্বল রোদে প্রভাতের নৃত্য আর মেলা
নভচারী আনন্দেরা বালুকায় ঝরে দুইবেলা।"

'কল্যাণব্রত' কবি আফজাল চৌধুরীর একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রকাশের পর ষাটের দশকের বিশিষ্ট কবি ও লেখক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ১৯৭০ সনে তাঁর সম্পাদিত 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার কবিতা সংখ্যায় লেখেন ঃ

"আমাদের কাব্যক্ষেত্রে ষাটের অঙ্গন যেসব উদ্যোগী তরুণের আশান্বিত পদভারে সরব হয়েছিল, আফজাল চৌধুরী তাদের অন্যতম। অন্য অনেকের মতো আমরাও ... যারা সেই নতুন কবিতা চেষ্টার প্রতিটি অনিবার্য ও সজীব প্রবণতাকে উদগ্রীব প্রত্যাশা নিয়ে লক্ষ্য করে চলছিলাম সে সময়, নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছিলাম, আফজাল চৌধুরীর সপারগ হাত এমন কিছু উল্লেখযোগ্য উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দে'াচ্ছে যা সজীব ও প্রাণবন্ত এবং যা আগামী সময়ের আকাঙ্ক্ষিত দিনগুলোয় কবিতার সচ্ছল প্রয়াসে আমাদের কাব্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করবে। আফজাল চৌধুরী সম্বন্ধে আমাদের এককালের সেই উদ্বুদ্ধ আশাবাদ যখন আজ সুনিশ্চিত সন্দেহের সম্মুখীন, কবি নিজেই যখন নিস্পৃহ হয়ে আসছেন কবিতা রচনার সক্রিয় প্রচেষ্টা থেকে যখন কবিতার সব রঙিন পালক হারিয়ে আফজাল চৌধুরী এখন কেবল একটা নাম ... শুধু নাম তাঁর কবিতা আস্বাদনের উত্তপ্ত আলোড়নগুলোও আমাদের হারানো অতীতের অনেক জীবন্ত ঘটনার মতো, ম্লান হতে হতে দূর থেকে দূরে অপসৃয়মান, সেই সময় হঠাৎ আফজাল চৌধুরীর কাব্য সংকলন অতীতের সব পুরোনো স্বাদ ও উত্তাপ নিয়ে ফিরে এসে আমাদের আস্তিন ধরে নাড়া দিয়েছে।

"'কল্যাণব্রত' আফজাল চৌধুরীর গত কয়েক বছরে রচিত কবিতার সংকলন। আঙ্গিকের দিক থেকে এ কবিতাগ্রন্থ একটি কারণে আমাদের সমকালে প্রকাশিত অন্যসব কবিতার বই থেকে স্বতন্ত্র। সেটা হলো প্রতিটি কবিতার রচনার পূর্ব মুহূর্তে যে বোধ ও প্রেরণা তাকে আশ্বস্ত ও আলোড়িত করেছে, এই গ্রন্থের প্রতিটি কবিতার প্রারম্ভে তিনি সেই আলোড়নের ইতিহাস দিয়েছেন স্বচ্ছন্দ ও কবিতাময় গদ্যে। কবিতার ভূমিকা সংযোজনের এই রীতিকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অভিনব বলবো না, তবে সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে অন্য কোনো কবি

www.nagorikpathagar.org

এই আঙ্গিক গ্রহণ করেছেন বলে মনে করতে পারছি না। এদিক থেকে আফজাল চৌধুরীর এই আঙ্গিক সমকালীনতার প্রেক্ষাপটে নতুনত্বের দাবী করতে পারে। এর ফলে প্রতিটি কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনার মুহূর্তে লেখক যে ভাবনা ও অভিজ্ঞতার স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছিলেন, অনুরণিত হয়েছিলেন যেসব বোধ ও বিশ্বাসের দ্বারা তার পরিচয় পাঠকের চোঁখে পুরোপুরি ধরা পড়ায় কবিতার পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন সহজতর হয়ে ওঠে।

"'কল্যাণব্রত' পাঠের সময় এই কাব্যের যে গুণটি বড় হয়ে পাঠকের চোঁখের সামনে ভাসে তা হলো ঃ এর স্বকীয়তা। আফজাল চৌধুরীর কণ্ঠস্বর আলাদা ও স্বকীয়, স্বাদে ও চরিত্রে গতানুগতিক কবিতা থেকে আলাদা। তার কবিতার ডালে ডালে শব্দের যে অবাক বিস্ময় গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে ফুটে আছে ... তা যে কোন পাঠককেই আকর্ষণ করবে।

"আফজাল চৌধুরীর কবিতা যে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র তার কারণ শুধু এই নয় যে, যে শব্দ শরীরকে আশ্রয় করে কবিতার বিকাশ ... তার কবিতার সেই শব্দশরীর অন্যদের কবিতার শব্দশরীর থেকে আলাদা। তার কবিতা আলাদা, তার কারণ তার জীবনানুভূতি আলাদা। তার কবিতা পড়তে বসে টের পাই, এক সজীব বিশ্বাসময়তা ছুঁয়ে আছে তার কবিতার হাত, এক রোমাঞ্চিত অসীমের চঞ্চল উন্মুখ শিহরণ উত্তল হাওয়ার মতো দোলা দিয়ে যাচ্ছে তার কবিতার বিস্বস্ত পাতায় পাতায়। আমাদের সমকালের ব্যাপ্ত নৈরাজ্য, অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও বস্তুসর্বস্বতার মধ্যে যাদের বিশ্বস্ত আত্মা ক্রন্দন করছে 'আনন্দের অমৃতময় উৎসবে' সমর্পণের ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায়, যাদের পথের দুই পাশে 'রাশি রাশি পুলক' আর 'নভোচারী আনন্দ' ঝরে যায় সকাল-বিকেল, আফজাল চৌধুরী তাদের একজন। আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার ক্ষেত্রে যে কয়টি নিঃসঙ্গ হৃদয় 'অমৃতের সফল আরতির' আকাশের স্বাস্থ্যময় হাত বাড়াতে চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে আফজাল চৌধুরীর নাম অন্তর্ভুক্ত। তার কবিতার একটা প্রধান গুণঃ দৃঢ়, সংবদ্ধ বাঁধুনি। একটা সংহত ক্ল্যাসিক্যাল স্বাস্থ্য আছে তার কবিতায় ... যেন পাথর কেটে তৈরী করা। ভারসাম্যময়, স্মিত ও উদাত্ত তার কবিতা আবেগকে ঘনীভূত করে শব্দ ও পংক্তির বাঁধনে সুসংবদ্ধ করা হয়েছে অবলীলায়।"

আফজাল চৌধুরীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ-'কল্যাণব্রত' সম্পর্কে তাঁর সমকালীন একজন বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ উপরোক্ত যে মন্তব্য করেছেন, তা আফজাল চৌধুরীর সমগ্র কাব্যালোচনার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তিনি

www.nagorikpathagar.org

অল্প অথচ সুনির্বাচিত কথামালায় তাঁর প্রতিভা ও কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের মতামত কবি আফজাল চৌধুরীকে যথাযথভাবে বুঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই উপরে বিস্তৃত আকারে তাঁর মতামতগুলো উদ্ধৃত হলো।

আফজাল চৌধুরীর বোধ ও বিশ্বাস ছিল সুস্পষ্ট ও দৃঢ়। তাঁর বিশ্বাসের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই, অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে তাঁর মনে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাঁর সমগ্র কাব্য-পরিমণ্ডলে তিনি এ বোধ ও বিশ্বাসের কথা কাব্যময় মনোমুগ্ধকর ভাষায় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই আফজাল চৌধুরীকে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। পাঠকের মনকে তিনি সহজেই দ্রবীভূত করেন। এটা সফল কবিদের এক জাদুকরী কৌশল, যা শব্দ, ছন্দ ও ব্যঞ্জনার অভিনব বিন্যাসে কবির বিশ্বাসকে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রীতে অনায়াসে পৌঁছে দেয়।

বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৭১ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত ও ডক্টর রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা'য় ষাটের দশকের কবিদের মধ্যে আফজাল চৌধুরীর স্থান ছিল শীর্ষে। রফিকুল ইসলাম তাঁর ভূমিকায়ও আফজাল চৌধুরীর নাম ও তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"ষাট দশকে আমাদের কাব্যক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল সাময়িক পত্র-পত্রিকার অভাব পূরণার্থে নিয়মিত ও অনিয়মিত কাব্য-সংকলন বা কেবলমাত্র কবিতার জন্যে পত্রিকার প্রকাশ। ... ঐ সব নিয়মিত-অনিয়মিত কবিতা সংকলন ও পত্র-পত্রিকা থেকে ষাট দশকের শেষপাদে বেশকিছু প্রতিভাবান তরুণ কবি আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই কবিদের মধ্যে আফজাল চৌধুরী, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ রফিক, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, মহাদেব সাহা, আবু কায়সার, হুমায়ুন আযাদ, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, সাযযাদ কাদির, রাজীব আহসান চৌধুরী, ফরহাদ মজহার, হুমায়ুন কবির আমাদের সমকালীন কাব্যক্ষেত্রে অতি পরিচিত নাম। এর মধ্যে উক্ত কবিদের অনেকেরই কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে যথা আফজাল চৌধুরীর 'কল্যাণব্রত', আব্দুল মান্নান সৈয়দের 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' ও 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা', মোহাম্মদ রফিকের 'বৈশাখী পূর্ণিমা', রফিক আজাদের 'অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস', নির্মলেন্দু গুণের 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই', সাযযাদ কাদিরের 'যথেচ্ছধ্রুপদ' ইত্যাদি। উক্ত কাব্য গ্রন্থসমূহ কবিতা শিল্পের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সমৃদ্ধ। বস্তুত সত্তর দশকে আমাদের কবিতা কোন খাতে প্রবাহিত হবে তার আভাস পাওয়া যায় আমাদের তরুণতম কবিদের ঐ সৃষ্টিধারা থেকেই।" (পৃঃ ৯১-৯২)।

www.nagorikpathagar.org

আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায় নলেজ হোম, ঢাকা থেকে ১৯৭৫ সনে প্রকাশিত হয় 'এক দশকের কবিতা'। সেখানে ষাটের দশকের ৩৮ জন কবির কবিতা সংকলিত হয় এবং এ ৩৮ জনের তালিকায় আফজাল চৌধুরীর স্থান ছিল তৃতীয়। আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর উক্ত সংকলনের ভূমিকায় আফজাল চৌধুরীকে 'সুসংহত প্রত্যয়স্মিত কবি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ বাংলা একাডেমীর 'উত্তরাধিকার' পত্রিকায় শহীদ দিবস ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর পঁচিশ বছরের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে আফজাল চৌধুরীকে মূল্যায়ন করেন এভাবে ঃ

"আফজাল চৌধুরী কবিতায় শুধু রূপরচনা করেই তৃপ্তি বোধ করেন না, অধিকন্তু নৈরাশ্য, হতাশা, বিষাদবোধ ও মানসিক-সংকটের আলেখ্য রচনাও তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি তাঁর কবিতার মাধ্যমে বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত করতে চান ; আস্তি ও নাস্তির দ্বন্দ্ব, আশা-নৈরাশ্যের টানাপোড়েন এবং মানবিকবোধকে তিনি কবিতায় উৎসারিত করতে চান- তাই প্রায় প্রতিটি ছন্দে সমর্পিত কবিতার পাশাপাশি গদ্যে রচনা করেন সে সবের ভাষ্য। 'কল্যাণব্রতে' উদ্বুদ্ধ বলেই তাঁর কবিতায় হতাশা-নৈরাশ্যের আঁধিকে বিদীর্ণ করে ঝলকিত যেন আশাবাদের আলো ... আফজাল চৌধুরীর কবিতায় আলো প্রার্থনা এবং সত্যলোকে উৎসারিত হবার আকাঙ্ক্ষাই নানাভাবে রূপ পেয়েছে। তিনি এক ধরনের দার্শনিক অভিজ্ঞান ও আর্তিতে মানব যাত্রীদের ইতিহাস পরিক্রম ও পর্যটন করেন, সভ্যতার অগ্রযাত্রার স্বরূপ অন্বেষণ ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং আকাঙ্ক্ষা উচ্চারণ করেন মানব মুক্তির নাস্তি থেকে আস্তিতে উত্তরণের মাধ্যমেই যে এই মুক্তি আসতে পারে এই বিশ্বাসে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী।" **(উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা, ১৯৭৪)**।

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ অন্যত্র আফজাল চৌধুরী সম্পর্কে বলেন ঃ

"আফজাল চৌধুরী ষাট এবং সত্তরের দশক থেকেই মানবতাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হন, 'কল্যাণব্রত'ই তাঁর সাহিত্য-সাধনার ও কাব্য-চর্চার উদ্দীষ্ট বা অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে ওঠে। রোমান্টিক মানস-প্রবণতার অধিকারী, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের রূপকার হলেও আফজাল চৌধুরী নিছক 'শিল্পের জন্য শিল্প' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবননিষ্ঠ, রহস্য-সন্ধানী এবং ক্রমাগত এক মহাশক্তির অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে আস্থাবান। প্রতীক ও রূপকের আশ্রয়ে এবং রহস্যময় ভাষায় তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ

'কে যেন শূন্যলোকে ডেকে গেল কাছে আয় কাছে আয় নারে
হেমন্তের একরাশ পাতা ঝরে যাওয়া গেরুয়ায়।
চারিদিকে নির্জনতা অস্বচ্ছ শূন্যতা কেঁপে যায়

www.nagorikpathagar.org

শুধু কে যেন বারংবার নাম ধরে ডেকে যায় তবু
কাছে আয় আয় নারে।'
(স্বর, কল্যাণব্রত, ডিসেম্বর ১৯৬৯)।

"পরবর্তীকালে আফজাল চৌধুরী এই অদৃশ্য 'স্বর'কে অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার আহ্বানকে শুধু শ্রুতিতে নয়, হৃদয়ের গভীরে অনুধাবন ও আবিষ্কার করেছেন, তিনি হয়ে উঠেছেন মানব 'কল্যাণব্রতী' এবং ইসলামী আদর্শ, এতিহ্য ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী। আফজাল চৌধুরী ছিলেন শুধু কাব্যের নয়, বিশ্ব ইতিহাসের মানব সভ্যতার অগ্রগতির বিচিত্রধারার অভিনিবিষ্ট পাঠক। তাঁর খণ্ড কবিতার গ্রন্থ 'কল্যাণব্রত' এবং কাব্যনাটক 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' এর অর্জন ও কবিতাবলীতে রয়েছে একজন মানবকল্যাণকামী এবং ইসলামের মানবতাবাদে বিশ্বাসী ও শান্তিকামী মানুষের আর্তি-আকুলতা এবং শান্তির অন্বেষক আফজাল চৌধুরী যে ইতিহাসের অভিনিবিষ্ঠ পাঠক এবং মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ তারও স্বাক্ষর আছে তাঁর কবিতায়। আফজাল চৌধুরীর গভীর পর্যবেক্ষণ ঃ

'তোমার নিজের গোত্র কাল হতে কালান্তরে
ঈগল বংশের
শিকারীরা রমণীরা ভেসে গেছে জীবনের
মরন্তুদ স্রোতে
শরাব ও সান্ত্বনার অন্ধকার থেকে আরো
গূঢ় অন্ধকারে। **(কল্যাণব্রত)**'

"আফজাল চৌধুরী ছিলেন তাঁর আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী, আদর্শবোধে উজ্জীবিত এবং এক ধরনের 'মিশনারী জিল' (Missionary Zeal) এ উদ্দীপিত। তিনি ছিলেন একজন নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ও সংগঠক। ... আফজাল চৌধুরীর 'কল্যাণব্রত', 'শ্বেতপত্র' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করে একজন শক্তিমান, মননশীল ও ছন্দ-দক্ষ কবিকে আবিষ্কার করেছিলাম, অনুধাবন করেছিলাম যে, সম্পূর্ণ প্রথাগত রীতির ও প্রচলিত ধারার অনুসারী কবি না হলেও তিনি নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যেও এক ধরনের সুমিতি ও সুসাম্য বজায় রাখেন। তাঁর কাব্য-নাটক 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' পাঠ করে একজন শক্তিমান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দক্ষ কবিকেই আবিষ্কার করলাম, উপলব্ধি করলাম যে আফজাল চৌধুরীর কবি-হৃদয় শান্তি-অন্বেষী, সত্য, ন্যায়, শুভ ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠায় প্রত্যয়ী এবং এ যুগের পৃথিবীর এবং সমকালীন মানব-সভ্যতার তথা নাস্তিক্যবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী জড়-সভ্যতার অসুস্থতায় তিনি ব্যথাহত এবং এই রোগের নিরাময়কারী।" **(দৈনিক সংগ্রাম, ১৬ জানুয়ারি ২০০৪)**।

www.nagorikpathagar.org

কবি আফজাল চৌধুরীর কাব্য নাটক 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' একটি নিরীক্ষাধর্মী নাটক। কবি ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য-নাটকের সাথে ভাবের দিক থেকে অনেকাংশে এ নাটকের মিল রয়েছে। ফররুখ আহমদ যেখানে হিংসা-দ্বেষ, লোভ-লালসা ও অহংকারের বিরুদ্ধে উদার মানবতার জয়গান গেয়েছেন, আফজাল চৌধুরীও তেমনি তাঁর 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' নাটকে সুস্থ-সুন্দর-স্বাস্থ্যবান পৃথিবীর প্রত্যাশায় তাঁর আকুলতা ব্যক্ত করেছেন। এ নাটকটি সম্পর্কে বিশিষ্ট কবি তালিম হোসেন বলেন ঃ

"কাব্য নাটকের আঁধারে প্রাকৃত বস্তু ও অতি-প্রাকৃত বস্তু ও অতি-প্রাকৃত মর্মকে মুখোমুখি করা হয়েছে। এ দু'টোর মুখ্য প্রতিনিধি যথাক্রমে নাটকের প্রধান চরিত্র এবং নেপথ্য প্রধান 'পুণ্যাত্মা'। সঙ্গ, বিসঙ্গ ও অনুসঙ্গ চরিত্রে এসেছে কয়েকজন নিকটের মানুষ ও প্রিয়জন, ইতিহাস ঐতিহ্যের কতিপয় অতীত পুরুষ, 'পুণ্যাত্মা'র বিপরীত মেরুতে স্থিত 'দাজ্জাল' এবং প্রকৃতির উপশমী প্রতীকবৃন্দ। আখতার বর্তমান কালের ফসল, বর্তমান সভ্যতার ফসল হিসাবে একজন প্রতিভাবান শিল্পী। তার শিল্পকৃতি আধুনিক মানস ও চরিত্রে অনবদ্য। কিন্তু তার সৃষ্টিশীলতা আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন অভিজ্ঞতার নিরন্তর অগ্রগমনের দিক-চিহ্নহীন অনুশীলনেরই সতীর্থ মাত্র। আর এই অনুশীলন আপন বৃত্তে অন্ধ আবর্তক বলে তার ফলশ্রুতি মানবতার জন্য বয়ে আনছে না উৎক্রান্তি র কোন প্রয়োজনীয়, বাঞ্ছিত ফসল। শুধু তাই নয়, তার সৃষ্টি ও আবিষ্কারের বুদ্বুদ সারা বিশ্বকে এক জলাবদ্ধ পললের প্রেক্ষিত করে তোলে, তাতে আপন পচনশীলতাকে ক্রমশঃ আরোগ্য নয় অপমৃত্যুর হাতে ছেড়ে দিচ্ছে।

"এই অনিবার্য প্রক্রিয়ার শিকার হয়েই আধুনিক সৃষ্টিধর শিল্প-প্রতিভা আখতার নিজেকে শাস্ত্রোক্ত 'দাজ্জালের' মুখোমুখি দেখতে পাচ্ছে। এই মহাপরাক্রান্ত অশুভ শক্তির প্রজাস্বত্ব মেনে নিলে অর্থাৎ তার বৈজয়ন্তী কাঁধে তুলে নিতে পারলে, আখতার তার অশান্ত চিত্ত-বৈকল্যের হাত থেকে আপাত ঃ সুখ-সমৃদ্ধির নিশ্চিত বলয়ে উত্তীর্ণ হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। গতানুগতিকতা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা বর্তমান বিশ্বের কতিপয় বিদ্রোহী স্ফুলিঙ্গের মতোই সে সহসা নিজের উৎস ও গন্তব্য সন্ধানে উদভ্রান্ত। দাজ্জাল তাকে অমোঘ শক্তিতে নিজের দিকে টানছে ; কিন্তু প্রচণ্ড নির্বেদে তাকে উপেক্ষা করে পরম পথের অবিচল অনুসন্ধিৎসায় সে চাচ্ছে পুণ্যাত্মার সান্নিধ্য ও তার উপশমী প্রভাব।"

গ্রন্থের অগ্রলেখায় বিধৃত কবির বক্তব্য উদ্ধৃত করে কবি তালিম হোসেন আরও লেখেন ঃ "এই বিবৃতি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় 'আপন ঘরে

www.nagorikpathagar.org

পরবাস' এক উন্মান কবি ব্যক্তিত্ব পরবাসীকেই আপন ঘরে স্থিত প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছেন। তাঁর কাব্যে, তাই যতোই বৈরী পরিবেশ হোক 'পুণ্যাত্মা' এবং তার সহমর্মিরা উদভ্রান্ত ঘর ছাড়া আখতারকে ঘরে ফিরে সহধর্মিনী প্রিয়ার বাহুবন্ধনেই নতুন পৃথিবী রচনা করতে প্রেরণা ও দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন।

"হে পৃথিবী নিরাময় হও' থেকে কবি- কল্পনার হাতে দিকভ্রান্ত রুগ্ন পৃথিবী নিরাময়ের যে দিগাভাস পাচ্ছে, তা নতুন না হলেও আমাদের আধুনিক কবিতায় তার হাতছানি অভিনব। আজকের সাহিত্য বস্তুবাদের কলরোলে প্রায় বধির। তার পাশাপাশি অধ্যাত্মের ইশারা সমৃদ্ধ সাহিত্যও আমাদের আছে। কিন্তু যা নেই যা থাকলেও খুবই দুর্নিরীক্ষ্য, তারই উজ্জ্বল উপহার বয়ে এনেছে এই কাব্য। বস্তুবিদ্ধতা থেকে অজর অধ্যাত্মে উত্তরণ। কবি এখানে অধমর্ণের শরীক হয়েই উত্তমর্ণের ভূমিকা পালন করেছেন। এবং 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' শুধু এক অসহায় জীবন-অভীপ্সা মাত্র নয়। পাঠকের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, এই কাব্যের কবি আপন অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞায় না হলেও অন্তত ঃ সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় অতীন্দ্রিয় বিশ্বাসে বলীয়ান। তাই তাঁর আহবানে সংশয় বা দৌর্বল্যের চিহ্ন মাত্র নাই। আমি মনে করি কাব্যে কবির চরিত্র বিভূতিই পাঠকের কাছে তাঁর অমোঘ ও অনিবার্য প্রভাব নিয়ে দেখা দেয়। এই অনিবার্য প্রভাবের উপযুক্ত বাহন হতে পারাতেই আঙ্গিক, প্রকরণ ও বাচনশৈলীর চরম সিদ্ধি। প্রাণ ও আত্মা ছাড়া বাহনের কোন ধ্রুপদী মূল্য বা উপযোগিতা নাই।"

কাব্য-নাট্য থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি পেশ করে কবি তালিম হোসেন তাঁর আলোচনার উপসংহার টেনেছেন এভাবে ঃ "প্রধানতঃ দৃঢ় সংবদ্ধ অথচ সাবলীল অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারে এই কাব্য রচিত হলেও এতে স্থান-কাল-পাত্রের মেজাজের সঙ্গে সহজ ও সংলগ্ন হতে গিয়ে কবি কখনো কখনো মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্ত ছন্দও ব্যবহার করেছেন। ছন্দপাতের ঘটনা এতই কচিৎ যে অনায়াসে তুচ্ছ করা চলে এবং কোথাও নাটকের সংলাপ উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে প্রয়োগসিদ্ধও বলা যায়। ভাষা-সৌকর্য প্রাগ্রসর আধুনিক ধারাকে অস্বীকার করে, কখনো নবতর আভাসের প্রতিশ্রুতি বহন করে। অভিনব দৃশ্য-পরিকল্পনা, নাটকীয় সংঘাত, প্রাণবন্ত সংলাপ এবং গীত ও চিত্রল আবহের জন্য এই কাব্যনাটকের মহৎ সাফল্য সম্পর্কে আমি আশাবাদী। বাংলাসাহিত্যের এক উন্নত ও স্থায়ী আসনের সোপান-মূলে আমি কবিকে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানাই।" **(তালিম হোসেন ঃ কবি আফজাল চৌধুরীর কাব্য নাটক ; 'হে পৃথিবী নিরাময় হও' দৈনিক সংগ্রাম, ১১ এপ্রিল,**

www.nagorikpathagar.org

১৯৮২)।

কবি আফজাল চৌধুরী আধুনিক বাংলা কাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য মৌলিক প্রতিভাধর কবি। দুর্ভাগ্যবশত নানা কারণে তাঁর সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা খুবই সীমাবদ্ধ। এ কারণে পাঠকের সুবিধার্থে উপরে কয়েকজন বিশিষ্ট সমালোচকের আলোচনা থেকে একটু বিস্তৃত আকারে উদ্ধৃতি পেশ করা হলো। তাঁর কাব্যের যথাযথ মূল্যায়ন হওয়া বাংলা কাব্যের অনুরাগী পাঠকদের জন্য একান্ত আবশ্যক।

আফজাল চৌধুরী মূলত কবি হলেও নাটক, প্রবন্ধ ও অনুবাদের ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করেছেন। তাঁর অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ইসলামী জীবনবোধ। বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, কোন কষ্ট-কল্পনা বা আবেগের তাড়নায় তিনি কখনো ইতিহাস বিকৃতি ঘটান নি। এক্ষেত্রে তাঁকে বাংলা সাহিত্যের অমর কবি কায়কোবাদের সঙ্গে তুলনা করা চলে। ইতিহাসের সত্য ও জীবন-সত্যকে তিনি প্রায়ই অবিমিশ্র করে ফেলেছেন। পাঠককে তিনি কোন অবস্থায়ই বিভ্রান্ত করেন নি, সত্য-সুন্দর ও কল্যাণের সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে ছিল তাঁর নিরন্তর অভিযাত্রা। এ মাধ্যমেই তিনি তাঁর কাব্য-সত্যকে জীবন-সত্যে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। আদর্শ-চেতনা এক্ষেত্রে তাঁকে নিরন্তর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

আফজাল চৌধুরীর রচিত নাটকসমূহও ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লেখা। এখানেও তিনি ইতিহাসের সত্য আর জীবন-সত্যকে একই সমান্তরাল অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর রচিত নাটকসমূহও ছন্দবদ্ধ কাব্য। বাংলা কাব্য-নাট্য রচনায় যাঁরা সফলতা অর্জন করেছেন, আফজাল চৌধুরী নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

আফজাল চৌধুরীর কাব্যের ভাষা ক্ল্যাসিকধর্মী। সংস্কৃতানুগ শব্দের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল। সংস্কৃতানুগ শব্দ তাঁর ধ্রূপদ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কাব্য রচনার উপযোগী ছিল বলে তাঁর ধারণা। এজন্য তিনি এ জাতীয় শব্দ অধিকমাত্রায় ব্যবহার করেছেন। ফলে সাধারণ পাঠকের জন্যে তা কিছুটা দুর্বোধ্য হলেও প্রকৃত কাব্যানুরাগীদের নিকট তার আবেদন হ্রাস পায় নি। তিনি ইসলামী আদর্শ-ঐতিহ্য- চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলেও আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দ ব্যবহারে আগ্রহী ছিলেন না। এক্ষেত্রে তিনি নজরুল-ফররুখ থেকে ছিলেন কিছুটা স্বতন্ত্র। তবে আদর্শ-ঐতিহ্য-চেতনার দিক থেকে তিনি ছিলেন তাঁদের সমগোত্রীয়।

www.nagorikpathagar.org

আফজাল চৌধুরীর গদ্যও অনেকটা কাব্যধর্মী। এজন্য তাঁর গদ্য নিরস না হয়ে পাঠকের নিকট সরস বাক্যবদ্ধ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। তাঁর গদ্য রচনা এ কারণে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে।

আফজাল চৌধুরীর অনুবাদ-কর্মও সহজ, সরল ও হৃদয়গ্রাহী। তিনি বিশ্ববিখ্যাত ফারসি ও উর্দু কবিদের কবিতা অনুবাদ করেছেন। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আফজাল চৌধুরীর সাফল্য ও অবদান কম নয়। 'বার্নাবাসের বাইবেল' তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ-কর্ম।

বিগত শতাব্দীর শেষ চার দশক কাল ধরে আফজাল চৌধুরী বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন মৌলিক প্রতিভাধর কবি। তাঁর সাহিত্যের স্বাদ ও আবেদনও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র মহিমায় সমুজ্জ্বল। তিনি বাংলা সাহিত্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

www.nagorikpathagar.org

www.nagorikpathagar.org

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম